বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক রাহবার
পীরে কামেল মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশ্‌বন্দী-এর বয়ান

খুতুবাতে যুলফিকার



খুতুবাতে যুলফিকার
[৩১ ও ৩২তম খণ্ড]

মূল

মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী

অনুবাদ

মুফতী শাফি বিন নূর

দাওরায়ে হাদীছ, জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

সম্পাদনা

মাওলানা মোহাম্মদ মুহিউদ্দীন

দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)
মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা
প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দারুল উলুম লাইব্রেরী
[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৮

প্রকাশক : মাওলানা শহীদুল ইসলাম
দারুল উলূম লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৮১৮৮০৮৫, ০১৭১২৫০৭৮৭৭

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

বর্ণবিন্যাস : পরশ কম্পিউটার, রায়েরবাগ, ঢাকা
প্রচ্ছদ : দি ব্রাইট

মূল্য : 500 মাত্র

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-৩১

- অনুপম নির্বাচন /২৩
- বোখারি শরীফের প্রথম সবক /৫৫
- বোখারি শরীফের শেষ সবক /৯৯
- আখেরাতের ধনাগার /১৪৭
- আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন ও গুরুত্ব /১৭৩
- গীবত ও নাশোকরি /২০৩
- মানুষ ও মাটি /২৩১

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-৩২

- তাওবার হাকীকত /২৫৩
- ওলামায়ে কেরামের প্রতি হৃদয়গ্রাহী দিকনির্দেশনা /৩০৫
- তাকওয়ার প্রতি যত্নবান হোন /৩৫৩
- ওলামায়ে কেরামের জন্য সোহবতে সালেহীনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য /৩৯১

সূচি নির্দেশিকা

খুতুবাতে যুলফিকার-৩১

অনুপম নির্বাচন /২৩

মহান আল্লাহর মহা অনুগ্রহ /২৩
অনুপম আদর্শ /২৪
সীরাতুন্নবীর একটি অভিনব দিক /২৫
মূল্যবান বস্তু অন্বেষণ দ্বারা-ই লাভ করতে হয় /২৫
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দুটি দু'আ /২৬
বিশেষ অতিথির আগমনের ঘোষণা /২৭
নবীজির উন্নত পূর্বপুরুষ /২৮
নবীজির উন্নত ভাষা /২৮
সর্বোত্তম জন্মস্থান /২৯
নিরাপত্তার শহর মক্কা মোকাররমা /৩০
মক্কা মোকাররমা : পৃথিবীর মধ্যদেশ /৩১
মক্কা মোকাররমার সর্বোত্তম মৌসুম /৩১
মক্কা মোকাররামার উত্তম সময় ও কাল /৩২
নবীজির উত্তম গোত্র ও বংশ /৩২
দাদার সর্বোত্তম নির্বাচন /৩৩
পিতার সর্বোত্তম নির্বাচন /৩৩
দুই যাবীহার বংশধর /৩৪
সম্মানিতা মায়ের সর্বোত্তম নির্বাচন /৩৫
নবীজির সর্বোত্তম নাম নির্বাচন /৩৬
লালনপালনের জন্য একজন শ্রেষ্ঠ নারীর নির্বাচন /৩৮
নবীজির জন্য উত্তম স্ত্রী নির্বাচন /৩৯
উত্তম পুত্রসন্তান নির্বাচন /৪০
উত্তম কন্যা নির্বাচন /৪১
নবীজির জন্য বন্ধু-সাথিও নির্বাচন করা হয়েছে সর্বোত্তম দেখে /৪২
সর্বোত্তম কিতাব নির্বাচন /৪২
সর্বোত্তম দীন নির্বাচন /৪৩
উপমাহীন সৌন্দর্য /৪৪
অভ্যন্তরীণ গুনাবলি /৪৬
নবীজির আরও কিছু প্রশংসনীয় বিষয় /৪৮

বর্ণমালার প্রশংসাজ্ঞাপন /৪৯
সুনিপুণ নির্বাচন /৫০

বোখারি শরীফের প্রথম সবক /৫৫

ইল্‌মে হাদীছের সংজ্ঞা /৫৬
ইল্‌মে হাদীছের ফজিলত /৫৬
ইমাম বোখারি (রহ.)-এর জীবনচরিত /৫৭
ইমাম বোখারি (রহ.) স্মরণশক্তি /৫৮
ইমাম বোখারি (রহ.)-এর তাকওয়া /৬০
বোখারি শরীফ লিপিবদ্ধের কারণ /৬০
বোখারি শরীফ লেখার সন /৬০
বোখারি শরীফ সংকলনের নিয়ম কী ছিল? /৬১
বোখারি শরীফে হাদীছের সংখ্যা /৬১
হাদীছ বর্ণনার শর্ত /৬২
কিতাবের নাম /৬৩
হাদীছ সংকলনের ইতিহাস /৬৪
সিহাহ সিত্তার বৈশিষ্ট্য /৬৫
সিহাহ সিত্তার সারাংশ /৬৬
আসাহ্‌হুল কুতুব /৬৭
আসাহ্‌হুল কুতুবের দলিল /৬৭
বোখারি শরীফের বৈশিষ্ট্য /৬৯
বোখারি শরীফ শুরু /৭০
بدء الوحي দ্বারা কেন শুরু করলেন /৭১
নূহ (আ.)-এর ওপর ওহীর আলোচনা কেন? /৭৫
হাদীছের সনদ : কিছু সূক্ষ্ম বিষয় /৭৬
প্রথম হাদীছ ও তার শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য /৭৯
উল্লিখিত হাদীছটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য /৮১
একাধিক নিয়তের ফলাফল /৮৩
হাদীছটি বলার প্রেক্ষাপট /৮৬
তাছাওউফের সূচনা /৮৮
হাদীছের নূর অর্জিত হবে কীভাবে /৯১
বক্তব্যের রেশ ধরে পৌঁছতে হবে বক্তা পর্যন্ত /৯২
সহীহ বোখারি শরীফের কবুলিয়্যাত /৯৩
সহীহ বোখারি শরীফ পাঠের নিয়ত /৯৫

বোখারি শরীফের শেষ সবক /৯৯

কুরআন ও হাদীছে মুতাআখ্খিরীনের সংজ্ঞা /১০০
সিহাহ সিত্তার সংকলকবৃন্দ সবাই অনারব ছিলেন /১০২
ইমাম বোখারি ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত /১০২
হাদীছের সর্বাধিক বিশুদ্ধ সংকলন /১০৪
সহীহ বোখারির মাকবুলিয়্যাত /১০৪
বোখারির শিরোনাম-পরিচিতি /১০৫
শেষ কিতাব কোনটি /১০৫
কিতাবুত তাওহীদের সাথে আমল পরিমাপের সম্পর্ক /১০৯
باب وزن اعمال কে শেষে আনার কারণ /১১৪
بدء الوحی এবং وزن اعمال এর মাঝে সম্পর্ক /১১৪
প্রথম হাদীছ ও শেষ বাবের সাথে সম্পর্ক /১১৫
কুরআনের আয়াত উল্লেখের উদ্দেশ্য /১১৫
আল্লাহর জন্য একবচন ও বহুবচন শব্দ ব্যবহার /১১৬
আল্লাহকে লক্ষ করে واحد ব্যবহার করা হবে না جمع/১১৬
আমলের ওজন অস্বীকারকারী /১১৭
আকল ও ওহী /১১৮
মিযানের হাকীকত ও মর্ম /১১৯
আহলে সুন্নাতের দলিল /১২০
আমল ওজন করার উপকারিতা /১২০
'মিযান' সম্পর্কে কিছু সূক্ষ্ম বিষয় /১২১
ওজন কে করবে /১২২
পাল্লা ঝুঁকানো হবে? /১২২
বহুবচন কেন ব্যবহার করা হলো /১২৩
কেয়ামতের দিন মিযান কত বড় হবে /১২৪
اعمال কেন বহুবচন /১২৪
সবার আমলই কি মিযান দ্বারা মাপা হবে /১২৪
কাফেরদের কর্ম কি মাপা হবে /১২৫
মাপা হবে কোন জিনিস /১২৬
মাআরেফে হাদীছ /১২৭
মতনের বিশ্লেষণ /১৩০
শিরোনাম সম্পর্কে কিছু তাত্ত্বিক কথা /১৩৪

ছন্দবদ্ধ ও মধুর বাণী /১৩৫
তাসবীহের গুরুত্ব /১৩৬
আশা ও শঙ্কা /১৩৯
জামাল ও জালালের মিশ্রণ /১৪১
প্রথম ও শেষ হাদীছের মাঝে সম্পর্ক /১৪১
সর্বশেষ বার্তা /১৪৩

আখেরাতের ধনাগার /১৪৭

আলেম ও জাহেলের মাঝে পার্থক্য /১৪৭
ইল্‌মের গুরুত্ব /১৪৮
পুঁজি কম, মুনাফা বেশি /১৪৯
প্রয়োজন অটল বিশ্বাস /১৫০
আখেরাতের ধনাগারের চাবি /১৫০
মজুর তিন প্রকার /১৫১
এক মিনিটে এক ঘণ্টার ইবাদাতের ছাওয়াব /১৫২
একটি বাক্যে দশ লাখ নেকি /১৫৩
চারটি শব্দ চার কোটি নেকি /১৫৩
অনেক বেশি ছাওয়াবের দুরুদ শরীফ /১৫৫
যে কালেমা ফেরেশতাদের ক্লান্ত করে দেয় /১৫৬
মণি-মুক্তার মতো মূল্যবান আমল /১৫৬
সত্তর হাজার ফেরেশতার দু'আ /১৫৭
আশি বছরের গুনাহ মাফের দুরুদ /১৫৮
সমুদ্রের ফেনাসমান গুনাহ মাফ /১৫৮
সত্তরটা মসিবত দূর হয়ে যাওয়া /১৬০
ভগ্নহৃদয় মানুষের জন্য সান্ত্বনা /১৬০
চার প্রকার শেফা /১৬২
সারা সপ্তার গুনাহ মাপ হবে যেভাবে /১৬৩
দাজ্জাল থেকে হেফাজত /১৬৩
আল্লাহর হেফাজত /১৬৩
আশ্চর্য পুরস্কার /১৬৪
মুসতাজাবুদ্দাওয়াহ /১৬৫
শাহাদাতের মর্যাদা লাভ /১৬৬
জাহান্নাম থেকে নাজাতপ্রাপ্তির দু'আ /১৬৭
নবীজির শাফাআত লাভ হবে /১৬৭

জ্ঞানী মানুষ /১৬৮
নবীজি হয়ে যাবেন জিম্মাদার /১৬৮
আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষণ /১৬৮
মাসনূন আমল জরুরি /১৬৯

আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন ও গুরুত্ব /১৭৩

মানুষের বিনির্মাণ /১৭৩
দেহ নির্মাণের স্থান /১৭৩
ব্যক্তিত্ব নির্মাণের স্থান /১৭৪
তাযকিয়ার সাধারণ পরিচয় /১৭৪
তাযকিয়ার নানা তরিকা /১৭৪
আল্লাহর কাছে তাযকিয়ার গুরুত্ব /১৭৫
প্রকৃত সাফল্যের মাপকাঠি /১৭৭
'ফালাহ' কী /১৭৮
তাযকিয়া হাসিলের তরিকা /১৭৮
জমিনের নাপাকি দূর করার পথ /১৭৮
আত্মার জমিন পবিত্র করার পদ্ধতি /১৭৯
আখেরাতে তাযকিয়ায়ে নফ্সের ব্যবস্থা /১৮১
আখেরাতের চিকিৎসালয় /১৮১
ইমার্জেন্সি রুম কবর /১৮১
কবরে গ্লুকোজের বোতল /১৮৩
কবরে প্রহার /১৮৪
কেয়ামতের দিনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ সুওয়াল /১৮৪
জাহান্নামের হাসপাতালের স্তর /১৮৪
সর্বনিম্ন শ্রেণি /১৮৫
স্পেশাল রুম /১৮৬
জাহান্নামের খাবার /১৮৭
জাহান্নামের পানীয় /১৮৮
জাহান্নামের হাসপাতালের ইউনিফর্ম /১৮৯
পর্দাহীন নারীর সাজা /১৯০
আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে মাহরুম হবে /১৯১
চামড়া পরিবর্তনের আযাব /১৯২
জাহান্নামিদের দেহাবয়ব /১৯৩
জাহান্নামের একটা বিশেষ ওয়ার্ড /১৯৩

যে যাকাত দেবে না তার শাস্তি /১৯৫
নিষিদ্ধ পথে গমন ও ব্যভিচারের শাস্তি
যে-রোগের কোনো চিকিৎসা নেই /১৯৮
জান্নাতে প্রবেশের শর্ত
রোগাক্রান্তদের প্রবেশ নিষেধ /১৯৯
ভালো করে চিন্তা করুন /১৯৯

গীবত ও নাশোকরি /২০৩

মানুষ ভালো মন্দের সমষ্টি /২০৩
ইচ্ছেটা মানুষেরই /২০৪
আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ক সঙ্কেত /২০৪
অঙ্গীকার পূর্ণ করা চাই /২০৬
গীবত একটা কবীরা গুনাহ /২০৬
গীবত কাকে বলে /২০৭
মহিলাদের গীবত ও নাশোকরির অভ্যাস /২০৭
গীবতের দ্বারা বান্দার হক নষ্ট করা হয় /২০৯
প্রকৃত গরিব কে /২০৯
জোড়ানো কঠিন খোয়ানো সহজ /২১০
গীবত একটা মহামারির রূপ নিয়েছে /২১০
গীবত ও অপবাদের শাস্তি /২১১
গীবত মৃত জন্তুর গোশত খাওয়ার মতো /২১২
ইসলামে মুমিনের মর্যাদা /২১৩
কেয়ামত দিনের ভয়াবহতা /২১৪
গীবত থেকে ক্ষমা পাওয়ার উপায় /২১৫
গীবত থেকে বাঁচার পথ /২১৬
সৎকর্মশীলদের নিদর্শন /২১৭
সরাসরি মাফ নিতে না পারলে দায়মুক্ত হওয়ার উপায়
হযরত শিবলি (রহ.)-এর হক মাফ করানোর অভিনব পদ্ধতি /২১৮
অবৈধ খেজুর আবদালের স্তর অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়াল /২২০
অনুমতি ছাড়া মাটি নেওয়ার কুফল /২২০
ফকীহ আবুল্লাইস সমরকন্দির তাকওয়া /২২১
নাশোকরির ফলে আল্লাহ থেকে দূরত্ব /২২২
অতীতকে ভুলে যেয়ো না /২২২
অকৃতজ্ঞতার আযাব /২২৩

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /২২৫
নেয়ামতের কদর করা উচিত /২২৭

মানুষ ও মাটি /২৩১

মানুষ মাটি থেকে সৃষ্টি /২৩১
শয়তান আগুন দ্বারা সৃষ্টি /২৩১
আগুনের চেয়ে মাটির উপকারিতা বেশি /২৩২
প্রত্যেক জিনিস তার মূল জিনিসের দিকেই ফিরে যায় /২৩২
মুসলিম ও অমুসলিমের দাফনের ব্যবস্থা /২৩৩
মাটির গুণগুলো বরণ করে নিন /২৩৪
রহমত হোন, আপদ নয় /২৩৪
নবীজির চরিত্র /২৩৫
আমাদের অবস্থা /২৩৬
ফেকাহর একটি মাসআলা /২৩৬
আমাদের মাঝে গ্রহণ করে নেওয়ার মানসিকতা কোথায় /২৩৭
সাহাবা কেরামের চরিত্র /২৩৮
ফুলের পরশে মাটি সুরভিত /২৩৯
শোনা ও মানার গুরুত্ব /৩৪০
নফসের হঠকারিতা শ্রবণে বাধা দেয় /২৪১
সফরের কিছু সাধনা /২৪৩
ফলদার শাখা ঝুঁকে থাকে বেশি /২৪৫
বিনয়ের ফল /২৪৬
আমিত্ব মিটিয়ে দিতে হবে /২৪৭

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

খুতুবাতে যুলফিকার-৩২

তাওবার হাকীকত /২৫৩

ইসলামের সৌন্দর্য /২৫৩
'আযাব প্রদানকারী' অর্থে আল্লাহর কোনো নাম নেই /২৫৪
ইসলামের শিক্ষা /২৫৪
মানুষের জীবন বরবাদ হওয়ার কারণ তিনটি /২৫৫
গুনাহের কালি মুছে যায় তাওবা দ্বারা /২৫৭
গুনাহ নেকি খেয়ে ফেলে /২৫৮
আল্লাহর সামনে নাফরমানি /২৫৮
গুনাহের তিনটি প্রকার /২৫৯
কবীরা গুনাহে লিপ্তদের করুণ অবস্থা /২৬০
গুনাহ লেখার ক্ষেত্রে অপেক্ষা /২৬১
গুনাহ প্রকাশকারীর ক্ষমা নেই /২৬১
দিন ও রাতের ফেরেশতা /২৬২
অনুতপ্ত হলে গুনাহ মাফ হয় /২৬৪
আফসোস করলে গুনাহ থেকে মুক্তি /২৬৪
আল্লাহর ভয়ের কারণেও মাফ মিলবে /২৬৫
ক্ষমা চাও বারবার /২৬৬
গুনাহকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করা হবে /২৬৭
গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করুন /২৬৮
আল্লাহর রহমতের আশা রাখবে /২৬৯
মুসলমানের গুনাহের বোঝা ইহুদি খ্রিষ্টানের কাঁধে /২৭০
তাওবা গুনাহকে মুছে দেয় /২৭১
বান্দা তাওবা করে কিনা আল্লাহ এই অপেক্ষায় থাকেন /২৭২
আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি /২৭২
তাওবাকারীর ওপর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি /২৭৩
নওজোয়ান যুবসমাজের তাওবা /২৭৪
প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য গুনাহ থেকে তাওবা /২৭৫
কেয়ামতের দিন যে-মানুষটি ভয়হীন থাকবে /২৭৫
তাওবার পরিসীমা /২৭৬
তাওবা নিয়ে টালবাহানা করা /২৭৬
তাওবা কবুলের সময় /২৭৭
'তাওবাতুন্নাছূহ' কাকে বলে /২৭৮

প্রত্যেক বান্দা-ই তাওবার তাওফীক পায় না /২৭৮
তাওবার নামায /২৭৯
রওজা শরীফে তাওবা করা /২৭৯
তাওবার গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা /২৮০
আল্লাহর রহমতের বিশালতা /২৮১
শিরকের ভয়াবহতা /২৮২
দীর্ঘবয়সিদের জন্য বিশেষ সুযোগ /২৮৩
চল্লিশ বছর বয়সিকে নবীজির উপদেশ /২৮৩
তিনটা ভুল মাফ /২৮৩
যাদের আমল লেখা হয় না /২৮৪
গুনাহগারদের ক্ষমাকারী আল্লাহ /২৮৫
সৌভাগ্যবান মানুষ /২৮৫
গুনাহও করব না, লজ্জিতও হব না /২৮৬
এস্‌তেগ্‌ফারের আমল /২৮৬
তাওবার মধ্যে ৬টি বিষয় আছে /২৮৭
এক বাদশাহর দাসির তাওবা /২৯০
এক রাজপুত্রের তাওবা /২৯০
জান্নাতি কাফেলায় শামিল হওয়া কঠিন নয় /২৯৫
২০ বছর পর ফিরে আসা /২৯৬
আশার প্রদীপ জ্বলতেই থাকবে /২৯৭
আল্লাহর রহমত এত প্রশস্ত! /২৯৭
আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা /২৯৯

ওলামায়ে কেরামের প্রতি হৃদয়গ্রাহী দিকনির্দেশনা /৩০৫

কুরআনের দৃষ্টিতে ইলমের গুরুত্ব /৩০৫
ইল্‌ম অর্জনের গুরুত্ব হাদীছের ভাষায় /৩০৭
ইল্‌ম বৃদ্ধি করার দুটি পথ /৩১০
তাফাক্কুহ ফিদ্দীন কীভাবে আসবে /৩১১
ইল্‌ম অর্জনের সুন্দর পথ /৩১১
মেহনত করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে /৩১৩
ইল্‌ম অর্জনের তাওফীক পেতে হলে দুটি জিনিস প্রয়োজন /৩১৪
খেদমত সৌভাগ্য এনে দিয়েছে /৩১৪
ইল্‌ম দুটি প্রচেষ্টার ফসল /৩১৮
বাতেনি ইল্‌মের বাহক ছিলেন যাঁরা /৩১৮
জানা ও মানার মধ্যে পার্থক্য /৩২০
ইল্‌মে ফুরকান লাভ করা /৩২১

দীনের ইল্‌ম সুরক্ষিত /৩২১
ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা সূফীদের থেকেও বহু ওপরের /৩২২
বে-আমল আলেম গাধার মতো /৩২৩
ওলামায়ে কেরামকে পথপ্রদর্শন /৩২৫
নিজের ভুল মেনে না নেওয়ার রোগ /৩২৫
নিজের এখলাছের পরীক্ষা নিতে থাকবে /৩২৬
সবার সাথে সমান সম্পর্ক বজায় রাখুন /৩২৮
জনসাধারণের অনুগত হয়ে থেকো না /৩২৭
দুনিয়াদারদের থেকে বিমুখ থাকবে /৩২৮
অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের পিছু পড়বে না /৩২৮
পবিত্রতার প্রতি যত্নবান থাকতে হবে /৩২৮
তোমার সুমহান মর্যাদা তোমাকেই রক্ষা করতে হবে /৩২৯
সব সংশয়ের জবাব দেওয়া জরুরি নয় /৩৩০
ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে সৎকাজের আদেশ ছেড়ে দিয়ো না /৩৩১
লেখালিখি ও বক্তৃতায় পারদর্শী হতে হবে /৩৩২
ওলামায়ে কেরাম সম্পদের পেছনে দৌঁড়াবে না /৩৩৩
আলেমরা কাফের বানান না, কাফের বাতান /৩৩৪
সুলূকের পথে মুজাহাদা আলেমদের কম করতে হয় /৩৩৪
বিষয়বস্তুকে সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করবে /৩৩৫
মাদরাসায় এসলাহি বয়ানের ধারা চালু রাখবে /৩৩৫
নিজের ওপর কঠোর আর অন্যের ওপর কোমল হোন /৩৩৬
ইল্‌মের নেয়ামতকে আল্লাহর ইহসান মনে করবে /৩৩৬
তিনটি অতুলনীয় কিতাব /৩৩৮
ইল্‌মে পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করা কঠিন /৩৩৮
ওলামায়ে দেওবন্দের ইল্‌ম ও আমল উভয় ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গতা /৩৩৯
হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.)-এর ইল্‌মি শান /৩৪০
মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর ইল্‌মি শান /৩৪০
মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদির ইল্‌মি শান /৩৪২
হযরত গাঙ্গুহির খলীফাদের ইল্‌মি শান /৩৪৩
তরবিয়তি মজলিসগুলোর উদ্দেশ্য /৩৪৫
ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে মুজাদ্দিদীনে উম্মাহ /৩৪৫
হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব /৩৪৭

তাকওয়ার প্রতি যত্নবান হোন /৩৫৩

তাকওয়ার অর্থ /৩৫৩
তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ /৩৫৩

তাকওয়ার পারিভার্ষিক অর্থ /৩৫৪
তাকওয়ার ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের বক্তব্য /৩৫৫
তাকওয়ার ফলাফল /৩৫৭
তাকওয়া প্রত্যেক কঠিন বিষয় থেকে নাজাত দেয় /৩৫৭
রিযিকের পেরেশানি দূর হয়ে যাবে /৩৫৮
কর্মে আসানি আসবে /৩৫৯
বোধশক্তি প্রদান করেন /৩৬০
এলাহি প্রেমের ভাগিদার হবে /৩৬০
এলাহি সম্পর্ক স্থাপিত হবে /৩৬১
রিযিকে বরকত হয় /৩৬১
ইল্‌মের প্রবৃদ্ধি /৩৬১
আমল কবুল করে নেবেন
অনিষ্ট হতে রক্ষা করবেন /৩৬২
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /২৬২
তাকওয়ার গুরুত্ব /৩৬৪
তাকওয়ার পয়গাম কুরআনে /৩৬৪
সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান হচ্ছে মুত্তাকী /৩৬৬
মুত্তাকী সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত /৩৬৬
আউলিয়া কেরামের আলোচনা /৩৬৭
তাকওয়ার সবচেয়ে বড় উপকারিতা /৬৯
সালফে সালেহীনের তাকওয়া ঘটনা /৩৬৯
খাদ্যখাবারে নবীজির সতর্কতা /৩৭০
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর তাকওয়া /৩৭০
হযরত ওমর (রাযি.)-এর তাকওয়া /৩৭০
ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর তাকওয়া /৩৭০
হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.)-এর তাকওয়া /৩৭১
হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর তাকওয়া /৩৭১
সায়্যেদা ফাতেমাতুয-যাহরা (রাযি.)-এর তাকওয়া /৩৭২
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর তাকওয়া /৩৭২
উলামা ও মাশায়েখে কেরামের তাকওয়া /৩৭৫
নারীদের মাঝে তাকওয়া /৩৭৭
ওলামায়ে দেওবন্দের তাকওয়ার ঘটনা /৩৭৯
নকশবন্দি তরিকার মাশায়েখে কেরামের তাকওয়া /৩৮৩
নিজের পরিমাপ করুন /৩৮৪
আখেরাতের স্ক্যানিং মেশিন /৩৮৫
আজই আত্মপর্যালোচনা করে নিন /৩৮৬

ওলামায়ে কেরামের জন্য সোহবতে সালেহীনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য /৩৯১

দুটি নেয়ামত /৩৯১
ইল্‌মের সাথে তাযকিয়াও লাগবে /৩৯১
আগেকার মাশায়েখে কেরাম উভয় নেয়ামতের অধিকারী ছিলেন /৩৯২
অধঃপতনের কারণ /৩৯৩
শায়খদের সোহবতে বিখ্যাত আলেমগণ /৩৯৩
ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) /৩৯৩
ইমাম মালেক (রহ.) /৩৯৩
ইমাম শাফেয়ি (রহ.) /৩৯৪
আবুল আব্বাস ইবনে শুরাইহ /৩৯৪
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল /৩৯৪
ইমাম আবু দাউদ (রহ.) /৩৯৬
আল্লাম ইবনে হাজ্‌র (রহ.) /৩৯৬
ইমাম রাযি (রহ.) /৩৯৬
শাইখুল ইসলাম আবদুল্লাহ আনসারি /৩৯৬
শাইখ আবুল আব্বাস ইয্‌যুদ্দীন আল-ফারুকী /৩৯৬
শায়খ আবদুল্লাহ (রহ.) /৩৯৬
মোল্লা জিওন (রহ.) /৩৯৬
ইমাম গায্‌যালি (রহ.) /৩৯৭
আল্লামা শামি (রহ.) /৩৯৭
মোল্লা নিযামুদ্দীন (রহ.) /৩৯৭
মোল্লা জামি (রহ.) /৩৯৭
আল্লামা মীর সায়্যেদ শরীফ জুরজানি /৩৯৮
আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলবি /৩৯৮
কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি /৩৯৮
হযরত মাওলানা আবদুল হাই (রহ.) /৩৯৮
ওলামায়ে দেওবন্দ /৩৯৯
একাধিক শায়খ থেকে ফয়েজ গ্রহণ /৩৯৯
সোহবতের প্রভাব /৩৯৯
বন্ধু চলে বন্ধুর ধারায় /৪০১
দৃষ্টি লাগার বাস্তবতা আছে /৪০২
আরেফীনের দৃষ্টি /৪০২
সোহবত ব্যতীত দীন আসে না /৪০৩
মাশায়েখের সোহবত ওলামায়ে কেরামের জন্য কেমন জরুরি /৪০৫

হযরত মুরশিদে আলমের উক্তি /৪০৭
মাশায়েখের সোহবত দ্বারা দিল জিন্দা হয় /৪০৭
অনুসরণের বরকত /৪০৯
মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)-এর উক্তি /৪১০
ইমাম গায্যালি (রহ.)-এর উক্তি /৪১১
আবুল কাসেম কুরায়শির উক্তি /৪১১
কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.)-এর উক্তি /৪১১
হযরত মুহাম্মাদ মা'সূম (রহ.)-এর উক্তি /৪১২
আল্লামা সায়্যেদ সালমান নদবি (রহ.)-এর উক্তি /৪১২
হযরত শায়খ মুহাদ্দিছে দেহলবি (রহ.)-এর উক্তি /৪১১
বিতর্কমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করো /৪১২
এসলাহের পথে বাধা /৪১৩
সোজা পথ কোনেটি /৪১৪
তাকলীদের ব্যাপারে দুটি কথা /৪১৪
সোহবতের বরকত /৪১৫
ওস্তাদ ছাড়া কিছুই হয় না /৪১৬
সোহবতের রং আসবে কীভাবে /৪১৬
এশ্কের দৌলত পাবেন আশেকীনের কাছে /৪১৭
স্বাদ নিয়ে দেখুন মজা পাবেন /৪১৮
এশ্কের দৌলত পাবেন আশেকীনের কাছে /৪১৯
তাবলীগ-তালীমের চেয়েও তাযকিয়া গুরুত্বপূর্ণ /৪২০
ইল্মের বিশ্বস্ততা /৪২০
তাছাওউফের সর্বনিম্ন উপকারিতা /৪২১
সোহবতের মাধ্যমে সহীহ দীনের ওপর অটল থাকা যায় /৪২৩
নেসবত প্রাপ্ত হওয়ার গ্যারান্টি /৪২৪
গায়রে মুকাল্লিদদের আকাবিরগণও তাছাওউফের প্রবক্তা ছিলেন /৪২৫
হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহির ওপর সোহবতের প্রভাব /৪২৬
মুফতী মুহাম্মাদ হাসান (রহ.)-এর উপর সোহবতের প্রভাব /৪২৮
কেম্বলপুরি থেকে কামেলপুরি /৪৩০
মূর্খতার অনুমান /৪৩১
যদি কোনো শুআইব আসে... /৪৩১

খুতুবাতে যুলফিকার

৩১তম খণ্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

অনুপম নির্বাচন

'নবীজির সীরাত ও তাঁর পবিত্র আদর্শ সুবিশাল আকাশের মতো সমগ্র জাতির জন্য স্থাপিত হয়ে আছে। মানুষ যেখানেই থাকুক– পাহাড়ে, জঙ্গলে, মরুপ্রান্তর আর অথৈ সমুদ্রে, নির্জন বা জনাকীর্ণ কোনো আবাসনে, যেখানেই থাকুক যদি সে মাথা উঁচু করে তাকায়, এই সুবিশাল আকাশ দেখতে পায়। তেমনি মানুষ জীবনবাঁকের যে-কিনারায়ই এসে দাঁড়াক, শিশু কিশোর যুবক-বৃদ্ধ যে-ই হোক, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও অনুসঙ্গে– চাই বিবাহ-বিরহ, ব্যবসাবাণিজ্য, সমাজ-রাষ্ট্র, রাজনীতি ও অন্য যেকোনো অবস্থায়ই হোক সর্বাবস্থার জন্য রয়েছে এক মহান আদর্শ। বিস্তৃত আকাশের মতো মানুষের মাথার ওপর সেই আদর্শ সর্বদা স্থির হয়ে আছে। জীবনের প্রতিটি কাজকর্মের জন্যই একজন মহানবী তাঁর এক সৌন্দর্যময় জীবনের সুমহান ধারা সমগ্র উম্মতের জন্য অকাট্যভাবে স্থাপন করে গেছেন। স্থাপন করে গেছেন অনাগত সকল উম্মতের জন্য একটি কর্মমুখর আদর্শের মানদণ্ড। নবীজির মহান জীবন তথা তাঁর সীরাত একটি আনুখা আলোচ্য বিষয় ওলামায়ে উম্মতের জন্য। তবে সত্য কথা হলো, কোনো মানুষ পরিপূর্ণভাবে প্রিয়নবীর সেই অসীম আদর্শের বর্ণনা কোনোদিনই উপস্থাপন করে শেষ করতে পারবে না। আজ আমরা সীরাতের আলোচনা করব একটু ভিন্নভাবে। আজ আমরা আলোচনা করব নবীজির জন্য নির্বাচিত বিষয়সমূহ। আল্লাহর এই নির্বাচন ছিল বড়ই সুনিপুণ ও অকাট্য।'

অনুপম নির্বাচন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

মহান আল্লাহর মহা অনুগ্রহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا

'আল্লাহ ঈমানদারদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন নবী পাঠিয়েছেন।'[১]

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

'যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তাহলে তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।'[২]

সেই অগণিত নেয়ামতের কথা আল্লাহ বলেননি যে, এই নেয়ামত ওই নেয়ামত তোমাদের আমি দিয়েছি। হাজারো নেয়ামতের কোনোটির কথা-ই বলেননি। কিন্তু একটি নেয়ামতের কথা বলেছেন। একটি নেয়ামতের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেছেন, এটি তো তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ। মানুষকে আল্লাহ চক্ষু দিয়েছেন, কর্ণ দিয়েছেন, নাসিকা দিয়েছেন, দেমাগ-আকল ও জ্ঞান দিয়েছেন। আলো-বাতাস, সাগর-নদী বিস্তৃত ভূমি আর স্বচ্ছ

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬৪

২. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৪

জলরাশি, ফুল-ফসল, গাছপালা আরও কত কী দিয়েছেন। কিন্তু কোনোটির কথাই তিনি বলেননি যে, এই নেয়ামত দিয়ে আমি তোমাদের অনুগ্রহ করেছি। শুধু একটি নেয়ামতকেই তিনি আপন অনুগ্রহ বলে উল্লেখ করেছেন। আর অনুগ্রহ প্রকাশ করার মতো আল্লাহর খাযানায় এই একটি নেয়ামতই ছিল। সেই নেয়ামতটি হচ্ছে প্রিয়নবী মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়ায় আগমন। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا

'আল্লাহ ঈমানদারদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন নবী পাঠিয়েছেন।'[১]

বোঝা গেল, এই ধরায় নবীজির আগমনই উম্মতের জন্য সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বড় নেয়ামত।

অনুপম আদর্শ

নবীজির সুবিশাল সীরাতের দৃষ্টান্ত আমি কী দিয়ে বোঝাব? উত্তাল সেই সমুদ্রকে আনব? আচ্ছা দেখুন, এই সমুদ্রের বিস্তৃতি, সমুদ্রের গভীরতা আর তার জলরাশির পরিমাপ করা যেমন কোনো বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতে মুবারাকার বর্ণনা উপস্থাপন করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এক কবি বড় চমৎকার বলেছেন,

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَ يَا سَيِّدَ الْبَشَرِ ■ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيْرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ

لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهٗ ■ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

'হে মহা সৌন্দর্যের অধিকারী! হে মানবসম্রাট! তোমারই চেহারার নূরের ঝলকে আলোকিত হলো চন্দ্র।

কারও পক্ষেই সম্ভব নয় তোমার নাম ও প্রশংসা পূর্ণভাবে প্রকাশ করা। আল্লাহর পরেই তুমি শ্রেষ্ঠ এই তো সারকথা।'

সংক্ষিপ্ত ও সারকথা তো এই যে, হে আল্লাহর পেয়ারা হাবীব! আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের পর তোমার মর্যাদাই সবার সেরা।

নবীজির সীরাত আকাশের মতো। মানুষ, শহরে, গ্রামে, পাহাড়ে, পর্বতে, সাগরে, নদীতে, মরুপ্রান্তর কিংবা বনবাদাড় যেখানেই থাকুক, যেখান থেকেই

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬৪

দৃষ্টি ওপরের দিকে তুলুক, জীবনের প্রতিটি ক্ষণে প্রতিটি অনুষঙ্গে সে দেখতে পায় সীরাতে নববীর এই মহা আকাশ। দেখতে পায় চলার পথ। ওই পথ বেয়ে সে এগিয়ে চলে অনন্তের পথে। এগিয়ে চলে জান্নাতের পথ ধরে। এই সীরাত তো সেই জান্নাতি কাফেলার চলার পথ। এই পথ তার পথিককে অতি যত্নের সাথে পৌঁছে দেবে জান্নাতে চিরশান্তির আবাসনে।

যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, বিবাহিত-অবিবাহিত, বণিক-চাষা, ধনী-দরিদ্র সবার জন্য সকল পথের জন্য এই সীরাতে, এই জীবনাদর্শে, এই মাহামনবের পথে রয়েছে মহামুক্তির সনদ। রয়েছে পথ পেরিয়ে মনযিলে পৌঁছার নিশ্চয়তা ও অঙ্গীকার। এই সীরাত মানুষের সারাটা জীবনকে আকাশের মতো ছায়া দান করে স্থাপিত রয়েছে। আর এই আকাশের পথ ধরেই মানুষ পেতে পারে অনন্ত জীবনের মহামুক্তি ও কল্যাণ। পেতে পারে কাঙ্ক্ষিত হেদায়েত।

সীরাতুন্নবীর একটি অভিনব দিক

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান জীবন তথা তাঁর সীরাত একটি অভিনব আলোচ্য বিষয় ওলামায়ে উম্মতের জন্য। তবে সত্য কথা হলো, কোনো মানুষ পরিপূর্ণভাবে তাঁর সেই অসীম আদর্শের বর্ণনা কোনোদিনই উপস্থাপন করে নিঃশেষ করতে পারবে না। আজ আমরা সীরাতের আলোচনা করব একটু ভিন্নভাবে।

আল্লাহর এই নির্বাচন ছিল বড়ই সুনিপুণ ও সম্পূর্ণই অকাট্য। মনে করুন, এক মায়ের অঢেল সম্পদ আছে। তিনি তাঁর কন্যাকে সোনা-গয়না-অলংকার কিনে দিতে চাচ্ছেন। তো তিনি তো অবশ্যই বাজার থেকে সেরা এবং সূক্ষ্ম হাতে গড়া সবচেয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয় জিনিসটিই তার আদরের কন্যার জন্য ক্রয় করবেন। তাহলে চিন্তা করুন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পেয়ারা হাবীবকে দুনিয়ায় পাঠালেন। তো তিনি তাঁর প্রিয় হাবীবকে সজ্জিত করার জন্যে সর্বপ্রকার উত্তম বিষয়কে নির্বাচন করলেন। যত উত্তম গুণে সাজানো যায়, সেই সর্বোচ্চ উত্তম গুণ ও আখলাকে তিনি তাঁর হাবীবকে সজ্জিত করলেন। আজ একজন তালেবুল ইল্‌মের মতো গভীর মনোনিবেশসহকারেই পড়তে হবে পেয়ারা নবীজির পেয়ারা সীরাত।

মূল্যবান বস্তু অন্বেষণ দ্বারা-ই লাভ করতে হয়

স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যদি একজন মানুষের কাছে কোনো অপ্রয়োজনীয় ও কম মূল্যের জিনিস থাকে, সে তা কোনো মানুষ না চাইলেও

দান করে দেয়। আর কোনো মূল্যবান জিনিস থাকলে সেই জিনিসটি একেবারে কাকুতির সাথে না চাইলে মানুষ দিতে চায় না। তো অন্যান্য যত আম্বিয়া কেরামই দুনিয়ায় এসেছেন, আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত তাঁদের কোনো চাওয়া ছাড়াই নিজের থেকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়ায় প্রেরণের সময় আল্লাহ চাইলেন যে, আমার কাছে কেউ আবেদন করুক।

হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন বাইতুল্লাহ শরীফের নির্মাণ সমাপ্ত করলেন, তখন ইলাহী দরবার থেকে ঘোষণা হলো, হে আমার বন্ধু ইবরাহীম! তুমি আমার ঘরটি বানিয়ে দিয়েছ, আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব। চাও তোমার কী চাওয়ার আছে। আবেদন করো। তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) দু'আ করলেন, হে আমার রব্বে কারীম! আমি মসজিদ বানিয়ে দিয়েছি; এবার ইবাদাতকারী ও ইবাদাত শিক্ষাদানকারী আপনি পাঠিয়ে দিন। আমি মাদরাসা বানিয়ে দিয়েছি; আপনি কুরআনের শিক্ষক প্রেরণ করুন। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে, ইবরাহীম (আ.) দু'আ করলেন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا

'হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গাম্বর প্রেরণ করুন।'[১]

যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদের কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চই আপনিই পরাক্রমশালী ও হেকমতওয়ালা।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুনিয়ার কোনো মালসম্পদ চাচ্ছি না! আমি আপনার কাছে একজন স্বর্ণপুরুষ চাই। আমি সেই নেয়ামত চাই, যে নেয়ামত তোমার কুদরতের খাজানায় শুধু একটিই আছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দুটি দু'আ

দেখুন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দু'আ হলো দুটি। একটি হলো, তিনি দু'আর মধ্যে সন্তান চেয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে সন্তান ইসমাঈল দান করেছেন। ইসমাঈল শব্দটির দুটি অংশ আছে। প্রথমটি ইসমা। দ্বিতীয়টি ঈল। ইসমা মানে তুমি শোনো আর ঈল মানে হে ইলাহ! অর্থাৎ– হে আল্লাহ!

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১২৯

তুমি শোনো। তো আল্লাহ তাকে ইসমাঈল দান করলেন। আর ইসমাঈলের ৪১তম বংশধরের মধ্যে আল্লাহ পেয়ারা হাবীবকে প্রেরণ করলেন।

তো তিনি যখন পেয়ারা হাবীবকে পাওয়ার দু'আ করলেন, তখন আমীন বলেছিলেন ইসমাঈল যবীহুল্লাহ। আর ওই দু'আটি যেখানে চেয়েছেন, তার নাম হচ্ছে বাইতুল্লাহ। আর যার থেকে চেয়েছেন সেই রব তো আল্লাহই। আর চেয়েছেন যাঁকে, তিনি হলেন হাবীবুল্লাহ। তো আল্লাহ তাঁর এই দু'আও কবুল করলেন এবং তাঁরই বংশধারায় প্রেরণ করলেন পেয়ারা হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে।

দেখুন, হযরত ইবরাহীম (আ.) দুটি নেয়ামত পেয়েছেন। এক. যমযমওয়ালা ইসমাঈল আর কাওছারওয়ালা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। ইসমাঈল (আ.) আল্লাহর নিকট প্রিয় হয়েছেন। কারণ, তিনি আল্লাহর জন্য কুরবান হওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিলেন। আর নবীজি তো হয়েছেন আল্লাহরই প্রেমাস্পদ। সুবহানাল্লাহ! কত অপূর্ব মিল! কত-কত নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন হযরত ইবরাহীম (আ.)! এক তো যবীহুল্লাহ তথা আল্লাহর জন্য কুরবান হতে প্রস্তুত সন্তান পেয়েছেন। আর দ্বিতীয়ত হাবীবুল্লাহ তথা আল্লাহর প্রেমাস্পদ পেয়েছেন। তো আল্লাহ হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর উভয় দু'আই কবুল করেছেন।

তো স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়, যদি কোনো প্রোগ্রাম চলতে থাকে এবং অনুষ্ঠান চলা অবস্থায় কোনো বিশেষ ও প্রধান মেহমানের আগমন হয়, তখন এলান করে দেওয়া হয়, অমুক সাহেব এসে গেছেন। তো আল্লাহও চাইলেন, যখন আমার হাবীবের আগমনের সময় হবে, তখনও কোনো এলানকারী এলান করে দিক, তিনি আসছেন।

বিশেষ অতিথির আগমনের ঘোষণা

এ-কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)কে নির্বাচন করলেন। বললেন, ঈসা! তুমি দুনিয়াতে যাও। গিয়ে ঘোষণা দাও। একজন পয়গাম্বর আমার পরে আগমন করছেন, যার পবিত্র নাম হবে আহমদ। আরেকটি কথা শুনুন। কোনো মজলিসে প্রধান অতিথি বয়ান করার আগে একজন উপস্থাপক তাঁর নামটা ঘোষণা করে দেন। আবার প্রধান অতিথির বয়ানের পর ওই উপস্থাপক মজলিসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেন। আল্লাহ তা'আলাও এই পদ্ধতিতেই হযরত ঈসা (আ.)কে আসমানে তুলে নিলেন

এবং আমাদের মুহাম্মাদি উম্মতের সমাপ্তির বেলায় তাঁকে আবারো প্রেরণ করবেন এবং তিনি মুহাম্মাদি শরীয়তের ওপর আমল করবেন। তারপর তাঁর মাধ্যমেই দীনে মুহাম্মাদির শুভ সমাপ্তি ঘটবে।

নবীজির উন্নত পূর্বপুরুষ

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের রহমত দেখুন। তাঁর প্রিয়তম হাবীবের আগমনের কথা ছিল তো আল্লাহ তাঁর আগমন উপলক্ষে যা-যা করেছেন তার সবই সর্বোৎকৃষ্ট। তাঁর পূর্বপুরুষ হিসেবে হযরত ইবরাহীম (আ.)কে নির্বাচন করেছেন। তিনি তো বড় বুযুর্গ ছিলেন। আর ইবরাহীম অর্থই তো বুযুর্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তো বুযুর্গ ব্যক্তি নির্বাচন করা হয়েছে পূর্বপুরুষরূপে। আর হযরত ইবরাহীম (আ.)ও এমন বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, তাঁর সুউচ্চ মর্যাদাকে সকলেই মেনে নিয়েছে। পৃথিবীর সকল বড় বড় ধর্মের অনুসারীরা তাঁর মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বকে সত্যায়ন করেছেন। যেমন– মুসলমান, খ্রিষ্টান, ও ইহুদি সকলেই তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রবক্তা।

নবীজির উন্নত ভাষা

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা নবীজির জন্য আরবি ভাষাকে নির্বাচন করেছেন। ইরানি ভাষাও তো নির্বাচন করতে পারতেন, হিব্রু ভাষাও নির্বাচন করতে পারতেন। ফারসি বা অন্য যেকোনো ভাষা নির্বাচন করতে পারতেন। কিন্তু নবীজির জন্য আল্লাহ আরবি ভাষা নির্বাচন করেছেন এজন্য যে, এই ভাষাটি এমন, যার মাধ্যমে মনের ভাবকে পূর্ণরূপে মনের মতো করে ব্যক্ত করা যায়। এই ভাষা বালাগাত-ফাসাহাত তথা অলংকার ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজের তুলনা শুধুই নিজে। আর এই ভাষায়ই আল্লাহ পূর্ণভাবে অলংকৃত করেছেন আপন পেয়ারা হাবীব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। নবীজি নিজেই বলেছেন,

اَنَا اَفْصَحُ الْعَرَبِ

'আমি আরবের সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী।'

ফাসাহাত ও বালাগাতের ব্যাপারে একটি শে'র শুনুন।

سمجھ میں صاف آجائے فصاحت اس کو کہتے ہیں

اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں

যে-ভাষা ও বক্তব্য শ্রবণ করে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তাকেই বলে ফাসাহাত। আর যে-ভাষা ও বক্তব্য শ্রবণ করার পর তা শ্রোতাকে প্রভাবিত করতে পারে, তাকে বলে ভাষার অলংকার তথা বালাগাত।

এজন্যই দেখা যায়, সেই জাহেলি যুগ থেকে আরবিরা অন্য ভাষাভাষীদের আজমী তথা বোবা বলে। কারণ, তাদের ভাষার এক বিশাল ভান্ডার রয়েছে। বেশ সমৃদ্ধ করে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এই ভাষাকে। তারা বলে, অন্য ভাষীরা মনের আবেগ-অনুভূতিকে প্রকাশই করতে পারে না। আর ব্যাপারটা এমনই। আরবিতে অল্প কথায় অনেক অর্থ সমৃদ্ধ বক্তব্য দেওয়া যায়। সেজন্যই আরবরা অন্য ভাষীদের আজমী বলে।

আপনি যদি কাউকে বলতে চান, নামায পড়ুন, তাহলে ইংলিশে এই বলতে হবে-offer the prayer ইংলিশে এখানে তিনটি শব্দ ব্যবহার হয়েছে। আর বাংলায় দুটি শব্দ ব্যবহার হয়। উর্দুতেও দুটি (نماز پڑھو) আর একই কথা আরবিতে বললে ছোট্ট একটি শব্দই এ-কথাটি ব্যক্ত করা যায় صَلِّ শব্দ একটি; অথচ অর্থ দিয়েছে কয়েকটি শব্দের। তাই বলছি, আরবি ভাষার গভীরতা অনেক। অনেক সমৃদ্ধ। তাই তো কুরআনের এটিও একটি বিশেষত্ব যে, তার কথা কম ও সংক্ষিপ্ত; কিন্তু অর্থ অনেক ও বিস্তৃত। যেন সমুদ্রকে কূপের ভেতর, পেয়ালার ভেতর নিয়ে আসা হয়েছে।

তো দেখুন, আল্লাহ তাঁর পেয়ারা হাবীবের জন্য যে-ভাষাটি নির্বাচন করেছেন, সেটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, মর্যাদাশীল ও ভাবসমৃদ্ধ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষা।

সর্বোত্তম জন্মস্থান

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর পেয়ারা হাবীবকে যে-স্থানে সৃষ্টি করেছেন, যেখানে পেয়ারা নবীর জন্ম হয়েছে, তা এক মহান ও সর্বোত্তম নগরী। উত্তর মেরু কিংবা দক্ষিণ মেরু বা পূর্ব পশ্চিমের অন্য যেকোনো দেশ বা জনপদেও তো নবীজির জন্ম হতে পারত। কিন্তু তা তো হয়নি। আপনি যদি একটি বিশ্বমানচিত্র সামনে নিয়ে বসেন, দেখবেন, জাযীরাতুল আরব স্থানটি এমন যে, তার চার পাশে পানি আর পানি। শুধু একটি জায়গা দিয়ে সংযুক্ত হয়ে আছে পৃথিবীর সাথে। যেমন– মানুষের দেহের ভেতরের হৃৎপিণ্ডটি সমস্ত দিক থেকে দেহ হতে পৃথক। শুধু এক দিক থেকে দেহের সাথে গাঁথা, যেন ঝুলে আছে। এই হৃৎপিণ্ডটিই তো যতক্ষণ স্পন্দিত হতে থাকে, ততক্ষণ মানুষ

ক্রিয়াশীল ও জীবন্ত থাকে। আর যখনই এর স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়, তখনই মানুষের জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

পৃথিবীর মানচিত্র দেখলেও এমনই মনে হবে, যেন জাযীরাতুল আরব অঞ্চলটি গোটা পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড। তাই তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার আলামতসমূহের মধ্যে সর্বশেষ আলামত হলো, কা'বা ঘরটি ধসে যাবে। তারপরই আল্লাহ এই বিশ্বজাহানকে ধ্বংস করে দেবেন। তো এই জাযীরাতুল আরব হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের হৃৎপিণ্ড। এই হৃৎপিণ্ড যত দিন বিদ্যমান থাকবে, ততদিন এই পৃথিবীও টিকে থাকবে।

নিরাপত্তার শহর মক্কা মোকাররমা

দেখুন, নিরাপত্তার শহর হলো মক্কা। এ শহরের ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছেন–

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا

'হে আল্লাহ! তুমি এই শহরকে নিরাপদ বানিয়ে দাও।'[১]

তো আল্লাহ রব্বুল আলামীন সেই সময় থেকেই শহরটিকে নিরাপদ করে দিলেন। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্জাতুল বিদা'-এর দিন আমভাবে এলান করে দিলেন, এই শহরের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করে দিলেন। এত সুদৃঢ় ছিল পেয়ারা হাবীবের সেই ঘোষণা যে, আজ পর্যন্ত সেই হেজায ভূমি, সেই জাযীরাতুল আরব নিরাপত্তার বলয়ে আচ্ছাদিত আছে। এখানে ভিনদেশি কোনো শত্রু বা পরাশক্তি এসে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ, এই ভূমির চার পাশের পাহাড়গুলোকে এমনভাবে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যে وَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ সবুজ বলে কিছু নেই সেখানে। শুধু এবড়েখেবড়ো শুষ্ক মরুপ্রান্তর। তাই তো তৎকালীন পরাশক্তি কেসরা ও কায়সার পর্যন্ত জাযীরাতুল আরবকে পদানত করার দুঃসাহস দেখায়নি।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা এই এলাকাটিকে অশুভ শক্তির হাত থেকে বড় সুন্দরভাবে রক্ষা করেছেন। এটি নিরাপদ এলাকা। কেউ এর শান্তি-সম্প্রীতিকে নষ্ট করে দিতে চাইলে আল্লাহ তাকেই ধ্বংস করে দেবেন।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১২৬

যেমন– আবরাহা একবার এতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ বরং আবরাহার গোটা হস্তিবাহিনীকে ধ্বংস করে দিলেন ক্ষুদ্র কতগুলো পাখি দ্বারা। এই জনপদের নিরাপত্তা বিনষ্ট করার চেষ্টায় কেউই সফল হতে পারেনি এবং কেউ সফল হতে পারবেও না।

লাখো মানুষ হজ করার জন্য পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসছে এই শহরে। এত-এত মানুষ বহিরাগত। আবার স্থানীয় কত মানুষ আছে। এখনও তো শুনিনি কখনও কোনো বিপর্যয় হয়েছে। এ আল্লাহর বড় এক নেয়ামত।

মক্কা মোকাররমা : পৃথিবীর মধ্যদেশ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন স্থানে প্রেরণ করলেন, যেটি সারা বিশ্বজগতের হৃৎপিণ্ড। আপনি যদি পৃথিবীর মানচিত্র দেখেন, তবে দেখবেন এই মক্কা মোকাররমাই হবে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। বাইতুল মোকাদ্দাস পৃথিবীর মধ্যদেশ নয়। পৃথিবীর মধ্যদেশ হচ্ছে এই পবিত্র শহর মক্কা। কারণ, এটি পৃথিবীর প্রথম আবাস। আবার কেন্দ্রবিন্দুও। একেবারে পৃথিবীর মাঝামাঝি স্থান।

যেমন– কোনো স্থির পানির মধ্যে যদি আপনি একটি ঢিল নিক্ষেপ করেন, তাহলে সেখানে ঢেউ উঠবে। সেই ঢেউটি একটি কেন্দ্রকে ঘিরেই কিন্তু প্রসারিত হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলাও নবীজিকে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে প্রেরণ করেছেন যেন প্রিয় হাবীবের নূর এই কেন্দ্রকে ঘিরে দিকদিগন্তে প্রসারিত হতে থাকে।

তো বোঝা গেল, আল্লাহ নবীজির জন্য স্থান হিসেবেও একটি উন্নত ও উৎকৃষ্ট ভূমি নির্বাচন করেছেন।

মক্কা মোকাররমার সর্বোত্তম মৌসুম

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় মক্কা মোকাররমার মৌসুমও উত্তম ছিল। দেখুন, কোনো-কোনো দেশে বৃষ্টি খুব বেশি হয়। কোনো-কোনো দেশে শীত বেশি পড়ে। কোনো-কোনো দেশে তুষারও পতিত হয়। আচ্ছা মক্কা মোকাররমার মৌসুমগুলো যদি এমন হতো, তাহলে মানুষ কত বেশি রোগাক্রান্ত হয়ে যেত! তাই আল্লাহ তা'আলা মক্কা মোকাররমার ঋতুকে এমনভাবে তৈরি করলেন যে, গরম ঠিক; কিন্তু সেই গরম এমন যে, লাখো মানুষ সমবেত হওয়ার কারণে যে-প্রতিক্রিয়া হওয়ার

কথা ছিল, তা আর হয় না। একের রোগ অন্যের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। সুবহানাল্লাহ! দেখুন, কেমন ঋতুর দেশে আল্লাহ তাঁর পেয়ারা হাবীবকে প্রেরণ করেছেন।

মক্কা মোকাররামার উত্তম সময় ও কাল

দেখুন, অনেক দেশ আছে, যেখানে ছয় মাস দিন আর ছয় মাস রাত থাকে। আর এই মক্কা আনুমানিক অর্ধেক সময় থাকে দিন আর বাকি অর্ধেক সময় থাকে রাত। অবশ্য ঋতু হিসেবে সামান্য আগ-পিছে হয়। দেখুন, সর্বদিক থেকে এই সময়টা এবং রাত-দিনের এই ধারা দারুণ চমৎকার। এমন ঋতুসমৃদ্ধ দেশই নির্বাচন করেছেন মহান আল্লাহ তাঁর হাবীবের জন্য।

নবীজির উত্তম গোত্র ও বংশ

একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট লক্ষ করুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের যেকোনো গোত্রেই জন্ম নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি জন্ম গ্রহণ করলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধারায়। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ৪৪টি বংশধারা ছিল। বনূ ছাকীফ, বনূ নাজীর, বনূ খাজরাজ, বকর ইবনে ওয়ায়েল ইত্যাদি। এমন আরও অনেকগুলো গোত্র ছিল, যার ধারা গিয়ে মিলিত হয়েছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে। তো আল্লাহ এসব গোত্রের মধ্যে অন্য কোনো গোত্রে তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেননি। বরং তিনি নবীজিকে কুরাইশ গোত্রে প্রেরণ করেছেন।

কোরাইশ (قُرَيْش) শব্দটি (قرش) কারশুন থেকে এসেছে। এর অর্থ এমন স্থান, যা নড়াচড়া করে না। তো কেমন যেন ওই গোত্রকে কোরাইশ এজন্য বলা হতো যে, তাদের চলনবলন, ওঠাবসা সবই ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাদের রুচি-প্রকৃতি সবই ছিল উন্নত ও সবার মাঝে গ্রহণযোগ্য। তো এমন সর্বোত্তম রুচিবোধসম্পন্ন গোত্রকে আল্লাহ নির্বাচন করেছেন তাঁর পেয়ারা হাবীবের আগমনস্থলরূপে। আবার তাদের মধ্যে সর্বোত্তম উপগোত্র বনু হাশেমের মধ্যে আল্লাহ নবীজিকে পাঠিয়েছেন। বনু হাশেম অতিথিপরায়ণ হিসেবে বিখ্যাত একটি গোত্র ছিল।

দাদার সর্বোত্তম নির্বাচন

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত নবীজির জন্য কেমন দাদা নির্বাচন করলেন? হ্যাঁ, আবদুল মুত্তালিব। তিনি বাইতুল্লাহ শরীফের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তিনি বাইতুল্লাহর খাদেম ছিলেন। সুবহানাল্লাহ! তাঁকে সর্বোত্তম কর্ম বাইতুল্লাহর কাজে লাগিয়েছেন এজন্যই যে, তাঁকে নবীজির দাদা হিসেবে নির্বাচন করবেন। তাঁর হাতেই আল্লাহ বাইতুল্লাহর চাবি তুলে দিলেন। এত মর্যাদাবান ছিলেন নবীজির দাদা আবদুল মুত্তালিব।

পিতার সর্বোত্তম নির্বাচন

আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবের জন্য কেমন পিতা নির্বাচন করলেন? আবদুল মুত্তালিবের ১২জন সন্তান ছিল। সেই বারোজনের মধ্যে অন্য কেউ তো হুজুরের পিতা হতে পারতেন। একটু চিন্তা করুন। তাদের একজনের নাম ছিল আবদুল ওয্যা। একেই আবুলাহাব বলা হতো। একজনের নাম ছিল আবদুশ শাসম। একজনের নাম ছিল আবদুল হারেস।

এখন দেখুন, এদের কারও ঔরসে যদি নবীজির জন্ম হতো, তবে লোকে বলত, ওর বাবার নামই তো মূর্তির নামে। ও আর কী ধর্ম প্রচার করছে! আবার নবীজির এক চাচার নাম ছিল নওফেল, যার অর্থ শক্ত ভূমি। এক চাচার নাম ছিল হামযা, যার অর্থ দীর্ঘ ভূমি। এক চাচার নাম ছিল আব্বাস, যার অর্থ পাথুরে জমিন। তো একেকজনের নাম একেক রকম। হয় কোনো মূর্তির নামে নাম, না হয় দেখা যায় একেবারে অর্থহীন।

হ্যাঁ; সেই বারোজন সন্তানের মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ। যার অর্থ আল্লাহর বান্দা। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর শান দেখুন, আল্লাহর কুদরতের কারিশমা দেখুন। তিনি তার প্রিয়তম হাবীবের জন্য কেমন বাবা নির্বাচন করলেন? তার নাম যে কতই-না সুন্দর। আবদুল্লাহ– আল্লাহর বান্দা। কারণ, প্রিয়তম নবী আগমন করছেন। তিনি তো এসে সেই আল্লাহর বন্দেগি-ই শেখাবেন। এবার নবীজিকে কেউ অপবাদ দিতে পারবে না, তুমি যে-মূর্তির বিরোধিতা করছ, তোমার বাবার নামই তো সেই মূর্তির নামে ছিল। আর আবদুল মুত্তালিবের বারো সন্তানের মধ্যে আবদুল্লাই অধিক সুদর্শন ছিলেন। তার চেহারায় এমন নূর জ্বলজ্বল করত যে, মানুষ হতভম্ব হয়ে যেত। ফাতেমা নামে এক নারী তো তাকে নিজের বিবাহের জন্য নিজ থেকেই প্রস্তাব দিয়ে বসে ছিল।

দুই যাবীহার বংশধর

হযরত ইসমাঈল যাবীহুল্লাহর মতো আবদুল্লাহও যাবীহুল্লাহ্ তথা আল্লাহর জন্য জবাইকৃত ছিলেন। কালের আবর্তে এই যমযম কূপ ধুলোবালির ভেতর হারিয়ে গিয়েছিল। আবদুল মুত্তালিব একে আবার আবিষ্কার করতে চাইলেন। বহু খোঁজাখুঁজি করছেন; কিন্তু পাচ্ছেন না। তাই তিনি মান্নত করলেন, যদি আমি যমযম পেয়ে যাই, তবে আমি তার বদলে আমার একটি সন্তানকে আল্লাহর জন্য কুরবান করে দেব। আল্লাহর কী কুদরত যে, এবার তিনি যমযম কূপ পেয়ে গেলেন। কূপের পানির প্রবাহ শুরু হয়ে গেল। কূপের ওপর বিশাল একটি পাথর রাখা ছিল। সেটি সরিয়ে দেওয়া হলো।

এবার আবদুল মুত্তালিব তার মান্নত পূর্ণ করার জন্য বারো পুত্রের নামে লটারি টানলেন। লটারিতে আবদুল্লাহর নাম এল। তো তিনি আবদুল্লাহকে জবাই করতে চাইলেন। কিন্তু লোকেরা বারণ করল। তারা বলল, এমন সুন্দর ও নম্র-ভদ্র ছেলেটিকে জবাই করবেন না। আপনি বরং তার বদলায় উট জবাই করুন।

এবার আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহ আর উটের মাঝে লটারি দিলেন। প্রথমে দশ উটের নিয়ত করলেন। এমন নিয়ত করলেন যে, দশ উট কোরবানি করব, না আবদুল্লাহকে কোরবানি করব। এই বলে লটারি দিলেন। এবারও লটারিতে আবদুল্লাহরই নাম উঠল। এবার বিশ উটের নিয়ত করে ভাগ্যপরীক্ষার লটারি দিলেন। এবারও আবদুল্লাহরই নাম উঠল। আবার ত্রিশটির নিয়ত করে লটারি দিলেন। এবারও আবদুল্লাহর নাম উঠল। এভাবে যতই সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে, আবদুল্লাহর বদলে উটের নাম উঠছে না। শেষে যখন লটারি দিলেন, আবদুল্লাহর জবাইর বদলে একশত উটের কোরবানি দেব কিনা। এবার উটের নাম এল।

আবদুল মুত্তালিব এবার একশত উট কুরবান করে দিলেন আল্লাহর নামে। এজন্য আবদুল্লাহকেও যবীহুল্লাহ বলা হয়। হাদীছ শরীফে এসেছে, এক বেদুইন নবীজির দরবারে হাজির হলো। সে নবীজিকে يَا ابْنَ ذَبِيحَيْنِ (হে দুই জবাইকৃতের ছেলে) বলে সম্বোধন করল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, হ্যাঁ আমার পূর্বসূরির মধ্যে ইসমাঈলও যবীহুল্লাহ ছিলেন আর আমার পিতা আবদুল্লাহও যবীহুল্লাহ ছিলেন। তো আমার দুই পিতাই যাবীহুল্লাহ তথা আল্লাহর জন্য জবাইকৃত। সুবহানাল্লাহ!

দেখুন, নবীজির ভাষাও সর্বোত্তম ভাষা হিসেবে নির্বাচিত। যেস্থানে তাঁর জন্ম, তা-ও সর্বোত্তম স্থান হিসেবে নির্বাচিত, যেস্থানে আজ লাখো মানুষ ছুটে যায় হৃদয়ে তীব্র আকুতি নিয়ে। আবার তার গোত্রও সর্বোত্তম নির্বাচিত। গোত্রের উপগোত্রও সর্বোত্তম হিসেবে নির্বাচিত। তাঁর দাদাও নির্বাচিত সর্বোত্তম ব্যক্তি। তাঁর পিতাও সর্বোত্তম ব্যক্তি।

সম্মানিতা মায়ের সর্বোত্তম নির্বাচন

তাঁর সম্মানিতা মায়ের অবস্থা দেখুন। তিনিও নির্বাচিত সর্বোত্তম নারী হিসেবে। তাঁর মা ছিলেন মদিনার অধিবাসী। সেখানে আরবের আরও কিছু গোত্রও বাস করত। যেমন– বনু সাকীফ, বনু নাজীর এ-ধরনের কয়েকটি গোত্র ছিল। কিন্তু একটি গোত্র ছিল, যার নাম বনু যাহরা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতা ছিলেন সেই বনু যাহরার কন্যা। তো সেই গোত্রও ছিল সর্বোত্তম।

তো হুজুরের মা হিসেবে আল্লাহ নির্বাচন করলেন মদিনার সর্বোত্তম গোত্রের সর্বোত্তম কন্যাকে। দেখুন, মাতার নামও কত উত্তম। সে-সময় নারীদের বিচিত্র ও আশ্চর্য রকম নাম রাখা হতো। যেমন খুনসা (বিশ্রী) হারবা (যুদ্ধবাজ) এমন ধরনের নাম হতো। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত আপন হাবীবের জন্য যে-নারীকে মা হিসেবে নির্বাচন করলেন, তার নাম হচ্ছে আমেনা। অর্থাৎ– আমানতদার। কারণ, আল্লাহ তো আপন আমানত পেয়ারা হাবীবকে তাঁরই হাতে সোপর্দ করবেন। আর সেই আমানত রক্ষিত হতে হবে। তাই তাঁর মায়ের নামও রেখে দিলেন আমেনা, যার অর্থ আমানতদার। যিনি আমানতকে হেফাজত করেন, রক্ষা করেন।

স্ত্রী আমেনা বলেন, আমি যখন সংসার জীবনে এলাম এবং মুহাম্মাদ আমার মাঝে এল, তখন আমি এমন বরকত উপভোগ করলাম যে, গাছ ঝুঁকে যেত আমার সামনে। আমি যমযমের পানি আনতে গেলে সেই পানি ওপরের দিকে উঠে আসত। মক্কা মোকাররামার অন্য নারীরা আমাকে ধরে রাখত কূপের পাড়ে। বলত, আমেনা! আমরা পানি তুলে নিই; তুমি দাঁড়াও, তুমি যেও না। তুমি চলে গেলে পানি নিচে নেমে যায়। তিনি যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন, ততক্ষণ পানি ওপরের দিকে স্ফীত হয়ে থাকত। ফলে কূপ থেকে পানি পাত্রে ভরা সহজ হতো। কারণ, এক মহা বরকতময় সন্তান তাঁরই কোলে আসতে যাচ্ছে। আর আল্লাহ এমন এক আমানতদার মহীয়সী নারীকেই এর জন্য নির্বাচন করলেন।

নবীজির সর্বোত্তম নাম নির্বাচন

নবীজি যখন এ দুনিয়ায় আগমন করলেন, তখন আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত তাঁর হাবীবের নাম হিসেবে বহু নামের মধ্যে সেই নামটিই নির্বাচন করলেন, যে নামটি বড়ই সুন্দর। মুহাম্মাদ! আহ! কী মধুর নাম! কত সুন্দর এক নাম। মুহাম্মাদ! মানে ওই ব্যক্তি, যার প্রশংসা এত বেশি করা হবে, যত প্রশংসা দুনিয়ার আর কারও জন্য করা হয়নি, হবে না। আর বাস্তবেও একথা সত্য যে, যত নবীর তারিফ হয়েছে এ-ধরায়, কারও তারিফই নবীজির তারিফের সমান নয়। নবীজির তারিফ তো মাখলুকও করেছেন এবং স্রষ্টা নিজেও করেছেন। আপনজনও তাঁর তারিফ করেছে। পরমানুষও তাঁর তারিফ করেছে। সবার চেয়ে বেশি যেব্যক্তির তারিফ হচ্ছে, তিনি আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজও সারা দুনিয়ার যেখানেই আযান হচ্ছে, নবীজির নাম-না'তও সেখানে উচ্চারিত হচ্ছে। তাঁর তারিফ ঘোষণা হচ্ছে।

হুজুরের আরেকটি নাম আহমদ। আহমদ অর্থ আল্লাহর সবচেয়ে বেশি প্রশংসাকারী। আর বাস্তব সত্যও এটিই যে, পৃথিবীতে যত মানুষ, যত সৃষ্টিজীব আল্লাহর প্রশংসা করেছে, সবার তারিফ থেকে আমাদের নবীজির করা আল্লাহর তারিফ বহুগুণ বেশি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনও কেয়ামতের দিন আমাকে আল্লাহ তা'আলা মাকামে মাহমূদ দান করবেন। আমি সেখানে গিয়ে সেজদায় মাথা নত করব এবং আল্লাহর এমন তারিফ ও প্রশংসা করব যেমন তারিফ না শুরুতে আগে কেউ করেছে, না ভবিষ্যতে কেউ করবে। সুবহানাল্লাহ! এই মর্যাদাও আল্লাহই তাঁর পেয়ারা হাবীবকে দান করেছেন। ফলে নবীজিরও অনেক বেশি তারিফ হবে আর নবীজিও আল্লাহর অনেক বেশি তারিফ করবেন। এমন তারিফ করবেন যেমন তারিফ না পূর্বে কেউ করেছে, না পরে কেউ করতে পারবে।

মুহাম্মাদ! এই নাম সারা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আমাদের নবীজির জন্যই রাখা হয়েছে। এই নামটিও সর্বোত্তম নাম হিসেবেই নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এটিও নির্বাচিত একটি নাম। না হয় অন্যান্য আম্বিয়া কেরামও তো ছিলেন। তাঁদেরও তো নাম রাখা যেত এই নামে। তাঁদের তো একেক জনের নাম ছিল একেক রকম।

দেখুন, আদম মানে গন্দম রংধারী। নূহ অর্থ ক্রন্দনকারী। যাকারিয়া মানে সবক মুখস্থকারী। ইদরীস মানে দরস দানকারী। ইউসুফ মানে

আফসোসকারী। ইয়াকূব মানে শেষে আগমনকারী। মূসা মানে পানি থেকে যাকে বের করা হয়েছে। ঈসা মানে সুস্থকারী। দেখুন, বহু নবীই তো আছেন; সবার নাম দেখুন। কারও নামের অর্থ এতখানি সুন্দর, আকর্ষণীয় ও শানদার নয় যতটা আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের অর্থে রয়েছে। দেখুন, মুহাম্মাদ (محمد) নাম লিখতেও নুকতা লাগে না আবার আহমাদ (احمد) নাম লিখতেও নুকতা লাগে না। উদ্দেশ্য, গোটা জাতিকে একথা বোঝানো যে, আমার হাবীবের নাম এমনভাবে, এমন শব্দে আমি রাখলাম, যার মধ্যে কোনো খুঁত তোমরা আবিষ্কার করতে পারবে না। আমি তো তার নাম এমন নিখুঁতভাবে রেখেছি যে, আমি এতে একটি নুকতার ব্যবহারও পছন্দ করিনি।

দেখুন, মুহাম্মাদ নাম উচ্চারণ করতে ঠোঁট দুবার নড়ে ওঠে। আবার একই মাপে দুবার নড়ে ওঠে মহব্বত শব্দ উচ্চারণ করতে। তো পেয়ারা হাবীব তো এমন ব্যক্তিত্ব; যিনি সারা পৃথিবীতে মহব্বত ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আরেকটি ব্যাপার দেখুন, আপনি নবীজির নাম নেবেন তো দেখবেন আপনার একটি ওষ্ঠ অপর ওষ্ঠের সাথে মিলিত হচ্ছে। তেমনি নবীজির শিক্ষার ওপর আমল করলেও একটি হৃদয় অপর হৃদয়ের সাথে মিলিত হয়।

আরেকটি সূক্ষ্ম ব্যাপার দেখুন। নবীজির একটি নাম احمد। তো এবার আমাদের নামাযের হালত চিন্তা করুন। নামাযী ব্যক্তি যখন দাঁড়ানো অবস্থায় থাকেন, তখন তিনি যেন ا আর যখন রুকুতে যান, তখন তিনি যেন ح যখন তিনি সেজদায় যান, তখন তিনি যেন م আর যখন আত্তাহিয়্যাতুর জন্য বসেন, তখন যেন তিনি د। যেন নামাযী তো নামায পড়ছেন; কিন্তু তার নামায পড়ার উঠাবসায় احمد নামের অঙ্কন চলছে। যেন বান্দা বলছে, আমি তো আমার রবের কথায় তাঁর তারিফ করছি; তবে আমার অঙ্গভঙ্গির রূপ এমনই হচ্ছে, যার অর্থ দাঁড়ায় সর্বোৎকৃষ্ট প্রশংসাকারী।

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত আপন হাবীবের জন্য সর্বোত্তম নাম নির্বাচন করেছেন। মানুষও তার সন্তানের জন্য সুন্দর নামই পছন্দ করে। স্ত্রীর সাথে মহব্বত প্রবল হয়ে গেলে সেই প্রবল মহব্বতের চাহিদা অনুসারেই স্বামী তাকে একটি সুন্দর নামে ডাকে। আর আল্লাহ তার হাবীবের জন্য কেমন নাম নির্বাচন করলেন? আহ! এমন নাম, যা শুনে মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়– মুহাম্মাদ; মানে প্রশংসিত। আল্লাহর প্রশংসিত বান্দা। কত সুন্দর নাম! কত

মধুর নাম! কত সুন্দর অর্থবিশিষ্ট নাম 'মুহাম্মাদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

লালনপালনের জন্য একজন শ্রেষ্ঠ নারীর নির্বাচন

তারপর দেখুন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়ায় আগমন করলেন, তখন তাঁর লালনপালনের জন্যে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত একজন মহান নারীকে নির্বাচন করলেন, যিনি বনু সা'দ গোত্রের লোক ছিলেন। সামান্য চিন্তা করুন। কবিলা তো অনেকই হয়। গোত্র তো বহু আছে। কিন্তু এই গোত্রটির নাম দেখুন, কবীলায়ে বনু সা'দ। সা'দ মানে ভাগ্যবান। আর বাস্তবেই ওই গোত্রটি বড়ই সৌভাগ্যবান ছিল, যার একজন নারীকে নবীজির লালনপালনের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

আবার বনু সা'দ-এর কেমন মহিলা? অন্য নামের যেকোনো মহিলাও তো হতে পারত। কিন্তু-না, এমন একজন নারীকে নির্বাচন করা হয়েছে, যার নাম হালীমা। আর হালীমা অর্থ সহনশীল নারী। সুবহানাল্লাহ! ছোট সন্তানকে গড়ে তোলার জন্য সহনশীলতার বড়ই প্রয়োজন রয়েছে। যদি মানুষের মাঝে এই গুণটি বিদ্যমান না থাকে, তাহলে ছোট সন্তানদের তারা লালনপালন করতে পারে না। সামান্যতেই রেগে যায়। চড়-থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। হাতের কাছে যা পায় তা দিয়েই আঘাত করে। এটা মানুষের অভ্যাস। কিন্তু যখন মানুষটির মাঝে সহনশীলতা থাকবে, তখনই তার মাঝে বরদাশত করার ক্ষমতা থাকে। তো হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্দর লালনপালনের প্রয়োজন ছিল। তাই আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত নারীদের মধ্য থেকে এমন একজন নারীকে নির্বাচন করলেন, যিনি সবার চেয়ে বেশি সহনশীল। তোমার কোলে আমার হাবীব বেড়ে উঠবে; তাই তোমার মাঝে এই মহৎগুণ থাকতে হবে।

তো সৌভাগ্যবতী নারী হালীমার কপাল যে, তিনি নবীজিকে, সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকে লালনপালন করেছেন। একজন সহনশীলা নারীর কোলে বেড়ে উঠলেন রহমত ও বরকতের অনুপম আধার, মানবতার পথিকৃত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কত বড় সৌভাগ্য আপনার হে মা হালীমা! আপনি চুমু খেয়েছেন এই নবীজির কপালে, মাথায়! আপনার সযত্ন হাতে তাঁকে করেছেন প্রতিপালন। আপনার কোলে-পিঠে, বুকে-হাতেই এই নবীজির বেড়ে ওঠা। কুদরতের কত সুন্দর ফয়সালা যে, এক হালীমার ঘরে, এক ভাগ্যবতীর ঘরে, এক বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী নারীর ঘরে প্রতিপালিত

হয়েছেন মানবতার দিশারী, রহমতওয়ালা ও বরকতওয়ালা নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তো বোঝা গেল, লালনপালনের জন্যও আল্লাহ একজন উত্তম নারী নির্বাচন করেছেন।

নবীজির জন্য উত্তম স্ত্রী নির্বাচন

তারপর দেখুন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন তিনি প্রথমটা বিয়ে করলেন ঠিক; কিন্তু তারপর নানা রকম কারণে ইসলামের উপকারার্থে নানা গোত্রে বিবাহ করেছেন। তাঁর স্ত্রীদের চমৎকার নামের দিকেই দেখুন, সেগুলোর অর্থ দেখুন। সুবহানাল্লাহ! এতেই বুঝে এসে যাবে যে, এই স্ত্রীগণ বড়ই ভাগ্যবর্তী, বড়ই উত্তম এবং সুনির্বাচিতা ছিলেন। আজকের যুগেও যদি কোনো মা তার ছেলের জন্য পাত্রী পছন্দ করতে চান, তবে তিনি ভালো ও উত্তম নারীই পছন্দ করেন। আর আমাদের হাবীব তো সৃষ্টিকুলের সর্দার। তিনি আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের পেয়ারা হাবীব। তিনি পূর্বাপর সকল মানুষের নেতা। তাঁর জন্য খোদ আল্লাহ পাত্রী নির্বাচন করেছেন। দেখুন, তাঁর জন্য আল্লাহ কেমন পাত্রি নির্বাচন করেছেন।

১. খাদিজা : যার অর্থ হাজী সাহেবানের খেদমতকারিণী।

২. সাওদা : শান্ত ও আরামদানকারিণী।

৩. আয়েশা : আয়েশ দানকারিণী।

৪. হাফসা : রাতে তাহাজ্জুদে যে দণ্ডায়মান থাকে।

৫. মাইমুনা : সৌভাগ্যবর্তী ও সুখী।

৬. সাফিয়্যা : নির্বাচিতা।

৭. যাইনাব : এস্তেগ্ফার ও প্রার্থনাকারিণী।

৮. উম্মে সালমা : শান্তির মা।

৯. উম্মে হাবীবা : প্রিয়তমার মা।

সুবহানাল্লাহ! নবীজির স্ত্রীগণের নামের প্রতি একটু লক্ষ করুন। কেমন গুণবতী নারীগণকে আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবের জন্য নির্বাচন করেছেন। কুরআনের এর সাক্ষ্য হিসেবে ইরশাদ হয়েছে–

يَانِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ

'হে নবীপত্নীগণ! তোমরা অন্য যেকোনো নারীর মতো নও।'[১]

আল্লাহু আকবার কাবীরা! কুরআনের মৌলিক নীতিগুলো দেখুন–

اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ

'পবিত্র নারীরা পবিত্র পুরুষদের জন্য।'[২]

আর আল্লাহর হাবীব তো ছিলেন যেমন নিজে পবিত্র, তেমনি অন্যকে পবিত্রকারী। তিনি পাক ও পরিশুদ্ধকারী। তাই আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সেরকম স্ত্রী-ই নির্বাচন করেছেন, যারা পবিত্রাত্মা ও মহাত্মা ছিলেন।

যেমন– হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ওপর অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একটি শিশু বাচ্চার সাক্ষ্যের মাধ্যমে রক্ষা করেছেন। হযরত মারইয়ামের ওপর অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা শিশু ঈসা (আ.)-এর সাক্ষ্যের মাধ্যমে তাঁর পবিত্রতা ও সতীত্ব প্রমাণিত করেছেন। অথচ যখন নবীপত্নি সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)কে মুনাফিকরা অপবাদ দিয়েছিল। তখন হাবীবে খোদার দ্বারা কুরআনুল কারীমের মাধ্যমে খোদ আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং একে কুরআনের অংশ বানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর চারিত্রিক পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতার কত বড় শান যে, খোদ আল্লাহ তাঁর পবিত্রতার ঘোষণা দিচ্ছেন। এই কালাম এই কুরআন কি শুধু দুনিয়াতেই তেলাওয়াত হবে? না; জান্নাতেও এর তেলাওয়াত হবে। চিরকাল এই কুরআন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযি.)-এর পবিত্রতার ঘোষণা দিয়েই যাবে।

উত্তম পুত্রসন্তান নির্বাচন

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহ তা'আলা সন্তান নির্বাচন করলেন। এর মধ্যে তো অন্য হেকমত ও রহস্য নিহীত যে, ছোট বয়সেই সন্তানদের আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট নিয়ে গেছেন। কিন্তু সেই ছেলেদের নামের ওপর সামান্য গবেষণা করা যাক।

নবীজির এক সন্তানের নাম ছিল কাসেম। কাসেম অর্থ বণ্টনকারী। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৩২

২. সূরা নূর : আয়াত ২৬

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِيْ

আমি হলাম আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতরাজির বণ্টনকারী আর আল্লাহ হলেন দানকারী।

এক পুত্রের নাম ছিল তায়্যেব, তাহের। অর্থাৎ– পাক-পবিত্র। তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ছিলেন তায়্যেব, তাহের। অর্থাৎ– পাক ও পবিত্র আর সন্তানের নামও তেমনই অর্থসমৃদ্ধ।

এক ছেলের নাম ছিল ইবরাহীম; মানে বুযুর্গিওয়ালা। আর নবীজিও তো ছিলেন বুযুর্গিওয়ালা।

তো সুন্দর ও উত্তম অর্থসমৃদ্ধ শব্দে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবের ছেলেদের নাম রাখা পছন্দ করলেন।

উত্তম কন্যা নির্বাচন

একটু মনোযোগের সাথে লক্ষ করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা নির্বাচন দেখুন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারজন কন্যা ছিলেন।

এক কন্যার নাম যায়নাব; অর্থাৎ– এস্‌তেগ্‌ফার ও ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

এক কন্যার নাম রুকাইয়া; অর্থাৎ– স্বামীর খেদমতকারী।

এক কন্যার নাম কুলসুম; অর্থাৎ– সন্তানকে সুশিক্ষাদানকারী।

এক কন্যার নাম ফাতেমা; অর্থাৎ– দোযখ থেকে মুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবকে এমন কন্যা দান করলেন, যাদের জীবন দেখে মানবাত্মা এই সাক্ষ্য দান করে যে, আল্লাহ তাঁর বন্ধুকে সর্বোত্তম কন্যা দান করেছেন।

চিন্তা করুন প্রিয় হাজিরীন!। বিবাহের জন্য সর্বোত্তম বংশ নির্বাচন করা হলো। আবার স্ত্রীও সর্বোত্তম নির্বাচন করা হলো। তারপর সন্তানদের মাঝে ছেলেও সর্বোত্তম নির্বাচন করা হলো, মেয়েও সর্বোত্তম নির্বাচন করা হলো। বোঝা যাচ্ছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সবকিছুই নির্বাচন করা হয়েছে সর্বোত্তম দেখে-দেখে।

নবীজির জন্য বন্ধু-সাথিও নির্বাচন করা হয়েছে সর্বোত্তম দেখে

তারপর দেখুন, আল্লাহ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বন্ধু ও সাথি নির্বাচন করলেন। আবুবকর, ওমর, ওছমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুম। প্রত্যেকের জীবনচরিত্র অধ্যয়ন করুন। তারপর গবেষণা করে দেখুন, আল্লাহ তাঁর হাবীবের জন্য এমন বন্ধু নির্বাচন করেছেন, যাঁরা ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। ওস্তাদের শান ও মান তার শাগরেদ দ্বারা বোঝা যায়। যেমন শাগরেদ তার ওস্তাদের ইল্‌ম ও আমলের ধারক-বাহক, তেমনিভাবে সাহাবা কেরামও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইল্‌মের ধারক-বাহক ছিলেন।

তো ওস্তাদের আযমত ও পরিচয় ছাত্রদের দ্বারা পাওয়া যায়। আর নবীজির আযমত ও জীবনচিত্র পাওয়া যায় সাহাবায়ে কেরামের জীবনের মাঝে। আর সাহাবা কেরামের মাঝে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত ছিল। তাঁরা তাঁদের জীবনকে নবীজির জীবনের ছাঁচে পরিচালিত করেছিলেন। তাঁরা তো বরং এমন ছিলেন যে, নবীজির জন্য জীবন কুরবান করতে প্রস্তুত ছিলেন। সর্বদা-ই যখন যে ডাক আসত, তাঁরা সেই ডাকে সর্বাত্মকভাবে সাড়া দিতেন। তাঁরা সেই ডাক প্রাণ উজাড়-করা ভালোবাসা দিয়ে বরণ করে নিতেন। নবীজির প্রেম, নবীজির ভালোবাসা তাঁদের মাঝে কেমন ছিল, তা বোঝার জন্য উহুদ ও খন্দক যুদ্ধকে আমাদের সামনে রাখলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। বদর যুদ্ধের আগে আনসার ও মুহাজির সাহাবাগণ কী বক্তব্য পেশ করেছিলেন, কী প্রতিশ্রুতি তাঁরা নবীজিকে দিয়েছিলেন, তার প্রতি দৃষ্টি দিলেই বোঝা যাবে, সাহাবা কেরামের কেমন প্রেম ছিল, কেমন অনুরাগ ছিল নবীজির প্রতি।

সর্বোত্তম কিতাব নির্বাচন

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবকে কিতাব দান করেছেন। অন্যান্য আম্বিয়া কেরামকেও দান করেছেন। তাওরাতও কিতাব, ইনজীলও কিতাব, যাবুরও কিতাব। কিন্তু এসব কিতাব অন্য ভাষায়। আর কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। এই কুরআন আল্লাহর কালাম। অন্যসব কিতাব আর এই কিতাবের মধ্যকার পার্থক্য একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। পূর্বের কিতাবগুলো কিতাব আকারে, সহীফা আকারে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এই কুরআন আল্লাহর কালামের আকৃতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। দেখুন, কারও কাছে

একজনের লিখিত পত্র এল আর একজনের কাছে কারও 'ভয়েস' তথা কণ্ঠ স্বরে সংবাদ এল, তাহলে কোনটির তাৎপর্য বেশি হবে? কোনটির গুরুত্ব বেশি হবে? তো পূর্বের কিতাবগুলো আল্লাহর লিখিত গ্রন্থ ছিল। আর কুরআন সরাসরি আল্লাহর কথা তথা কালাম।

তাই তো হাদীছ শরীফে এসেছে–

تَبَرَّكُ بِالْقُرْاٰنِ فَاِنَّهٗ كَلَامُ اللهِ

'কুরআন দ্বারা বরকত হাসিল করো। কেননা, এটি আল্লাহর কালাম।'

সুবহানাল্লাহ! এই কিতাবের শান দেখুন। পূর্ববর্তী কিতাবগুলো অবতরণের কিছুকাল পরই উম্মত সেই কিতাবের মাঝে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে ফেলেছে, উলটপালট করে ফেলেছে। ফলে সেগুলো বিকৃত কিতাব হয়ে গেছে। আজ আসল আকৃতির আসল প্রকৃতির ও আসল ধারার তাওরাত, ইনজীল ও যাবুর কেউ খুঁজেও পাবে না। কিন্তু আলহাম্দুলিল্লাহ। আল্লাহর এই কালাম, এই কুরআন, চৌদ্দশ বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও অবিকৃত অবস্থায় আমাদের মাঝে বিদ্যমান। আজও এই কুরআন সুসংরক্ষিত রয়েছে। সারা পৃথিবীময় আজও ছড়িয়ে আছে একই প্রকৃতির একই কুরআন। তো বলছিলাম, আমাদের নবীকে দান করা হয়েছে সর্বোত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল কুরআন।

সর্বোত্তম দীন নির্বাচন

তারপর নবীজির দীনের দিকে তাকান। তাঁর ধর্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর জন্য দীনে ইসলামকে নির্বাচন করেছেন। পূর্বের ধর্ম ও দীনসমূহের নাম হয়তো নবীর নামে হতো, না হয় গোত্র ও গোষ্ঠির নামে হতো। যেমন– ঈসায়ী। এটি হযরত ঈসা (আ.)-এর নামে। ইহুদি। এটি ইহুদি গোত্রের নামে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু ইসলাম? ইসলাম কোনো ব্যক্তি বা সমাজ বা জনগোষ্ঠির নামে পরিচিত হয়নি। মুসলিম শব্দটির অর্থ হচ্ছে মান্যকারী, গর্দান নত করে মান্যকারী, শান্তির ধারক-বাহক। ইসলাম অর্থ মান্য করা, গর্দান নত করে মেনে নেওয়া, শান্তি ইত্যাদি। দেখুন, লক্ষ করুন। আল্লাহ তাঁর হাবীবকে কেমন দীন ও কেমন ধর্ম দান করলেন! এমন ধর্ম দান করলেন, যে ধর্ম শান্তি ও নিরাপত্তা দান করে। যে ধর্ম আনুগত্য শেখায়।

ইরশাদ হচ্ছে–

اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

'হে আমার হাবীব! আমি আপনার জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে পছন্দ করলাম।'[১]

উপমাহীন সৌন্দর্য

নবীজিকে আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক যে সৌন্দর্য এবং অভ্যন্তরীণ যেসব গুণাবলি দান করেছেন, তা অত্যন্ত উত্তম এবং সুউচ্চ মানদণ্ডে উন্নীত। নবীজির সৌন্দর্য প্রকাশ করার কোনো ভাষা কারও জানা নেই। পৃথিবীতে কোনো শব্দ নেই। কোন ভাষায়, কোন শব্দে বোঝানো হবে নবীজির চরিত্রমাধুরি? কোন শব্দে, কোন ভাষায় প্রকাশ করা হবে, বর্ণনা করা হবে নবীজির সৌন্দর্য। কোন শব্দ বা ভাষা নেই পৃথিবীতে। শুধু এটুকু বলা যায় কবির ভাষায়–

والليل سیاہی زلفوں کی چہرہ اس کا والضحیٰ اسکا

سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محبت ہے خدا اس کا

رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

'কুরআনের শব্দ والیل হচ্ছে নবীজির কেশরাজির কৃষ্ণতা। আর والضحیٰ হচ্ছে নবীজির অবয়ব ও চেহারার শুভ্রতা।

সারা জাহান ছিল নবীজির প্রেমিক আর তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রেমিক। আল্লাহ যখন তাকে বানিয়েছেন, তখন নিজেই বলেছেন সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ।

তাঁর হাবীবকে এমন উপমাহীন সৌন্দর্য দান করেছেন যে, কেউ একজন বড় আজব কথা বলেছে–

اے رسول امین خاتم المرسلین

تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৩

হে রাসূলে আমীন! খাতামুল মুরসালীন! আপনার এত কেউ নেই। আপনার এত কেউ নেই।

ہے عقدہ یہ اپنا بصدق ویقین
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں

সত্যতা এবং একিনের সাথেই বলছি, এ-ই আমার বিশ্বাস। আপনার এত কেউ নেই। আপনার এত কেউ নেই।

بزم کونین پہلے سجائی گئی
پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی
سید الاولین سید الآخرین
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں

(উভয় জাহানের মধ্যমণি ও প্রধান আকর্ষণ আপনি) বিশ্বসংসার সাজানো হয়েছে প্রথমে, তারপর আপনার সত্তা এ বিশ্বসভায় দৃশ্যে আনা হয়েছে। আপনি পূর্বের সবার বাদশাহ। পরবর্তীদেরও সবার বাদশাহ। আপনার এত নেই কিছু। আপনার মতো কিছু নেই ।

وست قدرت نے ایسا بنایا تجھے
جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے

কুদরতি হাত আপনাকে এমন বানিয়েছে যে, সমস্ত গুনাগুণ দিয়ে আপনাকে সাজিয়েছে।

اے ازل کے حسیں اے ابد کے حسین
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں

হে চির সুন্দর! হে অনন্তের সুন্দর! আপনার এত কেউ নেই। আপনার এত কেউ নেই।

تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا
اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا

کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر زمیں
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں

আপনার শিষ্য ও আপনার ভক্ত উভয় জাহানের মধ্যেই হয়েছে। এই জমিনে ওই আসমানে সবখানেই হয়েছে। কি আরব, আর কি আজম সবার মাঝেই তৈরি হয়েছে আপনার ভক্ত ও অনুরুক্ত। শিষ্য ও শাগরেদ। আপনার মতো কেউ নেই। আপনার মতো কেউ নেই ।

کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں
کوئی ہے وہ جس کو تجھ سا کہوں
توبہ توبہ میری کوئی تجھ سا نہیں
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں

কেউ একজন বলে দিক আমায়, কেমন করে তার পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরব আমি। কেউ কি আছে এমন, যাকে আপনার মতো বলব? তাওবা! তাওবা! আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আপনার মতো কেউ নেই। আপনার মতো কেউ নেই। আপনার মতো কেউ নেই।

অভ্যন্তরীণ গুনাবলি

আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতেনি গুণ তথা অভ্যন্তরীণ গুণাবলির অবস্থা তো এই। সুবহানাল্লাহ! ভাষায় এতটুকু গভীরতা নেই, এতটুকু সমৃদ্ধি নেই যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি ব্যক্ত করা যায়। কোনো এক কবি বলেছেন,

کتاب فطرت کے سرورق پہ اگر نام احمد رقم نہ ہوتا
تو نقشے ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا

কিতাবের ওপরের পাতায় যদি আহমদ নাম খচিত না থাকত, তবে তো লাওহ ও কলমের অস্তিত্বই আসত না এবং সেই কিতাব কিতাবই হতো না। কোনো গ্রন্থ গ্রন্থই হতো না।

হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.) লিখেছেন–

سب سے پہلے مشیت کے انوار سے
نقش روح محمد بنایا گیا
پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی
بزم کون و مکان کو سجایا گیا
وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی
اس کے مطلق کا شاہد و مشہود بھی
علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی
ظاہرا عامیوں میں اٹھایا گیا

'সর্বপ্রথম ইচ্ছার নূর দ্বারা মুহাম্মাদের আত্মার রূপ সৃষ্টি করা হয়। তারপর সেই রূপ থেকে আলো নিয়ে বিশ্বজগতকে আলোকিত করা হয়। তিনি মুহাম্মদও, আহমাদও, মাহমূদও। তাঁর সব কিছু স্বাক্ষীও এবং তিনি সত্যায়িতও। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে তিনি অসীমও। যদিও তাঁকে নিরক্ষরদের মধ্য হতে নির্বাচন করা হয়েছে।'

আল্লামা ইকবাল (রহ.) লিখেছেন–

لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب
گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط ہیں گلاب
فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے

'তুমি লাওহ-ও, তুমি কলমও। তোমার অস্তিত্ব হলো কুরআন। তোমার রং হলো কাচের গম্বুজের মতো, যাকে ঘিরে আছে গোলাপের সুবাস। জুনায়েদ ও বায়েজিদের কবিতা তোমার সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। তোমারই করুণায় তাঁরা পেয়ে গেছে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য।'

নবীজির আরও কিছু প্রশংসনীয় বিষয়

নবীজির শানে বহু লেখক লিখেছেন নানা রকম কথা। এক আরব কবি নবীজির শানে চল্লিশ হাজার কবিতা নিবেদন করেছেন। খুব গভীরভাবে লক্ষ করার মতো বিষয়। দু-চারটা কবিতা? চল্লিশ হাজার কবিতা। সেই কাব্যমালার শেষে কবি যা লিখেছেন, তার উর্দু অর্থ এই–

فقیہ ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے
قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے
ورق تمام ہو اور مدح باقی ہے
تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے

'জ্ঞানবান গভীর চিন্তায় মগ্ন। নিত্যনতুন ফিকিরে মশগুল (তাঁর প্রশংসা বর্ণনায়) তবু তাঁর প্রশংসার বিবরণ অব্যক্তই রয়ে গেল।

কলম তো বড়ই দুর্বল হয়ে গেল। (তাঁর প্রশংসা লিখতে-লিখতে) কিন্তু তাঁর প্রশংসা তো বাকিই রয়ে গেল। পৃষ্ঠা তো শেষ হয়ে গেল; কিন্তু তাঁর প্রশংসা বাকি রয়ে গেল। সারাটা জীবন লেখা হলো; তবু তাঁর প্রশংসা বাকি রয়ে গেল। (হলো না বর্ণনা করা)।'

তো চল্লিশ হাজার কাব্য রচনা করেও সে একথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলো যে, আমি নবীজির শান বর্ণনার হক সামান্যও আদায় করতে পারিনি।

মাওলানা মানাযির আহসান গিলানি (রহ.) একজন দেওবন্দি আলেম। তিনি নবীজির শানে একটি কিতাব লিখেছেন। নাম 'আননাবীয়্যুল খাতিম'। সেখানে চারশত পঞ্চাশটি বিষয় ও শিরোনাম লেখা হয়েছে। লেখার পর শেষে তিনি বলেছেন, দুনিয়ায় যে এসেছে সে চলে যাওয়ার জন্যই এসেছে ওই ব্যক্তি ব্যতীত যিনি মক্কায় আগমন করেছেন। তিনি এসেই চলে গেছেন।

لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہان جہاں
اک طلوع آفتاب دست و نگر سحر سحر

লাখো তারকারাজি উদিত আছে। আবার পৃথিবীময় অন্ধকারও ছড়িয়ে আছে। একটিমাত্র সূর্যোদয়ে শহর-নগরে প্রভাত এসে (চারপাশকে আলোকিত করে ফেলে)।

আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয়তমকে কেমন গুণই-না দান করলেন।

বর্ণমালার প্রশংসাজ্ঞাপন

শেষ কথাটি অন্তরের কান দ্বারা শুনে নিন। আরবি যতগুলো হরফ আছে, সেসব হরফ দিয়ে যত সিফাতি তথা গুণপ্রকাশক শব্দ নির্মিত হয়, সবগুলো গুণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর পেয়ারা হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। সামান্য চিন্তা করে মনোযোগ দিয়ে দেখুন, লক্ষ করুন, পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়ায় আগমন করলেন, তখন আরবি হরফ আলিফ (الف) ঘোষণা দিতে লাগল, احمد এসেছে। امى এসে গেছে। اولى এসে গেছে।

আর আলিফ দ্বারা গঠিত এই তিনটি নামই নবীজির গুণবাচক নাম।

احمد অর্থ অধিকতর প্রশংসনীয়।

امى অর্থ জাগতিক ও মানবতৈরী শিক্ষাবঞ্চিত।

اولى অর্থ যোগ্যতর, শ্রেষ্ঠতর।

ب ঘোষণা করতে লাগল بَشِيْرٌ এসে গেছেন। بَشِير অর্থ সুসংবাদদাতা, অগ্রদূত।

ت বলতে লাগল, দুনিয়াকে تنوير তথা প্রদীপ্ত ও আলোকিতকারী এসে গেছেন।

ث বলতে লাগল, দুনিয়ায় ثاقب তথা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি এসে গেছেন।

ج বলতে লাগল, দুনিয়ায় جمل ও جواد তথা সুন্দর, সুদর্শন, মনোরম, দানশীল ও উদার ব্যক্তি এসে গেছেন।

ح বলতে লাগল, حبيب حامد حافظ حكيم ও حجازى তথা প্রশংসাকারী, প্রিয়তম, তত্ত্বাবধায়ক, বিচক্ষণ, প্রজ্ঞাবান, হেজাযের অধিবাসী এসে গেছেন।

خ বলল, দুনিয়ায় خاتم النبيين ও خاشع অর্থাৎ– খাতামুননাবিয়ীন ও শ্রদ্ধাবনত ও নম্র ব্যক্তি এসে গেছেন।

د বলতে লাগল, داعى তথা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী এসে গেছেন।

ذ বলতে লাগল, ذكى তথা প্রতিভাবান ও বুদ্ধিমান এসে গেছেন।

ر বলতে লাগল, رسول، رشيد، رفيق তথা সুহৃদ, বন্ধু, বিচক্ষণ ও রাসূল এসে গেছেন।

ز বলতে লাগল, زائر তথা পরিদর্শক এসে গেছেন।

س বলতে লাগল, سيد ও سرج তথা আলোর প্রদীপ ও নেতা এসে গেছেন।

ش বলতে লাগল, شفيع ও شهيد তথা সুপারিশকারী, আত্মার রোগের চিকিৎসাকারী ও সাক্ষদানকারী এসে গেছেন।

ص বলল, দুনিয়ায় صفى الله তথা আল্লাহর খাঁটি বন্ধু এসে গেছেন।

ض বলল, ضامن তথা প্রতিভূ, জামিনদানকারী এসে গেছেন।

ط বলে, طاهر طيب তথা পবিত্র ও উৎকৃষ্ট ব্যক্তি এসে গেছেন।

ظ বলে, ظاهر তথা বিজয়ী এসে গেছেন।

ع বলে, عبدالله عزيز ও عادل তথা আবদুল্লাহ, প্রিয়জন, ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহর বান্দা এসে গেছেন।

غ বলল, غيور তথা আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তি এসে গেছেন।

ف বলল, فاتح তথা বিজয়কারী এসে গেছেন।

ق বলল قاسم ও قارى তথা বণ্টনকারী ও তেলাওয়াতকারী এসে গেছেন।

ك বলল, كفيل ও صاحب كوثر তথা তত্ত্বাবধানকারী ও কাওসারওয়ালা এসে গেছেন।

م বলল, مصطفى، محمد، عبود، مدثر، مزمل এসে গেছেন।

ن বলল نذير তথা সতর্ককারী এসে গেছেন।

و বলে, وكيل তথা প্রতিনিধি এসে গেছেন।

ه বলল, هادى তথা হেদায়েতকারী এসে গেছেন।

ء বলল, اخرى তথা শেষ নবী এসে গেছেন।

ى বলল, يسين ও يتيم তথা ইয়াসীন ও এতিম ব্যক্তি এসে গেছেন।

দেখুন, আরবি ভাষায় যত হরফ আছে, প্রত্যেক হরফ দিয়ে যত গুণ হয়, তা নবীজির সিফাতি নাম ছিল। সেই গুণগুলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর পেয়ারা হাবীবকে দান করেছেন।

সুনিপুণ নির্বাচন

তো আল্লাহর এসব নির্বাচন অত্যন্ত নিপুণ। কেউ এর ওপর কোনো প্রশ্ন তুলতে পারে না। বাস্তবিকই অন্তর থেকে একথা বের হয় যে, হে আল্লাহ! আপনি আপনার ভালোবাসা এভাবে প্রকাশ করেছেন! বড় আশ্চর্য কথা! আপনি আপনার হাবীবকেও নিপুণভাবে প্রেরণ করেছেন। আর তার গুণাবলিও আপনি নিপুণ বানিয়েছেন। কেউ তাতে প্রশ্ন তুলতে পারে না। এই

নির্বাচন বড়ই সুনিপুণ। এই নির্বাচন বড়ই সুষ্ঠু ও প্রশ্নাতীত। আজকের বয়ান একটি কবিতা বলে শেষ করছি।

কবি বলেন–

وہ جو شیریں شخنے ہے میرے مکی مدنی
تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی!
تیرا پھلاؤ بہت ہے، تیرا قامت ہے بلند
تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی!
دست قدرت نے تیرے بعد پھر اسی تصویر
نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی!
نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم
تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی!

'ওই মধুময় কথামালা আমার মক্কি-মাদানি (নবীর)
তোমার মুখনিঃসৃত, আমার মাক্কি-মাদানি (নবী)।
তোমার বিস্তৃতি বিশাল, তোমার দৈর্ঘ্য সুউচ্চ
তোমার ছায়াও ঘনকালো আমার মক্কি-মাদানি।
কুদরতের হাত তোমার পর এমন আকৃতি
না বানিয়েছেন, না সৃষ্টি হয়েছে।
আমার মক্কি-মাদানি (নবী)।
আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম তোমার অস্তিত্বের কাছে ঋণী
তুমি ধনী ঘরের ধনী আমার মক্কি-মাদানি (নবী)।

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শমতো তাঁর তরিকা ও শিক্ষার আলোকে আমাদের আমল করার তাওফীক দান করেন। কেয়ামতের দিন তাঁর হাতে হাউজে কাওছারের পানি পানে ধন্য করেন। জান্নাতে তার কদমের নিচে স্থান দান করেন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বোখারি শরীফের প্রথম সবক

'ইমাম বোখারি (রহ.)-এর নাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল। জু'ফ গোত্রের লোক তিনি। তিনি বোখারার বাসিন্দা ছিলেন। ১৯৪ হিজরিতে জুমার নামাযের পর তাঁর জন্ম। জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে ২৫৬ হিজরির ঈদুল ফিতরের রাতে। সমরকন্দের নিকটবর্তী স্থানে একটা বসতি আছে, যার নাম খরতঙ্গ। সেখানে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত আছেন।

তিনি শিশু বয়সেই এতিম হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মাথার ওপর থেকে পিতৃচ্ছায়া সরে গিয়েছিল। তাঁর তত্ত্বাবধান করতেন তাঁর মুহতারামা আম্মাজান ও তাঁর শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আহমদ ইবনে ইসমাঈল (রহ.)। তিনি শিশু বয়সে একবার হঠাৎ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর মা আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে লাগলেন। সেই দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

বোখারি শরীফের প্রথম সবক

اَلْحَمْدُ لله وَكَفٰى وَسَلَمٌ على عِبادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ: وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنِّيْ اِلَى الْاِمَامِ الْهُمَّامِ يَقُوْلُ الْعَبْدُ الْفَقِيْرُ ذُوالْفِقَارِ اَحْمَدُ حَدَّثَنِيْ حَضْرَةُ الْاُسْتَاذِ حَافِظُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيْثِ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ جَعْفَرُبْنُ مُحَمَّدٍ اَمِيْر قَالَ حَدَّثَنِيْ حَضْرَةُ الْاُسْتَاذُ مَوْلَانَا شَيْخُ مُحَمَّدٌ مَالِكٌ كَانْدهلَوِىْ نَوَّرَاللهُ مَرْقَدَه قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ مُحَمَّدٌ اِدْرِيْس قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ مُحَمَّدٌ اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الظَّاهِرِ الْوَتْرِيّ الْمَدَنِيّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ عَابِدٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَالِحُ الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَنَةَ الْعُمَرِىْ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ الْعَجَلِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ قُطْبُ الدِّيْنُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ الْمُعَمَّرُ الشَّيْخُ يُوْسُفُ هَرَوِىْ اَلْمَشْهُوْرُ بِسَه صَدْسَاله قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ شَادٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفُ الْفِرَبْرِىْ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى رَحْمَةً وَّاسِعَةً قَالَ حَدَّثَنِيْ الشَّيْخُ الْاِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ الْحَدِيْثِ وَ سَيِّدُ الْمُحَدِّثِيْنَ اَبُوْ عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيْرَةَ الْجُعْفِيّ الْبُخَارِىْ رَحِمَهُ اللهُ رَحْمَةً وَّاسِعَةً

بَابُ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله وسلم وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ : (اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِه) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِنِ الْاَنْصَارِىُ قَالَ : اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ: اِنَّه سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ نِ اللَّيْثِىُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِه وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍمَّانَوٰى؛فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُه الٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا ، اَوْ اِلٰى امْرَاَةٍ يَّنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُه، اِلٰى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ،
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

ইল্‌মে হাদীছের সংজ্ঞা

সালফে সালেহীন ইল্‌মে হাদীছের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন–

عِلْمٌ يُدْرَكُ بِهٖ اَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَفْعَالُهٗ وَاَحْوَالُهٗ وَاَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَاَفْعَالُهُمْ وَاَحْوَالُهُمْ ،

'এমন একটি বিদ্যা, যার মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলের কথা, কাজ ও অবস্থা এবং সাহাবা ও তাবেয়িনের কথা, কাজ ও অবস্থাদি জানা যায়।'

ইল্‌মে হাদীছের ফজিলত

হাদীছ শরীফের জ্ঞান অর্জন করায় বড় সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর দারবারে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَاءً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا ثُمَّ اَدَّعَهَا كَمَا سَمِعَهَا

আল্লাহ তা'আলা ওই ব্যক্তির চেহারাকে সতেজ রাখুন, যে আমার বাণী শুনল, এবং সংরক্ষণ করল, এবং অন্যের নিকট হুবহু পৌঁছে দিল।

অন্য একটি হাদীছের মধ্যে এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِيْ

'হে আল্লাহ! আপনি আমার খলীফাদের ওপর রহম করুন।'

قِيْلَ وَمَنْ خُلَفَائُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

'জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার খলীফা কে হে আল্লাহর রাসূল?'

قَالَ الَّذِيْنَ يَرْوُوْنَ اَحَادِيْثِيْ

'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা আমার হাদীছ বর্ণনা করে, তারা-ই আমার প্রতিনিধি, আমার স্থলভিষিক্ত।'

যে জবানের ফয়েয ও বরকতে আমরা কুরআন পেয়েছি, সেই জবানের মাধ্যমেই তো পেয়েছি আমরা হাদীছ। আর নবীজির জবান হতে উচ্চারিত, নবীজি মুখনিঃসৃত কথামালাকেই তো বলি হাদীছ।

ইমাম বোখারি (রহ.)-এর জীবনচরিত

হযরত ইমাম বোখারি (রহ.)-এর নাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল। জু'ফ গোত্রের লোক তিনি। তিনি বোখারার বাসিন্দা ছিলেন। ১৯৪ হিজরিতে জুমার নামাযের পর তাঁর জন্ম। জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে ২৫৬ হিজরির ঈদুল ফিতরের রাতে। সমরকন্দের নিকটবর্তী স্থানে একটা বসতি আছে, যার নাম খরতঙ্গ। সেখানে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত আছেন।

তিনি শিশু বয়সেই এতিম হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মাথার ওপর থেকে পিতৃচ্ছায়া সরে গিয়েছিল। তাঁর তত্ত্বাবধান করতেন তাঁর মুহতারামা আম্মাজান ও তাঁর শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আহমদ ইবনে ইসমাঈল (রহ.)। তিনি শিশু বয়সে একবার হঠাৎ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর মা আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে লাগলেন। সেই দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ষোলো বছর বয়সে মা ও বড় ভাইয়ের সাথে হারামাইন শরীফে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। ষোলো বছর বয়সেই তাঁর সম্মানিত ওস্তাদ ওয়াকী' ইবনে জাররাহ ও আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের রেওয়ায়াতগুলো তাঁর ঠোঁটস্থ ছিল। আঠারো বছর বয়সে মদিনা তায়্যেবায় এক চাঁদনি রাতে বসে 'তারীখে কাবীর' কিতাবটি লিখেছেন। তারপর লিখেছেন 'কাজায়াস্ সাহাবা ওয়াত্তাবিয়ীন' কিতাবটি।

রিজালে হাদীছ তাঁর সামনে আল্লাহ তা'আলা ফটোগ্রাফির মতো করে দিয়েছেন। তার তাকওয়া ও খোদাভীতির বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা এমন স্মরণশক্তি ও মেধা তাঁকে দান করেছেন যে, তিনি কোনো বিষয় একবার শুনলেই মুখস্থ হয়ে যেত।

ইমাম বোখারি (রহ.) হাদীছের অন্বেষণে হেজায, শাম, মিশর, বাগদাদ, কুফা ও খোরাসানসহ বহু স্থানে ভ্রমণ করেছেন। ১০৮০ জন ওস্তাদের নিকট থেকে ইল্‌ম অর্জন করেছেন। তিনি সারা জীবনে ৯০ হাজার শাগরেদকে ইল্‌ম দান করে গেছেন।

যেমনভাবে গাছের পরিচয় ফল দিয়ে মেলে, তেমনিভাবে ওস্তাদের পরিচয় ছাত্র দিে মেলে। ইমাম বোখারির শাগরেদ হচ্ছেন ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযি, ইমাম নাসায়ি (রহ.) প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছীনে কেরাম। বড়-বড় বহু মুহাদ্দিছ তাঁর শিষ্য। এতেই অনুমান করা যেতে পারে তাঁর ইল্‌মের বিস্তৃতি ও গভীরতা কেমন ছিল।

ইমাম বোখারি (রহ.) স্মরণশক্তি

তাঁর স্মরণশক্তি এমন ছিল যে–

قَالَ ابْنُ الْمُجَاهِدِ كُنْتُ عِنْدَ بَيْكَنْدِى فَقَالَ لِيْ لَوْ جِئْتَ قَبْلُ لَرَأَيْتَ صَبِيًّا يَحْفَظُ سَبْعِيْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ

ইবনুল মুজাহিদ বলেন, আমি একদিন বয়কনদিনর নিকট বসা ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, যদি তুমি সামান্য আগে আসতে, তাহলে একটি ছেলেকে দেখতে পেতে, যার সত্তর হাজার হাদীছ মুখস্থ আছে।

এর থেকেই বোঝা যায়, সেই কিশোর বয়সেই সত্তর হাজার হাদীছ মুখস্থ রাখা কেমন স্মৃতিশক্তির প্রমাণ বহন করে।

ইমাম বোখারি (রহ.) নিজেই বলেছেন,

اَحْفَظُ مِأَةَ اَلْفِ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ وَمِأَتَيْ اَلْفِ حَدِيْثٍ غَيْرِ صَحِيْحٍ

'আমার এক লক্ষ সহীহ হাদীছ এবং দুই লক্ষ গায়রে সহীহ হাদীছ মুখস্থ আছে।'

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের অনেক বড় ফজল ও করম আছে তাঁর ওপর। কিশোর বয়সেই ওস্তাদ থেকে হাদীছ রেওয়ায়াত করতে গিয়ে দেখলেন, সনদের মধ্যে একস্থানে কিছু নাম এলোমেলো হয়ে গেছে। তিনি সেগুলো দাগ দিয়ে রাখলেন। ওস্তাদ বললেন, আমি যা বলছি তা-ই সঠিক। কিন্তু যখন কিতাবের লিখিত কপির সাথে মিলিয়ে দেখা হলো, তখন দেখা গেল, ইমাম বোখারির কথা-ই সঠিক। ওস্তাদ চমকে গেলেন। ভাবলেন, কিশোর বয়সেই যে ছেলের স্মৃতিশক্তি এমন, পরিণত বয়সে এই ছেলে কী হবে আল্লাহই ভালো জানেন।

ইমাম বোখারি (রহ.) একবার বাগদাদ তাশরীফ নিলেন। সেখানকার লোকেরা পরস্পর মুশাওয়ারা করল, এই লোকের মুখস্থশক্তির পরীক্ষা নেওয়া হবে।

তারা এক আশ্চর্য পন্থা আবিষ্কার করল। প্রত্যেকে দশটি-দশটি করে হাদীছ নিল, যেগুলোর প্রত্যেকটিতে মতনে বা সনদে কোনো-না-কোনো বিচ্যুতি আছে। তারা তো আগেই এলান করে রেখেছিল যে, এক বড় হাফেযে হাদীছ এসেছেন। একজন মুহাদ্দিছ এবং অত্যন্ত প্রবল স্মৃতিশক্তি ও মুখস্থশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি এসেছেন। তো লোকেরা তাঁকে সকল হাদীছের

ব্যাপারে অভিজ্ঞই ধরে নিল। তখন এক লোক দাঁড়াল এবং জিজ্ঞেস করল,আমার নিকট কিছু হাদীছ আছে। আপনি কি সেসব শুনেছেন? ইমাম সাহেব বললেন, শোনান তো দেখি! লোকটি প্রথমটি শোনালে ইমাম সাহেব বললেন, না; আমি এই হাদীছটি শুনিনি! দ্বিতীয়টি শোনালে ইমাম বোখারি বললেন, না শুনিনি।

এভাবে লোকটি শুনিয়েই চলেছে আর ইমাম বোখারি (রহ.) নাসূচক বাক্য ব্যবহার করে চলছেন। এভাবে লোকটি একশত হাদীছ শোনাল। ইমাম বোখারি একশতটির ব্যাপারেই অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে নাসূচক শব্দ উচ্চারণ করলেন। লোকেরা বিচলিত হয়ে ভাবতে লাগল, এ কেমন হাফেযে হাদীছ?

এবার ইমাম বোখারি দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি যত হাদীছ বলেছেন, সবগুলোতেই হয়তো মতনে না হয় সনদে– কোথাও-না-কোথাও উল্টাপাল্টা ছিল, ভুল ও বিচ্যুতি ছিল। সেজন্য আমি নাসূচক বাক্য ব্যবহার করেছি। এবার শুনুন, আপনি যে-হাদীছগুলোর এতক্ষণ ভুল ইবারত বলেছেন, সেগুলো হুবহু শুনুন এবং তার শুদ্ধ হাদীছটি কি তা-ও শুনুন।

এই বলে ইমাম বোখারি (রহ.) লোকটির বলা একশত হাদীছ ভুলভাবে লোকটি যেভাবে বলেছে হুবহু সেভাবে মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন এবং প্রত্যেকটির সাথে-সাথে শুদ্ধ হাদীছটিও শুনিয়ে দিলেন। তাকে এ-ও বলে দিলেন যে, আপনার এই হাদীছের এই স্থানে এই ভুল ছিল। এভাবে একশত হাদীছ জায়গায় দাঁড়িয়ে শুনিয়ে দিলেন। এবার তো সকল মানুষের আশ্চর্য ও অভিভূত হওয়ার পালা।

মুহাদ্দিছীনে কেরাম বলেন, সেই ভুল হাদীছগুলোর শুদ্ধ হাদীছ শুনিয়ে দেওয়া ইমাম বোখারির জন্য বড় কিছু নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, সেই প্রশ্নকারীর উল্টাপাল্টা ইবারত ও সনদের হাদীছগুলো কেমন করে ইমাম সাহেব হুবহু শুনিয়ে দিলেন!

ذَالِكَ فَضْلُ اللهِ يُعْطِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

'এটি হলো আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে খুশি দান করেন।'[১]

---

১. সূরা হাদীদ : আয়াত ২১

ইমাম বোখারি (রহ.)-এর তাকওয়া

ইমাম বোখারি (রহ.)-এর তাকওয়া এমন ছিল যে, হাফেয (রহ.) বলেছেন–

هُوَ اٰيَةٌ مِّنْ اٰيَاتِ اللهِ يَمْشِىْ عَلَى الْاَرْضِ

'তিনি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে জমিনে বিচরণকারী একটি জীবন্ত নির্দশন।'

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেছেন,

مَا اَخْرَجَتْ خُرَاسَانُ مِثْلَ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ الْبُخَارِى

'খোরাসানে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বোখারির মতো কোনো ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেনি।'

ইমাম মুসলিম (রহ.) একবার এত খুশি হলেন যে, বলতে লাগলেন–

دَعْنِىْ اُقَبِّلُ رِجْلَيْكَ يَا اُسْتَاذَ الْاُسْتَاذِيْنَ وَيَا سَيِّدَ الْمُحَدِّثِيْنَ

'হে ওস্তাদদের ওস্তাদ! হে মুহাদ্দিছগণের নেতা! আমাকে সুযোগ দিন; আমি আপনার পায়ে চুম্বন করব।'

আল্লাহ তাঁকে সম্মানের এমনই সুউচ্চ আসন দান করেছেন এবং এমনই মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

বোখারি শরীফ লিপিবদ্ধের কারণ

বোখারি শরীফ লিপিবদ্ধের কারণ এই যে, ইমাম বোখারি (রহ.) একবার স্বপ্নে দেখলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারকে মাছি উড়ছে। তাঁর ওস্তাদ আবু ইসহাক (রহ.)-এর ব্যখ্যায় বললেন–

اَنْتَ تَذُبُّ عَنْهُ الْكِذْبَ

তুনি নবীজির সহীহ হাদীছ থেকে মিথ্যার মিশ্রণকে দূরে সরিয়ে দেবে, পৃথক করে দেবে। পরে বাস্তবে তা-ই ঘটল।

বোখারি শরীফ লেখার সন

হযরত শায়খ যাকারিয়া (রহ.)-এর তাহকীকমতে বোখারি শরীফ সংকলনের কাজ ২১৭ হিজরিতে শুরু হয়েছে এবং ২৩৩ হিজরিতে শেষ

হয়েছে। এরপর তাঁর জীবনের আরও ২৩ বছর বাকি ছিল। তেইশ বছরে তিনি কিতাবটি নব্বই হাজার ছাত্রকে পড়িয়েছেন।

বোখারি শরীফ সংকলনের নিয়ম কী ছিল?

হযরত ইমাম বোখারি (রহ.) এ কিতাবটি আল্লাহর দিকে অনেক বেশি পরিমাণে অভিমুখী হয়ে অত্যন্ত তাওজ্জুহর সাথে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা স্থাপন করে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন,

صَنَّفْتُ كِتَابِيْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا اَدْخَلْتُ فِيْهِ حَدِيْثًا حَتّٰى اِسْتَخَرْتُ اللّٰهَ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَتَيَقَّنْتُ صِحَّتَهٗ

আমি দুই রাকাত নফল নামায পড়তাম, এস্‌তেখারা করতাম এবং যতক্ষণ হাদীছটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস না হতো, ততক্ষণ হাদীছটি লিখতেন না।

وَقَدْ رَوٰى اِبْنُ عَدِيٍّ اَنَّ الْبُخَارِيَّ حَوَّلَ تَرَاجِمَهٗ بَيْنَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْبَرِهٖ وَكَانَ يُصَلِّيْ لِكُلِّ تَرْجَمَةٍ رَكْعَتَيْنِ

প্রত্যেক হাদীছের ক্ষেত্রে যেখানে-যেখানে তরজমাতুল বাব লিখেছেন, সেই তরজমাতুল বাব তিনি রিয়াজুল জান্নাহয় বসে লিখেছেন। তো যখন এক-একটি হাদীছের ব্যাপারে তিনি এত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, এতটুকু আল্লাহ অভিমুখী হয়েছেন, এত যাচাই বাছাই করেছেন, তাহলে তো আল্লাহর নিকট এই কাজ কবুল হয়েই যাবে।

বোখারি শরীফে হাদীছের সংখ্যা

ইমাম বোখারি (রহ.) বলেছেন,

اَخْرَجْتُ هٰذَا الْكِتَابَ مِنْ نَحْوِ سِتِّ مِائَةِ اَلْفِ حَدِيْثٍ

আমি ছয় লক্ষ হাদীছ থেকে এই কিতাব সংকলন করেছি। হাদীছসংখ্যার ব্যাপারে ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন, বোখারি শরীফে ৭ হাজার ২ শত ৭৫টি হাদীছ আছে। তবে অনেক হাদীছই কিতাবটিতে বারবার এসেছে। যেমন– اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ এই হাদীছটি। বিভিন্ন রকম আলোচনাসংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে বহু শিরোণামের আওতায়-ই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটি প্রথমে باب بدء الوحي এর আওতায় লেখা হয়েছে। তারপর ما جاء

الاعمال بالنية এই শিরোণামের আওতায় লেখা হয়েছে। তারপর كتاب العتق এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। باب الهجرة এর আওতায় বর্ণিত হয়েছে। باب النكاح এর মধ্যে লেখা হয়েছে। আবার باب النزول এবং كتاب الحيل এর মধ্যেও লেখা হয়েছে। একটি হাদীছই ৭ বার লেখা হলো সাতটি প্রসঙ্গে। এভাবে ব্যবহার হওয়াকে তাকরার বলে। একই হাদীছ; কিন্তু ভিন্ন-ভিন্ন প্রয়োজনে কিতাবে অনেক স্থানে হাদীছটি ব্যবহৃত হয়েছে। তো এমন তাকরারগুলোকে একটি ধরে গণনা করলে দেখা যায়, বোখারি শরীফে ৪ হাজার হাদীছ আছে। হাফেয ইবনে হাজ্‌র (রহ.)-এর তাহকীকমতে মোট হাদীছ সংখ্যা ৭ হাজার ৩ শত ৯৭। তাকরার বাদ দিয়ে ২ হাজার ৭ শত ৬১টি হাদীছ বোখারি শরীফে আছে।

হাদীছ বর্ণনার শর্ত

৬ লক্ষ হাদীছের বিশাল সম্ভার থেকে মাত্র ২ হাজার একষট্টিটি হাদীছ হযরত ইমাম বোখারি (রহ.) নির্বাচন করেছেন, তাঁর কিতাবে লিখেছেন। তার কারণ এই ছিল যে, তাঁর মতে হাদীছ বর্ণনার শর্ত বড় শক্ত ও কঠিন। অনেক যাচাইবাছাই করতে হয়। তাঁর মতে হাদীছ বর্ণনার শর্ত নিম্নরূপ–

* হাদীছটির বর্ণনাকারী মুসলমান হতে হবে। ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন হতে হবে।

* ছেকাহ হতে হবে। লোকটি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হতে হবে। লোকটির কোনোরূপ জরাহ তথা অন্যায় না থাকতে হবে। কোনোরূপ দুর্বলতা না থাকতে হবে।

* বর্ণনাকারী হাফেয হতে হবে। অর্থাৎ– হয়তো হাদীছটির রাবী তথা বর্ণনাকারীর এমনভাবে মুখস্থ থাকতে হবে যেমন কুরআনের হাফেযের কুরআন মুখস্থ থাকে। অবশ্য আগের যুগে হাফেযে কুরআনকে কারী বলা হতো। হাফেয বলা হতো হাদীছের হাফেযকে। যেমন– হাফেয ইবনে কায়্যেম (রহ.), হাফেয ইবনে তাইমিয়া, হাফেয ইবনে কাছীর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে 'হাফেয' বলা হয় হাদীছের হাফেয হওয়ার কারণে।

* হাদীছের রাবীদের সংখ্যা প্রত্যেক স্তরে দুজন করে হতে হবে।

* ওস্তাদ ও শাগরেদের মাঝে لقاء তথা সাক্ষাৎ হওয়া জরুরি।

তো এই শর্তগুলো যেসব হাদীছের মধ্যে পাওয়া যেত, সেসব হাদীছই তিনি তাঁর কিতাবে লিখেছেন। আর যেসব হাদীছ এসব শর্তে উন্নীত হতো না, সেসব হাদীছ তিনি তাঁর কিতাবে লেখেননি।

কিতাবের নাম

বোখারি শরীফ কিতাবের মূল নাম কী? অনেক সময় দাওরা সম্পন্নকারী ছাত্রকে জিজ্ঞেস করা হলেও সে নামটি বলতে পারে না। কিতাবটির নামই তার মনে থাকে না। নামটি তো অন্তত মুখস্থ রাখা চাই। ইমাম নববি (রহ.) বলেছেন, বোখারি শরীফের মূল নাম হচ্ছে–

اَلْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ اُمُوْرِ رَسُوْلِ اللهِ وَاَيَّامِهٖ

এবার নামের মধ্যে যত শব্দ আছে, প্রত্যেকটি শব্দ নিয়ে আলোচনা করা যাক। বোখারি শরীফকে الجامع এজন্য বলা হয়েছে যে, আটটি বিষয়সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে অর্থাৎ– হাদীছের যে-কিতাবে আটটি শাখাপ্রশাখা নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে جامع বলা হয়। সেই আট বিষয় হচ্ছে

سير، آداب، تفسير، عقائد، فتن، اشراط الساعة، احكام، مناقب

এই আট বিষয়ের প্রত্যেকটি বিষয়েই যে-কিতাবে হাদীছ বর্ণিত হবে, সেই কিতাবকে جامع বলা হবে। তারপর مسند এর অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক সাহাবি পৃথক-পৃথকভাবে হাদীছ বর্ণনা করা। অর্থাৎ– সাহাবা কেরামের ক্রমানুসারে হাদীছের ধারাবাহিকতা দান করে কিতাব লেখা।

আর আরেকটি অর্থ হচ্ছে, কিতাবে মুত্তাসিল সনদের সাথে মারফূ' হাদীছ বর্ণনা করা। এমন কিতাবকে مسند বলা হয়।

الصحيح যে কিতাবে সহীহ হাদীছের ইহতেমাম করা হবে প্রবলভাবে।

المختصر ওই কিতাবকে বলা হবে, যে-কিতাবে হাদীছগুলো মানদণ্ড মেপে নির্বাচন ও বাছাই করে বর্ণনা করা হয়। ব্যাপারটি এমন নয় যে, বোখারি শরীফে যত হাদীছ আছে, সবই সহীহ। এছাড়া অন্য যত হাদীছ আছে, তা সহীহ নয়। বরং ইমাম বোখারি তাঁর নিজস্ব মানদণ্ডে মেপে সহীহ হাদীছ নির্বাচন করেছেন।

امور رسول الله এর দ্বারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ উদ্দেশ্য।

ايامه দ্বারা নবীজির গাযাওয়াত উদ্দেশ্য। আল্লামা ইবনে হাজ্‌র আসকালানি (রহ.) বলেছেন, বোখারি শরীফের নাম–

اَلْجَامِعُ الصَّحِيْحُ الْمُسْنَدُ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ وَسُنَنِهٖ وَاَيَّامِهٖ

এই উভয় নামই মুখস্থ রাখা চাই। বুঝে রাখা চাই বোখারি শরীফের নামের বিশ্লেষণ।

হাদীছ সংকলনের ইতিহাস

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় হাদীছ সংকলনের কাজ সর্বপ্রথম খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর হাতে শুরু হয়। তিনি তাঁর যুগের মুহাদ্দিছীনে কেরামকে বললেন, দেখুন, এই সময়টা স্বর্ণযুগ, কল্যাণের সময়, উত্তম সময়। এখন তো মানুষের স্মৃতিপটে নবীজির হাদীছ সংরক্ষিত আছে; কিন্তু বর্তমানের মানুষগুলো দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পর হাদীছের রত্নভান্ডারও দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে। তাই উচিত সকলে মিলে হাদীছসমূহ লিখে রাখা। অনেক মুহাদ্দিছীনে কেরাম তাঁর এই কথায় হাদীছ লেখার কাজ শুরু করলেন। আল্লামা সুয়ূতী (রহ) তার الفيه নামক গ্রন্থ বলেছেন,

اَوَّلُ جَامِعِ الْحَدِيْثِ وَالْاَثَرِ ■ اِبْنُ شَهَابٍ اَمَرَ لَهٗ عُمَرُ

اَوَّلُ الْجَامِعِ لِلْاَبْوَابِ ■ جَمَاعَةٌ فِي الْعَصْرِ ذُوْ اِقْتِرَابِ،

كَابْنِ جُرَيْجٍ وَهُشَيْمٍ مَالِكٍ ■ وَمَعْمَرَ وَوَلَدِ الْمُبَارَكِ،

وَاَوَّلُ الْجَامِعِ بِاقْتِصَارٍ ■ عَلَى الصَّحِيْحِ فَقَطْ اَلْبُخَارِيْ،

'হাদীছ ও আছার সর্বপ্রথম যিনি সংকলন করেছেন, তিনি হলেন ইবনে শিহাব। কাজটি তিনি হযরত ওমর (রাযি.)-এর আদেশে সম্পাদন করেছিলেন। সংকলিত হাদীছগুলোকে সর্বপ্রথম অধ্যায়ে-অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন সমকালীন একদল বিজ্ঞ আলেম। যথা– ইবনে জুরাইজ, হুশাইম, মালেক, মা'মার ও ইবনে মুবারক। সর্বপ্রথম শুধু সহীহ হাদীছের সংকলন তৈরি করেছেন একমাত্র ইমাম বোখারি।'

তো হাদীছ শাস্ত্রে এ উম্মত হাজার-হাজার কিতাব লিখে গেছেন। সেই হাজারো কিতাবের মধ্যে ছয়টি কিতাব এমন, যেগুলোর ব্যাপারে উম্মতের সকল মুহাদ্দিছ একমত যে, সেই ছয়টি কিতাবে সহীহ হাদীছ রয়েছে। এগুলোকে 'সিহাহ সিত্তা' বলা হবে। এই সিহা সিত্তা কিতাবই তোমরা তোমাদের তালেবে ইল্‌মি জীবনের শেষ বর্ষে এসে অধ্যয়ন করছ। ছয় কিতাব হচ্ছে–

১. বোখারি শরীফ
২. মুসলিম শরীফ
৩. তিরমিযি শরীফ
৪. আবু দাউদ শরীফ
৫. নাসায়ি শরীফ
৬. ইবনে মাজাহ শরীফ

এই ছয় কিতাব তোমরা এ বছর পড়ছ। এই ছয় কিতাব থেকে দুটি কিতাব বেশি সহীহ। এগুলোকে সাহীহাইন বলা হয়। এই দুটি কিতাব হচ্ছে বোখারি ও মুসলিম শরীফ।

সিহাহ সিত্তার বৈশিষ্ট্য

এই কিতাবগুলোতে মুহাদ্দিছগণ তাঁদের আপন-আপন রুচিবোধ ও স্বভাবসুলভ নীতির মাধ্যমে হাদীছ জমা করেছেন। নানা অভ্যাস ও নানা রুচির পার্থক্যের কারণে দেখা গেছে তাঁদের একেকজন একেক ধারায় তাঁদের কিতাবে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সিহাহ সিত্তার দিকে তাকালে দেখা যায়, লেখকগণ একেকজন একেকভাবে নানা প্রকৃতির শিরোনাম দিয়ে তাদের কিতাবকে সাজিয়েছেন। একেকজন একেকভাবে তাঁদের কিতাবের সূচনা করেছেন। যেমন– ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অভিমত হচ্ছে, উসূলে হাদীছ ব্যতীত হাদীছ শিক্ষা করা অসম্ভব। তাই তিনি তার কিতাব লেখার পূর্বে একটি ভূমিকা লিখলেন, যাকে 'মুকাদ্দামায়ে ইমাম মুসলিম' বলা হয়। উসূলে হাদীছের ব্যাপারে এই মুকাদ্দামার বেশ সুখ্যাতি আছে। তো ইমাম মুসলিম উসূলে হাদীছ তথা হাদীছের মূলনীতি বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর কিতাবের সূচনা করেছেন। হযরত ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.)-এর কথা হলো, হাদীছ তো পড়া হবে আমল করার জন্য। আর হাদীছের ওপর আমল করা ততদিন সম্ভব নয় যতদিন পর্যন্ত বান্দার অন্তরে নবীজির ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত না হবে। তাই তিনি حب رسول এর শিরোনাম দিয়ে তাঁর কিতাবের সূচনা করলেন।

ইমাম তিরমিযি, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়ি (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিকহী তারতীবে হাদীছ জমা করা। তাই তাঁরা ফিকহী ধারাবাহিকতায় كتاب الطهارة -এর মাধ্যমে তাঁদের কিতাবের সূচনা করলেন।

ইমাম বোখারি (রহ.)-এর প্রধান টার্গেট ছিল শরীয়তের আহকামসমূহকে স্পষ্ট করা। তাঁর মতে হাদীছের আসল মাকসাদ হচ্ছে–

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

'মানুষের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা স্পষ্ট করা।'[১]

তো যেহেতু হাদীছ আহকামে শরীয়তকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করে আর আহকামে শরীয়তের মূল ভিত্তি ওহী, তাই তিনি كيف كان بدء الوحي শিরোনামে তাঁর কিতাব শুরু করলেন। তাই সিহাহ সিত্তার প্রত্যেকটি কিতাব ভিন্ন-ভিন্ন ধারায় লিখিত। প্রত্যেকটিরই আলাদা-আলাদা রূপ আছে। আলাদা-আলাদা রং আছে। যেমন– বাগানের ফুল। সব ফুলকে তো ফুলই বলা হয়। অথচ একেক ফুল একেক রকম। একেক ফুলের একেক ঘ্রাণ। এমনকি একেক ফুলের একেক রকম রূপ আছে, রং আছে। মনে রাখবেন সিহাহ সিত্তা একটি পুষ্পকানন, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর পেয়ারা হাবীবের কথামালাকে একস্থানে একত্রিত করে দিয়েছেন।

সিহাহ সিত্তার সারাংশ

হযরত শাইখুল হাদীছ যাকারিয়া (রহ.) সিহাহ সিত্তার সারাংশ এই বলেছেন যে–

যদি তিরমিযি শরীফ পড়া হয়, তাহলে জানা যায়, মাযহাবের ইমামগণ প্রত্যেক হাদীছের ব্যাপারে কী বলেন। শাফেয়িগণ কী বলেন, হাম্বলীগণ কী বলেন বা অন্যান্যরা কী বলেন। এসব আমরা তিরমিযি শরীফ অধ্যয়ন করে জানতে পারি।

তারপর আবু দাউদ শরীফের দ্বারা মাযহাবের দলিলসমূহ আমরা জানতে পারি।

বোখারি শরীফ পড়ে মাসআলা উদ্ভাবন করার তরিকা জানতে পারি।

মুসলিম শরীফ অধ্যয়নে দলিলসমূহের মাঝে মজবুতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারি।

নাসায়ি শরীফ অধ্যয়ন করে জানতে পারি, যে-হাদীছ দিয়ে দলিল দেওয়া হচ্ছে, তাতে কোনো ইল্লত আছে কি-না।

আর ইবনে মাজাহ পড়ে জানতে পারি এমন সব বিষয়, যার সাহায্যে পাঠক মুসান্নিফের তাহকীক ব্যতীতই ইল্লত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়।

তো দেখা যায়, প্রত্যেক কিতাবের আপন-আপন বৈশিষ্ট্য আছে। আপন-আপন মাহাত্ম্য আছে, যে অনুযায়ী কিতাবটি লেখা হয়েছে।

---

১. সূরা নাহল : আয়াত ৪৪

আসাহ্হুল কুতুব

সিহাহ সিত্তাহর মধ্যে দুটি কিতাব আছে, যেগুলোকে সহীহাইন বলা হয়। ওলামায়ে কেরাম এই দুই কিতাবের মধ্যে কোনটি বেশি সহীহ তা নিয়ে কথা বলেছেন। বলা হয়েছে, সবচেয়ে সহীহ হাদীছের কিতাব হচ্ছে বোখারি শরীফ।

اَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ

'আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনুল কারীমের সবচেয়ে সহীহ বা বিশুদ্ধতম কিতাব হচ্ছে বোখারি শরীফ।'

এই কিতাবটিকে কেন সবচেয়ে সহীহ বা সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব বলা হয়েছে? কোনো এক আলেম এ বিষয়ে একটি কবিতা লিখেছেন। তিনি তাতে বলেছেন,

تَنَازَعَ قَوْمٌ فِي الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ ■ لَدَيَّ فَقَالُوا اَيُّ ذَيْنِ يُقَدَّمُ

فَقُلْتُ لَقَدْ فَاقَ الْبُخَارِيُّ صِحَّةً ■ كَمَا فَاقَ فِي حُسْنِ الْقَنَاعَةِ مُسْلِمُ

তিনি বলছেন, বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে বোখারি শরীফের পাল্লা বেশি ভারী। তবে সুন্দর তারতীবের দিক থেকে ভারি মুসলিমের পাল্লা।

আসাহ্হুল কুতুবের দলিল

তো বিশুদ্ধতার দিক থেকে বোখারি শরীফের প্রধান্য বেশি। কারণ, পাঁচটি ভিন্ন-ভিন রকম দলিল আছে–

দলিলগুলো তোমরা মুখস্থ করে নাও। এ-ব্যাপারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। তখন তো উত্তর দিতে হবে। তাই শুনে রাখো–

১. عدالت رواة (বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা) : প্রথম দলিল عدالت رواة এর ব্যাপারে। রাবীগণ কতটুকু عادل (নির্ভরযোগ্য) হযরত ইমাম বোখারি (রহ.) তাঁর কিতাবে ৪৩৫ জন রাবী থেকে হাদীছ রেওয়ায়াত করেছেন। তাদের মধ্যে ৮০ জন ছিলেন এমন, যারা মুতাকাল্লামও ছিলেন, যাদের ওপর মুহাদ্দিছীনে কেরাম كلام করেছেন এবং جرح (যে-রাবির ব্যাপারে নেতিবাচক বক্তব্যও পাওয়া যায়) করেছেন।

আর ইমাম মুসলিম (রহ.) ৬০০ মুহাদ্দিছ থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। তাদের মধ্যে متكلم فيه রাবী আছেন ১৬০ জন। এতেই عدالت رواة এর সূক্ষ্ম

দিকটি স্পষ্ট হয়ে যায়। এতে বোঝা যায়, বিশুদ্ধতার দিক থেকে বোখারি শরীফের পাল্লা ভারী।

২. تعدادحديث : তারপর হাদীছের সংখ্যার দিক। ইমাম বোখারি (রহ.) যতজন متكلم فيه (যে-রাবির ব্যাপারে ভালো-মন্দ উভয় প্রকার বক্তব্য পাওয়া যায়) রাবী থেকে হাদীছ রেওয়ায়াত করেছেন। কারও থেকে একটি রেওয়ায়াত করেছেন। কখনো দুটি হাদীছ রেওয়ায়াত করেছেন। আবার কারও থেকে চারটিও রেওয়ায়াত করেছেন।

মোটকথা ইমাম বোখারি অল্প কিছু হাদীছ রেওয়ায়াত করেছেন متكلم فيه রাবী থেকে। আর ইমাম মুসলিম (রহ.) এমন রাবী থেকে বহু হাদীছ রেওয়ায়াত করেছেন। এখানেও বিশুদ্ধতার দিক থেকে বোখারি শরীফের পাল্লা ভারী দেখা যায়।

৩. রেওয়ায়াতকারীগণ : তারপর রেওয়ায়াতকারীদের ব্যাপারটিও দেখার মতো। ইমাম বোখারি (রহ.) যে-সকল রেওয়ায়াতকারী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে সকলেই তাঁর ওস্তাদ ও শায়খ ছিলেন। অর্থাৎ– তাঁদের জীবন ইমাম বোখারি (রহ.) খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছেন। আর জরাহকারীরাও হয়তো এত কাছ থেকে তাদের জীবনধারা প্রত্যক্ষ করতে পারেননি।

ইমাম বোখারি তাঁদের শাগরেদ হওয়া, তাঁদের জীবনকে কাছ থেকে দেখা, তারপর তাঁদের থেকেই হাদীছ রেওয়ায়াত করা এ কথার প্রমাণ যে, ওই সকল متكلم فيه রেওয়ায়াতকারী ততটা দুর্বল ও কমজোর ছিলেন না যে, তাদের থেকে রেওয়ায়াত করা যাবেই না। এদিকে ইমাম মুসলিম (রহ.) যতজন متكلم فيه রাবী থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, তাঁদের অনেকে তাঁর আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তিনি অনেকের সাক্ষাৎই পাননি। তো এদিক থেকেও তো বোখারির পাল্লা ভারী দেখা যায়।

৪. معيار মাপকাঠি : মানদণ্ডের দিকটিও লক্ষ করার মতো। যেমন– ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, যেব্যক্তি معنعن (যে-হাদীছ عن দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে) করে রিওয়ায়াত করে সে এবং তার ওস্তাদ যার থেকে রেওয়ায়াত করেছেন উভয়ে সমসাময়িক হলেই যথেষ্ট। আর ইমাম বোখারি বলেন, উভয়ের মাঝে সাক্ষাৎ হওয়া জরুরি। শুধু সমসাময়িক হলেই চলবে না। এদিক থেকেও বোখারির পাল্লা ভারী দেখা যায়।

৫. علت : এর প্রতি লক্ষ করলেও বোখারির শেষ্ঠত্বই ফুটে ওঠে। ইমাম বোখারির পুরো কিতাবে ৮০টি হাদীছের মধ্যে কালাম করা হয়েছে। অথচ মুসলিম শরীফের ১২৩ হাদীছের ওপর কালাম করা হয়েছে। এদিক থেকেও বোখারি শরীফের পাল্লাই ভারী দেখা যায়।

তো পাঁচটি দিক এমন আছে, যার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বোখারি শরীফই হচ্ছে 'আল্লাহর কিতাবের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব'।

বোখারি শরীফের বৈশিষ্ট্য

ইমাম বোখারি (রহ.)-এর কিতাবের মধ্যে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা বোখারি শরীফকে উচ্চাসনে সমাসীন করে রেখেছে।

* বোখারি শরীফের প্রথম সৌন্দর্য হচ্ছে تراجم ابواب অর্থাৎ– প্রত্যেক অধ্যায়ের শিরোনাম। তিনি শিরোনামের মধ্যেই ওই অধ্যায়ের আলোচনার সারাংশ নিয়ে এসেছেন। তো এই শিরোনামটি বড় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে গেছে।

* ترجمة الباب তথা শিরোনামের মাঝে কুরআনের আয়াতও নিয়ে এসেছেন। তো তিনি যখন হাদীছের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত উল্লেখ করে দেন, তাই আলোচ্য বিষয়টি বড় মজবুত ও শক্তিশালী হয়ে যায়। ফলে বিষয়টি অকাট্য হয়ে যায়।

আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে যে-হাদীছটি সবচেয়ে রাজেহ (প্রাধান্যযোগ্য), সেটি প্রথমে উল্লেখ করেন।

বোখারিতে যত হাদীছ আছে, সবই তিনি তাঁর ওস্তাদগণ থেকে শুনেছেন। এমন নয় যে, শুধু লিখে নিয়েছেন।

কোনো-কোনো স্থানে কিতাবটিতে ইমাম বোখারি بدء শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন بدء الوحی এমনিভাবে بدء الخلق، بدء الاذان، بدء الحيض

তিনি হাদীছগুলো এমনভাবে এনেছেন যে, অধ্যায়ের শেষ হাদীছটি দ্বারা মানুষকে তিনি আখেরাতের দিকে মনোনিবেশ করতেন। এটি তাঁর কিতাবের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মুহাদ্দিছগণ বলেছেন, ইমাম বোখারি (রহ.) তাঁর ছাত্রদের বারবার আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। বারবার আখেরাত-অভিমুখী করতেন।

লেখার বিরতির পর তিনি بسم الله الرحمن الرحيم বলে আবার লেখা শুরু করেন।

বোখারি শরীফের মধ্যে ২২ টি হাদীছ ثلاثيات আছে। ثلاثي ওই হাদীছকে বলে, যার মধ্যে মুসান্নিফ ও নবীজির মাঝে স্তর মাত্র তিনটি। এটি সর্বনিম্ন সংখ্যকস্তর হাদীছের ক্ষেত্রে। তাই এমন হাদীছের মান অনেক উঁচু।

যাহোক, এগুলো বোখারি শরীফের একক কিছু বৈশিষ্ট্য, যার কারণে কিতাবটি আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত কবুল করে নিয়েছেন।

বোখারি শরীফ শুরু

এবার কিতাবের দিকে তাকাও। দেখো, ইমাম বোখারি (রহ.) তাঁর এই কিতাব بسم الله الرحمن الرحيم দ্বারা শুরু করেছেন। সাধারণ নিয়মের একটু ভিন্নরূপে এটি শুরু করা হয়েছে। কারণ, অধিকাংশ লেখক حمد বা صلوة এর মাধ্যমে বা شهادة এর মাধ্যমে কিতাবের সূচনা করেন। আর সে ব্যাপারে হাদীছও আছে–

كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَا يُبْدَاُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللهِ وَالصَّلٰوةِ عَلَىَّ فَهُوَ اَقْطَعُ وَاَبْتَرُ مَمْحُوْقٌ مِنْ كُلِّ بَرَكَةٍ

'যেকোনো শানদার কাজই আল্লাহর হাম্‌দ ও আমার দুরুদের মধ্যমে শুরু না করা হয়, তা লেজকাটা এবং সর্বপ্রকার বরকত থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।'

তো এই হাদীছের প্রতি লক্ষ রেখেই লেখকগণ তাঁদের কিতাবকে تحميد এর মাধ্যমে শুরু করতেন। অথচ ইমাম বোখারি (রহ.) بسم الله الرحمن الرحيم দ্বারা শুরু করেছেন।

একটি প্রশ্ন

এখানে একটি প্রশ্ন জাগ্রত হয় যে, ইমাম বোখারি (রহ.) الحمد لله বলে কেন কিতাব শুরু করেননি। মুহাদ্দিছীন এর অনেক রকম উত্তর দিয়েছেন। আমি সময়ের স্বল্পতার দিকে লক্ষ করে মাত্র দু-তিনটি উত্তর প্রদান করব, যা বুঝতে সহজ। মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো।

উত্তর– ১. প্রথম উত্তর এই দেওয়া হয় যে, ইমাম বোখারি (রহ.) যখন কিতাব লিখতে বসেছেন, তখন তিনি হাম্‌দ মৌখিকভাবে করেছেন– কলমে লেখেননি।

اِنَّهٗ حَمِدَ لَفْظًا لَا كِتَابَةً

তিনি জবানে আলহাম্‌দুলিল্লাহ পড়ে নিয়েছেন। এতে হাদীছের ওপরও আমল হয়ে গেল। আর লেখার ক্ষেত্রে তিনি بسم الله الرحمن الرحيم দ্বারা শুরু করলেন।

উত্তর– ২. দ্বিতীয় উত্তরটি এই যে, ইমাম বোখারি بسم الله দ্বারা শুরু করেছেন আর بسم الله এর মধ্যে الحمد لله বিদ্যমান রয়েছে। যেমন بسم الله পড়ার সময় তুমি আল্লাহকে الرحمن এবং الرحيم বলবেই। এটি আল্লাহর গুণবাচক নাম। যেখানে সিফাতি নামের আলোচনা হবে, সিফাতি নাম উচ্চারিত হবে, সেখানে তো হাম্‌দ হয়েই যায়। তো বোঝা যায় بسم الله এর ভেতর تحميد ও আছে। তাই ইমাম বোখারি শুধু بسم الله বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

উত্তর– ৩

الحمد لله দ্বারা শুরু করা এটি বক্তব্যের হুকুম। লেখার হুকুম তো নয়। কারণ, খোতবাদানকারী الحمد لله وكفى বলে শুরু করে। যেমনটি নবীজির আমল দ্বারা বোঝা যায়। সুলহে হুদায়বিয়ার সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে চুক্তিনামা লেখা হচ্ছিল। তিনি প্রথমে بسم الله লিখলেন। তারপর চুক্তিগুলো লেখলেন। তো নবীজির আমল রয়েছে যে, লেখার ক্ষেত্রে প্রথমে بسم الله লেখা হবে। তারপরই লেখা শুরু হবে। তাই ইমাম বোখারি নবীজির ওই আমলটিরই অনুসরণ করলেন। بسم الله লিখে তারপর হাদীছ লেখা শুরু করলেন।

بدء الوحي দ্বারা কেন শুরু করলেন

বোখারির প্রথম বাব আনা হয়েছে باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم এই বাবে ইমাম বোখারি (রহ.) ওহীর সূচনা কীভাবে হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, ওহী অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়। এখন প্রশ্ন জাগে ইমাম বোখারি কেন এই বাব দ্বারা কিতাব শুরু করলেন।

তাহলে শোনো। ইল্‌ম হাসিল করার নানা রকম মাধ্যম আছে। কয়েকভাবে ইল্‌ম হাসিল করা হয়।

১. পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ : কিছু বিষয় علم ظاهري তথা বাহ্যিক জ্ঞান, যা আমরা অর্জন করি পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। বিজ্ঞানও এই

পঞ্চইন্দ্রিয়ের কথা বলে। যেমন– চক্ষু দ্বারা দেখার মাধ্যমে ধারণা লাভ হয়, জ্ঞান হয়। তবে চক্ষুর দেখার ওপর নির্ভর করা যায় না। কারণ, অনেক সময় চোখের দেখা ভুল প্রমাণিত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, শীতকালে পুকুরের পানির ওপর ধোঁয়া উঠছে। অথচ তা ধোঁয়া নয়। আবার দেখা যায় দূর থেকে একটি জন্তুকে দেখে মনে করা হলো, জন্তুটি হয়তো ছাগল। কিন্তু কাছে গেলে বোঝা যায়, এটি ছাগল নয় ভেড়া বা কুকুর। আবার অনেক সময় দেখা যায়, আপনি গাড়িতে বসে আছেন। আপনার গাড়ি বন্ধ। এখন পাশ দিয়ে আরেকটা গাড়ি ধীরগতীতে অতিক্রম করলে আপনার কাছে মনে হয় আপনার গাড়িটা চলছে। অথচ আপনার গাড়ি চলছে না। একে ইংলিশে বলা হয় Illusion (চোখের ধোঁকা)। তো বোঝা গেল, শুধু চোখের দর্শনের ওপর নির্ভর করা যায় না।

মানুষের আরেকটি ইন্দ্রিয়ের নাম কান বা শ্রবণশক্তি। শোনার মধ্যেও ভুল হয়ে যায়। ওস্তাদ এক রকম বলে আর ছাত্র শোনে ভিন্ন রকম। তো কান দ্বারা যে ধারণা হয়, তার মধ্যে ভুল হতে পারে। তৃতীয় ইন্দ্রিয় হচ্ছে ঘ্রাণ নেওয়া। নাসিকা বা নাকের মাধ্যমেও মানুষ ধারণা ও জ্ঞান লাভ করতে পারে। তবে যার সর্দি হবে, সে ঘ্রাণ নিয়ে কোনো দিন বুঝতে পারবে না এটি মেশকের ঘ্রাণ, না অন্য কিছুর; গোলাপ ফুলের ঘ্রাণ, নাকি হাসনাহেনার। তো নাকও অনেক সময় ভুল তথ্য দেয়।

আরেকটি ইন্দ্রিয় হচ্ছে স্পর্শ করা। স্পর্শ করে মানুষ ধারণা ও জ্ঞান লাভ করতে পারে। কিন্তু শীতে যদি পা অবশ হয়ে যায়, তখন পা-ও বুঝতে পারে না কী হচ্ছে। পায়ের ওপর ব্লেড চালালেও বোঝা যায় না, পা কাটা হচ্ছে। তো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বহু কিছু বোঝা যায়। বহু কিছু জানা যায় এবং বহু বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু এর ওপর ভরসা করা যায় না। কারণ, এসব ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জিত ধারণা সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। তাই পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জিত ইল্‌মের ওপর নির্ভর করা যাবে না।

২. আকল ও মস্তিষ্কে অর্জিত ইল্‌ম

জ্ঞান লাভ করার আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে আকল, যাকে মস্তিষ্ক বলি। মস্তিষ্কের দ্বারা জ্ঞান ও ধারণা লাভ হয়। কিন্তু মস্তিষ্কের ওপরও নির্ভর করা যায় না। কারণ, মস্তিষ্কও মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়, ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত করে। দেখুন, অনেক সময় কোনো বৈধ কাজকে আকল মনে করে এটি

অবৈধ। আবার কোনো অবৈধ কাজকে আকল মনে করে এটা বৈধ। ইতিহাসে একটা স্থূল মস্তিষ্কের নাম আছে, যে একটি ভ্রান্ত মতবাদের জন্ম দিয়েছে। তার আকল এত কম, তার জ্ঞান ও বুদ্ধি এত স্থূল যে, সে বলেছে, ভাই ও বোনের মাঝে বিবাহ বৈধ। বৈধতার পেছনে সে দলিল দিয়েছে এই যে, মানুষের সর্বোত্তম স্ত্রী তো সে, যে স্বামীর মনের কথা, তার সমস্ত চাহিদা ও ইচ্ছা-অনিচ্ছা বুঝতে পারে। আর এসব বোনই সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারে ভাইয়ের ক্ষেত্রে।

দেখুন, তার মস্তিষ্ক তাকে কত বড় ধোঁকায় ফেলল। সে ভুলেই গেল, মা ও বোন যাদের সাথে তার রক্তের সম্পর্ক, তাদের প্রতি যদি তার কামনার দৃষ্টি পড়ে, তাহলে সে কত বড় ধ্বংসের মধ্যে পড়ে যাবে। তো জ্ঞান ও আকল তথা মস্তিষ্ক তাকে ধোঁকা দিয়ে ভুল পথে নিয়ে গেল।

আবার কোনো এক রাষ্ট্রপ্রধান পার্লামেন্টে বৈধতা দিয়েছেন, পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে বিবাহ করতে পারবে। আচ্ছা তাহলে বিবাহের কী ফল হবে। তো এ ব্যক্তির আকল ও মস্তিষ্ক তাকে ভ্রান্তির দিকে নিয়ে গেছে। বলুন, এই আকলের ওপর কীভাবে ভরসা করা যাবে? মানবমস্তিষ্কের ওপর কীভাবে নির্ভরশীল হওয়া যাবে?

৩. ওহীর মাধ্যমে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া

ইল্‌ম হাসিল করা এবং জ্ঞান লাভ করার তৃতীয় মাধ্যম হচ্ছে ওহী। ওহীয়ে ইলাহী। আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যাতের পক্ষ থেকে আম্বিয়ায়ে কেরাম যে ইল্‌ম প্রাপ্ত হয়েছেন, তা এমন ইল্‌ম, যা চির সত্য, অকাট্য ও শক্তিশালী। এই ইল্‌মের ওপরই ভরসা করা যায়। এই জ্ঞানের ওপরই নির্ভর করা যায়। তাই তো আল্লাহ তা'আলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইল্‌ম ও জ্ঞান দান করেছেন এবং সাথে-সাথে বলে দিয়েছেন–

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

'মিথ্যা তাতে অনুপ্রবেশ করবে না– সামনের দিক থেকেও না, পেছনের দিক থেকেও না। এটি প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসার্হ আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ।'[১]

---

১. হা-মীম আস-সাজদাহ : আয়াত ৪২

তো এমন পাকাপোক্ত ও মজবুত ইল্‌ম। এই অকাট্য ইল্‌ম আল্লাহ তাঁর পেয়ারা হাবীবকে দান করেছেন। তাই ইমাম বোখারি (রহ.) প্রথম পরিচ্ছেদ স্থাপন করেছেন ওহীর বিষয়ে। প্রথম পরিচ্ছেদ এনেছেন بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ এর ব্যাপারে।

এখানে একটি আয়াতে মুবারাকা লিখেছেন। তা হচ্ছে–

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ

'আমি তোমার কাছে অহি নাযিল করেছি, যেমন করেছিলাম নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের ওপর।'[১]

এই আয়াত উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলে দেওয়া যে, ওহী দুই প্রকার হয়ে থাকে। এক প্রকারকে ইলহামও বলা হয়। ইরশাদে বারী তা'আলা–

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ

'আমি মূসার মায়ের কাছে আদেশ পাঠালাম যে, তুমি তাকে দুধ পান করাও।'[২]

এখানে ওহী দ্বারা ইলহাম উদ্দেশ্য। এমনিভাবে

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ

'তোমার রব মৌমাছির কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালেন।'[৩]

এখানেও ইলহাম উদ্দেশ্য। তো ওহী দ্বারা উদ্দেশ্য ইলহাম হতে পারে। তাই বোখারি (রহ.) বলে দিলেন, না; এখানে ইলহাম উদ্দেশ্য নয়। এই আয়াত উল্লেখ করে তিনি এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, যে-ওহীর কথা আমি বলছি, তা সেই ওহী, যা পূর্ববর্তী নবীগণের নিকট আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছেন। তারপর এই ওহীর আগমনধারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর আনুমানিক ছয়শত বছর বন্ধ ছিল। তারপর এই ওহীর ধারা আবার শুরু হলো। আমাদের নবীজির নিকট ওহী প্রেরণের ধারা আরম্ভ হলো। তাই তো এই ওহীর ওপর আমরা পূর্ণ নির্ভরশীলতার সাথে ভরসা রাখি। এই ওহী সেই ওহী, যা হযরত নূহ (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। আম্বিয়া কেরামের

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১৬৩
২. সূরা কাসাস : আয়াত ৬
৩. সূরা নাহল : আয়াত ৬৮

নিকট এই ওহীর ধারা অব্যাহত ছিল। এই ওহী সেই ওহী, যার ধারা আমাদের নবীর ওপর শুরু হয়েছিল।

নূহ (আ.)-এর ওপর ওহীর আলোচনা কেন?

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, বলা হয়েছে, আপনার ওপর আমি ওহী প্রেরণ করি যেমন নূহ (আ.)-এর ওপর প্রেরণ করেছি। তাঁর কথা-ই বলা হলো। তাঁর পূর্বের অন্যসব নবীদের কথা কেন বলা হলো না? ওলামায়ে কেরাম এই প্রশ্নের নানা রকম উত্তর দিয়েছেন। অনেকে বলেছেন, নূহ (আ.)-ই প্রথম নবী, যাকে হালাল-হারামের ব্যাপারে ইল্‌ম দান করা হয়েছিল। তার পূর্বে ইল্‌ম ছিল। তবে এমন যথারীতি শরয়ী ইল্‌মের আকারে ছিল না। তাঁর থেকেই ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। তার দৃষ্টান্ত এভাবে বুঝুন যে, বাচ্চা জন্মগ্রহণ করল। প্রথম দিনই কিন্তু তাকে জামাকাপড় পায়জামা-লুঙ্গি পরিধান করানো হয় না। বাচ্চা তখন এতটুকু ছোট থাকে যে, কাপড়ে পেঁচিয়েই রাখা যায়। কয়েক মাস এভাবে অতিবাহিত হয়। তারপরই ওই বাচ্চাকে জামা পরিধান করানো হয়। তারপর আরও বড় হলে পাজামা-প্যান্ট পরিয়ে দেওয়া হয়। তো দেখা গেল, জামা প্রথম দিনই বাচ্চার গায়ে পরিয়ে দেওয়া হয় না। কিছুদিন যাওয়ার পর যখন সে জামা পরার উপযুক্ত হয়, তখনই তাকে জামা পরানো হয়।

তো তেমনিভাবে আদম (আ.) যখন দুনিয়ায় আগমন করলেন, তখন মানবতাবোধ একটি শিশুর মতো ছিল। শরীয়ত নামক পোশাক পরিধানের অযোগ্য ছিল। আদম (আ.)কে শুধু কিছু জিনিসের নামের ইল্‌ম দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। কোনো কিছু লিখতেও জানতেন না। হযরত ইদরীস (আ.) ইল্‌মুল কলম নিয়ে আগমন করেছিলেন। লেখার জ্ঞান তাঁর থেকেই শুরু হয়ে ছিল।।

তেমনিভাবে হযরত নূহ (আ.)ই প্রথম নবী, যাঁকে যথারীতি শরীয়ত আকারে দীন দান করা হয়েছে। হুকুম-আহকাম দান করা হয়েছে। এজন্যই বলা হয়েছে যে, আমি যেমনভাবে আপনাকে শরীয়ত দান করেছি, তেমনটি আমি নূহ (আ.)কেও দিয়েছিলাম।

উক্ত প্রশ্নের ২য় উত্তর এই যে, নূহ (আ.) প্রথম নবী, যার গোত্রের লোকেরা তাঁর কথা অস্বীকার করেছে, অমান্য করেছে। আর সেই গোত্রের ওপর আযাব এসেছে। দুনিয়া থেকে মানুষের নাম-নিশানাই মুছে দিয়েছে শুধু

নূহ (আ.) ও তাঁর সঙ্গিরা ছাড়া। ইমাম বোখারি (রহ.) বলছিলেন, তার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, হে কুরাইশে মক্কা! তোমাদের পূর্বে নূহ (আ.)-এর গোত্র ছিল, যারা নূহকে নবী মানতে অস্বীকার করেছিল।। আমি সেই গোত্রের নাম-নিশানাও মুছে দিয়েছি। আর এখন তোমরাও যদি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী মানতে অস্বীকার কর, তাহলে আমি তোমাদেরও নাম নিশানা মুছে দেব। এই দিকে ইঙ্গিত করেই নূহ (আ.)-এর কথা বলা হয়েছে।

হাদীছের সনদ : কিছু সূক্ষ্ম বিষয়

এবার আসি হাদীছের সনদের আলোচনায়। এই সনদ উল্লেখের পেছনে আশ্চর্যসব সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম বিষয় আছে। ইমাম বোখারি (রহ.)-এর কিতাবের এটি এক অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয় যে, সনদের মধ্যে নানাবিধ সূক্ষ্ম ইঙ্গিত থাকে এবং এই বিষয়ে এত সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম কাজ করেছেন যে, যেন এই কিতাবের পেছনেই সকলে শহীদ হয়ে যেতে চেয়েছেন। এক-এক আলেম এক-এক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বোখারি শরীফে শ্রম দিয়েছেন। বোখারি শরীফের নানা রকম সূক্ষ্ম বিষয় আবিষ্কার করেছেন। তাই নানাবিধ বিষয়ের এক বিশাল সম্ভার তৈরি হয়ে গেছে। শুধু এই সনদের মধ্যে যে-সকল সূক্ষ্ম বিষয় ও ইঙ্গিত আছে, তার প্রতি লক্ষ করুন।

বোখারির হাদীছের সনদ শুরু হয় حدثنا الحميدى বলে আর রাবীগণের মধ্যে একজন হচ্ছেন হযরত ওমর (রাযি.), যিনি সরাসরি নবীজি থেকে হাদীছটি গ্রহণ করেছেন। তারপর তাঁর থেকে যিনি গ্রহণ করেছেন, তিনি হলেন হযরত আলকামা। তাঁর থেকে যিনি গ্রহণ করেছেন, তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম। তারপর যিনি তাঁর থেকে গ্রহণ করেছেন, তিনি হলেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ। তো এই তিনজন হচ্ছেন তাবেয়ি। অবশ্য কেউ-কেউ বলেছেন, আলকামা সাহাবি ছিলেন। যদি এঁকেও সাহাবি ধরা হয়, তাহলে হাদীছটির রাবীদের মধ্যে দুজন সাহাবি আর দুজন তাবেয়ি পাওয়া যায়। আর যদি আলকামাকে তাবেয়ি ধরা হয়, তাহলে একজন সাহাবি আর বাকি তিনজন হচ্ছেন তাবেয়ি।

তারপর দেখো, প্রথম হাদীছটির দিকে লক্ষ করো। এই হাদীছটির সনদের মধ্যে, হাদীছ বর্ণনার যত রকম শব্দ ও সিগাহ আছে, সকল প্রকার সিগাহ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– تحديث থেকে حدثنا ব্যবহার করা

হয়েছে। اخبار থেকে اخبرنا ব্যবহার করা হয়েছে। আবার قال اخبرنی محمدبن ابراهیم এই শব্দও আছে। তারপর سماع থেকে سمعت ব্যবহার হয়েছে। قال قول ও ব্যবহৃত হয়েছে। তো যত রকম শব্দে হাদীছের রেওয়ায়াত করা হয় সব রকম শব্দই হাদীছটিতে আছে।

তারপর ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে আবুযর-এর নুসখায় (নানান ব্যক্তি থেকে ইমাম বোখারির এই কিতাবের নুসখা আছে) হাদীছটি معنعن এর পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। তো এদিক থেকে রেওয়ায়াত এর معنعن পদ্ধতিটিও এই হাদীছে ব্যবহৃত হয়ে গেল। অর্থাৎ– রেওয়ায়াতে হাদীছের যত পদ্ধতি আছে, সব পদ্ধতিই হাদীছটিতে জমা হয়ে গেল। ইমাম বোখারি (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি দেখো। কত চমৎকার ব্যাপার!

আরেকটি কথা শোনো। এই حَدَّثَنَا এর পরে اَخْبَرَنِیْ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। এগুলোর মধ্যে পার্থক্য কী?

حدثنی মানে ওস্তাদ নিজে হাদীছটি পড়েছেন আর ছাত্র তা শুনেছেন।

আর যদি ছাত্র পড়ে আর ওস্তাদ সেই পড়া শুনে যায়, তাহলে ব্যাবহার হয় اخبرنی।

তো এমন উভয় সুরতে বারবার হাদীছ বয়ান করার জন্য متصل سند যেটি আছে সেটি বয়ান করতে হয় না। তার জন্য وبه قال বলে দেওয়া হয়। যেমন– আমি বলেছি بسند المتصل الی امام همام তো এত লম্বা সনদকে সহজ করে উক্ত দুরকম হাদীছের ক্ষেত্রে বলা হয় وبه قال তাহলেই বোঝা যাবে হাদীছটির সনদ متصل আছে।

আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় দেখুন–

এই হাদীছের রেওয়ায়াতকারী حدثنا الحمیدی এর হুমাইদি ইমাম বোখারি (রহ.)-এর ওস্তাদ যিনি মক্কাবাসী ও কুরাইশি। মক্কার অধিবাসী। আবার কুরাইশ গোত্রের লোক তিনি। আর কুরাইশ গোত্রের ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قَدِّمُوْا قُرَيْشًا

'কুরাইশকে আগ্রাধিকার দাও!'

আরও ইরশাদ হয়েছে–

اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ

তো নবীজির এমন বাণীর কারণে ইমাম বোখারি (রহ.) উক্ত হাদীছদ্বয়ের ওপর আমল করণার্থে নিজের মাক্কি ও কুরাইশী ওস্তাদ এর হাদীছ সর্বপ্রথম এনেছেন।

বোখারি শরীফের আরেকটি সূক্ষ্ম ব্যাপার এই যে, প্রথম হাদীছটি ইমাম সাহেব মাক্কি তথা মক্কার অধিবাসী রাবী থেকে উল্লেখ করেছেন। ২য় যে-হাদীছটি আসছে, সেটি ইমাম সাহেব মাদানি রাবী হযরত মালেক মাদানি থেকে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন قال اخبرنا مالك এই মালেক হচ্ছেন মালেক মাদানি (রহ.)। লক্ষ করুন, ইমাম বোখারি তাঁর কিতাবের প্রথম হাদীছটি নিলেন মাক্কি ওস্তাদ থেকে। আর ২য় হাদীছটি উল্লেখ করলেন মাদানি ওস্তাদ থেকে। আর ওহীরও সূচনা হয়েছিল মক্কায় এবং সমাপ্তি হয়েছে মদিনায়। দেখুন, কত চমৎকার একটি ধারা ইমাম সাহেব রক্ষা করেছেন।

কিতাবটিতে আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় হলো, বোখারির প্রথম হাদীছটি হুমাইদি থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে আহমাদ ইবনে আশরাফ থেকে। তো সেটিও حمد থেকে দেখা যাচ্ছে। আর জান্নাতেরও শেষ কথা হবে–

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

কেয়ামতের দিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে যে ঝান্ডা থাকবে, তা হবে لواء الحمد। নবীজির জন্য জান্নাতে যে-আবাসন থাকবে, তা হবে بيت الحمد। তো দেখুন, ইমাম বোখারি (রহ.) সকলকে حمد এর দিকে মনোযোগী করতে চেয়েছেন।

বোখারি শরীফের প্রথম হাদীছের রাবী হচ্ছেন সাহাবি ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) আর শেষ হাদীছটির রাবী আবু হুরায়রা (রাযি.)। তো ইমাম বোখারি (রহ.) এ কথাটি-ই যেন বলতে চাচ্ছেন যে, যদি তুমি ওমরের মতো জীবন গড়তে চাও, তাহলে আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর মতো তালেবুল ইল্‌ম হও। আর এ-লক্ষ্যে আল্লাহর যিকির বেশি কাজ দেবে। তাই তিনি শেষ হাদীছটি উল্লেখ করেছে–

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ

তারপর দেখুন, এই যে প্রথম হাদীছটি, একে সনদের দিক থেকে غريب বলা হয়। অর্থাৎ– কোনো এক স্তরে গিয়ে এমন কোনো রাবী আছেন, যাঁর থেকে একাকভাবে হাদীছটি বর্ণিত। দেখুন, সাহাবা কেরামের মাঝে এটি এক আজব কথা যে, ওমর (রাযি.) মিম্বরে বসে বয়ান করে চলছেন আর শ্রোতা হাজারো সাহাবি ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর কী আজব শান যে, যে সাহাবি পরে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, সে সাহাবি হযরত ওমর থেকেই তা বর্ণনা করেছেন। ওমর (রাযি.)-এর বরাত দিয়েই অন্যজনের কাছে বলেছেন। তো সকলেই এই একজনমাত্র সাহাবি থেকেই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন বলেই হাদীছটিকে غريب বলা হয়। আর দেখা যায়, বোখারি শরীফের শেষ যে হাদীছটি, সেটিও সনদের দিক থেকে গরিব। তো ইমাম বোখারি (রহ.) তালেবুল ইল্‌মকে মূলত একথাটি-ই বলতে চাচ্ছেন যে–

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ

'তুমি দুনিয়ায় প্রবাসী বা পথচলা মুসাফিরের মতো জীবন যাপন করো।'

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا وَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ

ইসলাম শুরু হয়েছিল নিঃসঙ্গভাবে এবং তা ফিরবেও নিঃসঙ্গ হয়ে। আর অসহায়দের জন্য সুসংবাদ।

প্রথম হাদীছ ও তার শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য

হাদীছটির আলোচ্য বিষয়ের দিকে একটু লক্ষ করো। দেখো, হাদীছে কী বলা হয়েছে।

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

'সকল আমলের ভিত্তি ঈমানের ওপর।'

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি প্রশ্ন। প্রশ্নটি হলো, হাদীছের বিষয়বস্তু তো হচ্ছে, আমলের ভিত্তি নিয়তের ওপর। আর ترجمة الباب তথা শিরোনামের মধ্যে আছে بدء الوحي এর কথা। তো হাদীছে আছে আমলের কথা আর শিরোনামে আছে ওহীর কথা। কোনো মিল তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর যে-আয়াতটি শুরুতে নেওয়া হয়েছে, তাতেও নূহ (আ.)-এর কথা। এদিক থেকেও কোনো সামঞ্জস্য পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে

কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম বোখারি (রহ.) কিতাবের প্রথম হাদীছ হিসেবে এই হাদীছটিকে এখানে উল্লেখ করেছেন?

প্রশ্নটির কয়েকটি উত্তর হতে পারে। সংক্ষেপে কয়েকটি উত্তর দিচ্ছি।

প্রথম জবাব : আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.) বলেছেন, ওহীর মাধ্যমে মানুষ হুকুম-আহকাম জানতে পারে। আর যে-হুকুম নাযিল হবে, তার ওপর আমল করা ফরজ হয়ে যায়। আর কোন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, তাও মানুষ জানতে পারে ওহীর মাধ্যমে। একে বলা হয় ورود اعمال অর্থাৎ– ওহীর মাধ্যমে ورود اعمال হয়ে থাকে। জানা যায় কোনটি হালাল, কোনটি হারাম। কী করণীয় আর কী বর্জনীয়। তো তিনি বলেন, একটি হচ্ছে ورود اعمال এর সম্পর্ক ওহীর সাথে। আরেকটি হচ্ছে صدور اعمال আর আমল প্রকৃত আমল হওয়ার সাথে নিয়তের সম্পর্ক রয়েছে। ওই মুনাসাবাতের কারণে ইমাম বোখারি (রহ.) এখানে এই বাবে সর্বপ্রথম ঈমানের হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যেন তিনি বলতে চেয়েছেন, এদিকে আলোচনা চলছে ورود اعمال এর আর হাদীছটিতে আলোচনা হচ্ছে নিয়ত সম্পর্কে। তাই صدور اعمال এর কারণেই এই হাদীছটি উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় জবাব : ওহীর অর্থই হচ্ছে আহকামে শরীয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া। আর আমল কীভাবে ঠিক হয়? নিয়তের দ্বারা। হাদীছটিতে তারই আলোচনা রয়েছে। তাই দেখা যায়, ওহীর সাথে হাদীছটির ভেতরগত একটি সম্পর্ক পাওয়া যায়।

তৃতীয় জবাব : ওহী মানুষের সঠিক জ্ঞান লাভের মাধ্যম। ওহী নাযিল হলেই আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর প্রশান্ত হতো, মনে তাজাল্লি অর্জিত হতো। যেমনটি পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ

'এভাবেই তোমার মনটাকে দৃঢ় করার জন্য আমি এমনটি করে থাকি।'[১]

আর আমলের মাধ্যমেও সঠিক জ্ঞান অর্জিত হয়, যাকে পরিভাষায় বলা হয় 'শরহে সদর'। দেখা গেল, ওহীর মাধ্যমেও শরহে সদর হয় এবং আমলের মাধ্যমেও শরহে সদর হয়।

---

১. সূরা ফুরকান : আয়াত ৩২

مَنْ اَخْلَصَ عَبْدًا للهِ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا اِلَّا ظَهَرَتْ يَنَابِيْعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهٖ عَلٰى لِسَانِهٖ

যেব্যক্তি চল্লিশ দিন এখলাছের সাথে নেক আমল করবে, আল্লাহ তার কলবে ও জবানে হেকমতের ঝরনাধারা প্রবাহিত করে দেন।

দেখা যাচ্ছে, ওহীর মাধ্যমেও শরহে সদর হয় আর আমলের মাধ্যমেও শরহে সদর হয়। এই সম্পর্কের কারণেই এখানে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

চতুর্থ জবাব : ওহী আমলের লক্ষ্যেই প্রেরিত হয়। আর আমল প্রকৃত আমল হয় নিয়তের মাধ্যমে। এই মুনাসাবাতের কারণেই হাদীছটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লিখিত হাদীছটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য

হাদীছটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেছেন,

اِنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ يَدْخُلُ فِيْهِ نِصْفُ الْعِلْمِ

এই হাদীছে রয়েছে দীনের অর্ধেক ইল্‌ম। কীভাবে হাদীছটিতে অর্ধেক ইল্‌ম রয়েছে। দেখুন, আমলটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হলো আমলের অর্ধাংশ আর অন্তরের মাধ্যমে সেই আমলের নিয়ত করা হচ্ছে অপরাংশ। এই হিসেবে তো স্পষ্টই বোঝা যায়, হাদীছটি ইসলামের অর্ধেক।

ইমাম বায়হাকি (রহ.) বলেছেন, এই হাদীছটি جوامع الكلم এর একটি। মানে সারগর্ভ ও সুসংক্ষিপ্ত বিস্তৃত অর্থবহ বাণী। جوامع الكلم এমন হাদীছকেই বলা হয়, যার শব্দ কম; কিন্তু বিষয়টি বেশ বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ। আমরা যেমন বলি, সাগরকে কূপে নিয়ে এসেছে। তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেমনিভাবে দরিয়াকে কুয়ার মধ্যে নিয়ে এসেছেন। এই হাদীছটিও তেমনই একটি হাদীছ। এখানে দীনের তৃতীয় অংশ এসে গেছে। তৃতীয় অংশ কেন বলা হলো? কারণ, দীন তিনটি ভাগে বিভক্ত।

১. ঈমান
২. আমল
৩.এখলাছ

তো এই হাদীছের সম্পর্ক হচ্ছে এখলাছের সাথে। এদিক থেকে দীনের এক তৃতীয়াংশ চলে এসেছে এই হাদীছের মধ্যে। বরং আবদুর রহমান ইবনে মাহদি তো এ-ও বলেছেন যে–

مَنْ اَرَادَ اَنْ يُّصَنِّفَ كِتَابًا فَلْيَبْتَدِئْ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ

কেউ যদি কিতাব লিখতে চায়, তার উচিত এই হাদীছের মাধ্যমে শুরু করা। তো মুহাদ্দিছীনে কেরাম ইমাম বোখারি (রহ.)-এর সমর্থন দিয়েছেন এবং বলেছেন, এই হাদীছটি দিয়েই তাঁর কিতাব শুরু করা সঠিক হয়েছে।

হাদীছের আলোচনা

এবার আমরা আলোচনা করব এই মুবারক হাদীছে কী-কী বিষয় আছে।

১. আমল ও নিয়ত

ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

এখানে আমল ও নিয়ত উভয়টির কথা আছে। এখানে আমল শব্দটি বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আর নিয়ত শব্দটিও বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বহুবচনকে আনা হয়েছে বহুবচনের বিপরীতে। তো এর দ্বারা একথাটি-ই বলা হচ্ছে যে–

كُلُّ عَمَلٍ بِنِيَّتِهِ

'প্রত্যেকটি আমলই তার নিয়ত অনুসারে বিবেচিত হয়।'

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

আমল শব্দটি বহুবচন এসেছে। আর নিয়ত শব্দটি এখানে একবচন ব্যবহার হয়েছে। এখানে মুহাদ্দিছীনে কেরাম বলেছেন, আমল করার জন্য তো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে। আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংখ্যা হচ্ছে অনেক। তাই তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বহুবচন। আর নিয়তের জন্য তো অঙ্গ একটি আর সেটি হচ্ছে অন্তর। তাই এর জন্য ব্যবহার হয়েছে একবচনের শব্দ।

২. فعل ও عمل এর পার্থক্য

এখানে হাদীছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اعمال বলেছেন افعال বলেননি। কারণ, اعمال হয়ে থাকে ذوى العقل তথা জ্ঞানবান ব্যক্তির দ্বারা। আর افعال জ্ঞানবান ও অর্ধজ্ঞান, জ্ঞানহীন সবার দ্বারাই হয়ে থাকে। عمل ওই কাজকে বলে, যা مكلف তথা দায়িত্বপ্রাপ্তের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আর فعل হচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত নয় এমন ব্যক্তি থেকেও যা সংগঠিত হয়। তাই তো

যেখানেই বান্দার কর্মের আলোচনা এসেছে, সেখানেই বলা হয়েছে عمل ধাতু থেকে নির্মিত শব্দে। বলা হয়েছে وَاعْمَلُوْا صَالِحًا নেক আমল করো। কোথাও وَافْعَلُوْا صَالِحًا এভাবে ব্যবহার হয়নি।

৩. নিয়ত ও এরাদার মাঝে পার্থক্য : এখানে নিয়তের কথা বলা হয়েছে– এরাদার কথা বলা হয়নি। মুহাদ্দিছীনে কেরাম লিখেছেন, নিয়তের পেছনে মানুষের কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। আর এরাদা শব্দটি উদ্দেশ্যহীন বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলার জন্য এরাদা শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে। সেজন্যই এখানে নিয়ত শব্দ ব্যবহার হয়েছে। কোনো-কোনো ফেকাহবিদ এর অর্থ এভাবে করেছেন–

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اِنَّمَا تَصِحُّ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

'আমল সহীহ হওয়া না হওয়া নির্ভর করে নিয়তের ওপর।'

কেউ-কেউ বলেছেন,

اِنَّمَا ثَوَابُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّةِ

'নিশ্চয়ই আমলের ছাওয়াব প্রাপ্তি নিয়তের ওপর নির্ভর করে।'

উদাহরণস্বরূপ একব্যক্তি নিয়ত করে উজু করল, তাহলে সে ছাওয়াব প্রাপ্ত হবে। আর কেউ একজন অন্য একব্যক্তিকে পানিতে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। এখন এই পতিত ব্যক্তিরও তো উজু হয়ে গেল; কিন্তু ছাওয়াব পেল না। কারণ, এই লোক নিয়ত করতে পারেনি। এই অর্থগুলো উঠে আসে ফেকাহবিদগণের ভাষ্য থেকে।

একাধিক নিয়তের ফলাফল

হাদীছটির আরেকটু সামনের বাক্য হচ্ছে–

اِنَّمَا لِاِمْرِءٍ مَّا نَوٰى

'বান্দা তা-ই প্রাপ্ত হবে, যার সে নিয়ত সে করবে।'

কোনো-কোনো মুহাদ্দিছ বলেছেন, এই কথাটি পূর্বের আলোচনাকে শক্তিশালী করবার জন্যই আনা হয়েছে। পূর্বের বক্তব্য জোরদার ও সুদৃঢ় করার জন্য এই অংশটুকু এবং নিয়ত শব্দের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তবে কেউ-কেউ বলেছেন, এই বক্তব্য দ্বারা অন্য একটি কথা বোঝানো হয়েছে। আর তা হচ্ছে–

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اِنَّمَا لِاِمْرِءٍ مَّا نَوٰى

একথার দ্বারা বোঝা যায়, যদি একটিমাত্র আমলে কয়েকটি নিয়ত করা হয়, তাহলে আমলের ছাওয়াব ততগুণ পাওয়া যাবে, যতটি সে নিয়ত করবে।

আমার স্নেহের ছাত্ররা! একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো। মনে করো, একজন মানুষ মসজিদে এল। লোকটি যদি সাধারণ মানুষ হয়, তাহলে তার নিয়ত থাকে শুধু এই যে, আমি মসজিদে যাব নামায পড়ার জন্য। তো এই লোক নামায পড়ার জন্য একবার ছাওয়াব পাবে। আর যদি সে একজন তালেবুল ইল্‌ম হয়, তাহলে সে তো জানে কয়েকটি বিষয়ে নিয়ত করলে ছাওয়াব কয়েকগুণ পাওয়া যায়, তাই সে নিয়ত করে, আমি মসজিদে যাব, গিয়ে আল্লাহর যিকির করব। দু'আ-দুরুদ পড়ব, কুরআন তেলাওয়াত করব, নফল এতেকাফ করব। জামাতের সাথে নামায পড়ব। একাকি সুন্নত ও নফল নামাযও পড়ব। মুনাজাত করব, অনর্থক কথা বলব না। মসজিদে গিয়ে আমার মুসলমান ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করব।

এভাবে তালেবুল ইল্‌ম অনেক নিয়ত করে।

দেখুন, আমল তো একটি; কিন্তু তার নিয়ত হয়ে গেল কতগুলো! তার নিয়ত যত বেশি হবে, ছাওয়াব তত বেশি হবে। কোনো-কোনো মুহাদ্দিছ বলেছেন, কাপড় পরিধান করার মধ্যে অন্তত চল্লিশটি নিয়ত করা যায়। অথচ আমরা মাত্র একটি নিয়ত করে থাকি? এর দ্বারা বোঝা যায়, তালেবুল ইল্‌ম তার ইল্‌মের কারণে একটিমাত্র আমলের কারণে অনেকগুণ ছাওয়াব প্রাপ্ত হতে পারে। সাধারণ মানুষ না জানার কারণে তা থেকে বঞ্চিত থাকে।

৫. সুন্দর নিয়তের কারিশমা : এখানে আরেকটি কথা এসে গেল। মানুষ তা-ই প্রাপ্ত হবে, যার নিয়ত সে করবে। এর দ্বারা বোঝা যায়, আমরা আমাদের সাধারণ অভ্যাসগত বিষয়গুলোকেও নিয়তের মাধ্যমে ইবাদাতে রূপায়িত করতে পারি। কীভাবে? যেমন দেখুন, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সন্তানকে ভালোবাসে। তবে যদি এই ভালোবাসা এ-লক্ষে হয় যে, নবীজি বাচ্চাদের ভালোবাসতেন, সুন্নতের নিয়তে যদি এই ভালোবাসা হয়, তাহলেই এই ভালোবাসা ইবাদাত হয়ে যাবে।

প্রত্যেক মানুষই তো মা-বাবাকে দেখে। কিন্তু যদি এই নিয়তে দেখা হয় যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ মা-বাবাকে মহব্বতের নিয়তে দেখে, আল্লাহ তাকে এক হজ এবং এক ওমরার ছাওয়াব

দান করবেন। এই নিয়তে যদি সে মা-বাবার দিকে তাকায়, তাহলে তার এই তাকানোও ইবাদাত হবে।

ঘরে তো প্রত্যেকেই দরজা-জানালা লাগায়। তো যদি শুধু আলো-বাতাস আসার নিয়তে লাগায়, তাহলে তো তা-ই পাবে শুধু। আর যদি এই নিয়তে লাগায় যে, এর মাধ্যমে আমি আযানের শব্দ শুনতে পাব, তাহলে ছাওয়াবও পাওয়া যাবে আর আলো-বাতাসও পাওয়া যাবে।

অনেক লোকই তো রাতে নিদ্রা যাওয়ার সময় কাপড় ও পোশাক পরিবর্তন করে। রাতের পোশাক পরিধান করে তারপর ঘুমায়। এই পোশাক পরিবর্তনও যদি এই নিয়তে করে যে, আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে পোশাক পরিবর্তন করে ঘুমাতেন, তাহলেই ছাওয়াবও পাওয়া যাবে আবার সুন্দর পরিপাটি পোশাকটি ভালোও থাকবে।

তো দেখা যায়, আমরা সামান্য একটু খেয়াল রাখলেই, মনকে একটু পরিবর্তন করতে পারলেই আমাদের সকল সাধারণ কাজও ছাওয়াবের উপাদান ও ছাওয়াব অর্জনের মাধ্যম হতে পারে।

إِنَّمَا لِامْرِءٍ مَّا نَوٰى এই অংশটুকু একথাই বোঝাচ্ছে যে, মানুষ যদি নিয়তের সাথে দুনিয়াবি কাজও করে, তাহলে তা-ই দীন হয়ে যাবে। তাতে ছাওয়াব পাওয়া যাবে। নিয়তই অনেক কিছু। বহু মানুষ আছে, যারা নিয়ত ঠিক করছে না। বদনিয়তের কারণে উম্মতের যত ক্ষতি হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে নিয়ত না করার কারণে। তাই বলি, আমাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ ও বিস্তৃত করা প্রয়োজন। তাহলে উপকারও যেমন হবে, ছাওয়াবও পাওয়া যাবে।

৬. একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে একটি সুপ্রসিদ্ধ প্রশ্ন আছে। إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ এর দ্বারা তো বাহ্যিকভাবে বোঝা যায়, কেউ কোনো খারাপ কাজও যদি ভালো নিয়তে করে, তাহলে সেই খারাপ কাজ ভালো হয়ে যাবে। যেমন– কোনো এক লোক চুরি করে এই নিয়তে যে, আমি গরিব মানুষকে তা সদকা করে দেব। তাহলে কি একাজ যায়েয হয়ে যাবে?

এ-প্রশ্নের জবাবে মুহাদ্দিছীনে কেরাম বলেছেন, কিছু কাজ এমন আছে, যা জায়েয; সেগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম। আর কিছু কাজ আছে নাজায়েয; সেগুলো আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। এগুলোতে আল্লাহ রাগ

করেন। এখন কেউ যদি কোনো নাজায়েয কাজ নেক নিয়তে করে, তাহলে অল্লাহ তা'আলা আরও বেশি রেগে যান। এমন করা তো দীনের সাথে উপহাস করা। দীন নিয়ে মজাক উড়ানো। দীনকে খেলায় পরিণত করা।

তো এই হাদীছ যেন বলেই দিচ্ছে, যে-কাজ খারাপ তা তো খারাপই। আর যে কাজ ভালো তা ভালোই। এই ভালো কাজই ভালো নিয়তে করা চাই। ভালো কাজটিই খারাপ কোনো নিয়তে না করা চাই। যেমন– কোনো নারী এই নিয়তে আতর ও সুগন্ধ ব্যবহার করল যে, আমার স্বামী এর ঘ্রাণ নেবে, তাহলে এই সুগন্ধ ব্যবহার করা হবে তার জন্য ইবাদত। আর যদি এই নিয়তে সুগন্ধ ব্যবহার করে যে, আমি রাস্তায় বের হব। এতে রাস্তার পুরুষরা আমার প্রতি আকৃষ্ট হবে। এমন নিয়ত থাকলে তো তার জন্য এই সুগন্ধ ব্যবহার হবে হারাম।

দেখুন, কাজ তো ভালো ছিল। সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নত। কিন্তু নিয়তের কারণে এই মহান সুন্নতটিও হারাম হয়ে যেতে পারে। তাহলে বোঝা গেল, হাদীছের উদ্দেশ্য হলো, সুন্দর ও সুউচ্চ নিয়তের কারণে জায়েয ও ছাওয়াবের কাজটি বহুবিধ ছাওয়াব অর্জনের মাধ্যম হয়ে যেতে পারে।

সারকথা

إِنَّمَا الْأَعْمَال এর আসল উদ্দেশ্য কী? হাদীছটির সামনের অংশ দেখুন–

مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا

যে দুনিয়ার জন্য হিজরত করবে, সে দুনিয়া পাবে। তাহলে তার হিজরত দুনিয়ার জন্যেই হবে।

أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

অথবা যে কোনো নারীকে পাওয়ার জন্য হিজরত করবে, তাহলে তার হিজরত সেজন্যই হবে, যে উদ্দিশ্যে সে হিজরত করল।

হাদীছটি বলার প্রেক্ষাপট

হাদীছটির একটি প্রেক্ষাপট আছে, যাকে শানে উরুদ বলা হয়। উম্মে কাইস নামে একজন মহিলা সাহাবি ছিলেন। একজন সাহাবি তাকে বিবাহ করতে চাইলেন। মহিলা শর্ত দিলেন, ঠিক আছে, তুমি হিজরত করে চলে এসো; তাহলেই বিবাহ হবে। তো ওই সাহাবি হিজরত করে চলে এলেন মদিনায়। ফলে অন্য সাহাবাগণ তাকে মুহাজিরে উম্মে কাইস বলে ডাকতে

লাগলেন। একথা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে গেল। জানতে পেরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীছটি বলে বুঝিয়ে দিলেন যে, যদি হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হয়, তাহলেই ছাওয়াব মিলবে। আর যদি শুধু বিবাহের নিয়ত থাকে, তাহলে তো বিবাহ হলো ঠিক; কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাওয়াব সে কী করে পাবে? হাদীছটি বলার পর ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল।

এখানে একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার লক্ষ করুন। এখানে হাদীছটিতে কোনো সাহাবির নাম উল্লেখ নেই। এখানে 'থার্ড পার্সন' হিসেবে হাদীছটিতে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারও নাম এখানে বলেননি। ফলে কারও দোষ প্রকাশিত হলো না। আবার মাসআলাও বোঝানো হয়ে গেল। ব্যাপারটি সত্যিই চমৎকার!

ফলে আজ কোনো তালেবুল ইল্‌ম বলতে পারবে না, কোন সাহাবিকে মুহাজেরে উম্মে কায়স বলা হতো। তার নাম কোনো কিতাবেও লিখিত নেই। এটিই মহান আল্লাহর সুমহান ইচ্ছা। এমন অলৌকিকভাবে কেন অনুল্লেখ থেকে গেলেন? অচিহ্নিত থেকে গেলেন প্রিয়নবীর এই মহান সাহাবি? দেখুন, সূরা ইউসুফে আল্লাহ ইউসুফ (আ.)-এর কথা আলোচনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, ইউসুফ (আ.)কে মহিলা তার নিজের দিকে পাপাচারে লিপ্ত করবার জন্য আহ্বান জানাল। তো এখানে যুলাইখার নাম উল্লেখ করেননি। কারও নাম উল্লেখ না করে আল্লাহ তা'আলা বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করেছেন। তা না করলেই তো কথা সংক্ষেপ হয়ে যেত। ইরশাদ হচ্ছে–

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ

ইউসুফ যে-নারীর ঘরে ছিল, সে তাকে নিজের দিকে আকর্ষিত করবার চেষ্টা করল।'[১]

এত বড় বাক্য না বলে নাম বলে দিলেই তো হতো। কিন্তু কেন তা করা হয়নি? বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহ নামটি লুকাতে চাচ্ছেন। তার মুখোশ উন্মোচিত না করে তাকে ঢেকে রাখতে চাচ্ছেন। কারণ, এটিই আল্লাহ তা'আলার কর্মরীতি। আর আল্লাহর পেয়ারা হাবীবও আল্লাহর পন্থার অনুসরণ করতেন। 'তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও' এই নীতির সর্বোত্তম ও যোগ্য নমুনা আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই তিনি হাদীছটিতে

১. সূরা ইফ্‌সুফ : আয়াত ২৩

তেমন করেই কথাটি ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি মুহাজিরে উম্মে কায়স কে তা বলে দেননি। 'থার্ড পার্সন' এর মাধ্যমে বক্তব্য দান করেছেন। শুধু মূলনীতিটি বলে দিয়েছেন যে, হিজরত যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে ছাওয়াব পাওয়া যাবে। আর দুনিয়ার অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যদি হিজরত করা হয়, তাহলে শুধু সেই উদ্দেশ্যই হাসিল হবে।

তো দেখুন, আমাদের অভ্যাস কী? আমরা তো কেউ সামান্য ত্রুটি করলেই তাকে অপরাধী বানাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠি। কারও দোষত্রুটি ধরা পড়লে আমরা তা প্রচার করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিই। আজকাল তো রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যম আছে। এসবে কী প্রচার করা হচ্ছে? মানুষের দোষ প্রচার ও প্রকাশ করা হচ্ছে না? একজনকে খুশি করতে গিয়ে আমরা হাজারজনের হৃদয়কে আহত করে ফেলছি। উল্লিখিত হাদীছটি পাঠ করে আমাদের এই নিয়ত ও কসম করা উচিত যে, আজকের পর থেকে আমরাও আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের দোষত্রুটি বর্ণনা থেকে বিরত থাকব। বরং দোষত্রুটি ঢেকে রাখতেই সচেষ্ট হব। হাদীছে আছে, যে দুনিয়ায় কারও দোষ গোপন করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন।

তাছাওউফের সূচনা

হযরত শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া (রহ.)-এর নিকট একবার কেউ একজন প্রশ্ন করল, তাছাওউফ কাকে বলে? তিনি জবাব দিলেন, তাছাওউফ এমন একটি মেহনত, যার সূচনা হয়েছে إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ থেকে আর সমাপ্তি হয়েছে أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ পর্যন্ত পৌঁছে।

হাদীছের নূর

দেখুন, কুরআনের নূর এক রকম আর হাদীছের নূর এক রকম। কুরআন পাঠ করলে لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ অর্থাৎ– রহমতের বারি বর্ষণ হয়। শায়খ আবদুল আযীয দাব্বাগ অন্ধ ছিলেন, নিরক্ষর ছিলেন, লেখাপড়া জানতেন না। তার সামনে যদি কুরআনের কোনো আয়াত তেলাওয়াত করা হতো, তিনি বলে দিতে পারতেন। যদি হাদীছ পাঠ করা হতো, তাও বলে দিকে পারতেন। আর অন্য কোনো মানুষের কথা হলেও তা-ও বলে দিতে পারতেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হযরত! আপনি তো দেখেন না। লেখাপড়াও আপনার নেই। কী করে বলতে পারেন এটি কুরআন, ওটি হাদীছ, ওটি মানুষের কথা?

তখন তিনি বলতেন, কুরআন পাকের আয়াতের নূর এক রকম। হাদীছ পাকের নূর অন্য রকম। আর মানুষের কথার মধ্যে তো কোনো নূরই নেই। অর্থাৎ– আল্লাহর এ বান্দা নূর অনুভব করে-করেই বলে দিতে পারতেন। তো কুরআনের আয়াতের যেমন নূর আছে, তেমনিভাবে হাদীছেরও নূর আছে ।

প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা আছে। শায়খুল হাদীছ মুহাদ্দিছে দেহলবি (রহ.)-এর দারুল হাদীছ ছিল। একটি জায়গা ছিল, যেখানে তিনি হাদীছ পড়াতেন। এক মাজযুব ব্যক্তি তাঁর কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলল, কে এই মশাল জ্বালিয়েছে? একজন সমঝদার লোক ছিলেন। তিনি বললেন, মুহাদ্দিছে দেহলবি (রহ.) জ্বালিয়েছেন। লোকটি নূর দেখতে পেয়েছিল। তো বোঝা গেল, হাদীছ শরীফ যেখানে পাঠ করা হয়, সেখানে একপ্রকার নূর অবতীর্ণ হয়। নবীজির এ হাদীছ নূরওয়ালা হাদীছ, জ্যোতির্ময় হাদীছ।

এতে বোঝা যায়, হাদীছ অধ্যয়নের দ্বারা শুধু কিছু শব্দ আর অর্থ মুখস্থ করা-ই মাকসাদ নয়। বরং মূল মাকসাদ তো হচ্ছে নূরে নবুওয়াত বা নববি আলোকধারা অর্জন করা, যে-নূর ও আলোক ছড়িয়ে আছে এই হাদীছপুঞ্জের ভেতর। কথা স্পষ্ট যে, পড়ালেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই যে হাদীছ শরীফে জড়িয়ে থাকা নূর অর্জন করা। আর এই নূর যখন ভাগ্যে আসবে, তখনই হাদীছের ওপর আমল করা সহজ হয়ে যাবে। এই আলোচনা দ্বারা আমি একথাটুকুই বোঝাতে চেয়েছি।

এজন্য হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেছেন, ইল্‌ম ওই নূরের নাম, যে-নূর অর্জন করার পর তার ওপর আমল না করা পর্যন্ত প্রশান্তি আসে না, স্থিরতা আসে না। তো এই নূর অর্জন করতে হবে। এই নূরের প্রবৃদ্ধির জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَّعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَدَنِيْ نُوْرًا

'হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর স্থাপন করে দিন। আমার ডান থেকেও নূর দান করুন, বাম থেকেও নূর দান করুন। আমার সমস্ত শরীরে নূর দান করুন।'

শেষে বলেছেন,

وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا

'স্বয়ং আমাকেই নূর বানিয়ে দিন।'

আর এই নূরই কেয়ামতের দিন কাজে আসবে।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ

'সেদিন মুমিন নারী ও মুমিন পুরুষদের দেখবে, তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানে ছোটাছুটি করছে।'[১]

এই নূরই সেদিন কাজে আসবে। যাদের কাছে নূর থাকবে না, তাদের বলা হবে–

قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا

'বলা হবে, তোমরা পেছনে ফিরে গিয়ে নূর তালাশ করো।'[২]

তো তোমরা এখন যে-হাদীছটি পাঠ করছ, তা শুধু হাদীছের শব্দ আর অর্থ শিক্ষা করেই ক্ষান্ত হয়ো না। বরং অর্থ-মর্ম তো বুঝবেই, সাথে-সাথে হাদীছে বিদ্যমান ঐশী নূরও অর্জন করতে সচেষ্ট হবে।

আমাদের আকাবিরীনে কেরাম এমনই করতেন। তাঁরা বলতেন, দারুল উলুম দেওবন্দে যখন ছাত্ররা দাওরায়ে হাদীছ সমাপণ করে বের হতো, তখন তাদের চেহারা এমন এক নূরে জ্বলমল করত যে, মনে হতো, তারা রমজানে মসজিদে এতেকাফকারী কাফেলা, যেন তারা দীর্ঘ দিন এতেকাফ করে বাড়ি ফিরছে। এমন নূরান্বিত ও জ্যোতির্ময় দেখাত তাদের চেহারা। তাই তো হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বলেছেন, হাদীছের দরসদানকারীও সাহেবে নেসবত হবেন আর অধ্যয়নকারীও সাহেবে নেসবত হবেন। তখনই দেখবেন, এই নূরের স্বাদ কেমন অমৃত সুধার মতো মনে হয়!

তাই বলছি, তোমরা এ-বছর দাওরায়ে হাদীছ অধ্যয়ন করবে। আজ তোমাদের হাদীছের কিতাবের প্রথম সবক দেওয়া হচ্ছে। দিলে-দিলে এই নিয়ত করে বসো, যেন এই নূর অর্জন করতে পার। পবিত্র কুরআনে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে–

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ

'... নাকি সে, যে মৃত ছিল; পরে আমি তাকে জীবন দান করেছি এবং তার জন্য এমন আলো দিয়েছি, যার মাধ্যমে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে?'[৩]

---

১. সূরা হাদীদ : আয়াত ১২
২. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৩
৩. সূরা আন'আম : আয়াত ১৩২

তো এই ইল্‌মের নূর তোমরা এখান থেকে নিয়েই তবে বের হবে। তারপর কর্মের ময়দানে, জনমানুষের মাঝে দীনের দাওয়াত দিতে পারবে। মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান করবে। তাই বলছি, তোমার মূল মাকসাদ ও আরাধ্য যেন হয় নূর অর্জন, আলো আহরণ।

হাদীছের নূর অর্জিত হবে কীভাবে

দেখুন, এখানে একটি আলোচনা এই যে, যদি আপনি কোনো একটি পাত্রে দুধ নিতে চান, তাহলে দুটি বিষয় আপনি লক্ষ করতে হবে। এক. পাত্রটি পরিচ্ছন্ন হতে হবে। পাত্র পরিচ্ছন্ন না হলে তো দুধদাতা সেই পাত্রে দুধ দেবে না। বলবেন, এ অপরিষ্কার পাত্রে আমি দুধ ঢালব না। অন্য পাত্র নিয়ে এসো। এই পাত্র সরিয়ে নাও। দুই. পাত্রকে দুধ যে পেয়ালা থেকে দেওয়া হবে সে পেয়ালা বরাবর সোজা করে ধরতে হবে। দেখুন, নূর আত্মার নূর। কত বড় কথা আমরা যদি এই নূর হাসিল করতে চাই তাহলে দিলের পেয়ালা আমাদেরকে পরিষ্কার করতে হবে। সাথে-স্যাথে সেই পেয়ালা সোজা করে ধরতে হবে আসমানের গায়েবি পেয়ালার দিকে। যেখান থেকে অফুরন্ত ধারায় উৎসারিত হবে অন্তরের নূর, আত্মার জ্যোতি। অন্তরকে পরিষ্কার করা তো সহজ। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলেই হবে। সত্য-সাচ্চা তাওবা করলেই হবে। তবে এই পেয়ালা সোজা করা বড় কঠিন বিষয়। যখন দরসে বসবে, তখন ধ্যান-মন-প্রাণ উপস্থিত রাখবে। এমন যেন না হয় যে, ওস্তাদ হাদীছের দরস দিচ্ছেন আর আপনারা নানা ভাবনায় 'মুরাকাবা'য় মগ্ন আছেন। আবার সর্বদা উপস্থিত থাকতে হবে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ

'নিশ্চয় এর মাঝে রয়েছে, উপদেশ সেই ব্যক্তির জন্য, যার অন্তর আছে।'[১]

তো তিনটি গুণ আপনার ভেতর থাকতে হবে।

১, কলবে তলব থাকতে হবে।

২. ধ্যান-মন এক থাকতে হবে।

৩. সর্বদা উপস্থিত থাকতে হবে।

---

১. সূরা কাফ : আয়াত ৩৭

এই তিনটি জিনিস নিজের মাঝে ধারণ করা চাই। তাহলেই আপনি হাদীছের এই দরসে সতেজ-সজীব ও প্রাণবন্ত থাকতে পারবেন। আপনার অন্তরে বর্ষিত হবে নূরে হাদীছের অনন্ত ধারা। হাদীছ অন্বেষণের তীব্র পিপাসা নিয়ে হাদীছের দরসে বসবেন। অন্তরকে সমস্ত গুনাহ থেকে মুক্ত রেখে বসবেন। তাহলেই এই নূরের ভাগিদার হওয়া সম্ভব।

বক্তব্যের রেশ ধরে পৌঁছতে হবে বক্তা পর্যন্ত

দেখুন, যখন আপনার ভেতর এই নূরের আগমন ঘটবে, তখন মানুষটির সাথে খোদ সেই বক্তার মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যায়, মানুষ যখন আল্লামা ইকবালের কবিতা শোনে, তখন আল্লামা ইকবাল তার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। আর অন্য কোনো বিষয় শুনলে সে-বিষয়টির বক্তার প্রতি তার হৃদয় ও আত্মা আসক্ত হয়ে ওঠে। তো দেখুন, কোনো একটি বক্তব্যের রেশ ধরে মানুষ কিন্তু সেই বক্তব্যের বক্তা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

যেমন যীবুন নিসা মখফী বলেছেন,

در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل

ہر کہ خواہد میل دارد در سخن خواہد مرا

'আমি আমারই কথায় লুকিয়ে আছি তেমন করে যেমন করে ফুলের মাঝে লুকিয়ে আছে খুশবু তার।

যে আমাকে দেখতে চায়, আমার সাক্ষাৎ পেতে চায়, সে যেন আমার লেখাগুলো পাঠ করে নেয়।

আর প্রিয়তম নবীর বাণী যা আমরা এখন পাঠ করব, এতে আত্মায় হাদীছের নূর পয়দা হবে। আর এর দ্বারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। তাই তো অনেক তালেবুল ইল্‌মকে দেখা যায়, এ-বছরটি বড় নেকির সাথে অতিক্রম করে। তারা তো নবীজির দিদার পর্যন্ত পেয়ে যায়। এমন ছাত্রও আছে, আমাকে যারা নিজেরাই বলেছে যে, হযরত! যখন থেকে বোখারি শরীফ পড়ছি, জীবনের কোনো সপ্তাহ নবীজির যেয়ারত ছাড়া যায়নি। তো বলছিলাম, এই নেয়ামতও ভাগ্যে জোটে। তবে অন্তর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। তখনই এই মহা নেয়ামত নসিব হবে। এ ছাড়া তো নেয়ামতই পাওয়া যাবে না।

সহীহ বোখারি শরীফের কবুলিয়্যাত

শেষ কথা শুনুন। এই বোখারি শরীফ কিতাবখানা একজন মাকবুল বান্দার লিখিত কিতাব। এই কিতাবের মাকবুলিয়্যাতের অবস্থান এভাবে বুঝুন যে, ইমাম মারুযি একবার স্বপ্নে দেখলেন, নবীজির সাথে তাঁর যেয়ারত হয়েছে। নবীজি তাকে বলছেন–

اِلٰى مَتٰى تَدْرُسُ كِتَابَ الشَّافِعِيِّ وَلَا تَدْرُسُ كِتَابِيْ

'তুমি আর কতদিন শাফেয়ির কিতাব পড়াবে আর আমার কিতাব পড়াবে না?'

আমি বললাম, আপনার কিতাব কোনটি? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার কিতাব তো জামে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বোখারি।

তো দেখুন, বোখারি শরীফ এমন একটি কিতাব, যার ব্যাপারে খোদ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটি আমার কিতাব। তুমি এই কিতাব পড়াও।

ইমাম তিরমিযি (রহ.)-এর একজন ওস্তাদের নাম ছিল ইমাম ফারাবি (রহ.), যার রেওয়ায়াত আমরা আজ হাদীছের ক্ষেত্রে বর্ণনা করি। তিনি ইমাম বোখারি (রহ.)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, স্বাপ্নে আমি নবীজির যেয়ারত লাভে ধন্য হই। আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন–

اَيْنَ تُرِيْدُ

কোথায় যাচ্ছ তুমি?

আমি বললাম–

اُرِيْدُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ

আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের নিকট যাচ্ছি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

اِقْرَأْهُ مِنِّيَ السَّلَامَ

'আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম বোলো।'

দেখুন, ইসমাঈল বোখারি (রহ.)-এর কত বড় মর্যাদা ছিল প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট!

আবদুর রহমান ইবনে আদম বলেন–

رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ وَهُوَ وَاقِفٌ فِيْ مَوْضِعٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ

স্বপ্নে আমি নবীজিকে দেখলাম এবং তাঁর সাথে তাঁর সাহাবাদের একটি দলকে দেখলাম। তখন তিনি একটি স্থানে দাঁড়ানো ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন।

فَقُلْتُ مَا وَقُوْفُكَ هِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছেন?

قَالَ اَنْتَظِرُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمَاعِيْل

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারির অপেক্ষা করছি।

فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ اَيَّامٍ بَلَغَنِيْ مَوْتُهُ فَنَظَرْتُ فَاِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ فِي السَّاعَةِ الَّتِيْ رَاَيْتُ فِيْهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

কিছুদিন পর আমার নিকট ইমাম বোখারি (রহ.)-এর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছল। আমি হিসাব করে দেখলাম, এটি ওই সময় ছিল, যখন আমি স্বপ্নে নবীজিকে দেখেছি।

যারা-ই হাদীছের খেদমত করেন, আল্লাহর হাবীব তাঁদের জন্য অপেক্ষা করেন। হাদীছের সাথে মহব্বত তৈরি হলে হাদীছের মাধ্যমে স্বয়ং নবীজির সাথেও সম্পর্ক হয়ে যায়। ইমাম বোখারি (রহ.) আল্লাহর এমন মাকবুল বান্দা ছিলেন, যাঁকে দাফন করার পর জমিন থেকে খুশবু নির্গত হওয়া শুরু করে। এটি আশ্চর্যের কোনো বিষয় নয়। কারণ, কবিতায় আছে

بگفتا من گلے ناچیز بودم
و لیکن مدتے باگل نشستم
جمال ہم نشیں در من اثر کرد
و گرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

'সে আমাকে বলল, আমি তুচ্ছ মাটি ছিলাম
কিন্তু কিছুকাল ফুলের সান্নিধ্যে ওঠাবসা করলাম।
ফলে সঙ্গীর সৌন্দর্য আমার মাঝে ক্রিয়া করে ফেলেছে।
অন্যথায় আমি সেই মাটি-ই বটে, যা কিনা আমি আগে ছিলাম।'

ফুল প্রথমে ফুল থাকে না। ফুলের বীজ কিছুকাল মাটিতে মেশার ফলে তার থেকে অঙ্কুর জন্মায়। সেই অঙ্কুর গাছ হয়। তার মাঝে ফুল ধরে। আবার সেই ফুল ঝরে পড়ে সেই মাটিতেই, যেখান থেকে অঙ্কুরটি উদ্গত হয়েছে। এবার এই ফুলের সুবাসে জমিনও সুবাসিত হয়ে যায়।

তো ফুল মাটিতে পড়ে থাকার কারণে, মাটি ফুলের সংস্পর্শে থাকার কারণে মাটির মধ্যে ফুলের ঘ্রাণ চলে আসে। ইমাম বোখারি (রহ.) ফুলেরই মতো। তাঁকে জমিনের মধ্যে দাফন করা হয়েছিল। ফলে এই জমিনের মাটি থেকেও খুশবু ছড়াতে লাগল।

কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা আল্লাহর এক মাকবুল বান্দার কিতাব পাঠ করে নিজেরাও মাকবুল হতে চেষ্টা করব। তাঁর কবুলিয়্যাতের নিদর্শন হলো, ইবনে আবী হামযা বলেছেন, যদি মসিবতের সময় সহীহ বোখারি শরীফ পড়া হয়, তাহলে ওই মসিবত দূর হয়ে যায়। যদি এই কিতাব নৌযানে নিয়ে ছাওয়ার হয়, তাহলে নৌযান কিনারে লেগে যায়। তিনি বলেন, এই কিতাবের লেখক মুস্তাজাবুদ্দা'ওয়া ছিলেন; তথা তিনি এমন ছিলেন যে, তাঁর দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নিতেন। তিনি এই কিতাব অধ্যয়নকারীদের জন্য দু'আ করে গেছেন।

আপনারা বড় সৌভাগ্যবান যে, আপনারা এই কিতাব পাঠ করতে পারছেন। এখন আপনারাও আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। এর পেছনে ইমাম বোখারি (রহ.)-এর দু'আ আছে।

সাইয়্যেদ আসীলুদ্দীন (রহ.) বলেন, আমি আমার প্রয়োজনে নানা সময়ে প্রায় একশত বিশবার এই কিতাব খতম করেছি। আল্লাহ একশত বিশবারই আমার হাজত পূর্ণ করেছেন। এই কিতাব এমন মকবুল কিতাব। এমন মহান কিতাব।

সহীহ বোখারি শরীফ পাঠের নিয়ত

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! এই মকবুল কিতাবটি আমরা কিছু নিয়ত নিয়ে পড়ব। আমাদের নিয়ত এই হওয়া চাই যে, হে আল্লাহ! আমাদের এমন

বানিয়ে দিন যে, আমরা আপনাকে পেয়ে যাই। হে আল্লাহ! আপনি প্রথমে আমাদের ওপর রাজি হয়ে যান। তারপরই আমাদের মৃত্যু দিন। এই নিয়ত দিলের মধ্যে রাখবে। এতেই কাজ হবে। আর সত্য কথা তো এই যে, কোনো বান্দা আল্লাহর সামনে মিথ্যা বলতে পারে না। আমরা তো বোখারি শরীফ নিয়ে বসারও উপযুক্ত নই।

আমাদের চক্ষু মলিন, আমাদের জবান মিথ্যা। আমাদের অন্তর পাষাণ ও অন্ধকারচ্ছন্ন। আমরা কীভাবে এর উপযোগী হলাম যে, আমরা বোখারি শরীফ হাতে নিয়ে বসব! আল্লাহ তা'আলা বাস্তব অবস্থা তো জানেনই। তবে আল্লাহ আমাদের ওপর রহম করেছেন। তিনি আমাদের মতো এত বড় গুনাহগারদের এই কিতাব খুলে বসার তাওফীক দান করেছেন। এখন এই দু'আ করা উচিত যে, হে আল্লাহ! তুমি যখন আমাকে এই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছ, তো আমাদের খালি হাতে ঘরে ফিরিয়ে দিও না এবং এই দু'আ করুন যে, হে আমাদের মাওলা! এখান থেকে আমাদের খালিহাতে উঠিয়ে দিও না। আমাদের ভরপুর কামিয়াব করে ঘরে ফিরিয়ে দাও। কিছুটা হলেও নূর দান করো আমাদের হৃদয়ে। আমরা যেন সুসজ্জিত হতে পারি। আমাদের পাল্লায় তো এ ছাড়া আর কিছুই নেই। কবি বড় সুন্দর বলেছেন,

عمل کی اپنے اساس کیا ہے
بجز ندامت کے پاس کیا ہے
رہے سلامت تمہاری نسبت
میرا تو بس آسرا یہی ہے

আমলের মূল ভিত্তি কী? অনুতাপ ছাড়া সাফল্য ও প্রাপ্তি কী? তোমাদের সম্পর্ক অটুট থাকুক। আমার তো চাওয়া এইটুকুই।

চাওয়া তো এটুকু-ই যে, আল্লাহর সাথে আমাদের নেসবত অটুট থাকুক। আমাদের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন থাকুক।

আমাদের ইল্‌মে গভীর প্রজ্ঞা দান করুন এবং তাঁর মাকবুল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বোখারি শরীফের শেষ সবক

'একটি আশ্চর্য কথা শুনুন। এই সিহাহ সিত্তা কিতাবের লেখকবৃন্দ সকলেই অনারব। ইমাম বোখারি অনারব, ইমাম মুসলিম অনারব, ইমাম তিরমিযি অনারব, ইমাম আবু দাউদ অনারব, ইমাম ইবনে মাজাহ অনারব। এভাবে সকল ইমামই ছিলেন আরবের বাইরের রাষ্টের। তাঁরা কেউই আরব নন। তাঁদের দ্বারা আল্লাহ এত বড় খেদমত নিলেন। আশ্চর্য তথ্যই বটে! দীন অবতীর্ণ হলো আরবের অধিবাসীর ওপর আর দীনের খেদমত হলো অনারবদের দ্বারা! বোঝা গেল, এখলাছের মাধ্যমে মানুষ কবুলিয়্যাত পায়। চাই সে আরব হোক বা অনারব।'

বোখারি শরীফের শেষ সবক

اَلْحَمْدُ لله وَكَفٰى وَسَلٰمٌ على عِبادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ: وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنِّيْ اِلَى الْاِمَامِ الْهُمَامِ يَقُوْلُ الْعَبْدُ الْفَقِيْرُ ذُوالْفِقَارِ اَحْمَدُ حَدَّثَنِيْ حَضْرَةُ الْاُسْتَاذِ حَافِظُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيْثِ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ جَعْفَرُبْنُ مُحَمَّدٍ اَمِيْر قَالَ حَدَّثَنِيْ حَضْرَةُ الْاُسْتَاذُ مَوْلَانَا شَيْخُ مُحَمَّدٌ مَالِكٌ كَانْدهلَوِىْ نَوَّرَاللهُ مَرْقَدَه قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ مُحَمَّدٌ اِدْرِيْس قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ مُحَمَّدٌ اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الظَّاهِرِ الْوَتْرِيّ الْمَدَنِيّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ عَابِدٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَالِحُ الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَنَةَ الْعُمَرِىْ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ الْعَجَلِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ قُطْبُ الدِّيْنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ الْمُعَمَّرُ الشَّيْخُ يُوْسُفُ هَرَوِىْ اَلْمَشْهُوْرُ بِسه صَدْسَاله قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ شَادٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفُ الْفِرَبْرِىْ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى رَحْمَةً وَّاسِعَةً قَالَ حَدَّثَنِيْ الشَّيْخُ الْاِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ الْحَدِيْثِ وَسَيِّدُ الْمُحَدِّثِيْنَ اَبُوْ عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيْرَةَ الْجُعْفِيّ الْبُخَارِىْ رَحِمَهُ اللهُ رَحْمَةً وَّاسِعَةً

بَاب: قَوْلِ اللهِ تعالى وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ (الانبياء:) وَاَنَّ اَعْمَالَ بَنِيْ آدَمَ وَقَوْلِهِمْ يُوْزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدُ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّوْمِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَاَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ اِشْكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَمَّارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِيْ الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

বোখারি শরীফের শেষ হাদীছটি তেলাওয়াত করা হলো–

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

এই হাদীছটির মধ্যে ইমাম বোখারি (রহ.) আমলের ওজনের কথা বলেছেন।

কুরআন ও হাদীছে মুতাআখ্‌খিরীনের সংজ্ঞা

সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, যখন সূরা যুমার নাযিল হলো, তখন আমরা কিছু মানুষ নবীজির খেদমতে হাজির ছিলাম। তখন এই আয়াত সম্পর্কে আলোচনা হলো–

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ

'তাদের মধ্য থেকে পরবর্তী কিছু লোক, যারা আজও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।'[১]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে উম্মী বা নিরক্ষর মানুষের মাঝে প্রেরণ করেছেন। 'কিছু লোক এমন অনাগত ব্যক্তি আছে, যারা এখনও তাদের সাথে যুক্ত হননি।' আবু হুরায়রা (রাযি.) প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর হাবীব! তারা কারা? নবীজি চুপ করে রইলেন। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করা হলো! নবীজি এবারও চুপ করে রইলেন। তৃতীয়বার যখন জিজ্ঞেস করা হলো, হযরত সালমান ফারসি পাশে ছিলেন। তার ওপর হাত রেখে নবীজি বললেন–

لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهٗ رِجَالٌ مِّنْ اَبْنَاءِ الْفَارِسِ

'যদি ঈমান সুরাইয়া তারকার নিকট থাকে, তাহলেও পারস্যের কিছু ব্যক্তি সেখান থেকে ঈমানকে ধরে নিয়ে আসবে।'

মুসনাদে আহমাদে এ-ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে–

---

১. সূরা জুমু'আ : আয়াত ৩

لَوْ كَانَ الْعِلْمُ عِنْدَ الثُّرَيَّا

এক হাদীছে ঈমানের আলোচনা আর অন্য হাদীছটিতে ইল্‌মের আলোচনা! তাবেঈনের যুগে ইমাম আবু হানিফা (রাযি.) যে মেহনত করেছেন ঈমান ও ইল্‌মের জন্য, তার ফল বহু বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। ওলামায়ে কেরাম এ-ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, উক্ত হাদীছের লক্ষবস্তু ছিলেন ইমাম আযম আবু হানিফা। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহ.) তাঁর কিতাব تبييض الصحيفه -এর মধ্যে স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, উক্ত হাদীছটির লক্ষব্যক্তি ছিলেন ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)।

আর উল্লিখিত হাদীছটি বোখারি শরীফে দুই জায়গায় এসেছে। এক রেওয়ায়েতে رجل তথা ব্যক্তি শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য রেওয়ায়েতে رجال তথা লোকসমূহ বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার হাদীছের অন্যসব কিতাবে এই বিষয়বস্তুর হাদীছে ناس শব্দ ব্যবহার হয়েছে। رجال শব্দের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, এখানে বহুবচনে رجال তথা ব্যক্তিদল দ্বারা ফোকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিছীনে কেরামের একটি জামাত উদ্দেশ্য, যাদের কাজ, যাদের আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছিল। কিন্তু হাফেয আবু নুআঈম (রহ.)-এর তাখরীজ করেছেন, হাদীছটিতে তিনি আরও কয়েকটি শব্দ উল্লেখ করে বোঝাতে চেয়েছেন তারা কারা?

وَيُكْثِرُوْنَ الصَّلٰوةَ عَلَيَّ

'তারা ওই সকল ব্যক্তি, যারা আমার ওপর বেশি পরিমাণে দুরুদ পড়বে।'[১]

এ-ক্ষেত্রে যদি ফুকাহা ও মুহাদ্দিছীনে কেরামের আমল ধরা হয়, তাহলে দেখা যাবে, মুহাদ্দিছীনের জন্য নবীজির ওপর দুরুদ পাঠের সুযোগ বেশি হয়। তাহলে তো হাদীছ দ্বারা মুহাদ্দিছীনে কেরাম উদ্দেশ্য বোঝা যায়। তাই তো ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এর দ্বারা ওইসব মুহাদ্দিছীন উদ্দেশ্য, যাদের কাজকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কবুল করা হয়েছে। ছয়টি কিতাব এমন রয়েছে, হাদীছ পাকের হিসাবে যেগুলোকে সিহাহ সিত্তা বলা হয়, সেই কিতাবগুলোর লেখকবৃন্দকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে কবুল করে নিয়েছেন যে, আজ কোনো মানুষই এই কিতাবগুলো অধ্যয়ন করা ছাড়া আলেম হতে পারে না। তাই বলছি, হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য এ সকল মুহাদ্দিছীনে কেরাম।

---

১. বোখারি, মুসলিম, তিরিমিযি, ইবনে মাজাহ, নাসায়ি

সিহাহ সিত্তার সংকলকবৃন্দ সবাই অনারব ছিলেন

একটি আশ্চর্য কথা শুনুন। এই সিহাহ সিত্তা কিতাবের লেখকবৃন্দ সকলেই অনারব। ইমাম বোখারি অনারব, ইমাম মুসলিম অনারব, ইমাম তিরমিযি অনারব, ইমাম আবু দাউদ অনারব, ইমাম ইবনে মাজাহ অনারব। এভাবে সকল ইমামই ছিলেন আরবের বাইরের রাষ্ট্রের। তাঁরা কেউই আরব নন। তাঁদের দ্বারা আল্লাহ এত বড় খেদমত নিলেন। আশ্চর্য তথ্যই বটে! দীন অবতীর্ণ হলো আরবের অধিবাসীর ওপর আর দীনের খেদমত হলো অনারবদের দ্বারা! বোঝা গেল, এখলাছের মাধ্যমে মানুষ কবুলিয়্যাত পায়। চাই সে আরব হোক বা অনারব।

ইমাম বোখারি ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত

ইমাম বোখারি (রহ.) পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত। তাঁর নামের শেষে জু'ফি শব্দটি ইয়েমেনের একটি বংশের পরিচয় বহন করে। এটি একটি বংশের নাম। অবশ্য তাঁকে এই বংশের দিক থেকে জু'ফি বলা হয় না। বরং তাঁর পরদাদা মুগীরাহ বুখারার গভর্নরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁর নাম ছিল ইয়ামান ইবনে আহমদ আল জু'ফী। ওলায়ে ইসলামের সূত্রে তাঁর নামের শেষেও জু'ফি শব্দ যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ওলায়ে ইসলাম ওই ব্যক্তি হতেন, যাঁর হাতে কেউ মুসলমান হতেন। নওমুসলিমের যদি কোনো ওয়ারিশ না থাকত, তাহলে তার মৃত্যুর পর যার হাতে সে মুসলমান হয়েছে, সে তার সম্পদের ওয়ারিশ হতো। এই জু'ফি শব্দ তার নামের সাথে সেই সময় থেকেই যুক্ত হয়ে যায়।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ইমাম বোখারি (রহ.) পারস্য বংশোদ্ভূত ছিলেন। এটিও এক আশ্চর্য কথা যে, ইমাম বোখারি (রহ.) তাঁর এই সুবিখ্যাত গ্রন্থের এক জায়গায় এমন একটি শব্দ লিখেছেন, যা তার দেশের ভাষা ফারসির শব্দ। শব্দটি আছে কিতাবুল হজ্জের ২২৬ নং পৃষ্ঠার

وَيُزَادُ فِيْ هٰذَا الْبَابِ هُمْ هٰذَا الْحَدِيْثُ حَدِيْثُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

এই ইবারতে রয়েছে। এখানে هم শব্দটি ফারসি। ফারসিতে যেমন বলা হয়, هم ثواب، هم پیاله، هم نواله، هم مسلک অথচ এখানে শব্দটির স্থানে লেখার উদ্দেশ্য ছিল وَلٰكِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُدْخِلَ فِيْهِ غَيْرَ مَعَادٍ আমি এই বাবে এমন সব হাদীছ উপস্থাপন

করতে চেয়েছি, যা পুনরাবৃত্ত হয়নি। অর্থাৎ– তিনি সাধারণত সনদ ও মতনের পুনরাবৃত্তির সাথে কোনো হাদীছ উল্লেখ করাকে পছন্দ করতেন না। যদি কোনো সময় একই হাদীছ পুনরায় উল্লেখ করতেই হতো, তাহলে হয়তো সনদে ভিন্নতা আনতেন, না হয় মতনের মাঝে ভিন্নতা আনতেন।

এমনকি আল্লামা কাসতল্লানি (রহ.) ইরশাদুস সারী কিতাবের মোকাদ্দামায় হাফেয ইবনে হাজ্‌র অসকালানি (রহ.)-এর লেখার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেখানে উল্লেখ করেছেন যে, একুশটি হাদীছে সনদ ও মতনের মাঝে মিল রয়েছে। আল্লামা কাসতল্লানি এক্ষেত্রে আরেকটি রেওয়ায়াতকে সংযুক্ত করে দিয়েছেন। সেই হিসেবে এমন হাদীছ বাইশটিতে দাঁড়ায়। হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস (মু.জি) যিনি সাহারানপুরের শায়খুল হাদীছ, তিনি এক্ষেত্রে আরও ১২৮টি রেওয়ায়াত সংযুক্ত করেন। এই হিসেবে এমন হাদীছের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০, যেগুলো মতন ও সনদের দিক থেকে তাকরার হয়েছে। হযরত শায়খুল হাদীছ সাহেব এসকল রেওয়ায়াতকে একত্রিত করে দিয়েছেন এবং নাম দিয়েছেন–

إِرْشَادُ الْقَاصِدِ إِلَى مَا تَكَرَّرَ فِي الْبُخَارِيِّ بِإِسْنَادٍ الْوَاحِدِ

হাদীছের সর্বাধিক বিশুদ্ধ সংকলন

এই ছিল ইমাম বোখারি (রহ.)-এর এখলাছ ও নিষ্ঠা। আল্লাহ তা'আলা বোখারি শরীফকে এমনভাবে কবুল করেছেন যে, অনারবদের কিতাব হওয়া সত্ত্বেও আরবরা তাকে হাতে তুলে নিয়েছে। আস্থার কারণে এই কবূলিয়্যাত জুটেছে কথাটি এমন নয়। বরং যারা এই ফন্নের ওপর বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন, তাঁরা তানকীদ করেছেন। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এক-একটি হাদীছের মতন ও সনদ দেখেছেন। মুহাদ্দিসীনে কেরাম তীক্ষ্মভাবে তাঁর হাদীছসমূহ যাচাইবাছাই করেছেন। তারপর সকলে এ-ব্যাপারে একমত হতে বাধ্য হয়েছেন যে–

أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ

'আল্লাহর কিতাব কুরআনের পর এটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব।'

ইমাম বোখারি (রহ.)-এর ছয় লক্ষ হাদীছ মুখস্থ ছিল। তার মধ্য থেকে তিনি বোখারির হাদীছগুলোকে নির্বাচন করেছেন। এক-একজন রাবীকে ভালোভাবে দেখেছেন, পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর মতন দেখেছেন, পর্যবেক্ষণ

করেছেন। তার পরই তাঁর অন্তর প্রশান্ত ও আস্বস্ত হয়েছে। শুধু এর ওপরই ক্ষান্ত হননি। যখন তাঁর অন্তর আশ্বস্ত হলো, তখন আল্লাহর দিকে গভীর মুতাওজ্জুহ হয়ে প্রত্যেক হাদীছ লেখার আগে গোসল করতেন, রিয়াজুল জান্নাহয় দু-রাকাত নামায পড়তেন। তার পর এস্তেখারা করতেন, যাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশনা আসে। যখন হৃদয়ে পূর্ণভাবে এ-ব্যাপারে সাড়া মিলত, তখন তিনি ওই হাদীছটি লিখে নিতেন। সুতরাং সুতীক্ষ্ম যাচাইবাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল যে, এই বোখারি শরীফ এমন একটি গ্রন্থ, যা পৃথিবীর বুকে আল্লাহর কিতাবের পর শ্রেষ্ঠতম বিশুদ্ধ গ্রন্থ।

সহীহ বোখারির মাকবুলিয়্যাত

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা বোখারি শরীফকে কেমন মাকবূলিয়্যাত দান করেছেন। ইমাম বোখারি (রহ.) তাঁর জীবনে এই কিতাবটি ষাট হাজার ছাত্রকে পড়িয়েছেন। এ সাধারণ কোনো কথা নয় যে, ষাট হাজার ছাত্রকে নিজেই বোখারি শরীফ পড়িয়েছেন। আবু যায়েদ মারওয়াযি (রহ.) একবার হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝামাঝি স্থানে সামান্য সময়ের জন্য ঘুমিয়ে গেলেন। তিনি বলেন, স্বপ্নে আমার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেয়ারত নসিব হলো। নবীজি আমাকে বললেন–

يَا اَبَا زَيْدٍ اِلٰى مَتٰى تَدْرُسُ كِتَابَ الشَّافِعِيِّ وَمَا تَدْرُسُ كِتَابِيْ

'হে আবু যায়েদ! তুমি আর কত কাল শাফেয়ির কিতাব পড়বে? আমার কেতাব পড়বে না?'

তিনি ইমাম শাফেয়ির অনুসারী ছিলেন। তাঁর কিতাবের দরস দিতেন। তো নবীজি তাঁকে একথা বললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কিতাব কোনটি ইয়া রাসূলাল্লাহ?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

جَامِعُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ الْبُخَارِيِّ

'ইমাম বোখারির লিখিত কিতাবটিই আমার কিতাব।'

ইমামুল হারামাইন (রহ.)ও এমনই স্বপ্ন দেখেছেন। এখানে একথা ভালো করে বুঝে রাখতে হবে যে, নবী ছাড়া অন্য কারও স্বপ্ন শরীয়তের দলিল হতে পারে না। শুধু বোঝানোর জন্য ঘটনাটি বলা হলো। যেন বুঝে আসে, আল্লাহর দারবারে এই কিতাবটি কত মর্যাদাবান।

বোখারি শরীফের যত ফজিলত আছে, তার মাঝে এটিও একটি যে, এক বুর্যু 'দালীলুল ফালিহীন' নামক একটি কিতাব লিখেছেন। তাঁর নাম ছিল শায়খ মুহাম্মাদ আলী সিদ্দীকি মাক্কি (রহ.)। ১০৪০ হিজরিতে তিনি কা'বা শরীফে বাইতুল্লাহর ভেতরে বসে পুরো বোখারি শরীফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খতম করেছেন। কত কবুলিয়্যাত পেয়েছে এ কিতাব যে, আল্লাহর ঘরের অভ্যন্তরে তার একটি-একটি শব্দ তেলাওয়াত হয়েছে।

বোখারির শিরোনাম-পরিচিতি

বোখারি শরীফে ইমাম বোখারি (রহ.) যে-শিরোনাম স্থাপন করেছেন, তা-ই তাঁর সাফল্য ও আযমতের বড় একটি দলিল। কুতুবে সিত্তার মধ্যে তো ইমাম মুসলিম (রহ.) শুধু হাদীছসমূহকে এক সাথে একত্রিত করে দিয়েছেন। তারাজিম তথা শিরোনাম তাঁরা স্থাপন করেননি। আর বাকি যে পাঁচটি কিতাব আছে, সেগুলোর লেখকগণ শিরোনাম স্থাপন করেছেন ঠিকই; কিন্তু বোখারি শরীফের শিরোনামগুলো সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও তাৎপর্যপূর্ণ। তাই একটি উক্তি প্রসিদ্ধ আছে–

فِقْهُ الْبُخَارِيِّ فِيْ تَرَاجِمِهٖ

'ইমাম বোখারির ফিকহ তাঁর কিতাবের শিরোনামেই।'

ওলামায়ে উম্মত আজ সুদীর্ঘ এক হাজার বছর পর্যন্ত এই শিরোনামগুলো জ্ঞানসাগরে সাঁতার কাটছেন এবং তার জ্ঞান ও তথ্যের মণিমুক্তা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। আজ পর্যন্ত এমন কোনো মুহাদ্দিছ আসেননি, যিনি দাবি করতে পারবেন, আমি সকল মণিমুক্তা উদ্ধার করে ফেলেছি। এই ধারা চলছে। এমনকি আল্লামা কাশ্মিরি (রহ.), যিনি ছিলেন ইল্‌মের পাহাড়, তিনিও বলেছেন, বোখারি শরীফের কিছু জায়গা এমন আছে, যার গভীর পর্যন্ত আজও কেউ পৌঁছতে পারেনি। ওলামায়ে কেরাম যা কিছু বলেন, তা তো ছিটেফোঁটা মাত্র। আসল ইল্‌ম তো রয়ে গেছে ইমাম বোখারি (রহ.)-এরই হাতে।

শেষ কিতাব কোনটি

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, বোখারি শরীফের শুরুটা কিতাবুল ঈমান দিয়ে হয়েছে। শেষ হয়েছে কোন কিতাব দিয়ে? কেউ-কেউ বলেন, كتاب التوحيد। আর কেউ-কেউ এ-ব্যাপারে বিচিত্র মতামত ব্যক্ত করেন।

১. হযরতজি শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) বলেন, শেষ কিতাবটি হচ্ছে كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة । এর ওপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, শেষ কিতাব তো আমরা দেখতে পাই كتاب التوحيد যেখানে তিনি বলেছেন والرد على الجهمية । এর জবাবে মুহাদ্দিছীনে কেরাম বলেন, শেষ কিতাব মূলত كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة আর كتاب التوحيد হচ্ছে কিতাবটির পরিশিষ্ট।

দলিল-১. তাঁদের একথার ওপর তাঁরা বড়ই শক্তিশালী দলিল পেশ করেছেন। তাঁরা বলেন, ইমাম বোখারি (রহ.) যখন কোনো কিতাব লেখেন, তখন তাঁর অভ্যাস হচ্ছে, তার মধ্যে তিনি বিপরীত বিষয়ও আলোচনা করেন। যেমন দেখুন–

কিতাবুল ঈমানে ইমাম বোখারি (রহ.) আলোচনা করেছেন এভাবে–

ظُلْمٌ دُوْنَ الظُّلْمِ، عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ كفرٌ دُوْنَ الْكُفْرِ، الْمَعَاصِيْ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، এ হচ্ছে কিতাবুল ঈমান। কিন্তু তিনি তাতে বিপরীত বিষয়ও আলোচনা করে দিলেন। আর কথায় আছে بِضِدٍ تَتَبَيَّنُ الْاَشْيَاءُ প্রত্যেক জিনিস তার বিপরীত জিনিস দ্বারা চেনা যায়। তো ইমাম বোখারি ঈমানের অধ্যায়ে তার বিপরীত প্রকারের আলোচনাও করেছেন।

এমনিভাবে কিতাবুল ইল্‌ম-এর মধ্যে ইমাম বোখারি (রহ.) লিখেছেন, رَفْعُ الْعِلْمِ وَظُهُوْرُ الْجَاهِلِيَّةِ এখানেও বিপরীতটি আলোচনা করেছেন।

كتاب الاستسقاء এর মধ্যে যেখানে বৃষ্টির ব্যাপারে দু'আ করা হয়েছে, সেখানে দুর্ভিক্ষের সময় মুশরিকীনের ওপর যে-বদদু'আ করা হয়েছে, তা-ও ইমাম বোখারি (রহ.) আলোচনা করেছেন।

তো বোঝা গেল তাঁর অভ্যাস হচ্ছে তিনি কিতাবের মধ্যে বিপরীত বিষয়েরও আলোচনা আনেন। তাই মূলত শেষ কিতাব হচ্ছে كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة এবং যেহেতু ابواب البدعة হয় তার বিপরীত কিতাব, তাই ইমাম বোখারি (রহ.) কিতাবটির পরিশিষ্টরূপে সেই কিতাবটি অর্থাৎ– كتاب التوحيد এখানে উল্লেখ করে দিয়েছেন।

كتاب الرد على الجهمية وغيرهم স্থাপন করেছেন। কারণ, তাঁর অভ্যাসই এমন।

দলিল- ২. দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে কিতাবের শুরুতে ওহিয়ে এলাহী অর্থাৎ– কিতাবুল্লাহর আলোচনা এবং শেষে الاعتصام بالكتاب والسنة এনেছেন। সুবহানাল্লাহ!

وَنِعْمَتِ الْبِدَايَةُ وَنِعْمَتِ النِّهَايَةُ

'যত সুন্দর সূচনা তত সুন্দর সমাপ্তি।'

দ্বিতীয়ত, কিছু ব্যাখ্যাকার বলেন, ব্যাপারটি এমন নয়। শেষ কিতাব হচ্ছে كتاب التوحيد। তাঁদের দলি–

দলিল- ১. ইবনে হাজ্‌র আসকালানি (রহ.)-এর শায়খ আবু হাফস আল ওমর বলেছেন, মানুষের ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত এবং আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ ও উপায় রয়েছে তাওহীদেরর মধ্যে। যেলোক তাওহীদের আলোয় উদ্ভাসিত হবে, সে আযাব থেকে মুক্তি পাবে। তার ইজ্জত-আব্রুও রক্ষা পাবে। তাই ইমাম বোখারি (রহ.) তাঁর শেষ কিতাব এনেছেন كتاب التوحيد। তিনি বলেছেন তাওহীদ অর্জন করে তোমরা সমস্ত মসিবত থেকে আত্মরক্ষা করো। কথা তো ঠিকই। আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যাত প্রত্যেক ওই বান্দার ওপরই রহম করেন, যার মৃত্যু তাওহীদের ওপর হবে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন।'[১]

হযরত হাসান বছরি (রহ.) বলতেন, এক ধোপা থেকে আমি তাওহীদের শিক্ষা পেয়েছি। কীভাবে? আমি আমার ঘরের ছাদে ছিলাম। পড়শীর ঘরে সামান্য হট্টগোল শুনতে পেলাম। আমি শুনতে চেষ্টা করলাম, সমস্যাটা কী? বুঝলাম, স্ত্রী তার স্বামীর সাথে লড়াই করছে। স্বামী দ্বিতীয় একটি বিবাহ করতে চাচ্ছে। স্ত্রী তাকে বলছে, দেখো আমি তোমার সংসারে শত রকম কষ্ট সহ্য করেছি। ক্ষুধায়-অনাহারে থেকেছি। সঙ্কট সহ্য করেছি। তোমার জন্য কত কত চাওয়াপাওয়া আমি বিসর্জন দিয়েছি। আমি আরও বেশি কষ্ট সইতে পারব। কিন্তু যদি তুমি আমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে বিয়ে করতে চাও, আমি তা কোনোভাবেই মেনে নেব না।

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১১৬

তিনি বলেন, আমি কুরআনের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছি। এই আয়াতটি আমার সামনে পড়েছে–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

'আমার বান্দা আমার সাথে শিরক করলে আমি তা ক্ষমা করব না। এ ছাড়া যত গুনাহ আছে আমি চাইলে তা ক্ষমা করে দিতে পারি।'[১]

একজন মহিলা, যে প্রেম-ভালোবাসার ক্ষেত্রে অন্যের ভাগ বসানোকে সহ্য করে না, অন্যজন তার স্বামীর ভালোবাসায় অংশীদার হোক তা সে মেনে নেয় না। একজন মানুষ হয়ে সে এমন করতে পারছে। আল্লাহ তা'আলা, যিনি আহকামুল হাকিমীন! রব্বুল আলামীন, তিনি তাঁর নিজের সাথে কীভাবে অংশীদার সাব্যস্ত করা সহ্য করবেন। এজন্য যে তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহ তার ওপর খাস রহমত নাযিল করবেন। আবার এমনও দেখা যায়, যদি স্বভাব-চরিত্রে নারী ভালো হয়, তাহলে স্বামী তার সকল প্রকার ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। কোনো এক নারীকে স্বামী বলল, তুমি তো আকারগঠনে ভালো নও, তুমি উঁচু বংশেরও নও, তুমি কোনো বিষয়ে পারদর্শিনীও নও। তোমার ভেতর ভালো কী আছে বলো তো শুনি? সমস্ত কথা শুনে নারী বলল–

نہیں کوئی اوقات او گن ہار دی

جیہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی

আমার ভেতরে কোনো যোগ্যতা নেই। কোনো সভ্যতা নেই, ভালো কোনো গুণও নেই। তবে শুনে রাখো, আমি যেমনই হই, তবুও সবসময় আমি তো শুধুই তোমার। আমার আত্মাজুড়ে আমার মন-প্রাণ ও হৃদয়জুড়ে শুধুই তুমি।

স্বামীর কাছে স্ত্রীর একথাটি বেশ ভালো লাগল। সে তার সমস্ত ভুল, সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করে দিল।

তো দেখুন, তাওহীদ একটি বুনিয়াদি বিষয়। একত্ববাদ শুধুই আল্লাহর হয়ে যাওয়া। আল্লাহর জন্য করা, আল্লাহর জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতে পারা অনেক বড় বিষয়। ইমাম বোখারি এ-কারণেই নিজের কিতাবের সর্বশেষ আলোচনায় তাওহীদের আলোচনা এনেছেন। সর্বশেষে كتاب التوحيد এনেছেন।

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১১৬

দলিল-২. দ্বিতীয় দলিল তারা এটি দেন যে, দীনের ভিত্তি ঈমানের ওপর। তো ঈমানের দুটি দিক রয়েছে। দুভাবে ও দুদিকে কথা বলা হয়। একটি হচ্ছে নেতিবাচক, আরেকটি ইতিবাচক। তো কিছু আছে করণীয়, কিছু বর্জনীয়। ইমাম বোখারি কিতাবের শুরুর দিকে করণীয়গুলো বলেছেন আর শেষের দিকে বর্জনীয়গুলো বলেছেন। তিনি সেগুলো ابواب البدعت এর আওতায় বলেছেন। বোঝাতে চেয়েছেন, দেখো ভাই! এগুলো তোমরা করবে আর এগুলো থেকে বেঁচে থাকবে। তাই বাতিল মতবাদ থেকে বেঁচে থাকা ঈমানেরই অংশ।

কিতাবুত তাওহীদের সাথে আমল পরিমাপের সম্পর্ক

এখানে একটি কথা বলতে চাই। কিতাবুত তাওহীদের সাথে وزن اعمال এর কী সম্পর্ক? كتاب التوحيد ই যদি শেষ কিতাব হয়, তাহলে তার বাবগুলোর সাথেও তো কোনো-না-কোনোভাবে সম্পর্ক থাকতে হবে। তাই না? এখানে كتاب التوحيد এর সাথে وزن اعمال এর বাবের সাথে সম্পর্কটা কী? এক্ষেত্রে কিছু কথা মনে রাখুন।

আল্লাহ তা'আলার গুণ দুই প্রকার। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

'কত মহান তোমার রবের নাম, যিনি মহিমময় ও মহানুভাব।'[১]

এখানে ذِي الجلال এবং الاكرام দুটি গুণ। কিছু সিফাতে جلال এর সাথে সম্পর্ক আর কিছু সিফাতে الاكرام এর সাথে সম্পর্ক। কিছু গুণকে صفات ثبوتيه বলা হয় আর কিছু গুণকে صفات سلبيه বলা হয়। صفات ثبوتيه ওই সকল গুণকে বলা হয়, যা আল্লাহ সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন– হায়াত, ইল্‌ম, কুদরত, ইবাদাত, সামা, বাছার, কালাম প্রভৃতি গুণকে صفات ثبوتيه বলা হয়। আর صفات سلبيه ওই সকল গুণকে বলে, যা افعال। এর সাথে সম্পৃক্ত, যেখানে কিছু নেওয়া-দেওয়া পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা معطى তথা দানশীল।

অবশ্য مانع তথা দান করেন এবং বঞ্চিতও করেন। তিনি محى জীবনদানকারী। আবার ميت তথা মৃত্যুদানকারী। نافع উপকারকারী। আবার

১. সূরা আর-রাহমান : আয়াত ৭৮

ضار কষ্টদানকারী। এমন গুণগুলোকে صفات سلبية বলা হয়। মোটকথা, দু-ধরনের গুণ আছে। এক. صفات ثبوتيه দুই. صفات سلبيه আর আমলের পরিমাপ ও ওজনের ব্যাপারটি صفات افعال গুলোর সাথে সম্পৃক্ত। আবার আল্লাহ তা'আলার একটি কাজ হচ্ছে, তিনি নেকি-বদির ওজন করবেন। আর তা صفات افعالএর আওতাভুক্ত বলে এই কিতাবের كتاب التوحيد এর সাথে باب وزن اعمال এর একদিক থেকে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হলো।

শায়খ ইবনুল কায়্যেম (রহ.) ও আল্লামা কাশ্মিরি (রহ.)-এর সিদ্ধান্ত হলো, এখানে تلاوت ও متلو এর মধ্যকার পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। এই উম্মতের মাঝে এমন ভ্রান্ত মতাদর্শের এক জামাত অতিবাহিত হয়েছে, যারা তাদের আকলের পূজা করত। তারা বলত, যেকথা জ্ঞান ও আকলে ধরবে, যেকথা বোঝা যাবে, তা-ই গ্রহণ করা হবে। আর যা আকলে বোঝা যাবে না, তা দূরে ঠেলে দেওয়া হবে। তারা বলত, প্রত্যেক সাধারণ মানুষ যারা আমল করবে, তারা সেই আমলের অন্তর্নিহিত কারণ ও রহস্য সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। তারা মনে করত, আল্লাহর কালাম মাখলুক এবং তা নশ্বর ও সসীম। অথচ ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের বিশ্বাস হলো, আল্লাহর কালাম মাখলুক নয়। এভাবে বিরোধের একটা ধারা প্রবাহিত হতে থাকল। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগেই তাঁর দীনের হেফাজতের জন্য কিছু মর্দে মুজাহিদকে দাঁড় করিয়ে দেন, যাঁরা পাহাড়ের মতো অটল থাকেন। তাঁরা বহু ত্যাগ স্বীকার করে, বহু কষ্ট করে, নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে হলেও দীনের হেফাজত করেই ছাড়েন। ফলে এই 'খালকে কুরআন'-এর যে মাসআলা, এর সমাধানের জন্য আল্লাহ তা'আলা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)কে কবুল করলেন। তাঁকে এর জন্য ময়দানে নামালেন। ঘটনা বড়ই আশ্চর্যের। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) স্বপ্নে দেখলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

بَشِّرْ اَحْمَدَ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُهٗ

'আহমদকে এমন একটা মসিবতের সুসংবাদ দাও, যা তার ওপর আপতিত হতে যাচ্ছে।'

ইমাম শাফেয়ি তাঁর ছাত্রবৃন্দের সামনে এই স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করলেন। বললেন, তোমরা কেউ একজন ইমাম আহমদকে এই সংবাদটা শুনিয়ে

দিয়ো। তো ইমাম তাহাবি (রহ.)-এর মামা ইমাম মুযানি গিয়ে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল (রহ.)কে এই সুসংবাদটা শুনিয়ে দিলেন। সংবাদ শুনেই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল নিজের জামাটা ইমাম মুযানিকে হাদিয়া দিয়ে দিলেন এবং তিনি খুশি হলেন। কা'ব ইবনে মালিক যেমন তাঁর নিজের ব্যাপারে তাওবা কবুলের সংবাদ যিনি তাকে পৌঁছে দিয়েছেন, তাকে নিজের জামাটি হাদিয়া দিয়েছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তেমনই করলেন। ইমাম মুযানি জামা নিয়ে এলেন এবং ইমাম শাফেয়ির নিকট ঘটনার বিস্তারিত ঘটনা দিলেন।

ইমাম শাফেয়ি বললেন, জামাটির হকদার তো তুমি; কিন্তু আমাকে জামাটির নিংড়ানো পানি দিয়ে যাও। জামাটি পানিতে ভিজিয়ে তার নিংড়ানো পানিটুকু ইমাম শাফেয়ি (রহ.) রাখলেন। তিনি কিতাবে লিখেছেন যে, কিছু পানি তিনি পান করেছেন আর কিছু পানি নিজের শরীরে ঢেলেছেন বরকত লাভের আশায়। আজ কি এমন কোনো লোক আছে, যে বরকত মানে না? তাহলে তো সে মূর্খ। বরকতের কথা তো কুরআন-হাদীছ দ্বারা-ই প্রমাণিত। দেখুন, মূসা ও হারুন (আ.)-এর ব্যবহৃত কিছু জিনিস ছিল, ফেরেশতারা যেটি একটি সিন্দুকের ভেতর নিয়ে রেখেছেন। কুরআনে আছে–

فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۝

'...যাতে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে চিত্তপ্রশান্তি আছে এবং যেটি মূসা ও হারুনের বংশের লোকেরা পরিত্যাগ করে গেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে, যাকে ফেরেশতারা বহন করে আনবে।'[১]

বলুন তো, আয়াতে বর্ণিত সাকীনা কোন জিনিস? হাঁ ওই বরকতই হচ্ছে সাকীনা। বোঝা গেল, আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দীনের ব্যবহৃত জিনিসে অফুরন্ত বরকত রয়েছে, যার সাথে ওই জিনিস লাগবে, তাও বরকতপূর্ণ হয়ে যাবে। তাই ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর কাপড়নিংড়ানো পানি ব্যবহারের আমল সঠিক ছিল। তারপর হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) খালকে কুরআনের বিরোধিতার কারণে গ্রেফতার হলেন। সে যুগের বাদশাহ এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর বিপরীত ছিল। তিনি চাইতেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তার অভিমত মেনে নিন। কিন্তু সত্য ও সুন্দরকে ছাড়তে রাজি হননি ইমাম। তিনি বললেন, আমি হক পথ

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৮

ছাড়ব না। মৃত্যু এলে আসুক। বিচারক তাকে শায়েস্তা করার ফয়সালা দিলেন। কিন্তু যুগের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বীর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল পুরোপুরি অনড় রইলেন।

রাজদরবার থেকে হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) কে ডাকা হলো। তাঁকে যখন গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে, তখনকার কথা তিনি বলেন যে, আমাকে কেউ যেন পেছন দিক দিয়ে জামা ধরে টানছে। আমি ফিরে তাকালাম। দেখলাম, সময়ের সবচেয়ে বড় ডাকাত। সে তত দিনে তাওবা করে ভালো পথে চলে এসেছে। নেককার ও সৎ হয়ে গেছে। তাকে দেখে আমি বললাম, তুমি আমাকে টানছ কেন? সে বলল, হযরত! আমি একসময় বড় অপরাধী ছিলাম। বারবার জেলে গিয়েছি। আমাকে আজ পর্যন্ত মোট ১৮ হাজার বেত্রাঘাত লাগানো হয়েছে। আমি আমার মান-সম্মানের দিকে তাকিয়ে ধনসম্পদের জন্য কখনও কারাগারে মাথা নত করিনি। আজ তো আপনি দীনের জন্য বন্দি হচ্ছেন। শত বাধা আসুক, শত নির্যাতন আসুক আপনি নত হবেন না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, একজন ডাকাতের সেই কথায় আমার দৃঢ়তা আরও বেড়ে গেল।

সেই সময়ের বাদশাহ ইমাম সাহেবকে চাবুকাঘাতের নির্দেশ দিলেন। চাবুকাঘাতের জন্য এত লোক মোতায়েন ছিল যে, প্রত্যেকে শুধু দুটি চাবুক মারবে। তারপর নতুন ব্যক্তি, তারপর নতুন ব্যক্তি। এভাবে প্রত্যেকে দুটি করে চাবুক মারবে। সারা দিন মারতে থাকবে। নতুন-নতুন ব্যক্তি, নতুন শক্তি নিয়ে আঘাত করবে। এত বেশি লোক ছিল যে, সারাদিন আঘাত করা যাবে এবং প্রত্যেকে দুটি করে চাবুকাঘাত করবে। তাকে এত আঘাত করা হয়েছিল যে, তার পিঠটা ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) প্রতিটা আঘাতের পর বলেছেন,

اَعْطُوْنِيْ شَيْئًا مِّنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهٖ حَتّٰى اَقُوْلَ بِهٖ

'আমাকে আল্লাহর কিতাব থেকে এবং নবীজির সুন্নত থেকে কোনো একটি দলিল দাও, যেন আমি তোমাদের মতে একমত হতে পারি।'[১]

২৮ মাস তিনি বন্দি ছিলেন। কিন্তু তার বরকতে এমন হয়েছে যে, এই খালকে কুরআনের মাসআলাটি আজীবনের জন্য মুছে গেছে। যেখানেই কোরবানি দেওয়া হয়, সেখানেই আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৮

আল্লাহ এই মাসআলার সমাধানের সৌভাগ্য ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)কে দান করেছেন। দেখুন, একটা সময় এমনও ছিল যে, মানুষ কুরআনকে মাখলুক বলত। তারপর আবার এমন একটা ফেরকা এল যে, বলা হতে লাগল কুরআনও মাখলুক নয়, আমাদের তেলাওয়াতও মাখলুক নয়। এরা মাতলূ ও তেলাওয়াত উভয়টিকেই অস্বীকার করতে শুরু করল। আগে ছিল চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। আর এখন হচ্ছে চূড়ান্ত ছাড়াছাড়ি। তার মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা ইমাম বোখারি (রহ.)কে কবুল করলেন। তিনি এর জন্য বহু কোরবানি ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বহু কষ্ট সহ্য করেছেন। দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। নির্বাসনে গেছেন। যখন বিচারক তাঁকে বোখারা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুকুম দিলেন, তখন তার অন্তর চাইল সমরকন্দ চলে যেতে। সমরকন্দের ওলামায়ে কেরাম তাঁকে আগেই পয়গাম পাঠাল যে, আমরা আমাদের শহরে আপনাকে কবুল করব না। তিনি উদ্বাস্তু হয়ে গেলেন। খরতঙ্গ নামক এক গ্রামে তার এক খালা থাকতেন। সমরকন্দ থেকে ২৩ মাইল দূরে এই গ্রাম। ইমাম বোখারির শেষ জীবন এখানেই একাকী কাটে এবং তিনি আল্লাহর প্রিয় হয়ে যান।

ইমাম বোখারি تلاوت ও متلو এর মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট করে দিতে كتاب التوحيد কে তাঁর কিতাবের শেষ এনেছেন এবং তাতে কয়েকটি অধ্যায় তথা বাব এনেছেন। তারই মধ্যকার একটি বাব আমলের ওজন সম্পর্কে রয়েছে। কীভাবে কেয়ামতের দিন আমলের ওজন করা হবে। আর আমলের মধ্যে তো তেলাওয়াত রয়েছে। তেলাওয়াতের ওজনও তো করা হবে। আর তেলাওয়াতের যখন ওজনই করা হবে, তখন কি তা মাখলূক হলো না? যারা متلو আর تلاوت কে غير مخلوق বলত, তাদের কত সুন্দরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন।

আল্লামা কিরমানি (রহ.)-এর কথা হচ্ছে–

كتاب التوحيد এর মধ্যে صفات الهى অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সুতরাং صفت كلام এবং كلام الله এর আলোচনায় ইমাম বোখারি তাঁর কিতাব সমাপ্ত করেছেন। শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া (রহ.) বলেছেন, ইমাম বোখারি (রহ.) তো শব্দ এই ব্যবহার করেছেন–

كِتَابُ التَّوْحِيْدِ وَرَدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ

তবে বাস্তবিক পক্ষে এখানে সমস্ত বাতিল ফেরকার লোকদের রদ ও প্রত্যাখ্যান করা উদ্দেশ্য। চাই সে বাতিল ফেরকা মু'তাযিলা হোক বা কাদরিয়া হোক।

باب وزن اعمال কে শেষে আনার কারণ

এখানে আরেকটি প্রশ্ন ছাত্রদের অন্তরে সৃষ্টি হয়। এই যে وزن اعمال এর বাব তাকে সবার পরে আনার কী হেকমত? এ-ব্যাপারেও মুহাদ্দিছীনে কেরাম বহু জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন।

এখানে وزن اعمال তথা আমলের ওজনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। আর আখেরাতে আমলের ওজন হবে। কারণ, মোআমালা তো আখেরাতেই হবে। তাই এই বিষয়টিকেও ইমাম বোখারি (রহ.) কিতাবের শেষেও এনেছেন।

শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস সাহেব বলেছেন, যেকথা শেষে বলা হয়, তা হৃদয়ঙ্গম হয় বেশি। তাই তো খতীব ও বক্তাগণ তাঁদের মূল্যবান কথাটি এবং বয়ানের চুম্বকাংশটি এমনভাবে বলেন, যেন তা মস্তিষ্কে বসে যায়, অন্তরে গেঁথে যায়।

তো ইমাম বোখারি (রহ.) এত হাদীছ একত্রিত করেছেন যে, তিনি তো জানেন, মূল সাফল্য ও ব্যর্থতার খবর আমলের ওজন করার পরই বোঝা যাবে। তাই ওজনে আমলের আলোচনা শেষে উল্লেখ করেছেন, যেন কিতাব পাঠকারীদের মাথায় একথা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, এমন আমল করা উচিত, যা কেয়ামতের দিন মিযানের পাল্লায় ওজন হবে।

শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারি (রহ.) বলেছেন, ইমাম বোখারি (রহ.) এই আশায় وزن اعمال এর বাব স্বীয় কিতাবের শেষে এনেছেন, যেন কিতাবটি কেয়ামতের দিন তাঁর জন্য ছাওয়াবের ওজনে সবচেয়ে বেশি ভারী হয়।

بدء الوحى এবং وزن اعمال এর মাঝে সম্পর্ক

এখানে একটি সূক্ষ্ম কথা মাথায় এল। ইমাম বোখারি (রহ.) তো তাঁর কিতাব শুরু করেছেন باب بدء الوحى দিয়ে। আর শেষ করেছেন باب وزن اعمال দিয়ে। তো শুরু ও শেষের সাথে সম্পর্ক কী? কোন সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে بدء الوحى দিয়ে শুরু হলো আর وزن اعمال দিয়ে শেষ হলো?

আল্লামা কাশ্মিরি (রহ.) বলেছেন, ওহী হচ্ছে ঈমানের বুনিয়াদ। তাই এই বাবটি সর্বপ্রথম রাখা হয়েছে। আর প্রতিদান হচ্ছে শেষ পরিণাম। নেক আমল করলে উত্তম জাযা পাওয়া যাবে আর খারাপ আমলে সাজা হবে। এজন্য ইমাম বোখারি (রহ.) তাকে কিতাবের শেষে রেখেছেন।

প্রথম হাদীছ ও শেষ বাবের সাথে সম্পর্ক

প্রথম হাদীছ এবং শেষ কটি হাদীছের মাঝেও সম্পর্ক আছে।

আল্লামা সিরাজুদ্দীন বালকীনি (রহ.) বলেছেন, ইমাম বোখারি (রহ.) প্রথম হাদীছে বলেছেন انما الاعمال بالنيات আমলের ভিত্তি দুনিয়ায় হয় নিয়তের ওপর আর আখেরাতে হয় ওজনের ওপর। তাই প্রথম কিতাবের হাদীছের مبتدا তথা প্রাথমিক অবস্থার কথা আলোচিত হয়েছে এবং কিতাবটির শেষে আলোচিত হয়েছে চূড়ান্ত ফলাফলের কথা।

আল্লামা সিন্ধি (রহ.) বলেছেন, আমলের সূচনা হয় নিয়ত থেকে। আর শেষ হবে ওজনের মাধ্যমে। তাই ইমাম বোখারি (রহ.) انما الاعمال بالنيات এর হাদীছ শুরুতে এনেছেন এবং শেষে আমল ওজন করার ব্যাপারে হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান (রহ.) বলেছেন, নিয়ত হচ্ছে আমলের প্রাথমিক পর্যায়। ইমাম বোখারি (রহ.)এই বিষয়টি শুরুতে লিখেছেন। আর আমলের ওজন হচ্ছে শেষ পর্যায়। তাই ইমাম বোখারি (রহ.) সে-বিষয়টি শেষে এনেছেন। তাই কিতাবের শুরুও শেষের সাথে মিল হয়ে গেল।

কুরআনের আয়াত উল্লেখের উদ্দেশ্য

এখানে গবেষণার একটি বিষয় আছে। ইমাম বোখারি শুধু হাদীছ উল্লেখ করেননি; বরং কুরআনুল কারীমের আয়াতও উল্লেখ করেছেন। তাহলে কুরআনের আয়াত উল্লেখের কারণ কী? শারেহীনে কেরাম (হাদীছবেত্তাগণ) বলেছেন, ইমাম বোখারি (রহ.) আয়াতে কুরআনের মাধ্যমে নিজের কথাকে মজবুত ও শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছেন। দেখুন, এই আলোচনা শুধু হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এমন নয়। তা তো কুরআন দ্বারাও প্রমাণিত। এজন্যই وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ এই আয়াতটিও শেষে এনেছেন।

আল্লাহর জন্য একবচন ও বহুবচন শব্দ ব্যবহার

এখানে মনকাড়া একটি দারুণ বিষয় ওলামায়ে কেরাম আলোচনা করে থাকেন। وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ আমি মিযান কায়েম করব। ওজন করব তোমাদের আমল। দেখব তোমাদের আমলের পরিমাণ। এখানে আল্লাহ নিজের জন্য صيغه جمع ব্যবহার করেছেন। আবার অনেক স্থানে صيغه واحد ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য অনেক স্থানেই جمع ব্যবহার করেছেন। এর মাঝে হেকমত কী? রহস্য কী? এখানে বড় মূল্যবান একটি কথা আছে ছাত্রদের জন্য।

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যেখানেই কুরআনুল কারীমে দয়া, রহমত ও অনুগ্রহের আলোচনা এসেছে, সেখানে আল্লাহ তা'আলা واحد এর সীগাহ ব্যবহার করেছেন। যেমন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর পূর্ণ করে দিলাম আমার নেয়ামত।'[১]

এখানে صيغه واحد ব্যবহার হয়েছে।

এখানে বোঝানো উদ্দেশ্য যে, আমি তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম। তো যেখানে দয়া ও অনুগ্রহের আলোচনা হয় সেখানে واحد এর صيغه ব্যবহার হয়। যেখানে عظمت ও বড়ত্বের কথা আলোচনা হয়, সেখানে আল্লাহ তা'আলা صيغه جمع ব্যবহার করেন। তাই তো وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ এ আয়াতে جمع এর صيغه ব্যবহার করা হয়েছে।

আল্লাহকে লক্ষ করে واحد ব্যবহার করা হবে না جمع

এ-ব্যাপারে ওলামায়ে উম্মত স্বতন্ত্র আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে দেখা গেছে, কুরআনুল কারীমে সম্বোধনের ক্ষেত্রে এবং আল্লাহকে ডাকার ক্ষেত্রে واحد এর صيغه ব্যবহার হয়েছে। আবার একস্থলে جمع এর صيغه ও ব্যবহার হয়েছে।

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৩

যেমন–

قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ

'বলবে, হে আমর রব! আমাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিন।'[১]

এখানে ارجعون শব্দটি বহুবচনে ব্যবহার হয়েছে। তবে উভয়ের মুআমালা সম্পূর্ণই ভিন্ন। واحد এর صيغه এর মধ্যে توحيد এর ব্যাপারটি প্রগাঢ়। শিরকের গন্ধও পাওয়া যায় না। আবার جمع এর صيغه এর মধ্যে সম্মান ও আদব প্রদর্শনের বিষয় প্রবল। এক দিক থেকে ওটি উত্তম, অপর দিক থেকে এটি উত্তম। আমাদের বুযুর্গানে দীনের আবার নিজস্ব এক-একটি বৈশিষ্ট্য আছে, নিজস্ব রীতি আছে। যেমন– হযরত মাওলানা ইয়াকূব নানুপুরি (রহ.) جمع এর صيغه ব্যবহার করতেন আদবের প্রাবল্যের কারণে। এতে বান্দার বিনয় বেশি প্রকাশ পায়। আবার হযরত মাওলানা থানবি (রহ.) বলতেন, আমার ওস্তাদের কারণে আমারও এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তিনিও জমার সীগাহ ব্যবহার করতেন। তবে একবচন তথা واحد ব্যবহার হোক বা বহুবচন তথা جمع ব্যবহার করা হোক সবই জায়েয। একটিতে তাওহীদ প্রবল, আরেকটিতে আদব প্রবল।

আমলের ওজন অস্বীকারকারী

এখানে একটি কথা হৃদয়ঙ্গম করে নিন। ওয্নে আমলের যেকথা ইমাম বোখারি (রহ.) বলেছেন, মৌলিকভাবে এতে তিনি মু'তাযিলা ফেতনাকে খণ্ডন করেছেন। তারা বলত, আমল অদৃশ্য জিনিস আর তা ওজন করা যায় না। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তাদের এই ভাবনা কেন হলো? কেন তারা এমন কথা বলল? হ্যাঁ, এর কারণ হচ্ছে, তারা আকলকে মাপকাঠি বানিয়েছিল।

দেখুন, কেউ যদি স্বর্ণকারের পাল্লা দিয়ে হিমালয় পর্বত মাপতে যায়, লোকেরা তাকে পাগল ছাড়া কী বলবে বলুন তো শুনি। তারাও এমন। জ্ঞান দ্বারা, এই দুর্বল আকল দ্বারা চিন্তা করে বের করেছে তারা এমন বিষয়, যা মূলত আল্লাহর কাজ। আল্লাহ ছাওয়াব মাপবেন। সেই মহা ক্ষমতাবান আল্লাহর কর্ম বান্দার আকল কীভাবে বুঝবে? মু'তাযিলারা আকলের মাধ্যমেই সব সমাধান করতে চায়, সব মাপতে চায়। অথচ আল্লাহর কর্ম মানবজ্ঞানের পুরোপুরিই বাইরে।

---

১. সূরা মূমিনূন : আয়াত ৯৯

আকল ও ওহী

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) সুন্দর একটি উদাহরণ দ্বারা কথাটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, মনে করুন, একটি পাহাড়। তাতে এক বান্দা আরোহণ করতে চাইল। তো এখানে তিন প্রকারের মানুষ থাকতে পারে।

এক. এমন ব্যক্তি, যে ঘর থেকে তার বাহনে আরোহণ করল। পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত চলে গেল। তারপর পাহাড়ের ওপরও ওই ঘোড়া নিয়েই আরোহণ করতে শুরু করল। এ ব্যক্তি কোথাও-না-কোথাও অবশ্যই আঘাত খেয়ে পড়ে যাবে। কারণ, পাহাড়ে এবড়োখেবড়ো টিলা-টিপিতে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায় না। তাই পাহাড়ে সফরকারী যদি ঘোড়ায় চড়ে পাহাড় অতিক্রম করতে চায়, তাহলে সে ব্যর্থ হবে।

দুই. এই ব্যক্তি চিন্তা করল, ঘোড়ায় বসে তো পাহাড়ে চড়া সম্ভব নয়। তাই সে ঘর থেকে পায়ে হেঁটে রওনা দিল। ঘোড়া নিল না। সে সারা জীবন হাঁটতেই থাকবে– পাহাড় পর্যন্ত আর যেতে পারবে না।

তিন. এমন ব্যক্তি, যে চিন্তা করল, যতটুকু পথ ঘোড়ায় অতিক্রম করা যায়, ততটুকু ঘোড়ায় চড়েই যাই। ফলে সে ঘোড়ায় ছাওয়ার হয়ে পাহাড়ের নিকটে গেল এবং পাহাড়ে চড়ার জন্য পায়ে হাঁটতে শুরু করল।

তো হযরত থানবি (রহ.) বলেছেন, এই তৃতীয় ব্যক্তি তার কর্মে সফল হতে পারবে। সে পাহাড়ের শিখরে পৌঁছাতে পারবে। তো আকল মানুষের জন্য একটা ঘোড়ার মতো। আকলের ক্ষমতা যতটুকু, তাকে ততটুকু পর্যন্ত ব্যবহার করো। আকলের সীমানা যেখানে শেষ, সেখানে আকলকে ছেড়ে তারপর অগ্রসর হও।

দেখুন, চক্ষু একটা সীমানা পর্যন্তই দেখে। সেই সীমানার বাইরে চক্ষু দেখতে পায় না। তাই মানুষ দুরবিন ব্যবহার করে এজন্য যে, যতটুকু চক্ষুর ক্ষমতা, ততটুকু চোখ দ্বারা এবং এর পরেরটুকু দুরবিন দ্বারা দেখা যাবে।

এমনিভাবে পা একটি নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। তারপর আর পারে না। এর পরের পথের জন্য বাহন নিতে হয়। তেমনি আকল একটি সীমানা পর্যন্ত মানুষকে পথনির্দেশ করে। তো যে পর্যন্ত আকল মানুষকে পথনির্দেশ করে, সে পর্যন্ত আকল দিয়ে চলো। আর যেখানে গিয়ে আকল থমকে দাঁড়ায়, সেখানে ওহীর মাধ্যমে পথ চলো। তো আহলে সুন্নাতের আকীদা এই যে, আকলকে সাথে নিয়ে চলো। এমন নয় যে, শরীয়ত বলছে,

আকলকে একেবারেই বর্জন করো। না; বরং শরীয়তই বলছে আকল আল্লাহর দেওয়া বড় একটি নেয়ামত। এর মাধ্যমে তোমরা সহজে দীন শিক্ষা করতে পারবে। তাই আকলকে সাথে নিয়েই চলো। তবে একথাটাও মাথায় রাখবে যে, এই আকলের একটি নির্দিষ্ট সীমানা আছে। সেই সীমানার বাইরে গেলে আকলকে বর্জন করো। সেখানে ওহীর নির্দেশনা অনুসরণ করো।

چاہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل
لیکن اسے کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو

'আকলকে তুমি সাথে রাখতে হবে। আকল তোমাকে পথ দেখাবে। কিন্তু কখনও-কখনও তোমাকে এই আকলকে ছেড়ে চলতে হবে।'

কারণ, যেখানে তুমি আকলের কথা শুনলে ভ্রান্তির শিকার হবে, যেখানে ওহীর মুআমালা এসে যাবে, সেখানে তোমার আকলকে বর্জন করতে হবে। তাই কোনো আমল বুঝে এলেও আমরা মানি আর বুঝে না এলেও মানি। কারণ, এটি ঈমানের মুআমালা। কিন্তু আজকাল ওজনের ব্যাপার তো বুঝে এসেই যায়। আগেকার যুগে কিছু জিনিস ছিল, যা মাপা যেত না। কিন্তু এখনকার যুগে সবকিছুই মাপা যায়। বাতাস, আগুন, পানি, তাপ এমনকি শরীরের উষ্ণতাও মাপা যায়।

মিযানের হাকীকত ও মর্ম

'মিযান' মানে শুধু এই নয় যে, একটা লম্বা রেখাকৃতির লাঠি হবে। তার দুই প্রান্তে দুটি পাল্লা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। আর এক পাল্লায় পরিমাপক এবং অপর পাল্লায় বস্তুটি রাখা হবে আর ওজন দেওয়া হবে। দেখুন, বিষয়টি কিন্তু তা নয়। আজকাল আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে এমন মেশিন আবিষ্কার হয়েছে, যার দ্বারা ডায়েবেটিস মাপা হয়। জ্বর মাপা যায়। দৈর্ঘ-প্রস্ত মাপার জন্য ফিতা আছে। নানা ধরনের মিটার আবিষ্কার হয়েছে দাঁড়িপাল্লার বদলে। এসব কিন্তু আগের যুগে ছিল না। আজকের যুগের মানুষ সহজেই বুঝতে পারে আমল মাপা যাবে কি-না। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত কেয়ামতের দিন এমন এক পদ্ধতিতে আমাদের আমলগুলো মেপে-মেপে দেখাবেন, যা আমরা কল্পনাও করতে পারব না। আমরা তো বড় অকৃতজ্ঞ বান্দা। আল্লাহ বাস্তবে আমাদের দেখিয়ে দেবেন। আমরা যা করছি, আমাদের তা দেখাবেন।

আহলে সুন্নাতের দলিল

এ-ব্যাপারে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের কাছে বেশ কটি দলিল রয়েছে। এসব দলিল আমরা কুরআনুল কারীমেই খুঁজে পাই।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ

'আমি কেয়ামতের দিন পরিমাপকযন্ত্র কায়েম করব।'[১]

আরেক স্থানে ইরশাদ হয়েছে–

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ نِ الْحَقُّ

'সেই দিন আমলের পরিমাপ সত্য।'[২]

কুরআনের এমন সুস্পষ্ট দলিল থাকার পরও আর কোনো দলিল দেওয়া হবে। আর কোনো দলিলেরই তো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কেউ যদি তার আকলের কথা শুনে তা মেনে না নেয় সে তো তার নিজের ব্যাপার। বাস্তব কথা এই যে, যেখানে দীনের ব্যাপার আসবে, বান্দার জন্য উচিত নবীগণের বাণী ও তথ্যের সামনে নত হয়ে যাওয়া। যা তাঁরা বলেছেন, তাকে সহজভাবে মেনে নেওয়া, তা কবুল করে নেওয়া। একেই বলা হয় ঈমান।

আমল ওজন করার উপকারিতা

ছাত্রদের মাথায় একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ওয্নে আমলের ফায়দা কী? আল্লাহ এমনিতেই সব কিছু জানেন। হ্যাঁ! আল্লাহ অবশ্যই সর্ববিষয়ে জ্ঞানী। তিনি জানেন কে দাঁড়িয়ে আছে, কে বসে আছে, কে আমল করছে আর কে গাফলতিতে আছে। কে ভাগ্যবান, কে দুর্ভাগা। কে কামিয়াব আর কে নাকাম। সবই তিনি জানেন। সর্ববিষয়ে তিনি খবর রাখেন। তবে আমল ওজন করার একটি বিশেষ উপকারিতা আছে। হাফেয ইবনে নাযীমুদ্দীন দামেশকি (রহ.) منهاج الاستقامة গ্রন্থে এর কয়েকটি দিক লিখেছেন।

তিনি বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমলের ওজন করবেন যেন ভালোভাবে প্রমাণিত হয়ে খারাপ বান্দা তার গুনাহের পরিমাণ দেখে নিতে পারে। বুঝবে, আমি যেসব অপকর্ম করেছি, তার পরিমাপ এই। আবার নেক বান্দা তার নেকগুলোর পরিমাপ দেখতে পাবে। গুনাহগারের

---

১. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৪৭

২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৮

কোনো নেক থাকলে তা-ও ওজন হবে। আর নেককারের গুনাহ্ থাকলে তা-ও ওজন হবে। বোঝা যাবে, নেক বেশি, না বদ বেশি। নেক বান্দা দেখবে, হ্যাঁ আমার নেক এই পরিমাণ হয়েছিল। সে দারুণ আনন্দিত হবে। নিজের নেকগুলো আজ নিজে স্বচক্ষে দেখছে। এই আনন্দের কোনো সীমা নেই।

মোটকথা, কে কোন আমলের কারণে জাহান্নামে বা জান্নাতে যাবে, তা একেবারে আয়নার মতো স্পষ্টরূপে দেখা যাবে।

আবার এই ফায়দাও আছে যে, দুনিয়ার মধ্যে মানুষ এই ওজনের ওপর ঈমান রাখত কিনা তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। যেমন– আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত ওজনের ওপর ঈমান রাখে আর মু'তাযিলারা তার ওপর ঈমান রাখে না। দেখা যাবে, কে হকের ওপর আর কে বাতিলের ওপর। আল্লাহ ইনসাফগার ও ন্যায়পরায়ণ। সেদিন কে কাফের, কে মুমিন সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে।

لِاِظْهَارِ قِسْطٍ لِاَنَّهٗ مُقْسِطٌ

'ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশের জন্য। কেননা, আল্লাহ হলেন ইনসাফগার।'

তাই বান্দার সামনে প্রমাণ করবেন কেয়ামতের দিন। কাফেরদের আফসোস সেদিন বেড়ে যাবে আর মুমিন সেদিন আনন্দিত হবে।

আরেকটি ফায়দা দেখুন। কেয়ামতের দিন যখন আমলের ওজন হবে, তখন নেক বান্দার খুশি বেড়ে যাবে। আমলের ওজন দেখে তারা আনন্দিত হবে। আর কাফেরদের বেইজ্জতি বেড়ে যাবে। তারা তাদের অপকর্ম দেখে লজ্জিত হবে। আর আল্লাহ তো চান হক ও বাতিল স্পষ্ট হয়ে যাক। স্পষ্ট হয়ে যাক কে ভালো আর কে খারাপ।

'মিযান' সম্পর্কে কিছু সূক্ষ্ম বিষয়

মিযান তথা কেয়ামতের দিনের ছাওয়াব পরিমাপকযন্ত্র নিয়ে কিছু কথা বলছি। খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো। আশা করি, উপকারে আসবে।

মনে রাখবে, একটি হচ্ছে হিসাব নেওয়া, আরেকটি হচ্ছে ওজন করা। কোরআনে উভয়টিরই কথা আছে। তো উভয়টি কি একসাথেই হবে, না আগে-পিছে হবে। হিসাব আগে হবে, না ওজন আগে হবে। এ-ব্যাপারে মুহাদ্দিছীনে কেরাম বিস্তারিতভাবে বহু কথা বলেছেন।

ইমাম বায়হাকি (রহ.) বলেছেন, জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মাযহাব হলো, প্রথমে হিসাব হবে, তারপর ওজন হবে। তার একটি উদাহরণ এভাবে বুঝে নাও যে, প্রথমে মুখে বোঝাপড়া হয়, তারপর দাঁড়িপাল্লায় মাপা হয়।

ওজন কে করবে

এই মিযানের জিম্মাদার কে হবেন? যখন আমল ওজন করা হবে, তখন তা কে সম্পাদন করবেন? এ-ব্যাপারে দুটি মত আছে। কিতাবুস সুন্নাহয় হযরত হুযায়ফা (রাযি.)-এর রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে–

صَاحِبُ الْمِيْزَانِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ جِبْرِيْلُ

'কেয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লার জিম্মাদার হবেন জিবরাঈল।'

এর একটি কারণও বুঝে আসে যে, জিবরাঈল ওই ফেরেশতা, যিনি দুনিয়ায় ওহী নিয়ে এসেছেন। তো তিনি দুনিয়ায় শরীয়তের মাপকাঠি নিয়ে এসেছেন। তাই বান্দার আমল শরীয়ত মোতাবেক কতটুকু হয়েছে, তা তিনি ভালো জানবেন। এই যাচাইবাছাইয়ের দায়িত্বটাও আল্লাহ হযরত জিবরাঈল (আ.)কে অর্পণ করবেন।

অন্য এক হাদীছে এ কথাও আছে যে, ইমাম বায়হাকি (রহ.) আনাস (রাযি.) থেকে রেওয়ায়াত করেন–

مَلَكُ الْمَوْتِ مُوَكَّلٌ بِالْمِيْزَانِ

'কেয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লার জিম্মাদার হবেন মালাকুল মউত।'

তো এমন একটা পাল্লা হবে সেদিন, যার এক পাল্লায় রাখা হবে নেক আমল, অপর পাল্লায় রাখা হবে বদ আমল।

পাল্লা ঝুঁকানো হবে?

এখানে একটি জটিল বিষয় আছে। নেকের পাল্লা ঝুঁকবে, নাকি ওপরের দিকে উঠবে? কেউ বলেন, নেকের পাল্লা ঝুঁকবে। শায়খ শিহাবুদ্দীন রামালি (রহ.) এ-বিষয়ে কিতাবে লিখেছেন, পাল্লা যেমন দুনিয়ায় আছে, তেমনই হবে সেদিন। তবে কিছু-কিছু মুহাদ্দিছীন বলেছেন, বিষয়টি এমন নয়। নেকের পাল্লা ওপরে উঠবে। তাঁদের দলিল কুরআনুল কারীমের আয়াত

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ

'তার দিকে উঠে আসবে পবিত্র সব কথা। আর নেক আমল তাকে উঁচু করে দেবে।'[১]

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ১০

নেক আমল ওপরের দিকে যায়। তাই কেয়ামতের দিন হিসাব উল্টোভাবে হবে। যদি নেক বেশি হয়, তাহলে নেকের পাল্লা ওপরের দিকে উঠতে থাকবে আর গুনাহ কম হবে। কিন্তু আবার বিষয়টি বোঝা কঠিনও বটে। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)-এর ওপর একটি দলিল স্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, আখেরাতে কিছু জিনিস দুনিয়ার বিপরীত হবে। দুনিয়ায় শয়তানকে দেখা যায় না। শয়তান আমাদের দেখতে পায়–

إِنَّهُ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

'সে নিজে ও তার দল তোমাদের এমনভাবে দেখে, যেন তোমরা তাদের দেখতে না পাও।'[১]

তবে কেয়ামতের দিন আমরা শয়তানকে দেখতে পাব। কারণ, সেদিন এসব বিষয় দুনিয়ার বিপরীত হবে। তেমনি কেয়ামতের দিন মিযানের ক্ষেত্রে, আমল পরিমাপের ক্ষেত্রেও তেমনই হবে। অর্থাৎ– যার নেকের পাল্লা ওজনদার হবে, তা ওপরের দিকে উঠতে থাকবে। আর এর দ্বারা বোঝা যাবে, নেকের পরিমাণ বেশি। ব্যাপারটি এমন নয় যে, ওপরের দিকে নেকের পাল্লা উঠে যাওয়া মানে নেকের পাল্লা হালকা।

বহুবচন কেন ব্যবহার করা হলো

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ

এখানে আয়াতটিতে ميزان শব্দ বহুবচনে موازين ব্যবহার করা হয়েছে। একবচন ব্যবহার করা হয়নি। এর দ্বারা বোঝা যায়, মিযান তথা মাপার পাল্লা অনেক হবে। এ-ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, একটি জিনিস কয়েকটি অণু-পরমাণু দিয়ে গঠিত হয়, কয়েকটি খণ্ড দ্বারা গঠিত হয়। এখানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তথা পাল্লার নানা রকম অংশের দিক থেকে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা কীভাবে? প্রত্যেকটি জিনিস পৃথক-পৃথক হয়– পাল্লা আলাদা হয়, দাঁড়ি তথা কাষ্ঠখণ্ডটি পৃথক হয়। পাল্লার দড়িটাও আলাদা হয়। তো বিচিত্র এ রকমে জিনিস নিয়ে একটা পাল্লা গঠিত হয় বলে এখানে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার হয়েছে।

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২৭

হাফেয ইবনে হাজ্‌র আসকালানি (রহ.) বলেছেন, ব্যাপারটি এমন নয়। বরং প্রত্যেক মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলাদা-আলাদা। আর প্রত্যেক অঙ্গের আলাদা-আলাদা গুনাহ হয়। তাই প্রত্যেক অঙ্গের গুনাহ পরিমাপের জন্য পৃথক-পৃথক পরিমাপকযন্ত্র থাকবে। তাই موازين তথা বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কতিপয় আলেম বলেছেন, মাঝে-মাঝে বড়ত্ব বোঝানোর জন্য বহুবচন ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই আযমত বোঝাতে এখানে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কেয়ামতের দিন মিযান কত বড় হবে

পরিমাপক মিযান কত বড় হবে? ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَفَّتَا الْمِيْزَانِ كَطِبَاقِ الدُّنْيَا كُلِّهَا

'মিযানের পাল্লা গোটা দুনিয়ার সমান হবে।'

সালমান (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে–

فَلَوْ وُزِنَ فِيْهِ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ لَوَسِعَتْ

'এমন বড়-বড় পাল্লা হবে যে, যদি জমিন ও আসমানকে মাপতে চাওয়া হয়, তাহলেও মাপা যাবে।'

اعمال কেন বহুবচন

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। ইমাম বোখারি বলেছেন–

قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَاَنَّ اَعْمَالَ بَنِيْ اٰدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوْزَنُ

এখানে আমল বোঝানোর জন্য اعمال বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর قولهم শব্দকে বহুবচন না এনে একবচনে আনা হয়েছে। কেন এমন করা হলো? এ-ব্যাপারে মুহাদ্দিছীনে কেরাম লিখেছেন, মূলত কথা এমনই ছিল। কিন্তু যেহেতু আমল করার অঙ্গ অনেক প্রকার হয়ে থাকে– চক্ষু, কান, হাত, পা ইত্যাদি, তাই আমল বোঝাতে اعمال বহুবচনের শব্দ এনেছেন। আর জবানের ক্ষেত্রে, কথার ক্ষেত্রে অঙ্গ মাত্র একটি। তাই قول শব্দটি একবচন আনা হয়েছে।

সবার আমলই কি মিযান দ্বারা মাপা হবে

এখানে আরেকটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। সকল মানুষের আমলই কি মিযান দ্বারা মাপা হবে? হ্যাঁ, সবার আমলই মাপা হবে। তবে প্রত্যেক বিষয়েই ব্যতিক্রম

থাকে। তবে অধিকাংশ হিসেবে এই হুকুম দেওয়া হয়েছে। একে لاكثرحكم বলা হয়। তো সকল মানবের আমল মাপা হবে ঠিক, তবে নবীগণ ব্যতীত। নবীগণের আমলের ওজন করা হবে না এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা আম্বিয়া কেরামের অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাঁদের সাথে কল্যাণের মুআমালা করবেন।

এক হাদীছ এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষকে বিনা হিসাবে জান্নাত প্রদান করবেন।

সত্তর হাজারের কথা শুনে তো হৃদয়টা চায় দু'আ করি। কিন্তু আবার থমকে যাই একথা ভেবে যে, আহা! নবীজির লাখো-লাখো, কোটি-কোটি উম্মত। তার মধ্যে আমরা কী আর আমাদের অস্তিত্ব কী। তবে আবার হাদীছের আরেকটু সামনের দিকে তাকালে মনটা বড় হয়ে যায়, প্রশান্তি আসে। নবীজি বলেছেন, সেই সত্তর হাজার এমন হবে যে, তারা আরও সত্তর হাজারকে নিতে পারবে। আহ! এবার তো আশায় বুক বাঁধতে পারি। দু'আয় বলতে পারি, হে আল্লাহ! আমরাও আছি। হে আল্লাহ! মাপা ও ওজনের উপযুক্ত আমরা নই। আমরা তোমার রহমত চাই। এত মানুষকে যখন আপনি বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখেল করতে পারবেন, তাহলে আমাদের মতো এই অসহায়দের সেই বিনা হিসাবীর দলভুক্ত করে নিন। আমাদেরও জান্নাত দিন।

কাফেরদের কর্ম কি মাপা হবে

আরেকটি প্রশ্ন অন্তরে উদিত হয়। কাফেরদের আমলও কি মাপা হবে? হ্যাঁ ভাই! কাফেরদের আমলও মাপা হবে। তবে কুফরির কারণে তাদের সমস্ত আমল ওজনহীন হয়ে যাবে। তাই তো আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا

'আমি কেয়ামতের দিন তাদের জন্য ওজন দাঁড় করাব না।'[১]

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন এমনটি হবে? তারা তো নেক কাজই করেছে! তাদের এই নেকের ওজন কেন ভারী হবে না? মনে করুন, একজন মানুষ জমিনের ওপর আছে। তার ওজন একশত কিলোগ্রাম।

---

১. সূরা কাহফ : আয়াত ১০৫

যদি এই মানুষটিকে আপনি চাঁদের দেশে পৌঁছে দেন, তাহলে মনে করুন তার ওজন ৪০ কি. গ্রা. হলো। তো ওই ওজনের একই মানুষ একই রকম শরীর নিয়ে চাঁদের দেশে যাওয়ার পর তার ওজন কমল কেন? আবার এ মানুষটিকেই যদি মঙ্গলগ্রহে নেওয়া হয়, তাহলে তার ওজন বেড়ে হয়ে যাবে কয়েকশো কেজি। শত কেজির মানুষ হয়ে গেল কয়েকশো কেজি! আবার তাকে যদি মহাশূন্যে নেওয়া হয়, তাহলে তার ওজন হয়ে যাবে জিরো কি. গ্রাম। বিজ্ঞানকে জিজ্ঞেস করো, কেন এমন হয়। তাহলে বিজ্ঞান বলবে, ওজনের ক্ষেত্রে বান্দার পরিমাপও দেখা যায়। আবার জমিনের আকর্ষণও দেখা যায়। ফলে উভয়ের মিলে ওজন বের হয়। জমিনের আকর্ষণ একটু বেশি। তাই এ-ক্ষেত্রে ওজন বেশি হয়। আর চাঁদের দেশের আকর্ষণক্ষমতা কম, তাই ওজন একটু কমে যায়। মঙ্গল গ্রহের আকর্ষণ ক্ষমতা অনেক বেশি হওয়ার কারণে সেখানে ওজন অনেক বেড়ে যায়। আর মহাশূন্যে মধ্য আকর্ষণ শক্তির কারণে কোনো দিকের আকর্ষণই প্রবল হয় না। তাই তাতে কোনো জিনিসেরই ওজন থাকে না। সব জিরো হয়ে যায়।

তো মহাশূন্যে একজন সুস্থসবল মানুষের ওজন জিরো হয়। কেন? এমন হয় কেন? আমরাও বলি, দেখুন, কাফের এমন বান্দা, যার মাঝে ঈমানের আকর্ষণক্ষমতা নেই। আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ ঈমানের আযমত প্রকাশ করবেন। বলবেন, দেখো! তোমার হৃদয়ে না আমার মহব্বত ছিল. না আমার প্রতি ঈমানি শক্তি ছিল। তোমার অন্তরে ঈমান তথা আকর্ষণক্ষমতা জিরো ছিল। তাই যত আমলই করা হোক তার ওজন জিরোই হবে।

وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا

'কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের আমলের কোনো রূপ ভারত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন না।'

তাদের আমল সেদিন ওজনহীন হয়ে যাবে।

মাপা হবে কোন জিনিস

এখানে ওলামায়ে কেরাম আরেকটি বিষয় আলোচনা করেছেন। কেয়ামতের দিন কোন জিনিসের পরিমাপ হবে। তো এ-ক্ষেত্রে তিন ধরনের বক্তব্য রয়েছে। কিছু রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝে আসে, আমল মাপা হবে। কেউ বলেন, আমলনামা মাপা হবে। আর কেউ-কেউ বলেন, খোদ আমলকারীকে মাপা হবে। যেমন– ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর গোড়ালি ছিল হালকাপাতলা। আর তার দুই সাথি বেশ সুস্থসবল ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই গোড়ালি আল্লাহর দরবারে এত ওজনদার যে, মিযানের পাল্লায় তা উহুদ পাহাড় থেকে বেশি ভারী হবে। তো তিন প্রকার রেওয়ায়াতই আছে।

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, তিন সূরতই হতে পারে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তো কেয়ামত দিবসের মালিক। একথাটা মাথায় রাখুন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ জজ হবেন না। কারণ, জজ নির্দিষ্ট নিয়মের ভেতর থেকে ফয়সালা দিতে হয়। নিজের থেকে কিছু করতে পারে না। আল্লাহ তো বরং কেয়ামতের দিনের মালিক! মালিকের ইখতিয়ার থাকে যে, চাই তিনি ইনসাফপূর্ণ হুকুম প্রদান করুন আর চাই তিনি তাঁর ফজল ও করমে অনুগ্রহসুলভ হুকুম দেন। তিনি যার আমল মাপতে চাইবেন, তার আমল মাপবেন, যার আমলনামা মাপতে চাইবেন, তার আমলনামা মাপবেন। আবার কোনো-কোনো বান্দাকেই পাল্লায় উঠিয়ে দেবেন।

মাআরেফে হাদীছ

ছাত্র ভাইয়েরা! এবার কিতাবটি খুলে দেখো। হাদীছটির দিকে তাকাও। হাদীছের মাআরেফকে গভীরভাবে উপলব্ধি করো। ইমাম বোখারি (রহ.) বলেছেন–

باب قول الله تعال

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَاِنَّ اَعْمَالَ بَنِىْ اٰدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوْزَنُ

এ পর্যন্ত তো ইবাদত। এবার মাআনি ও মাআরেফ তথা অর্থ ও জ্ঞাতব্য বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ করো।

ইরশাদ হচ্ছে, আমি কেয়ামতের দিন বনী আদমের আমল পরিমাপ করব। এ-ব্যাপারে পাকিস্তানের গ্র্যান্ড মুফতী হযরত শফী (রহ.) বড় আশ্চর্য একটি কথা বলেছেন–

যখনই তোমরা কোনো কাজ কর বা কোনো কথা বল, তখন বুঝে নাও, এসব একদিন কাঠগড়ার সম্মুখিন হবে। চাই সেই কাঠগড়া দুনিয়ার হোক বা আখেরাতের হোক। আমরা যে-কাজই করি বা যেকোনো কথা-ই বলি, সেই কথা বা কাজকে একদিন আদালতে দাঁড় করানো হবে। চাই তা দুনিয়ার আদালত হোক বা আখেরাতের আদালত হোক। তাই প্রত্যেক কাজেই আমরা আল্লাহর রিজা ও সন্তুষ্টির নিয়ত করা চাই যেন আমলটি আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়।

এ-ক্ষেত্রে হযরত আরেফি (রহ.) বড় আশ্চর্য কথা বলেছেন। তিনি বলেন, যখনই প্রভাতে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হবে এবং দু'আ পড়বে, তখন এই নিয়ত করে নেবে যে, আজ আমি যত আমল করব, তোমার রিজা ও সন্তুষ্টির জন্যই করব। তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তবিয়তে জিদ না আসবে, ততক্ষণ প্রত্যেক আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হয়েছে বোঝা যাবে। কারণ, সে তো নিয়ত করেই নিয়েছিল।

তো দেখুন, এটি কত সহজ আমল! যখনই সকালে ঘুম থেকে উঠবে, তখন এই দু'আটি পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি মৃত্যুলাভের পর আমাকে জীবিত করেছেন আর আর তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।'

তখন সাথে-সাথে এ নিয়তও করে নেবে যে, হে আল্লাহ! আজ আমি যে-আমলই করব, তোমার সন্তুষ্টির জন্যই করব। অনেক সময় আমরা কাজটি করার সময় নিয়ত করি না। তো যেহেতু নিয়ত করি না, পূর্ব থেকেই একটি আম নিয়ত যেহেতু আমাদের হয়ে যাবে, তখন তা-ই সকল আমলের জন্য নিয়ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে জীবনের অধিকাংশ আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তেই করা হয়ে যাবে। এবার ইমাম বোখারি (রহ.) বলছেন–

وَقَالَ مُجَاهِدُ الْقِسْطَاسُ–الْعَدْلُ بِالرُّوْمِیَةِ

القسطاس মানে العدل। এটি রোমান ভাষার শব্দ।

এখানে একটি কথা মাথায় রাখুন। কুরআনের কিছু শব্দ এমন আছে, যেগুলোর ব্যাপারে একথা বলা হয় যে, শব্দটি অন্য ভাষার। যেমন– আল্লামা সুয়ূতি (রহ.) একটি কিতাব লিখেছেন اَلْمُهَذَّبُ فِیْمَا وَقَعَ فِی الْقُرْآنِ مِنَ الْمُعَرَّبِ সেখানে কাজী সাজুদ্দীন সুবুকি ২৭টি শব্দ গণনা করেছেন, যেগুলো অনারব ভাষার শব্দ। ইবনে হাজ্‌র আসকালানি এ-ক্ষেত্রে ২৪টি শব্দের কথা বাড়িয়ে যুক্ত করেছেন। আল্লামা সুয়ূতি বলেছেন আরও ৬৯টির কথা। সর্বমোট ১২০টি শব্দ হয়। অর্থাৎ– কুরআন মাজীদে এমন একশত বিশটি শব্দ আছে, যেগুলোর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, এগুলো অনারবি শব্দ, যা আরবিতে ব্যবহার হয়েছে। এর একটি উৎকৃষ্ট জবাব প্রদান করেছেন ইমাম শাফেয়ি (রহ.)। তিনি বলেছেন–

لَا یُحِیْطُ بِاللُّغَةِ اِلَّا نَبِیٌّ

'ভাষার ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যতটুকু ধারণা আছে, অন্যদের ততটুকু নেই।'

সুতরাং এই যে সাধারণ মানুষ বলে যে, এটি আরবি ভাষার শব্দ নয় তাদের কথা সঠিক নয়। হ্যাঁ; বহু শব্দই তো এমন থাকতে পারে, যা কয়েক ভাষায় বা দুই ভাষায় ব্যবহার হতে পারে। যেমন– উর্দু ভাষায় বহু শব্দ এমন আছে, যা আরবিতে ব্যবহার হয়। যেমন– কিতাব, কলম, ইনসান, জিসিম, কুরসী ইত্যাদি। এগুলো তো কুরআনেরই শব্দ। এসব তো আমাদের ভাষায়ও আছে। তো ভাষায় কিন্তু শব্দ সংযোগ হয়েই চলছে। তবে আরবরা কোনো শব্দ তখনই ব্যবহার করে, যখন শব্দটি তাদের ভাষাগত নিয়মে গঠিত হয় বা ভাষাগত অবকাঠামোর আওতায় পড়ে।

যেমন– আরবিতে فعل যে শব্দটি আছে, তা মূলত ফারসি ভাষার শব্দ پیل থেকে এসেছে, যার অর্থ হাতি। আরবরা শব্দটিকে সামান্য পরিবর্তন করে নিজেদের ভাষায় সংযোজন করে নিয়েছে। তো বোঝা গেল, কোনো শব্দ যখন আরবরা তাদের ভাষার সাথে মিলিয়ে নেয় এবং আমভাবে শব্দটিকে গ্রহণ করে নেয়, তখন তা আর অনারব থাকে না, তা হয়ে যায় আরবি ভাষারই কোনো শব্দ।

এই সত্যায়ন তো খোদ আল্লাহই করে দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ছটি সূরায় قرانا عربيا বলেছেন। আর তিনটি সূরায় لسان عربي বলেছেন। সামনে দেখো ইবারত। وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ দেখো এখানের قسط শব্দটি দু'ভাবে ব্যবহার হচ্ছে। একটি হচ্ছে قِسْطٌ আরেকটি হচ্ছে قِسْطٌ (কাফ পেশযুক্ত)। قِسْطٌ অর্থ ইনসাফ। আর قُسْطٌ অর্থ না-ইনসাফি। তাই مُقْسِطٌ শব্দটি এসেছে قِسْطٌ থেকে। তার অর্থ হবে আদেল বা ন্যায়পরায়ণ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করছেন–

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের মহব্বত করেন।'[১]

এমনিভাবে হাদীছে পাকেও শব্দটি এসেছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে–

يَنْزِلُ حَكَمًا مُقْسِطًا

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৪২

আবার আসমাউল হুসনায় আল্লাহর একটি নাম আছে الْمُقْسِطُ । তবে قُسْطٌ শব্দটি আবার বিপরীত তথা জুলুম অর্থে ব্যবহার হয়। قاسط শব্দের অর্থ জালেম। কুরআনে শব্দটি আল্লাহ তা'আলা ব্যবহার করেছেন–

فَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

'আর যারা কাসেত, তারা হলো জাহান্নামের ইন্ধন।'[১]

এখানে قاسط শব্দটি জুলুম তথা জালেম অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর مقسط এর অর্থ ন্যায়পরায়ণ।

ইরশাদুল বোখারীতে আল্লামা কাসতল্লানি (রহ.) একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাযি.)কে গ্রেফতার করে ফেলল। সে অনেক বড় প্রভাবশালী ছিল যে, যে তার মর্জি মোতাবেক চলতে অস্বীকৃতি জানায়, তার ব্যাপারে সে কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়। যখন সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাযি.)কে সামনে আনা হলো, তাকে সে জিজ্ঞেস করল

مَاذَا تَقُوْلُ فِيَّ

'আমার ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী?'

সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাযি.) বললেন–

قَاسِطٌ عَادِلٌ

লোকেরা তো পেরেশান হয়ে গেল যে, আরে! হযরত তো দেখছি হাজ্জাজের তারীফ করে ফেললেন! হাজ্জাজ খোদ আরবি ভাষায় পণ্ডিত ছিল। সে বলতে লাগল–

وَيْلَكُمْ لَمْ تَفْهَمُوْا جَعَلَنِيْ جَائِرًا كَافِرًا

'আরে! তোমরা তো বোঝনি। সে তো আমাকে জালেম ও কাফের সাব্যস্ত করে দিয়েছে!'

أَلَمْ تَسْمَعُوْا قَوْلَهُ تَعَالٰى – فَأَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

وَقَوْلِهِ تَعَالٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ

মতনের বিশ্লেষণ

হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে, আহমাদ ইবনে আসকার থেকে ইমাম বোখারি (রহ.) রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি মুহাম্মাদ ইবনে ফুজাইল থেকে।

---

১. সূরা জিন : আয়াত ১৫

তিনি আম্মারাহ থেকে। তিনি আবুযারা' থেকে। তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন–

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ

كلمتان এখানে كلمتان দ্বারা আরবি ভাষা ব্যাকরণিক কালেমা উদ্দেশ্য নয়। তার দ্বারা শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য। শব্দটি দ্বি-বচন। এর দ্বারা শব্দ উদ্দেশ্য। বাকি দুটি বাক্য, বাক্যাংশ উদ্দেশ্য। এখানে كلمتان দ্বারা এক বাক্যের বাক্যাংশকে বোঝানো হয়েছে। এক অংশ হচ্ছে سبحان الله وبحمده আর অন্যটি হচ্ছে سبحان الله العظيم। তো প্রথমে বলা হয়েছে كلمتان। তারপর বলা হয়েছে حبيبتان আল্লাহর কাছে কালেমাদুটি বড়ই প্রিয়। কেন উভয়টি এত প্রিয়? মানুষের একটা সাধারণ অভ্যাস হচ্ছে, সে সর্বদা কামনা করে, কোনো অকল্যাণ ও মন্দ আমার দিকে সম্পৃক্ত না করা হোক। আমাকে সম্পৃক্ত করা হোক ভালোর সাথে, মঙ্গলের সাথে এবং কল্যাণের সাথে।

তো মানুষ যেমনটি চায় আল্লাহ তা'আলাও তেমনই চান। কোনো খারাপতা, কোনো মন্দ আমার দিকে সম্পৃক্ত না করা হোক। যা কিছু ভালো আছে, সুন্দর আছে এবং সত্য আছে, তা-ই আমার সাথে সম্পৃক্ত করা হোক। তাই এই শান আল্লাহরই এবং এমনটি আল্লাহকেই মানায়। যেমনটি বলা হয়েছে মুসলিম শরীফের বর্ণনায়। ইরশাদ হচ্ছে–

اِنَّ اَحَبَّ الْكَلَامِ اِلَى اللهِ اَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ وَسُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

এই উভয় কালেমা আল্লাহর পছন্দ হলো কেন? কারণ, এতে আল্লাহর পবিত্রতার ঘোষণা রয়েছে। আল্লাহ প্রত্যেক খারাপ থেকে, মন্দ থেকে পবিত্র। সর্বগুণে তিনি গুণান্বিত। আর এজন্যও আল্লাহর কাছে এই কালেমা প্রিয় যে, এতে আল্লাহর আযমত প্রকাশ পায়। ইরশাদ হচ্ছে–

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ

এখানে الى الرحمن বলা হয়েছে الى الله বলা হয়নি। এর মাঝে বড় একটি হেকমত নিহিত। রহমান এমন এক সত্তাকে বলে, যিনি এমন দয়ালু যে, প্রাপককে তার পাওনার চেয়ে অধিক দেন। অল্প কর্মকারীকে বেশি বিনিময় দেন। আল্লাহকে এজন্য রহমান বলা হয় যে, কারণ, আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত, বান্দার সামান্য আমলেও প্রতিদান অধিক দিয়ে থাকেন। তাই তাঁর সিফাতি

নাম ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'রহমানের পছন্দ'। আর খোদ রহমান যখন পছন্দই করে ফেলবেন, তখন এর বিনিময় কত বেশি দান করবেন? হাদীছ পাকে ইরশাদ হয়েছে–

سُبْحَانَ اللهِ نِصْفُ الْمِيْزَانِ

'সুবহানাল্লাহ মিযানের অর্ধেক।'

যে-বান্দা একবার সুবহানাল্লাহ পড়বে, সে মিযানের অর্ধেক অংশ পূর্ণ করল।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ

'আর আলহাম্‌দুলিল্লাহ তা পূর্ণ করে দেয়।'

অল্প আমলে অধিক প্রতিদান দেওয়া রহমানের বৈশিষ্ট্য। এবার হাদীছের ভাষ্য ও বাচনভঙ্গির সৌন্দর্য দেখুন। কত গভীর থেকে চিন্তা করে رحمن শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। كلمتان মানে দুটি বাক্য حبيبتان মানে বাক্যদুটি আল্লাহর প্রিয় ও পছন্দনীয়। কারণ, কালেমাদুটিতে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার ঘোষণা রয়েছে এবং আল্লাহর গুণাবলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর الى الرحمن এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, رحمن তো এমন সত্তা, যিনি এমনিতেই ছোট আমলেও অনেক বেশি দান করেন।

এবার সামনের দিকে দেখুন–

خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ

'উচ্চারণে বেশ সহজ।'

উচ্চারণে সহজ মানে এটা হালকাভাবে সহজে পাঠ করা যায়। শব্দ কম। বাক্য ছোট। দেখছ না سبحان الله وبحمده তিনটি মাত্র শব্দ। তারপর আছে سبحان الله العظيم তিনটি মাত্র শব্দ। শব্দ কম। বাক্য ছোট। তাই তা পাঠ করাও বেশ সহজ। সেজন্যেই বলা হয়েছে–

خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ

কিন্তু একটু গভীরে প্রবেশ করুন। একটু গভীর থেকে চিন্তা করুন।

কেরাত বিশেষজ্ঞগণ তো শব্দের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করে। আমরা এখানে তাজবীদের দৃষ্টিকোণ থেকে সামান্য আলোচনা করি।

কিছু হরফ আছে, যেগুলোকে حروف استعلا বলা হয়। মানে এমন হরফ, যেগুলো ভরাট হয়ে উচ্চারিত হয়। আদায় করার সময় মোটা হয়ে আদায় হয়। যেমন ض এমন হরফের সমষ্টি হচ্ছে خص ضغط قظ এসকল হরফকে حروف استعلاء বলা হয়। এবার দেখুন, কোন হরফ এখানে ব্যবহার হয়েছে। عظيم শব্দে আছে ظ তো এখানে একটি পাওয়া গেছে حرف استعلاء বোঝা গেল, সহজ হরফ বেশি। কঠিন হরফ মাত্র একটি।

কিছু হরফ আছে যেগুলোকে حروف شدة বলা হয়। যেগুলোর সমষ্টি হলো اجد قط بكت। এখানের শুধু ب হরফটি এসেছে। বাকি কোনো হরফই কঠিন হরফ থেকে ব্যবহার করা হয়নি। حروف شدة বড় কম ব্যবহার হয়েছে।

সাধারণ নিয়ম আছে اسماء এর মোকাবেলায় افعال – ثقيل হয়ে থাকে। অথচ এই দুই বাক্যে কোনো ক্রিয়া বা فعل ই নেই। আবার যে-শব্দটি غير منصرف হয়, তা বেশি কঠিন হয়। এখানে এমন হরফও নেই। আর দেখুন, এখানে এই কঠিন হরফগুলোর একটিও নেই। এখানে ث ও নেই ش ও নেই।

তো দেখুন, حروف استعلاء এর হরফও নেই حروف شدة এর হরফও নেই। কোনো افعال ও নেই। আবার اسماء غير منصرف ও নেই। حروف ثقيله ও নেই। তারপর আরও একটি মজার বিষয় দেখুন। তিনটি হরফ এমন আছে, যেগুলোকে حرف لين বলা হয়। বড় নরমভাবে আদায় হয়। ا و ى। সবগুলোই কিন্তু এখানে ব্যবহার হয়েছে। বোঝা গেল, বাস্তবিক পক্ষেই প্রিয়নবীর পাক জবানে যে-কালামগুলো উচ্চারিত হয়েছে, তা خفيفتان على اللسان সর্বাবস্থায় ও সর্বরকমে উচ্চারণে সহজ।

ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ

'মিযানের পাল্লায় ভারী।'

এখানে ছাত্রদের মনে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বলায় এত সহজ অথচ ওজনে এতই ভারী? হ্যাঁ; সহজ একটি দৃষ্টান্ত দেখুন, মাখন খাওয়া কত সহজ; অথচ তা উদরে গিয়ে কেমন ভার হয়ে যায়। হজমই হতে চায় না। এমন বহু জিনিস আছে। খেতে তো সহজ; কিন্তু পেটে গিয়ে বেশ ভারী হয়ে যায়। এমনিভাবে উচ্চারণে সহজ ও হালকা, তবে ওজনে বেশ ভারী। তার ছাওয়াব অনেক বেশি। তাই বলা হয়েছে–

ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ

এবার প্রশ্ন জাগে, কতটুকু ভারী হবে? একথা আল্লাহই ভালো জানেন। কেয়ামতের দিন বান্দা বুঝতে পারবে, سبحان الله وبحمده বলার ফলে কিংবা سبحان الله العظيم বলার কারণে কী অফুরন্ত ছাওয়াব অর্জিত হয়েছে। তাই তো আল্লামা কাশ্মিরি (রহ.) এক আশ্চর্য কথা বলেছেন যে, জান্নাতে মুমিনের জন্য সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হবে মাওলা পাকের দিদার। আর দিদারের পর যে-বিষয়টি মুমিনের জন্য সবচেয়ে মজার ও স্বাদের জিনিস হবে, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতিদের প্রত্যেক বস্তুর বাস্তবতা নসিব করবেন। সকল বস্তুর তত্ত্ব জানা হয়ে যাবে। নবীজি দু'আ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ كَمَا هِيَ

'হে আল্লাহ! আমাকে বস্তুরাশির স্বরূপ দেখিয়ে দিন।'

সেদিন বোঝা যাবে, দুনিয়ায় যে বলা হতো, মিযানের পাল্লায় ভারী হবে এর বাস্তবতা কী? তো এই বাস্তবতা-ই কেয়ামতের দিন আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। কারী তায়্যেব (রহ.) বলেছেন, মিযানে ভারী হওয়ার তিনটি বুনিয়াদ আছে। سبحان الله এর মধ্যে আল্লাহর পবিত্রতার ঘোষণা রয়েছে। وبحمده এর মধ্যে প্রশংসা রয়েছে এবং العظيم এর মধ্যে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা রয়েছে। আর যেহেতু এখানে তিনটি বিষয়ই একত্রিত হয়ে গেছে– পবিত্রতারও বয়ান হলো। তারিফেরও বয়ান হলো। আবার আযমতও বিবৃত হলো। তো যখন কাউকে বড় বলা হয়, তার বড়ত্বের ঘোষণা দেওয়া হয়, তখন দাতা বেশ বড় কিছু দান করেন। দুনিয়ার ফকিররা দাতার সামনে তার গুণ বর্ণনা করে। তারাও বোঝে, দাতার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলে বেশি পাওয়া যাবে। আর এখানেও তো তেমনি বড়ত্ব ও গুণাবলির ঘোষণা আছে। তাই তার দানও তেমনই হবে। কারণ, তিনি তো বাস্তবেও বড়ই। আর আল্লাহ তো অল্প দিতেই পারেন না। সুতরাং যখন তিনি দেবেন, তখন এত-এত দেবেন যে, ثقيلتان في الميزان ওজনে তা অনেক ভারী হবে। মহান বাদশাহ আল্লাহর দান তো বড়ই হবে। তাঁর দান তো তাঁর শান অনুযায়ী-ই হবে।

শিরোনাম সম্পর্কে কিছু তাত্ত্বিক কথা

ইমাম বোখারি শিরোনামে ওয্নে আমলের যে-আলোচনা করেছেন, তাতে তিনি আলোচ্য বিষয় বলেছেন। তার বাবের সাথে ثقيلتان শব্দের মাধ্যমে মিল সৃষ্টি হয়। তিনি চিন্তা করেছেন, কোনো জিনিস যদি ভারী হতে

হয়, তাহলে তার ওজন নিশ্চয় হবে। সে হিসেবে তিনি ওয্নে আমলের কথা বলে শিরোনাম তৈরি করেছেন। তিনি এ-ও বলেছেন যে, যখন মানুষের মৌখিক ইবাদাত মাপা হবে, তখন তো শারীরিক ইবাদাতও মাপা হবে।

ছন্দবদ্ধ ও মধুর বাণী

আমরা সুন্দর করে হাদীছটি তেলাওয়াত করলে এভাবে পড়তে হবে–

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ

দেখো, কত চমৎকার ছন্দবদ্ধ কথা। সুমধুর বাণী। কী অপূর্ব মিল এই হাদীছের অঙ্গে-অঙ্গে। কিছু-কিছু ছন্দবদ্ধ কথা হৃদয়েও ছন্দ তোলে। অবশ্য কিছু ছন্দ বিরক্তিও সৃষ্টি করে। বিরক্তি সৃষ্টিকারী ছন্দ কোনটি তা চেনার দুটি আলামত আছে। এক. কৃত্রিমতার সাথে কথাটি বলা হবে। দুই. তাতে কোনো ভ্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

যদি এই দুটি বিষয় থাকে, তবে বুঝবে, এই ছন্দ মাকরূহ। এই ছন্দ বিরক্তিকর। আর যদি অকৃত্রিমভাবে কথাটি ব্যক্ত করা হয়, তাহলে কথাটি এমনিতেই ভালো শোনায়। তখন সেই কথাকে বলা হয় সুমধুর বাণী। আর নবীজির এই যে কথা এর মাঝে না কৃত্রিমতা আছে, না ভ্রান্তির অবকাশ আছে। অকৃত্রিমভাবে বলে গেছেন আমাদের নবীজি সত্য ও সুন্দর কথাগুলো। তাই তো নবীজির কথা হয়েছে এত সুমধুর, এত সুগভীর।

তোমরা হয়তো প্রশ্ন করতে পার, এমন ছন্দময় সুমধুর কথা আরও আছে কী? বলব, হ্যাঁ; আছে, বহু আছে। হাদীছের সুবিশাল সম্ভার খুলে দেখো। কুরআনের সুমধুর বাণীর দিকে তাকাও। কুরআনের শেষ সূরাটির দিকেই একটু তাকিয়ে দেখো–

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ إِلٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۝٤
الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

'বলো, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, যিনি মানুষের অধিপতি, যিনি মানুষের ইলাহ আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে– জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।'[১]

---

১. সূরা নাস : আয়াত ১-৬

সুবহানাল্লাহ! কতই-না সুমধুর বাণী। কত মজাদার কালাম! সুবিন্যস্ত তাসবীহদানার মতো সাজানো বাণী।

অকৃত্রিমভাবে কেমন করে বয়ে চলছে ভাষার ছন্দ। এ-ই তো ভাষার সৌন্দর্য। দেখো, এবার আমরা হাদীছের সেই কালেমাদুটি নিয়ে আলোচনা করব।

سُبْحَانَ اللهِ

শব্দটির অর্থ হচ্ছে আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র সকল অসম্পূর্ণতা থেকে। সকল দোষ, দুর্বলতা ও মন্দ থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র। ছাত্ররা! এখানে সুন্দর একটি কথা ভালো করে শোনো। 'সুবহানাল্লাহ' বলে আমরা একথার ঘোষণা দেই যে, হে আল্লাহ! আপনি সর্বপ্রকার দোষত্রুটি থেকে পবিত্র। তো আল্লাহর দরবারে একটি নিয়ম আছে। নিয়মটির নাম جزاء من جنس العمل অর্থাৎ– যেমন কর্ম তেমন ফল। এই নীতি আল্লাহর। যখন বান্দা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, জবাবে আল্লাহ তা'আলাও বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার পবিত্রতা বর্ণনা করছ। এর বিনিময়ে আমি তোমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে দেব। ফলে এই যিকির বান্দার আত্মাকে, বান্দার হৃদয়কে, বান্দার মনকে আলোকিত করে দেয়। দোষ থেকে তাকে পবিত্র করে দেন।

এর একটি দলিল শুনুন। যখন আমরা একথা বললাম যে, আল্লাহ দিলকে ধুয়ে দেন, এখন তো এ-ব্যাপারে একটি দলিল দিতে হয়। তো শুনুন দলিল। হাদীছ শরীফে নবীজি ইরশাদ করছেন–

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

'যে-বান্দা দিনে শতবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহাম্‌দিহী' বলে, আল্লাহ তার ভুলভ্রান্তিগুলো মাপ করে দেন। যদিও সেই গুনা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।'

তো যখন ভুল ও গুনাহকে মিটিয়ে দেওয়া হয়, তখন তো গুনাহের দাগও মুছে যায়। ব্যস আত্মাও পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। বোঝা গেল, মানুষের দিল ধৌত করা হয়।

তাসবীহের গুরুত্ব

তাসবীহ বড়ই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তা'আলা ফাতহে মক্কার যে-সুসংবাদ দিয়েছেন, সুলহে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী ঈমানদারদের যে-

সুসংবাদ জুটেছে, তারপর দলে-দলে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকা কত বড় নেয়ামত! আল্লাহর কত বড় ইহসান! সেই অনুগ্রহের কথা আল্লাহ তা'আলা যেখানে আলোচনা করেছেন, সেখানে বলেছেন–

يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا

'তারা দলে-দলে ইসলামে প্রবেশ করবে।'

এই আয়াতটির পরেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

আল্লাহর তাসবীহ বয়ান করুন।

এতসব নেয়ামতের পর রবের তাসবীহের কথা বলা হয়েছে। তাই যখনই কোনো নেয়ামত জুটবে, তখনই মানুষ তাসবীহ বয়ান করবে। কুরআনুল কারীমে ত্রিশটি স্থানে এমন শব্দ ব্যবহার হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে سبح لله কোথায় আছে يسبح কোনো স্থানে আছে فسبح কোথাও আছে سبحان নানারকম আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে একটি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে যে, তাসবীহ আদায় করো। ত্রিশটি স্থানে এমনটি বলা হয়েছে। তাই এই যিকির, এই তাসবীহ বান্দার জন্য বড় উপকারী।

وَبِحَمْدِهٖ

শব্দটিতে আল্লাহ তা'আলার তারিফ রয়েছে। এখানে আল্লাহর কামালাত কে ইজহার করা হয়েছে। আল্লাহর পূর্ণতাকে প্রকাশ করা হয়েছে। শব্দটি কেন আনা হলো? হ্যাঁ এজন্য আনা হয়েছে যে, আগে তো আল্লাহর পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে। এটি কিন্তু আযমত জাহির করার জন্য যথেষ্ট নয়। মনে করুন, কেউ কোনো বাদশাহর ব্যাপারে বলল, এই বাদশাহ চামার নয়। এতেই বাদশাহর আযমত প্রকাশ পায় না। বরং বাদশাহর প্রশংসার দিকও আলোচনা করতে হয়।

তেমনি আল্লাহ দোষক্রটিমুক্ত এ কথা বলার পর যখন বলবে وبحمده অর্থাৎ– আল্লাহর প্রশংসা যখন করবে, তখনই আল্লাহর আযমত পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে। তাই কথাকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্যই وبحمده শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

তাই বলা হয়েছে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ

অর্থাৎ– আল্লাহ এবং সব তারীফ তারই জন্য।

এখানে سبحان الله ও بحمده এর মাঝে واو আনা হয়েছে। এ নিয়ে মুহাদ্দিছীনে কেরাম বেশ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কেউ বলেন, واو عاطف কেউ বলেন, واو حاليه। তবে সারকথা এই যে, এখানে واو টির মতলব এই নয় যে, কেউ মজলিসে এসে বলে দিল, বাদশাহ দোষমুক্ত। তো একথা বললেই হয় না। সাথে-সাথে বাদশাহর ভালো কাজটির কথাও বলতে হয়। না হয় বাদশাহ নারাজ হন। তাই বলতে হয়, হে বাদশাহ আপনি দোষমুক্ত এমতাবস্থায় যে, আপনি এই-এই মহাকর্ম সাধন করেছেন। তাই এখানে واو حاليه আনতে হয়।

যেন বলা হয়, হে আল্লাহ! আপনি সমস্ত অসম্পূর্ণতা, সমস্ত দোষত্রুটি থেকে পবিত্র এমতাবস্তায় যে, আমি স্বীকার করছি, আপনি বড়ই শানওয়ালা। সমস্ত প্রশংসা আপনারই। তাই বলা হলো–

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ

এখানে এই নীতিটি মনে রাখতে হবে যে, আগে পবিত্রতার ঘোষণা দিতে হয়; তারপরই প্রশংসা করা হয়। কারণ, আগে ঝং দূর করা হয়; তারপরই রং লাগানো হয়। একে বলা হয় اَلتَّخْلِيَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى التَّحْلِيَةِ এরই ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণায় سبحان الله বলা হয়েছে আগে। তারপরই আনা হয়েছে প্রশংসামুলক শব্দ وبحمده স্পষ্ট হয়ে গেল কেন سبحان الله আগে আনা হলো এবং তারপর وبحمده বলা হলো।

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

এবার দ্বিতীয় বাক্যটির দিকে তাকাও। এখানে سبحان الله শব্দটি ঠিক রেখে সাথে العظيم বাড়ানো হয়েছে। বাক্যে কোনো বিষয় বহাল রাখলে তার গুরুত্ব বোঝানো হয় যে, এ বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। বোঝা গেল, আল্লাহ তা'আলা শেরেক এত অপছন্দ করেন এবং এর থেকে পবিত্রতাকে এত পছন্দ করেন যে, যদিও কথক একবার বলেছে سبحان الله এখন আবার বলুক। এটি আল্লাহ পছন্দ করেন। তো سبحان الله শব্দটি দ্বিতীয় বাক্যেও বহাল রাখা হয়েছে। তবে بحمده এর স্থলে আনা হয়েছে العظيم শব্দটি। তবে মুহাদ্দিছীন বলেছেন, العظيم শব্দের মাঝেও হাম্‌দ রয়েছে। যখন আল্লাহকে বড় বলা হলো, তখন তাতে এমনিতেই হাম্‌দ আদায় হয়ে যায়। সেজন্যই العظيم শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আশা ও শঙ্কা

উল্লিখিত বাক্যদুটিতে আল্লাহ তা'আলার দুটি গুণবাচক নাম আলোচিত হয়েছে। একটি আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের الرحمن নাম, আরেকটি তাঁর العظيم নাম। এগুলো আসমায়ে হুসনার অন্তর্ভুক্ত। তো এখানে দুটি গুণ এসেছে। উভয় নামই বেশ প্রসিদ্ধ। তবে رحمن নাম সামনে এলেই, রহমান নাম শুনলেই বান্দার মনে আশা জাগে, যখন তিনি আজর ও বিনিময় দেবেন, তিনি তখন বাড়িয়ে দেবেন। তাই নেক বান্দারা তো আশায় বুক বাঁধেনই। ফাসেক-ফাজের গুনাহগার বান্দারাও আশায় বুক বাঁধেন। সকলেই ভাবে তিনি رحمن। তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। সামান্য আমলের অধিক বিনিময় দেবেন। এখানে رحمن শব্দ ব্যবহার করলে কথা ভিন্ন দিকে চলে যেত। ইরশাদ হচ্ছে–

كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا

'আল্লাহ মুমিনদের জন্য দয়ালু।'[১]

কারণ, রহীম-এর মুআমালা ঈমানওয়ালাদের সাথে। আর রাহমান সেটি তো সবার জন্য। আপন-পর সবার জন্য রাহমান। তিনি দুনিয়ায় আনুগত্যকারীদেরও দিচ্ছেন, অবাধ্যদেরও দিচ্ছেন। এটি করছেন রাহমান গুণের কারণে। এতে অন্তরে আশা জাগে। মানুষ বুক বাঁধতে সাহস করে। ভাবে, রহমান; তিনি তো আমাদের প্রতিও মেহেরবানি করবেন। কিন্তু যখন عظيم শব্দ শোনে, তখন আল্লাহর আযমত ও বড়ত্বের কথা শুনে অন্তর কেঁপে ওঠে, মনে ভয় জাগে।

তো বোঝা গেল, এখানে দু-ধরনের দুটি শব্দের মাধ্যমে পাঠকবৃন্দের মনে আশাও জেগে ওঠে, আবার আশঙ্কা ও জাগে। একইভাবে বলা হয়েছে–

يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ

'তারা আল্লাহর রহমতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে।'[২]

তো দেখুন, উল্লিখিত আসমাউল হুসনাদুটির মাধ্যমে কুরআনের আয়াতটি বোঝা সহজ হয়ে যাচ্ছে। ইবনে রজব হাম্বলি (রহ.) বলেছেন, 'জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম' গ্রন্থে ইবনে সীরীন (রহ.) এই কালেমাদুটির কথা বলতেন–

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৪৩

২. সূরা বানী ইসরাইল : আয়াত ৫৭

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

তোমরা হয়তো প্রশ্ন করতে পার, ইমাম বোখারি (রহ.) কেন এই তাসবীহের হাদীছটি শেষে আনলেন? শোনো, একে বলা হয় براعت اختتام। মানে كمال এর পূর্ণাঙ্গতা। অর্থাৎ– সমাপ্তির পূর্ণাঙ্গতা। ইমাম বোখারি (রহ.) এই হাদীছটি শেষে আনার মাধ্যমে একথা বলতে চেয়েছেন যে, কিতাবটি যেখানেই পড়বে, সেটি তো একটি মজলিসেই হবে। অন্য মজলিসের সমাপ্তিতে নবীজির সুন্নত হচ্ছে তাসবীহ বয়ান করা।

তাই তো নবীজি ইরশাদ করেছেন–

مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهٗ فَقَالَ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْمَ مِنْ مَّجْلِسِهٖ ذَالِكَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ اِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهٗ مَا لَغَطَ فِيْ مَجْلِسِ ذَالِكَ

'যেব্যক্তি কোনো মজলিসে বসে আর সেই মজলিসে ভুল হয় অনেক। তারপর সে তার সেই মজলিস থেকে ওঠার পূর্বে যদি দু'আটি পড়ে, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।'

তাই ইমাম বোখারি তাঁর কিতাবের শেষে এই হাদীছটি এজন্য নিয়েছেন যে, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, আমরা এই মজলিসে যা ভুল করেছি, আমরা যদি হাদীছ মোতাবেক তাসবীহ বয়ান করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন।

এর মাঝে আরেকটি হেকমত আছে। তা হলো উল্লিখিত কালেমাতে আল্লাহর তারিফ করা হয়েছে আর এই হাম্‌দ ও তারিফ মুমিনের শেষ আমল হলো। আর এই আমল আল্লাহর এত পছন্দনীয় যে, আল্লাহ হাম্‌দ দ্বারা তাঁর কালামের সূচনা করেছেন। কুরআনের প্রথম শব্দ الحمد।

আর মুমিন যখন জান্নাতে যাবে, তখন তাদের শেষ আমলটি হবে হাম্‌দ।

وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ইমামা বোখারি তাঁর কিতাবের সর্বশেষ কথা হাম্‌দের মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন।

জামাল ও জালালের মিশ্রণ

ইমাম বোখারি (রহ.) তাসবীহের যে কালেমা এই হাদীছে উল্লেখ করেছেন, তাতে একটি দিক এই যে, বাক্যদুটিতে আল্লাহর দুটি নাম ব্যবহার করা হয়েছে। একটি رحمن আরেকটি عظيم। এখানে رحمن শব্দটি আল্লাহর صفة جمال এর দিকে ইঙ্গিত করে। আর عظيم শব্দটি صفت جلال এর দিকে ইঙ্গিত করে। جمال দ্বারা মহব্বত তৈরি হয় আর جلال দ্বারা ভয় সৃষ্টি হয়। আর মহব্বত ও খাওফ তথা ভয় ও ভালোবাসার মিশ্ররূপকে বলা হয় خشيت। অবশ্য এর অর্থও ভয়। তবে خوف ও خشيت এর মাঝে ব্যবধান আছে। خوف বলা হয়, কারও ক্ষতি থেকে ভয় করা। যেমন– সাপ থেকে ভয় করা। আবার আরেকটি হচ্ছে কাউকে মহব্বত করার কারণে সে নারাজ হয়ে যাবে এই ভয় করা। একই অর্থ خشيت এরও।

দেখো, বাঘের ভয়ের ক্ষেত্রে তোমার মাঝে বাঘের প্রতি কোনো রূপ মহব্বত থাকে না। আবার বড় কোনো ব্যক্তি যেন তোমার প্রতি নারাজ হয়ে না যান, সেই ভয় করার সাথে-সাথে সেই বড় ব্যক্তির প্রতি তোমার অবশ্যই কিছু-না-কিছু প্রেমবোধ থাকে। তো মহব্বত এবং خوف ও ভয়মিশ্রিত হয়। তখন তাকে বলা হবে خشيت। তালেবে এলমের এই خشيت-ই অর্জন করা উচিত। রব্বে কারীম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরা-ই তাঁকে ভয় করে।'[১]

তো ইমাম বোখারি যেন বলতে চাচ্ছেন, তালেবে ইল্‌মদের যেমন ইল্‌মের পথে অগ্রসর হতে থাকা উচিত, তেমনি আল্লাহর খাশিয়াতেও অগ্রসর হতে থাকা কর্তব্য। খাশিয়াত তথা ভয় ছাড়া যে ইল্‌ম অর্জিত হবে, তা নাফে, তথা উপকারী হবে না। তাই ইল্‌মে যত অগ্রসর হবে, খাশিয়াতেও ততখানি অগ্রসর হতে হবে।

প্রথম ও শেষ হাদীছের মাঝে সম্পর্ক

প্রথম ও শেষ হাদীছটির দিকে ভালো করে দৃষ্টি দাও। তাতে তুমি বেশ কটি সূক্ষ্ম বিষয় দেখতে পাবে।

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ২৮

একটি বিষয় এই যে, হাদীছটি তিনটি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হচ্ছে এই কিতাবুত তাওহীদের মধ্যে, যেটি আমরা আজ পড়লাম। এখানে এটি বর্ণিত হয়েছে আহমদ ইবনে ইসহাক (রহ.) থেকে।

আরেকটি আছে كتاب الدعوات এর মধ্যে। সেটি যুহাইর ইবনে হারব থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আরেকটি হচ্ছে كتاب الايمان والنزول এর মধ্যে। এটি বর্ণিত হয়েছে কুতাইবা ইবনে সাঈদ থেকে।

তো হাদীছটি তিনটি স্থানে লিখিত হয়েছে। তবে তিনটির রাবী-ই পৃথক-পৃথক ব্যক্তি। আর আহমদ ইবনে আশকাব (রহ.)-এর বর্ণনাটি শেষে এনেছেন। এখন দেখুন, বোখারির প্রথম হাদীছ বর্ণনাকারীর নাম হুমাইদি (রহ.) আর শেষ হাদীছটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন আহমদ। আর احمد নামের মাদ্দা আর حميدى নামের মাদ্দা এক। তো শুরুতেও حمد এল, শেষেও حمد এল। কিন্তু যদি বোখারি (রহ.) যদি এই হাদীছের দুই রেওয়ায়াতের কোনো একটি বর্ণনা করতেন, তাহলে এই মিলটুকু সৃষ্টি হতো না। এটিই আল্লাহর দীন। আল্লাহ তাঁর অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন যে, এই রেওয়ায়াতটি শেষে লিখো। তাহলে তোমার কিতাবের একটি সৌন্দর্য বেড়ে যাবে। এতে শুরু ও শেষের সাথে মিল সৃষ্টি হয়ে যাবে।

আল্লামা নাছেরুদ্দীন আল মুতাওয়ারী লিখেছেন, ইমাম বোখারি তাঁর কিতাবের শুরুতে এখলাছে নিয়তের হাদীছ এনেছেন এবং শেষে এনেছেন তাসবীহের হাদীছ। উভয়টি বিষয়ই সুন্নত। মানুষ আমলের মধ্যে এখলাছের নিয়ত পয়দা করবে আর আমলের শেষে আল্লাহর তাসবীহ বয়ান করবে। ইমাম বোখারি সুন্নাতের অনুসরণ করেছেন।

আরেকটি কথা বলেছেন হযরত কারী তায়্যেব (রহ.)। শুরুতে এখলাছের হাদীছ আনা হয়েছে। আর শেষে আবদিয়াত ও বন্দেগির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর শানের ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। বোখারি থেকে আমাদের এ-বিষয়টি শেখা উচিত যে, আমরা বান্দা। আল্লাহর হুকুম পালন করা আমাদের কাজ। আমাদের রব তো আল্লাহই।

সনদের দিকটি দেখুন। এখানের প্রথম হাদীছটি হযরত ওমর (রাযি.) থেকে রেওয়ায়াত করা হয়েছে। একে সনদের দিক থেকে 'গারীব' বলা হয়। আর শেষের যে-হাদীছটি আছে তাকেও সনদের দিক থেকে 'গারীব' বলা হয়। তো ইমাম বোখারি শুরুতে যে-হাদীছটি এনেছেন, তা-ও সনদের দিক

থেকে 'গারীব' আবার শেষে যে-হাদীছটি এনেছেন, সেটিও সনদের দিক থেকে 'গারীব'। যেন তিনি তালেবুল ইল্‌মকে এই বার্তা দিচ্ছেন যে,

بَدَاءَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا سَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ

'ইসলাম শুরুতেও গারীব তথা অপরিচিত ছিল, আবার অচিরেই অপরিচিত হয়ে যাবে। কাজেই 'গারীব'দের জন্য সুসংবাদ।'

কারণ, ছাত্ররা তো পরবাসী-ই হয়ে থাকে। ইল্‌মের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তারা মা-বাবাকে ছেড়েছে, স্ত্রী-বাচ্চা ছেড়েছে, দেশ ও সমাজ ছেড়েছে। ইল্‌মের অন্বেষণে তোমরা নানা জায়গা থেকে এসে এখানে জড়ো হয়েছ। আলেম হওয়ার জন্য এসেছ।

সর্বশেষ বার্তা

ইমাম বোখারি (রহ.) বলতে চাচ্ছেন, হে প্রিয় ছাত্ররা! তোমরা পরদেশী, মুসাফির, সর্বস্ব বিসর্জনকারী। ঘর ছেড়েছ, বাড়ি ছেড়েছ! ইল্‌মের খাতিরে সর্বস্ব কুরবান করেছ। কষ্ট সহ্য করে ইল্‌ম অর্জন করছ। এখানে আমল করে তোমরা বিনিময়ের হকদার হয়ে যাবে। যতক্ষণ এই আমল আল্লাহর দরবারে কবুল না হবে, ততক্ষণ এসব মেহনতের কোনো ফায়দা-ই থাকবে না। আজ আল্লাহর দরবারে এ দু'আ করার সময় এসেছে যে, হে আল্লাহ! আমরা ইল্‌মের অন্বেষণে ঘর থেকে বের হয়েছি। কিন্তু যতটুকু ইল্‌ম অর্জন করার কথা ছিল, ততটুকু করতে পারছি না। আদবের খেয়াল রাখতে পারছি না। মেহনতও পূর্ণভাবে করতে পারছি না। আমাদের মাঝে এখলাছও নেই।

হে আল্লাহ! যদি আপনি আজ আমাদের কবুল না করেন, তাহলে এতসব মেহনত আমরা কেন করছি! হে আল্লাহ! আমরা জীবজন্তু ও পশুপাখিকে দেখি, জমিনে বসতে-বসতে পায়ে দাগ বসে যায়। এই দেখুন, চাটাইয়ে বসতে-বসতে আমাদের পায়েও দাগ বসে গেছে। রুকু-সেজদার দাগ বসে গেছে। তারপরও যদি কবুল না কর হে আল্লাহ! তাহলে আমাদের মাঝে আর জীবজন্তুর মাঝে কোনো ব্যবধান রইল না।

گر گر کے یہاں پہنچا مر مر کے تجھے پایا
چھوٹے نہ الٰہی اب سنگ در جاناناں
ساری دنیا مجھے کہتی ہے سودائی ہے
اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے

'হোঁচট খেতে-খেতে পৌঁছেছি এখানে
মরতে-মরতে পেয়েছি তোমায়।
হাতছাড়া এবার না হয় যেন প্রভু
তোমার দুয়ারের পদধূলি।
সারা দুনিয়া বলছে, তুমি দারুণ মুনাফায় আছ
(কিন্তু সত্য হলো) এখন আমার চৈতন্যে ফিরে আসা
(প্রভু) তোমার অবমাননারই শামিল।'

হে আমার মাওলা! আমি সবকিছু ছেড়ে– ঘরবাড়ি ছেড়ে, দেশ-জাতি ছেড়ে এসেছি। আপনার সামনে আঁচল পেতে ধরেছি। নিজের ভুল স্বীকার করে নিচ্ছি। আপনি যে রব, সেই উসিলা বানিয়ে বলছি, হে আল্লাহ! আপনার আযমত আমার দিলে আছে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মেহেরবানি করুন। আপনি তো অল্প আমলে অধিক বিনিময় দানকারী পরওয়ারদেগার। আমাদের মেহনত অল্প তা মেনে নিলাম। কিন্তু সেই মেহনতের প্রতিদান আপনি বেশি করে দিন। আমাদের দাওরা হাদীছের এই বর্ষকে আপনি কবুল করে কেয়ামতের দিন আমাদের সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন, যাদের ব্যাপারে আপনার হাবীব বলেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ ওলামায়ে কেরামকে দাঁড় করাবেন। তারপর বলবেন, হে ওলামায়ে কেরামের জামাত! আমি তোমাদের সিনায় এজন্য ইল্‌ম জমা করে দিইনি যে, আজ লোকদের সামনে তোমাদের অপমানিত করব? যাও; বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাও। আল্লাহ কেয়ামতের দিন আমাদের এই বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

আখেরাতের ধনাগার

'আল্লাহর রহমতের খাজানার তালা-চাবি রয়েছে। সেই তালা-চাবির সন্ধান আছে যার, সে সহজেই দরজা খুলে নিতে পারে। রহমতে ধন্য হতে পারে সে। আর যার সেই খবর নেই, সে তো হতভাগা। সে দুয়ার খুলতে পারে না। যে আলেম, যে আল্লাহর পথ চেনে, সে সহজে এই পথ পাড়ি দিতে পারে। কিন্তু যে জাহেল, যে অজ্ঞ ও মূর্খ, সে কী করে এই পথ পাড়ি দেবে? সে কীভাবে পাবে আল্লাহকে? তাই বলছি, আলেম ও জাহেল কোনোভাবেই সমান হতে পারে না।'

আখেরাতের ধনাগার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

আলেম ও জাহেলের মাঝে পার্থক্য

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

'হে আমার হাবীব! আপনি বলে দিন, যারা জানে আর যারা অজ্ঞ তারা উভয়েই কি সমান? আলেম ও জাহেল কি সমান হতে পারে?'[১]

اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ

'একথা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই বুঝতে পারে।'[২]

অর্থাৎ– আলেম আর জাহেল এক সমান নয়।

কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ

'অন্ধ আর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সমান নয়।'[৩]

---

১. সূরা যুমার : আয়াত ৯

২. সূরা যুমার : আয়াত ৯

৩. সূরা ফাতির : আয়াত ১৯

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّوْرُ

'আলো ও আঁধার একসমান নয়।'[১]

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ

ছায়া আর গরম এক নয়।[২]

وَلَا يَسْتَوِى الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ

'জীবিত আর মৃত সমান নয়।'[৩]

এসকল শব্দে আলেম ও জাহেলের ব্যবধান স্পষ্ট করা হয়েছে। আলেম জীবিতের মতো আর জাহেল মৃতের মতো। আলেম আলোর মতো আর জাহেল অন্ধকারের মতো। বোঝা গেল আলেম ও জাহেলের মধ্যে পার্থক্যটা আকাশ আর পাতাল।

ইল্‌মের গুরুত্ব

আজ সারা বিশ্বে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যার ইল্‌ম আছে, জ্ঞান আছে সে তার সকল কাজকে সহজে সমাধান করে নিতে পারে। যার ইল্‌ম থাকে না, তার কাজ বন্ধ থাকে। তার সাফল্যের পথ হয়ে থাকে রুদ্ধ। সহজ কথায় যেব্যক্তি গন্তব্যের পথ চেনে, সে সহজে পৌঁছে যায় আর যে পথ চেনে না, সে পড়ে থাকে পথে। তাই পথের পরিচয় জানা থাকা একান্ত জরুরি। যদি গন্তব্যে পৌঁছতে হয়, পথের খবর থাকতেই হবে। এখন তো কম্পিউটারের যুগ। দ্রুতগামী মিডিয়ার যুগ। কম্পিউটার অন করে ব্যবহার করতে একটি কোড ব্যবহার লাগে। যে কোড জানে, সে সহজেই কম্পিউটার চালু করে কাজ করে নিতে পারে আর যে কোড জানে না, সে কাজ করতে পারে না।

তাই পথ চেনে যে, পথের সন্ধান থাকে যার, সে গন্তব্যে পৌঁছে যায় সহজেই।

আল্লাহর রহমতের খাজানার তালা-চাবি রয়েছে। সেই তালা-চাবির সন্ধান আছে যার, সে সহজেই দরজা খুলে নিতে পারে। রহমতে ধন্য হতে পারে সে। আর যার সেই খবর নেই, সে তো হতভাগা। সে দুয়ার খুলতে

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ২০
২. সূরা ফাতির : আয়াত ২১
৩. সূরা ফাতির : আয়াত ২২

পারে না। যে আলেম, যে আল্লাহর পথ চেনে, সে সহজে এই পথ পাড়ি দিতে পারে। কিন্তু যে জাহেল, যে অজ্ঞ ও মূর্খ, সে কী করে এই পথ পাড়ি দেবে? সে কীভাবে পাবে আল্লাহকে? তাই বলছি, আলেম ও জাহেল কোনোভাবেই সমান হতে পারে না।

পুঁজি কম, মুনাফা বেশি

আজকে সারা পৃথিবীর সকলেই চায়, আমি আমার অর্থ এমন কাজে লাগাব, যেখানে টাকা দেব কম, মুনাফা আসবে বেশি। সামান্য সময়ে লভ্যাংশ বেশি হবে। অর্থনীতির ভাষায় বলে আমার Return বেশি হতে হবে। যেভাবে দুনিয়াদার লোকেরা বেশি উৎপাদন, বেশি মুনাফা ও বেশি আয়ের খাতে অর্থ বিনিয়োগ করতে চায়, তেমনিভাবে মুমিন বান্দাও চায়, আমি এমন আমল করব, যাতে সময় ব্যয় হবে কম, তবে নেকি আসবে বেশি, যাতে আল্লাহর বেশি কাছে চলে যেতে পারব। মানুষ যেপথে বেশি নেকি পায়, আমি সে পথে চলব। বুঝদার ব্যক্তিরা এমনটিই ভেবে রাখেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু কাজ করার কথা আমাদের বলে গেছেন, যা করা অনেক সহজ। অথচ তার জন্যে বিনিময় বেশি হবে, লভ্যাংশ অধিক হবে। আজ তো মানুষ হাজারো পেরেশানির মধ্যে আছে। কেউ বাড়ি-গাড়ি নিয়ে, কেউ ব্যবসা নিয়ে, কেউ চাকরি নিয়ে। কেউ অন্যান্য কর্ম নিয়ে। শত পেরেশানির মাঝে আমাদের জীবন আটকে আছে। অথচ ইসলাম আমাদের সারা জীবনের জন্য পথ দেখায়। নবীজি উম্মতকে খালি মাঠে ছেড়ে যাননি। নবীজি উম্মতকে অজ্ঞতায় ফেলে যাননি। এমনও নয় যে, কোনো কথা বলার ছিল; কিন্তু তিনি তা বলে যাননি। বরং সারা জীবনের প্রতিটি অঙ্গনের জন্য তিনি আমাদের জন্য শিক্ষা রেখে গেছেন। পথ প্রদর্শনের গাইড ও বুক রেখে গেছেন। রেখে গেছেন তাঁর সুন্নাহ ও অকাট্য কুরআন।

একদিকে লিখিত নীতিমালা ও জীবন ব্যবস্থা কুরআন, অন্যদিকে আছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব জীবনের আদর্শ। সেই নীতি বাস্তবায়ন করে তিনি রেখে গেছেন তাঁর পবিত্র সুন্নাহ। এবং হাতে গড়ে রেখে গেছেন কুরআনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবা কেরামের একটি সুবিশাল জামাত।

প্রয়োজন অটল বিশ্বাস

যেসব বান্দার পরিপূর্ণ একিন আছে, অটল বিশ্বাস আছে আল্লাহর ওপর, তাদের কোনো ভয় নেই দুনিয়ায়। ভয় তো তার, আল্লাহর ওপর যার বিশ্বাস নেই। তার দৃষ্টান্ত এভাবে বুঝুন যে, একটা বাচ্চার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তার পিতার। তার কি কোনো টেনশনের ব্যাপার আছে? বাচ্চাটির যেকোনো প্রয়োজনে তার বাবা আছেন। কিন্তু যে এতিম, তাকে দেখার মতো কেউ থাকে না, তার জন্যই যত টেনশন। তো আমরা এমন লোক, যারা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখি। আমরা আল্লাহতে বিশ্বাসী। আল্লাহর ওপর ঈমান রাখি। তাহলে তো আমাদের কোনো পেরেশানি নেই, টেনশন নেই। সাহাবা কেরামের শান তো এমন ছিল যে, তাঁরা বুঝতেন, আমাদের জন্য আল্লাহ আছেন; তাই আমাদের কোনো সমস্যা নেই। জঙ্গে উহুদের সময় সেজন্যেই তাঁরা বলেছিলেন–

لَنَا مَوْلٰى وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ

'হে কাফেররা! হে মুশরিকরা! আমাদের মাওলা আছে। তোদের কোনো মাওলা নেই।'

এ অনেক বড় কথা!

দেখুন, ঘরে তো একটা ছাদ আছেই। তার ওপরে রয়েছে একটা নীল ছাদ। সেই ছাদ আমাদের আল্লাহ আমাদের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ আমাদের তত্ত্বাবধায়ক। তিনি আমাদের তত্ত্বাবধান করেন।

আখেরাতের ধনাগারের চাবি

আমাদের ভুল তো এতটুকু যে, আমরা রুদ্ধ ঘরে চাবি ব্যবহার করছি না। তাই দরজাও খুলছে না। নবীজি বহু ছোট-ছোট ও সংক্ষিপ্ত দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। সহজ শব্দে, সহজ উচ্চারণে, মুখস্থ করতে সহজ এমন বহু দু'আ আছে। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকলেই তা মুখস্থ করতে পারে। যদি আমরা সুযোগমতো সেগুলো পড়তে থাকি, তাহলে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের পক্ষ থেকে মদদ ও রহমতের দরজা খুলে যাবে। যে-বান্দা তা জানতে পারে, সে কাজটি বড় সুন্দরভাবে করতে পারে। এখানেই আলেম ও জাহেলের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আলেম যেহেতু জানতে পারে, কোন আমল করলে কী হয়, সেহেতু তারা অল্প সময়ে অনেক ছাওয়াবের কাজ করতে সক্ষম হয়। আর জাহেল বহু কষ্ট করেও ছাওয়াবের ভাগিদার হতে পারে না। নানা কারণে

তার আমল নষ্ট হয়ে যায়। তাই চিন্তা করলাম, আজ আপনাদের সামনে এমন কিছু বিষয় উপস্থাপন করব, যা আমলে আনা বড়ই সহজ, যার প্রতিদান অনেক বেশি। আমাদের তো আমল করা-ই কর্তব্য। আমাদের আমলনামা তো আজ গুনাহের আঁধারে ছেয়ে গেছে। তা দূর করা জরুরি। সেখানে ছাওয়াব ও নেকের নূর স্থাপন করা খুবই প্রয়োজন। কারণ–

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

'নেক আমল বদ-আমলগুলো মুছে দেয়।'[১]

যে-কাপড়ে ময়লা বেশি লাগে, তাতে সাবান বেশি ব্যবহার করতে হয়। বারবার তাতে সাবান ব্যবহার করতে হয়। কয়েকবার ধৌত করার পরই তা পরিষ্কার হয়। তাই আমাদের আত্মাকে আমাদের কলবকে এবং আমাদের আমলনামাকে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

মজুর তিন প্রকার

হাদীছে মোবারকা অধ্যয়ন করলে বড় অবাক লাগে। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য কত সহজ করে দিয়েছেন। উম্মতের মুক্তির পথ কত সুগম করে দিয়েছেন। উম্মতের কল্যাণে হাদীছে পাকে ছড়িয়ে রেখেছেন বহু বহু মূল্যবান সম্পদ। এ উম্মতের ওপর নবীজির বড়ই অনুগ্রহ।

এক হাদীছে এসেছে, উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম ইহুদিরা আসবে। তারপর খ্রিষ্টানরা। তারপর মুসলমানরা। তো মজুর তিন প্রকার হলো। একদল ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত মজুরি করে। সে পায় একশত টাকা। আরেকজন আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মজুরি করে। সেখানে তার সময় কম ব্যয় হয়। সে-ও একশত টাকা পায়। আরেকজন আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কাজ করে। সেখানে সময় আরও কম হয়। সে-ও একশত টাকা পায়।

তো পূর্বেকার উম্মতের হিসাবও এমনই। ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত প্রথম উম্মত ইবাদাত করেছে। তার বিনিময় সে পাবে। আবার দ্বিতীয় প্রকারের উম্মত যোহর থেকে আছর পর্যন্ত ইবাদাত করেছে। সে তার ইবাদাতের বিনিময় পাবে। আর উম্মতে মুহাম্মদীর হিসাব এমন, যেন আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ইবাদাত করল। সে-ও বিনিময় পেল। কিন্তু আল্লাহ সবার বিনিময়, সবার প্রতিদান সমান-সমান করে দান করলেন।

---

১. সূরা হূদ : আয়াত ১১৪

তো এই উম্মতের জন্য প্রিয়নবীর অনেক বড় অনুগ্রহ রয়েছে। দেখুন, পূর্বেকার উম্মত কত দীর্ঘ সময় ইবাদাত করত। আর শেষ নবীর উম্মতের হায়াত কম বলে নবীজি এমন কিছু বিষয় শিখিয়েছেন, যেগুলোর ওপর আমল করে উম্মত অনেক বেশি ছাওয়াবের ভাগিদার হতে পারে। যেমন– আমরা রমযান মাসে শবে কদর পেয়েছি, যে রাতের ইবাদাত ৮৩ বছর ইবাদাতের সময়। এটি তো অন্য উম্মতরা পায়নি।

এগুলো ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আমল, যার বিনিময় অনেক। এসব আজ বলতে চাচ্ছি এজন্য, যেন আমরা প্রস্তুত হতে পারি এবং সহজ-সহজ বিষয়গুলো আমলে আনতে পারি। এমন যেন না হয় যে, কিতাবের ইল্‌ম কিতাবে রয়ে যায়। বরং তা যেন আমাদের আমলে এসে যায়। কারণ, কিতাবের ইল্‌ম কিতাবে থেকে গেলে উম্মতের ফায়দা কী হবে?

এক মিনিটে এক ঘণ্টার ইবাদাতের ছাওয়াব

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়াইরিয়াহ (রাযি.) মোছল্লায় ইবাদাতে মশগুল ছিলেন। নবীজি নামায আদায় করলেন। তারপর ইশরাকের সময় হলো। যখন তিনি ঘরে তাশরীফ আনলেন, দেখলেন উম্মুল মুমিনীন এভাবেই বসে আছেন। তিনি আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল আছেন। নবীজি বললেন, হে জুয়াইরিয়াহ! এত সময় ধরে কি তুমি ইবাদাতে মশগুল ছিলে? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি কালেমা শিক্ষা দিচ্ছি, যদি কোনো মানুষ এটি তিনবার পড়ে নেয়, তাহলে ফজর থেকে ইশরাক পর্যন্ত ইবাদাতে মশগুল থাকার ছাওয়াব হবে। কালেমাটি এই–

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

'আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর সৃষ্টিকুলের সমান, তাঁর সন্তুষ্টির সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান এবং তাঁর বাক্যাবলির কালির সমান।'[১]

দেখুন, দু'আটি পাঠ করতে আধা মিনিট সময়ও কিন্তু লাগে না। বরং এক মিনিটে এটা তিনবার পড়ে নেওয়া যায়। এই মাত্র একটি মিনিটের

---

১. মুসলিম : হাদীছ নং ৪৯০৫

আমলের বিনিময়ে আল্লাহ ফজর থেকে ইশরাক পর্যন্ত ইবাদাত করার ছাওয়াব প্রদান করেন।

এবার দেখুন, এদিকে কমপক্ষে দু-ঘণ্টার ইবাদাত ছিল। কারণ, দেড় ঘণ্টা তো ফজরের সময়ই হয়ে থাকে। তারপর আবার ইশরাকের জন্য অপেক্ষা। তারপর নবীজির ঘরে আসা। এতে তো আন্দাজ করা যায়, দুই ঘণ্টার ইবাদাত ছিল। এত সময় চলে গেছে। দেখুন, একদিকে দু-ঘণ্টার ইবাদাত, অন্য দিকে এক মিনিটের একটি কালেমা। এক মিনিটে তো বরং তা তিনবার পড়া যায়। আর ছাওয়াব কত বেশি!

যারা কাজকারবারে ব্যস্ত থাকেন, তারা সামান্য একটু চিন্তা করুন। আপনারা তো এক টাকা কোথায় বেশি দেয়, সে দিকে ছোটেন। যে এক টাকা বেশি দেয়, তার কাজ করতে চলে যান। এখানের বিষয়টি একটু যাচাই করে দেখুন। হাদীছটি তো আমাদের সামনেই আছে। এর দিকে তাকিয়েই তো এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। এমন আমলেই তো সময় দেওয়া চাই। মাত্র এক মিনিটের আমলে কত দীর্ঘ সময় নামায ইত্যাদি ইবাদাতে মশগুল থাকার ছাওয়াব মিলে।

একটি বাক্যে দশ লাখ নেকি

আরেকটি হাদীছ শুনুন। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযি (রহ.)। হযরত ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, যেব্যক্তি বাজার দিয়ে অতিক্রমের সময় এই দু'আটি পড়বে, তাকে দশ লক্ষ নেকি দেওয়া হবে, তার দশ লক্ষ গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তবে আমলটি ছোট হওয়ার কারণে সামান্যও সন্দেহ করা যাবে না যে, আসলে এত নেকি হবে কি না। এমন সন্দেহ হলেও তো ঈমানের মধ্যে ঝুঁকি দেখা দেবে। কারণ, কথাটি আল্লাহর পেয়ারা হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই বলেছেন। যে জবানে আমরা কুরআন পেয়েছি, যাঁকে কাফেররাও সত্যবাদী আল-আমীন বলত, সেই মোবারক জবান থেকে এই কথাটি নিঃসৃত হয়েছে।

তো যে-বান্দা বাজার দিয়ে অতিক্রমের সময় একবার এই দু'আটি পাঠ করবে, সে দশ লক্ষ নেকির ভাগিদার হয়ে যাবে। তার দশ লক্ষ গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আর যদি বারবার পাঠ করা হয়, তাহলে তো কত ছাওয়াব হবে তার হিসাব করা অসম্ভব হয়ে যাবে।

দেখুন, আমাদের মাঝে কে আছে, যার বাজারে যেতে হয় না? কোনো-কোনো ব্যক্তি তো মসজিদে আসতে হলেও বাজার হয়ে আসতে হয়। কারও

কাজকারবারের সম্পর্ক রয়েছে বাজারে। কারও অফিস বাজারে। তো আপনি গাড়িতে থাকুন, মোটর সাইকেলে থাকুন আর যেভাবেই বাজার অতিক্রম করুন-না কেন, আপনি দু'আটি পড়লেই উল্লিখিত ফজিলত পেয়ে যাবেন। এখানে পায়ে হেঁটে যেতে হবে এমন কিছু কিন্তু বলা হয়নি। পুরুষ-মহিলা যে-ই পড়ুক সে-ই ছাওয়াব পাবে। যদি কেউ জানতে পারে বা এ-ব্যাপারে যার জ্ঞান আছে, সে-ই সামান্য একটু আমলে অনেক বড় ছাওয়াব পেতে পারে। এত ফজিলত জানতে পেরেও কে আছে, যে তা আমলে আনবে না! দেখুন, কত সহজ এই দু'আটি :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক– তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, যাঁর কোনো মৃত্যু নেই। তাঁর হাতে সকল কল্যাণ। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'[১]

একটু পড়েই দেখুন কত সহজ এই দু'আ। কত সাবলীল এবং উচ্চারণে কত সহজ দু'আটি। ছোটরাও তা সহজেই মুখস্থ করে নিতে পারে। এটি আমাদের আমলে আনা উচিত। কিতাবে তো একথাও লেখা হয়েছে যে, কোনো-কোনো সাহাবা যাঁরা ঘরেই থাকতেন তারা বাজারে কোনো কাজ করতেন না। তাঁরাও ঘর থেকে এই নিয়তে বাজারে যেতেন যে, তারা শুধু দু'আটির ওপর আমল করবেন। যেন তাঁরা এত বড় ছাওয়াবের অধিকারী হয়ে যেতে পারবেন। তো তারা এই ছাওয়াবের নিয়তেই বাজারের পথে রওনা হতেন। বলুন তো কে এই আমলটি ছাড়তে চায়?

চারটি শব্দ চার কোটি নেকি

আরেকটি বিষয় দেখুন। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে, হযরত তামীমদারি (রাযি.) বলেছেন, যেব্যক্তি চারটি কালেমা দশবার পড়বে, সে চার কোটি নেকি পাবে। কালেমাগুলো খুবই ছোট-ছোট।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ إِلٰهًا وَّاحِدًا صَمَدًا لَّمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

১. আল-মুসনাদ : হাদীছ নং ১৯৭৪

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, যাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনিই একমাত্র উপাস্য ও অমুখাপেক্ষা। তিনি কোনো সঙ্গিনী গ্রহণ করেননি, না কোনো সন্তান। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই।'[১]

এই যে কত ছোট-ছোট চারটি বাক্য। এগুলো মাত্র দশবার পড়লেই চার কোটি ছাওয়াব পাবে। বাক্য চারটি কেমন দেখুন। একটু গভীরভাবে দেখুন। কালেমাগুলো দশবার পড়লে যেন আমরা চল্লিশটি কালেমা পড়লাম। আর আগের হাদীছটিতে দশ লক্ষ নেকির ভাগিদার হওয়া যায় একটি মাত্র বাক্যে। আর দশ লক্ষকে চার দ্বারা গুণ দিলেই কিন্তু চার কোটি হয়। তা এমন কালেমা, যা একবার পড়লে আল্লাহ দশ লক্ষ নেকি দান করবেন।

কেয়ামতের দিনটি তো এমন দিন, যেদিন একটি নেকির সন্ধানে মানুষ দৌড়ঝাপ দেবে, ছোটাছুটি করবে। কামনা করবে, কেউ আমাকে একটি নেকি দিয়ে দিক। অথচ মাত্র এক মিনিটেই আজ আমরা কোটি-কোটি নেকি লাভ করতে পারি।

অনেক বেশি ছাওয়াবের দুরুদ শরীফ

জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, একটি দুরুদ এমন আছে যে, সকালে ও সন্ধায় যদি তা একবার করে পাঠ করা হয়, তাহলে ফেরেশতা তার ছাওয়াব এক হাজার পর্যন্ত লিখতে থাকে। দুরুদটি এই–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَجْزِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ اَهْلُهٗ

'হে আল্লাহ! হে মুহাম্মাদের রব! আপনি মুহাম্মদ ও তাঁর পরিজনের ওপর রহমত নাযিল করুন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর উপযুক্ত বিনিময় দান করুন।'[২]

দুরুদটি যে-ই ইচ্ছে করে মুখস্থ করে নিতে পারে। একজন সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষও তা মুখস্থ করতে পারে। একটি-একটি শব্দ করে পড়া শুরু করে দিন; দেখবেন দু-তিন দিনেই মুখস্থ হয়ে যাবে। তারপর একবার সকালে, একবার সন্ধায় পাঠ করবেন। আল্লাহর ফেরেশতা এক হাজার পর্যন্ত এর ছাওয়াব লিখতে থাকবে।

---

১. তিরমিযি : হাদীছ নং ৩৩৯৫
২. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ৩৯০০

যে কালেমা ফেরেশতাদের ক্লান্ত করে দেয়

আরেকটি হাদীছে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যেব্যক্তি এই দু'আটি একবার পাঠ করে, তাহলে ফেরেশতারা এর ছাওয়াব লিখতে-লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আমার এর অভিজ্ঞতা আছে যে, আমাদের একটা ড্রয়িং বানানোর প্রয়োজন দেখা দিল। কাজটা ছিল খুবই দুরুহ। যার ওপর ড্রয়িং তৈরি করা হয়, তাকে বলা হয় প্লাটার। আর সেটা চলে কম্পিউটারের মাধ্যমে। তার ওপর কম্পিউটারের প্রোগ্রাম ভরে আমরা যখন তার বাটনে চাপ দিলাম, তখন সেটা অবিরাম আট ঘণ্টা চলতে থাকল এবং ড্রয়িং তৈরি হতে থাকল। আমি যতক্ষণ ওই প্লাটারের কাছে বসা ছিলাম, ততক্ষণ চিন্তা করতে থাকলাম, ইয়া আল্লাহ! দুরুদ শরীফও তো এমনই হবে যে, একটা কমান্ড দিয়ে দিল আর ফেরেশতারা তার ছাওয়াব লিখে-লিখে ক্লান্ত হতে থাকল। আমার অবস্থা এই ছিল যে, যতক্ষণ ওই প্লাটারের ওপর ড্রয়িং তৈরি হচ্ছিল, ততক্ষণ প্লাটারের ওপর আমার খুব মায়া লাগছিল যে, আমরা কমান্ড দিয়ে দিলাম আর এই বেচারা বিরামহীনভাবে আটটা ঘণ্টা পর্যন্ত লিখে চলছে! কিছু একটা তৈরি করে চলছে! কিছু একটা কাজ করছে।

তো এই পবিত্র দুরুদও এমনই যে, যেলোক একবার পড়ে নিল, তাতে ফেরেশতারা এমন একটা কমান্ড পেয়ে গেল যে, তার ছাওয়াব লিখতে-লিখতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। বাক্যটি কতই-না সহজ!

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ

'হে আমার রব! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য আপনার মহত্ত্ব ও রাজত্বের বিশালতার দাবি অনুপাতে।'[১]

হাতেগোনা কয়েকটা শব্দমাত্র। এত সংক্ষিপ্ত কয়েকটা শব্দের এত বেশি ছাওয়াব!

মণি-মুক্তার মতো মূল্যবান আমল

হাদীছগুলো পড়লে বাস্তবেই অন্তরে উদিত হয় যে, আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত তাঁর প্রিয় হাবীবের উম্মতকে দান করার বাহানা বানিয়ে দিয়েছেন। ছোট-ছোট বাক্য! সোনার চেয়েও দামি। মুক্তা দেখতে কত ছোট; অথচ দাম

---

১ ইবনে মাজা : হাদীছ নং ৩৭৯১

কত বেশি। হীরা; কত ছোট তার আয়তন। অথচ দাম কত বেশি। এই দু'আগুলোও মণি-মুক্তার মতো দামি। তাই এগুলোকে সেই অনুপাতেই মূল্যায়ন করা উচিত। নিজেরাও আমল করুন এবং পরিবারের সদস্যদেরও এগুলো মুখস্থ করে আমল করতে বলুন।

সত্তর হাজার ফেরেশতার দু'আ

তিরমিযি শরীফের একটি বর্ণনা। মাখায ইবনে ইয়াসার (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, তিনটি আয়াত এমন আছে, যা কোনো ব্যক্তি সকালে পাঠ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে। যদি তা সন্ধ্যায় পাঠ করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা রহমতের দু'আ করবে। যদি সেদিন তার মৃত্যু হয়, তাহলে আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন শহীদদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করবেন। আর সেই আয়াতগুলো হচ্ছে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۴﴾

'তিনিই আল্লাহ। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনি দয়াময় ও পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি। তিনিই নিরাপত্তাবিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। তারা যাকে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান।

তিনিই আল্লাহ। তিনি সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা ও রূপদাতা। সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।'[১]

মাত্র দু-মিনিটের আমল। দু-মিনিট মুখ নাড়ালেই রহমত আসার দু'আ। সত্তর হাজার ফেরেশতার দু'আ। সহজ কথা কি?

---

১. সূরা হাশর : আযাত ২২-২৪

আশি বছরের গুনাহ্ মাফের দুরুদ

এ বিষয়টি আল্লামা সাখাবি القول البديع এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যেব্যক্তি জুমার দিন আছরের নামাযের পর নিজ স্থানে অটল থেকে আশিবার দুরুদটি পাঠ করে, তার আশি বছরের গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।

দেখুন, দুরুদটি কত ছোট; অথচ তার বিনিময় কত বড়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

এত সংক্ষিপ্ত দু'আ। আশিবার পাঠ করলে আশি বছরের গুনাহ্ মাফ! ঘরের মহিলাদেরও শিখিয়ে দিন। তারাও যেন জুমার দিন এর ওপর আমল শুরু করে দেয়। আছর নামাযের পর শিশুদের একত্রিত করে নেবে। তাদেরও এতে অভ্যস্ত করাবে। শৈশব থেকেই যেন আমলটি তারা শিখে নেয়।

সমুদ্রের ফেনাসমান গুনাহ্ মাফ

হাদীছে এসেছে, একটি কালেমা এমন আছে যে, ফজর নামাযের পূর্বে যদি তিনবার পাঠ করা হয়, তাহলে আল্লাহ পাঠকারীর গুনাহ মাফ করে দেবেন। যদিও সেই গুনাহ সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। দু'আটি এই–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

দেখুন, কত সহজ এই দু'আটি। অনেকের এটি মুখস্থ আছেও অনেকের মনে এর গুরুত্ব নেই। কারণ, তারা জানেই না এর ফজিলত কত তাই তারা সেভাবে আমল করতে সচেষ্ট নয়। এর ফজিলত তাদের সামনে স্পষ্ট নয়। তালেবুল ইল্মরাও অনেকে তা জানে না। অনেক ওলামায়ে কেরাম জানেন, বেশ ফজিলত আছে; অথচ ফজিলতটা কী তা কারও জানা নেই। অনেকে আমল করেন; তবে মাঝে-মাঝে! স্থায়িভাবে অনেকে আমল করতে পারেন না। আজকের এই মজলিস থেকে পাক্কা এরাদা করে নিন। নিয়ত করে নিন, কখনও এই দু'আটি ছাড়ব না। সর্বদা আমল করে যাব। আজকের পর কোনোদিন এর আমল ছুটবে না বলে অঙ্গীকার করুন।

একটি দু'আ

এক হাদীছে আছে, দু'আটি যদি কোনো ব্যক্তি প্রতিদিন সাতবার পাঠ করে– সাতবার সকালে সাতবার সন্ধ্যায়, তাহলে আল্লাহ তার অসম্পূর্ণ

কাজগুলো পূর্ণাঙ্গ করে দেবেন। রেওয়ায়াতটি আবু দাউদ শরীফে উল্লেখিত আছে। বলুন, কে আছে যার কর্ম অসম্পূর্ণ ও অর্ধসম্পন্ন নেই? কারও মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। কারও ছেলের বিয়ে হচ্ছে না। কেউ এই কাজে পেরেশান। কেউ অন্য কাজে পেরেশান। প্রত্যেক কাজেই কোনো-না-কোনো বাধা আছেই। কারও চাকরিতে সমস্যা। কারও ব্যবসাবাণিজ্যে সমস্যা। সবার কাজই তো এভাবে অর্ধ-অর্ধ হয়ে আছে। কত মানুষ যে আমার কাছে আসে আর বলে হযরত! কোনো আমল দিন যেন আমার কাজকর্মে সফল হতে পারি। আরে ভাই! আল্লাহর পেয়ারা হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এর সমাধান বলে দিয়েছেন চৌদ্দশো বছর আগে। যদি কর্ম অসম্পূর্ণ থেকে যায়, পূর্ণ করা যায় না, তাহলে এই দু'আটি সকালে ও সন্ধ্যায় সাতবার করে পাঠ করো। আল্লাহ কর্ম সম্পাদন করে দেবেন। অর্ধকর্মকে পূর্ণতা দান করবেন। দু'আটি কুরআনেই আছে–

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

এত সংক্ষিপ্ত দু'আ। দিনে সাতবার করে সকালেও বিকেলে পাঠ করতে কতক্ষণ লাগবে। সাতবার রাতে পাঠ করবে আর সাতবার দিনে পাঠ করবে। আল্লাহর হাবীব বলেছেন, এটি বান্দার অর্ধ কাজকে পুরো করে দেয়। আটকে যাওয়া কাজকে সচল করে দেয়, সহজ করে দেয়। কঠিন কাজকে সহজ করে দেয়। কোনো সমস্যা-ই এমন নেই, যার সমাধান নেই। আমরা বলতে পারব না যে, এ-কাজের কোনো সমাধান নেই। এ কেমন কথা? যে পরোয়ারদেগারের আদেশে আমাদের জীবন চলমান, তিনিই তো সমস্ত সমস্যায় সমাধান দেন। আমাদের হাতে চাবি থাকা চাই। এসব ছোট-ছোট বাক্যগুলোই চাবি। নবীজি আমাদের চাবির গুচ্ছই হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন যেন তিনি আমাদের বলছেন, সারা জীবনের পেরেশানি ও সমস্যার সমাধান তো এই চাবিগুচ্ছেরই মাঝে। এটি সঠিক স্থানে সঠিক সময়ে ব্যবহার করো। আজ আমাদের অবস্থা তো এই যে, চাবিগুচ্ছ পকেটে আর বলছি আহ! দরজা বন্ধ; ঘরে যেতে পারছি না। বাইরে দাঁড়িয়ে আছি কত সময় ধরে। এমন হলে তো সবাই তাকে বেআক্কেল বলবে। তার পকেটে চাবির ছড়া। সে তা ব্যবহার করছে না। আরে একটায় না খুললে অন্যটা দিয়ে খুলতে চেষ্টা করো। চাবির ছড়া তো আছেই তোমার হাতে। এখন দেখুন, সাতবার দিনে ও সাতবার রাতে এই আমল করলে আল্লাহ আমাদের সমস্ত অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ কর্মগুলোকে সম্পাদিত করে দেবেন।

সত্তরটা মসিবত দূর হয়ে যাওয়া

আরেকটি আমলের কথা রেওয়ায়াত করেছেন হযরত আবু নুআঈম (রাযি.)। ইবনে আবী শাইবা তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যেব্যক্তি এই দু'আটি একবার পাঠ করবে– আরে, শতবার নয় মাত্র একবার যে এই দু'আটি পাঠ করবে, আল্লাহ তার সত্তরটা মসিবত দূর করে দেবেন। আর তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট মসিবত হচ্ছে দারিদ্র্য। সত্তরটা মসিবতের মধ্যে সবচেয়ে ছোট মসিবত হলো দারিদ্র ও অনটন। বাকি মসিবতগুলো এর চেয়ে বড়। সেগুলোও আল্লাহ দূর করে দেন।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ

'আল্লাহ ছাড়া আর কারও কোনো শক্তি নেই। আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর কোনো আশ্রয় ও মুক্তি নেই।'

অনেকের হয়তো দু'আটি মুখস্থ আছে। যাদের নেই তারা এখানের শায়খুল হাদীছ সাহেবের সাথে যোগাযোগ করবেন। তিনি আপনাদের লিখে দেবেন। এটি মুখস্থ করে নেবেন। আমলে নিয়ে আসবেন। নানা রকম মসিবত তো দূর হবেই, অভাবঅনটনও দূর হয়ে যাবে।

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

'সেই একটি সেজদা, যাকে তুমি বোঝা মনে করছ, হাজার সেজদা থেকে তোমাকে মুক্তি দেয়।'

আরে ভাই! আল্লাহর দরবারেই ছুটে এসো। আল্লাহর হাবীবের বলে দেওয়া পথে অগ্রসর হও; সকল মসিবত থেকে নাজাত পেয়ে যাবে। দারিদ্র্য কেটে যাবে।

ভগ্নহৃদয় মানুষের জন্য সান্ত্বনা

কানযুল উম্মাল কিতাবে বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তিনবার এই দু'আটি পাঠ করবে

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

যদি ভারাক্রান্ত ও ভগ্নহৃদয়ের মানুষ তা পড়ে, তবে আল্লাহ তার পেরেশানি দূর করে দেবেন। বিশ্বাসের সাথে পড়তে হবে। এখানে ইয়াকীন

শর্ত। ইয়াকীনে দুর্বলতা থাকলে ফল পাওয়া যাবে না। সন্দেহ যেন না হয়। সন্দেহ শিরক থেকেও খারাপ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ শিখিয়েছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ

'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি সংশয় ও শিরক থেকে।'

এখানে সন্দেহের শব্দ আগে ও শিরকের শব্দ পরে আনয়ন করা হয়েছে। এই সন্দেহ অনেক সময়ই ঈমানকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। তাই সন্দেহের শেকড় কেটে দিন।

কুরআনের শুরুতে এসেছে–

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ

'এই কিতাবটিতে কোনো সন্দেহ নেই।'

তারপরই বলা হয়েছে هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ তাই সন্দেহ নিয়ে পড়লে ফায়দা হবে না। তো দু'আটি তো সহজ; তবে তার সাথে ইয়াকীন শর্ত। অর্থাৎ– ইয়াকীনের সাথে পড়তে হবে। পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে যে, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তা শতভাগ সত্য বলেছেন। যেব্যক্তি উল্লিখিত আয়াতটি তিনবার পাঠ করবে, আল্লাহ তার সমস্ত পেরেশানি দূর করে দেবেন, অন্তরকে প্রশান্ত করে দেবেন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

'তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলাম।'[১]

এই আয়াতটি তো অধিকাংশ মানুষরেই মুখস্থ আছে। তো কয়েকবার পড়ে নেওয়া কঠিন কী। ইয়াকীনের সাথে পড়ুন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ

'আমি ইউনুস-এর দু'আ কবুল করেছি। আমি তাকে পেরেশানি থেকে মুক্তি দিয়েছি।'[২]

---

১. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৭

২. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৭

وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ

'এভাবেই আমি মুমিনগণকে নাজাত দিয়ে থাকি।'[১]

তো আমি এভাবে তাদের অস্থিরতা ও পেরেশানি দূর করে তাদের নাজাত দান করি।

এখন দেখুন, কত সহজ আমল। এই ছোট একটি আয়াতের মাধ্যমে আমরা সমস্ত পেরেশানি থেকে মুক্তি পাই। দেখুন, হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে চলে গিয়েছিলেন। তিনি সাগরে নিপতিত হয়েছিলেন। তারপর তিনি এই দু'আর মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে গিয়েছিলেন। আজ কি আমাদের অবস্থা মাছের পেটের ভেতর থাকার চেয়ে মারাত্মক? কক্ষনো নয়। আমাদের জীবন সংকীর্ণ হতে পারে। বলতে পারি, এই মসিবত থেকে মুক্তির পথই তো পাচ্ছি না। কিছু মানুষের অবস্থা মাছের পেটে বন্দিদশার মতো। সেই বন্দিত্ব থেকে বের হওয়ার পথ পাচ্ছে না। অথচ এখানে বলা হয়েছে, তুমি যেকোনো মৎস্যের পেটেও যদি বন্দি হও– হতে পারে তা তোমার জন্য কোনো মসিবত, কোনো বিপদ, কোনো রোগ, কোনো পেরেশানি যেকোনো মসিবত মৎস্যের গর্ভেই তুমি নিমজ্জিত হও না কেন, দু'আ পড়ো। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো। দেখবে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তোমাকে কীভাবে মুক্তি দান করছেন।

চার প্রকার শেফা

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে, যেব্যক্তি এই দু'আটি ফজরের পর পড়বে, আল্লাহ তাকে চারটি রোগ থেকে শেফা দান করবেন। দেখুন, একটিমাত্র দু'আ। ফজরের পর পাঠ করবেন মাত্র চারবার। এতে মুক্তি মিলবে চারটি রোগ থেকে। প্রথম রোগ উন্মাদনা, দ্বিতীয় রোগ কুষ্ঠ বা শ্বেতি, যার কারণে শরীরের চামড়ার রং বদলে যায়। তৃতীয় অন্ধত্ব । চতুর্থ প্যারালাইসিস। তো এ চারটি রোগ থেকে মুক্তি মিলবে দু'আটি মাত্র চারবার পাঠ করলে। দেখুন, কত সহজ একটি দু'আ।

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

'আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহ ছাড়া আর কারও কোনো শক্তি নেই।'

---

১. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৭

দেখুন, দু'আটিতে মেহনত কত কম; অথচ ছাওয়াব কত বেশি। আরে! আমাদের তো Investment এর সুযোগ হয়ে গেল। আমাদের এই নিয়ত করে নেয়া উচিত যে, আজকের পর কোনোদিন এর আমল ছাড়ব না।

সারা সপ্তার গুনাহ মাপ হবে যেভাবে

হাদীছ শরীফ বর্ণিত হয়েছে, যেব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহ্ফ তেলাওয়াত করবে, দুটি বিষয় তার নসিব হবে।

এক. পেছনের জুমা থেকে এ পর্যন্ত একটি নূর সৃষ্টি হয়।

দুই. আল্লাহ পেছনের জুমা থেকে এ পর্যন্ত যত গুনাহ করেছে, সব মাফ করে দেন।

কত সামান্য আমলের কারণে আল্লাহ অন্তরকে নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেবেন আবার গুনাহও মাফ করে দেবেন!

দাজ্জাল থেকে হেফাজত

প্রতিদিন সকালে যদি সূরা কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত ও শেষের দশ আয়াত পাঠ করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা পাঠকারীকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজতে রাখবেন। ভাই! দাজ্জালের ফেতনা অনেক বড় ফেতনা। সাহাবা কেরামও দাজ্জালের ফেতনায় শঙ্কিত ছিলেন। এমনকি কেউ-কেউ বলেছেন, আমাদের অবস্থা তো এই ছিল যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের দাজ্জালের ব্যাপারটি বলেছেন, তখন আমরা পথ চলার সময় ভয়ার্ত থাকতাম এই ভেবে যে, গাছের আড়াল থেকে দাজ্জাল এসে পড়ল না তো? তারা এমন আশঙ্কা করতেন।

এটি হচ্ছে বড় দাজ্জাল থেকে বাঁচার কথা। দাজ্জাল আরও আছে। একটু বুঝে নিন। دجل শব্দের অর্থ হচ্ছে ধোঁকা দানকারী, প্রবঞ্চনা দানকারী। তো সব প্রতারক, প্রবঞ্চক থেকেই বাঁচতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের বড় দাজ্জাল থেকেও বাঁচিয়ে রাখুন এবং ছোট-ছোট প্রবঞ্চক-প্রতারকদের থেকেও হেফাজতে রাখুন। আমীন।

আল্লাহর হেফাজত

অন্য এক হাদীছে আছে, যেব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, এক নামায থেকে আরেক নামায পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাকে

হেফাজত করবেন। দেখুন, অনেকেরই আয়াতুল কুরসী মুখস্থ আছে। যদি তার মৃত্যু এসে যায়, তাহলে এর শব্দের মর্ম দ্বারা বোঝা যায়, মৃত্যু ছাড়া জান্নাতের প্রবেশের কোনো বাঁধা তার থাকে না। মুত্যু হলেই সে জান্নাতে চলে যাবে। এবার বলুন, আয়াতে কুরসীর ওপর আমলের ফলে আল্লাহর তরফ থেকে কত বড় প্রতিদান পাওয়া যাবে!

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۵﴾

'আল্লাহ। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রণকারী। তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না, নিদ্রাও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে সবই তিনি অবগত। তাঁর যতটুকু ইচ্ছা করেন, তার বাইরে কোনো কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসি (আসন) আকাশ ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ।'

আশ্চর্য পুরস্কার

ইমাম তিরমিযি (রহ.) বর্ণিত এক হাদীছে বলা হয়েছে, যেব্যক্তি ফজর নামাযের পর কারও সাথে কথা বলার পূর্বে এই দু'আটি পড়বে, সে পাঁচটি নেয়ামত পাবে। তার জন্য দশটি নেকি লেখা হবে, দশটি গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। দশটি গোলাম আযাদ করার ছাওয়াব পাবে। শয়তান থেকে হেফাজতে থাকবে। মসিবত থেকে আল্লাহ তাকে হেফাজত করবেন। দু'আটি এই–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

'আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, যাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'

দু'আটি ফজর নামাযের পর দশবার পাঠ করলেই আল্লাহ উক্ত নেয়ামতদানে ধন্য করবেন।

মুসতাজাবুদ্দাওয়াহ

আপনাকে যদি কেউ বলে, আমি তোমাকে এমন একটি আমলের কথা বলব, যার কারণে আপনার দু'আ কবুল করে নেওয়া হবে, একথা শুনলেই তো আপনি চমকে উঠবেন। বলবেন, হ্যাঁ; আমার তো তা অবশ্যই দরকার। তো ওই লোক বলল, আমি তোমাকে ইসমে আ'যম বলে দেব। এর দ্বারা দু'আ কবুল হবে। তাহলে নিশ্চয় আপনার খুশির সীমানা থাকবে না। আপনি তো দৌড়ে গিয়ে ঘরের সকলকে বলতে থাকবেন, আমাকে এক পীর সাহেব একথা বলেছে। একজন আলেম বলেছেন, এই দু'আটি পড়ার পর যা দু'আ করব তা-ই কবুল করা হবে।

দু'আটি বলেছেন আমাদের প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি সায়্যিদুল আম্বিয়া বা সকল নবীর সরদার, যিনি সায়্যিদুল আউওয়ালীন ওয়াল আখেরীন বা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সেরা মানব। সায়্যিদুল মালাইকা। আল্লাহর পেয়ারা হাবীব বলেছেন, যেব্যক্তি একটি আমল প্রতিদিন করবে, সে মুসতাজাবুদ্দাওয়াহ (যার দু'আ কবুল করা হয়) হয়ে যাবে।

হাদীছটি উবাদা ইবনে সামেত (রাযি.) বর্ণনা করেছেন। এটি জামেউস সাগীর ও মাজমাউয-যাওয়ায়েদ-এ আছে। বলা হয়েছে, যেব্যক্তি ২৭বার ঈমানওয়ালাদের জন্য এস্‌তেগ্‌ফার করবে, আল্লাহ প্রতিদিন তাকে এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন, যাদের দু'আ কবুল করা হয়। এই দু'আটি প্রত্যেক দিন ২৭ বার পড়া চাই।

দু'আটি এই–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে, সমস্ত ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীদের মাফ করে দিন।'

দু'আটি দিনে ফজরের পরে বা অন্য কোনো সময়ে ২৭ বার পড়ে নেবে। এতে আল্লাহ তা'আলা তাকে এত কবুল করবেন যে, তাকে মুসতাজাবুদ্দাওয়াহর অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। আরেক বর্ণনায় আছে, যেব্যক্তি এই দু'আটি ২৭ বার পাঠ করবে, আল্লাহ তার আমলনামায় সারা দুনিয়ায়

যতজন মুমিন নারী-পুরুষ আছে, ততজন নারী-পুরুষের সমপরিমাণ নেক আমল দান করবেন।

আজ তো মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশি। আমরা শুধু মুছল্লায় বসে দু'আটি পড়ব আর শত-শত কোটি নেকির ভাগিদার হয়ে যেতে পারব। বাস্তবেই হাদীছগুলো পড়লে নবীজি আমাদের ওপর কত ইহসান করে গেছেন তার আন্দাজ তৈরি হয়, একটি ধারণা তৈরি হয়। বোঝা যায়, আল্লাহর পেয়ারা হাবীব কত ইহসান করে গেছেন আমাদের ওপর। যদি নবীজি এসব আমাদের না বলে যেতেন, তাহলে আমরা কী করে জানতে পারতাম এসব দু'আয় যে এত-এত নেকি হয়! এ তো আমাদের জন্য বড় ইহসান ও অনুগ্রহ। তিনি আমাদের জন্য ছোট-ছোট অথচ বেশি নেকি অর্জনে সহায়ক এমন দু'আগুলো শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমাদের উচিত এসবের যথাযত মূল্যায়ন করা। এগুলো আমলে বাস্তবায়ন করা।

শাহাদাতের মর্যাদা লাভ

ইমাম বোখারি ও তিরমিযি (রহ.) একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে হযরত বুরাইদাহ (রাযি.)-এর রেওয়ায়েতে। তিনি বলেছেন, যেব্যক্তি দিনে একবার সায়্যিদুল ইস্‌তিগ্‌ফার পড়ে নেবে, যদি সে এদিন মারা যায়, তাহলে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। অর্থাৎ– দুনিয়ায় তো সাধারণভাবে তার মৃত্যু হয়েছে; কিন্তু কেয়ামতের দিন তাকে শহীদগণের কাতারে দাঁড় করানো হবে।[১]

আহ! ঘরে বসেই তো শাহাদাতের মর্যাদা হাসিল হয়ে গেল। এমনিভাবে কেউ রাতে পড়লে আর সেই রাতেই তার মৃত্যু হলে সেও শাহাদাতের দরজা পাবে। দেখুন, আমরা যদি পাবন্দির সাথে নিয়মিত সকালে ও সন্ধ্যায় দু'আটি পড়তে পারি, তাহলে তো যেকোনো সময়ই মৃত্যু হয় আমরা শহীদি মর্যাদা পেয়ে যেতে পারি।

সায়্যিদুল ইস্‌তিগ্‌ফার হচ্ছে–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

১. সুনানে ইবনে মাজা ॥ হাদীছ নং ৩৮৬২

'হে আল্লাহ! আপনি আমার রব। আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা আর আমি নিজের সাধ্যপরিমাণ আপনার প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদার ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি। আপনার কাছে আমি যা কিছু করেছি, তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আপনার নেয়ামতের স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং আমার গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। কাজেই আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। গুনাহ মাফ করবার মতো আপনি ছাড়া আর তো কেউ নেই।'[১]

জাহান্নাম থেকে নাজাতপ্রাপ্তির দু'আ

তাবারানি ও আবু দাউদ-এ উল্লেখিত হাদীছ। হযরত আবু হারেস (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমরা ফজর ও মাগরিবের পর ৭ বার এই দু'আটি পড়ে নাও, যদি সেইদিন তোমার মৃত্যু এসে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেবেন, তোমাকে নাজাত দান করবেন। খুবই ছোট একটি দু'আ। মাগরিব ও ফজরের পর পড়ে নেওয়া চাই।[২]

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

এত ছোট দু'আ! অনেকের হয়তো মুখস্থ আছেও। এখন শুধু পাবন্দির সাথে আমল করলেই হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিন। আমীন।

নবীজির শাফাআত লাভ হবে

মাজমাউয-যাওয়ায়েদ কিতাব থেকে একটি হাদীছ বলছি। হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.) থেকে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যেব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় ১০বার করে আমার ওপর দুরুদ পাঠাবে, কেয়ামতের দিনে সে আমার শাফাআত লাভ করবে।

দেখুন, ১০বার দুরুদ শরীফ পাঠ করা কত সহজ কাজ। যদি একশত বার পড়ে নেয়, তাহলে কেমন লাভজনক বিষয় হবে নিজেই ভাবুন। মাত্র ১০বার পড়ার ব্যাপারেই তো বলা হয়েছে, এতে নবীজির শাফাআত পাওয়া যাবে। তাহলে শতবার পড়লে কেমন হবে?

---

১. সুনানে ইবনে মাজাহ ॥ হাদীছ নং ৩৮৬২

২. সুনানে আবী দাউদ ॥ হাদীছ নং ৩৮৬২

জ্ঞানী মানুষ

সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করার বিশেষ ছাওয়াবের কথা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আলী (রাযি.) বলেছেন, কোনো জ্ঞানবান মানুষ আয়াতদুটি পাঠ করা ছাড়া ঘুমুতেই পারে না। মানে যে আয়াতদুটি পাঠ না করে ঘুমুবে সে বিবেকবান নয়। সে বোঝেই না কেয়ামতের দিন কী অফুরন্ত নেয়ামত এতে পাওয়া যাবে। নবীজি ইরশাদ করেছেন, যেব্যক্তি শয়নের পূর্বে সূরা বাকারার দুটি আয়াত পড়বে, যদি সে ওই রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে না পারে, আল্লাহ তাকে তাহাজ্জুদের ছাওয়াব দিয়ে দেবেন। আহ! কত বড় কথা যে, দুটি আয়াত পড়লে তাহাজ্জুদের ছাওয়াব পাওয়া যাবে! আমরা চাইলেই তো প্রতিদিন তাহাজ্জুদের ছাওয়াব লাভ করতে পারি।

নবীজি হয়ে যাবেন জিম্মাদার

শেষে একটি হাদীছ বলছি। আজকের মজলিসের সমাপ্তি টানা হবে এখানেই। হাদীছটি হচ্ছে হযরত মুনযির (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যেব্যক্তি সকালবেলা এই দু'আটি ৩ বার পাঠ করবে, সে এত অধিক ছাওয়াব লাভ করবে যে, আত্মা আনন্দে নেচে উঠবে। সুবহানাল্লাহ! কত বড় ছাওয়াব। অথচ দু'আটি কত ছোট।[১]

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا

'আমি রব হিসেবে আলাহর প্রতি, দীন হিসেবে ইসলামের প্রতি এবং নবী হিসেবে মুহাম্মাদ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।'

তো সেই বড় ছাওয়াবটি কী, যা শুনলে আত্মা আনন্দে নেচে ওঠে। হ্যাঁ; হাদীছে এসেছে, যেব্যক্তি ফজরের পর ৩ বার এই দু'আটি পাঠ করবে, নবীজি বলেন, আমি তাকে হাতে ধরে জান্নাতে নিয়ে যাব। আমি তাকে জান্নাতে দাখিলের জিম্মাদার হয়ে যাব।

আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষণ

বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ.)কে জিজ্ঞেস করল, আমরা কীভাবে বুঝব, আল্লাহ আমাদের ওপর সন্তুষ্ট আছেন? তখন হযরত মূসা (আ.) তূর

---

১. মুসনাদে আহমাদ ॥ হাদীছ নং ১৮৯৬

পর্বতে গেলেন। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের কাছে তিনি প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ! কীভাবে জানতে পারব, আপনি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট আছেন? আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মূসা! আপনি আপনার কাওমকে বলে দিন, আল্লাহকে রাজি করা বড়ই সহজ। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পথ অত্যন্ত সুগম। তারা তাদের অন্তরের দিকে তাকাবে। যদি তাদের অন্তর আমার প্রতি রাজি থাকে, তাহলে আমিও তাদের প্রতি রাজী। আমিও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর যদি তাদের অন্তর আমার থেকে বিমুখ থাকে, তাহলে আমি তাদের থেকে বিমুখ থাকি।

তো বোঝা গেল, যে-বান্দা আল্লাহ তা'আলার ওপর রাজী, আল্লাহও সেই বান্দার ওপর রাজী। তিনিও বান্দার ওপর সন্তুষ্ট। আর আমাদের উল্লিখিত দু'আটির মধ্যে তো একথার ঘোষণা বড়ই প্ররিস্ফুট।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا

আমি আল্লাহর ব্যাপারে সন্তুষ্ট...।

এই দু'আটির ফজিলত এত বেশি যে, বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাকে হাতে ধরে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জিম্মাদার হয়ে যাবেন।

মাসনূন আমল জরুরি

আল্লাহ তা'আলা আমাদের উক্ত বিষয়গুলোর ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। দু'আগুলো মুখস্থ করে এর ওপর আমল করার অভ্যাস করে নেওয়া চাই। কিছু-কিছু সালেক বলেন, হযরত! বাইআতের পর আমাদের যেসব আমলের কথা বলেন, তাতে তো এসব নেই। আমি বলব, আরে ভাই! হযরতগণ তো মাসূনন আমল ছাড়া যেসব আমল আছে সেগুলোর কথা বলেন। মাসনূন আমল তো এমনিতেই মান্য করতে হবে। এ-ব্যাপারে আলাদাভাবে বলতে হবে না। এসব তো জরুরি। তারা তো বরং। মাসনূন আমল তো করবেনই। মাসনূন দু'আ তো পড়বেনই। সাথে-সাথে অন্যসব সহজ ও সাধারণ বিষয়ের প্রতিও যত্নবান হবেন। আল্লাহ আমাদের মতো দুর্বল বান্দাদের তাওফীক দিন। আমাদের নেককারদের মধ্যে শামিল করে নিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন ও গুরুত্ব

'তো এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ৭ বার কসম করেছেন। দেখুন, কোনো মহান ব্যক্তি যদি কোনো ব্যাপারে কোনো কথা একবার বলে দেন, তাহলে তা-ই যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যদি তিনি এভাবে কসম করে বলেন, তাহলে তো কথাটি মজবুত ও দৃঢ়তর হয়ে যায়। আর যদি ৭ বার কসম করে কোনো মহান ব্যক্তি কোনো বিষয়ে কথা বলেন, তাহলে তার কথা কতটুকু মজবুত হবে তা ভেবে দেখুন।

আল্লাহ ৭বার কসম করে বলছেন, যে নিজের আত্মাকে, নিজের ব্যক্তিত্বকে পরিশুদ্ধ করে নেয়, সেই সফলকাম। অর্থাৎ– যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করল না, সে ব্যর্থ। বলুন, এই তাযকিয়ায়ে নফ্সের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কত বেশি! অথচ আজ আমরা তাযকিয়ার ব্যাপারে, আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে বড়ই উদাসীন হয়ে আছি, বড় গাফেল হয়ে গেছি।'

আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন ও গুরুত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

মানুষের বিনির্মাণ

মানুষ মূলত দুটি জিনিসের সমষ্টির নাম। শরীর ও রূহ। শরীর স্থানতুল্য আর রূহ সেই স্থানে আসীন বস্তুতুল্য। শরীর মানবের প্রতিচ্ছবি ও বাড়তি জিনিস। আর রূহ মানুষের মূল ও আসল জিনিস। শরীর মাটি দ্বারা তৈরী আর রূহ আল্লাহর আমর বা হুকুমে নির্ধারিত একটি জিনিস। এই উভয় জিনিস দ্বারাই মানবের বিনির্মাণ।

দেহ নির্মাণের স্থান

দেহ নির্মাণের স্থান মায়ের উদর। মায়ের উদরে যদি কোনো সন্তানের দেহ পরিপুষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে তৈরী না হয়, তাহলে দুনিয়ায় এসে তা আর পূর্ণাঙ্গ হয় না। কোনো অঙ্গ অপুষ্ট ও বিকলভাবে মায়ের পেটে নির্মাণ হলে দুনিয়ায় এসে সেই অঙ্গ আর পুষ্ট হয় না। যেমন– কোনো সন্তান যদি মায়ের উদর থেকে অন্ধ হয়ে জন্ম নেয়, তাহলে দুনিয়ায় কোনোভাবেই আর দৃষ্টিশক্তি বা চোখ তৈরি করা যায় না। কোনো সন্তানের হাতের আঙ্গুলই যদি না থাকে, তবে কোনোভাবেই আঙ্গুল উদ্‌গত করা যায় না। কোনো বাচ্চার একটি হাত অপূর্ণ থাকলে বা কোনো একটি অঙ্গ না থাকলে তামাম পৃথিবীর সমস্ত শক্তি মিলে, সমস্ত ডাক্তার মিলে সেই অঙ্গ তৈরি করতে পারবে না। ডাক্তাররা স্বীকার করে নিয়েছেন, যেকোনো সন্তান যদি অপূর্ণ অঙ্গ নিয়ে জন্ম নেয়, তাহলে তা আর পূর্ণ করা যায় না–যে-অঙ্গটি নেই, তা তৈরি করা তো অনেক দূরের কথা।

ব্যক্তিত্ব নির্মাণের স্থান

একইভাবে মানবের ব্যক্তিত্ব নির্মাণের স্থান এই দুনিয়া, এই দুনিয়া নামক উদর। মানবের আদব-আখলাক, স্বভাব-চরিত্র চালচলন, উঠা-বসা, লেনদেন ও কথাবার্তা সবই সুন্দর, পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত করার স্থান এই দুনিয়া নামক উদর। যদি কারও ব্যক্তিত্বে এসব গুণ পরিপুষ্ট, প্রস্ফুটিত ও শোভিত না হয়, তবে আখেরাতে তা আর কোনোভাবে ঠিক করে নেওয়া যাবে না। তাই এখানে ব্যক্তি নির্মাণের এই উদরটার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের জীবন অনেক সংকীর্ণ; তবে বড়ই মূল্যবান এই জীবন।

তাযকিয়ার সাধারণ পরিচয়

যে মানুষ নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নেয়, যে নিজের নফসের তাযকিয়া করে নেয়, নিজের আধ্যাত্মিক চিকিৎসা করিয়ে নেয়, তাহলে সে তার জীবনকে কাজে লাগাল। সে তার জীবনকে মূল্যায়ন করল। তাযকিয়া আরবি ভাষার একটি শব্দ। শব্দটি কুরআনুল কারীমে ব্যবহার হয়েছে। শব্দটির উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিষ্কার করা, দোষত্রুটি মুক্ত হওয়া। যেমন– একটা ময়লা জামা। আপনি জামাটার ময়লা দূর করতে চাচ্ছেন। তাহলে শুধু জামাটা হাতে নিয়ে ঝাড়লে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে না। ইস্তিরি করে নিলেও পরিষ্কার হবে না। বরং জামার ময়লা দূর করতে হলে জামাটি প্রথমে পানিতে রাখতে হবে। তারপর সাবান লাগাতে হবে। তারপর তা সুন্দর করে খলিয়ে ধুতে হবে। এরপর নিংড়াতে হবে। এভাবে কয়েকবার ধুয়ে নিলে তারপর এর ময়লা দূর হবে। তো এই পদ্ধতিগুলোকেই তাযয়িয়া বলা হয়। অর্থাৎ– বোঝানো হয় যে, কাপড়টি পরিষ্কার হয়েছে। কাপড় থেকে ময়লা দূর হয়েছে।

তাযকিয়ার নানা তরিকা

কাপড়ের মতো মানুষেরও পরিচ্ছন্নতা আছে। মানুষের আত্মার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপার আছে। তবে প্রত্যেক জিনিস পরিচ্ছন্ন করার একেকটি পদ্ধতি আছে। সোনাকে পরিশুদ্ধ করতে হয় একভাবে। তাতে সাবান-পানি ব্যবহার করতে হয় না। সোনাকে নিখাঁদ করতে স্বর্ণকার তাকে গলিয়ে ফেলে। স্বর্ণ পরিষ্কার করার উপকরণ হচ্ছে আগুন। যখন সোনাকে আগুন দ্বারা গলিয়ে ফেলা হয়, তখন সোনা নিখাঁদ হয়ে যায়।

তো দেখুন. কাপড় পরিষ্কার করার পদ্ধতি এক রকম। সোনা পরিশুদ্ধ করার পদ্ধতি এক রকম। তেমনি করে আত্মাকে দূষণ থেকে পরিশুদ্ধ করার তরিকা ভিন্ন রকম।

আল্লাহর কাছে তাযকিয়ার গুরুত্ব

এই তাযকিয়ায়ে নফ্স এত জরুরি যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) বাইতুল্লাহ শরীফ সংস্কারকর্ম সম্পাদন করে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমি তো আপনার ঘর বানিয়ে দিয়েছি। এবার আপনি এই ঘরের আবাদকারী তৈরি করার সেই মহামানব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করুন। তিনি কেমন রাসূল হবেন দু'আয় সেকথা বলতে গিয়ে বলেছেন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'হে আমার রব! আপনি তাদের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের মাঝে আপনার আয়াত তেলাওয়াত করবেন এবং তাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও হেকমত আর তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয়ই আপনি দয়াবান ও হেকমতওয়ালা।'[১]

এখানে চারটি বিশেষণ পাওয়া যায় :

১. তাদের সামনে আমার আয়াত তেলাওয়াত করবেন।

২. তাদের কিতাবের শিক্ষা দেবেন।

৩. হেকমত শিক্ষা দেবেন।

৪. তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবেন।

এখানে চার নম্বর বিশেষণ এই বলা হয়েছে যে, তিনি মানুষের তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধি করবেন। তাদের হৃদয়কে পরিষ্কার করবেন। আল্লাহ তা'আলা নিজ মাহবুবকে এই দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন এবং প্রার্থিত এই চারটি গুণ নবীজিকে দান করেছেন। এই দু'আকে 'দু'আয়ে ইবরাহীমি' বলা হয়।

আল্লাহ নিজেও বলে দিয়েছেন–

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيٰتِنَا وَ يُزَكِّيكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

'যেমনিভাবে আমি তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকেই রাসূল প্রেরণ করেছি– তিনি তোমাদের মাঝে আমার আয়াত তেলাওয়াত করবেন, তোমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবেন, তোমাদের কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং শিক্ষা দেবেন সেসব বিষয়, যা তোমরা জান না।'[২]

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১২৯

২. সূরা বাকারা : আয়াত ১৫১

এখানে এই আয়াতে পূর্বের দু'আয়ে ইবরাহীমির ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম করে তাযকিয়াকে আগে আনা হয়েছে। অর্থাৎ– দু'আয়ে ইবরাহমীতে وَيُزَكِّيهِمْ কথাটি শেষে আনা হয়েছে আর এখানে وَيُزَكِّيكُمْ দুই নম্বরে আনা হয়েছে।

فِعْلُ الْحَكِيْمِ لَا يَخْلُوْا عَنِ الْحِكْمَةِ

'হাকিমের কাজ হেকমত বিনে নয়।'

এভাবে বলার পেছনে ও হেকমত আছে। পরোয়ারদেগারে আলম এতেও হেকমত নিহিত রেখেছেন।

বাস্তবতা এই যে, তাযকিয়া হাসিল করার জন্য কুরআন মাজীদে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত ৭ বার কসম খেয়েছেন। এছাড়া অন্য কোনো কাজ এমন নেই, যার জন্য লাগাতার ৭ বার ৭ বিষয়ের কসম খেয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

وَالشَّمْسِ وَضُحٰىهَا ۝ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ۝ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ۝ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ۝ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ۝ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ۝ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝

'সূর্য ও তার কিরণের শপথ! শপথ চাঁদের, যখন তা সূর্যের পশ্চাতে চলে যায়। শপথ দিবসের, যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে। শপথ রাত্রির, যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর। শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তাঁর। শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সে-ই সফলকাম হয়।'[১]

তো এখানে আল্লাহ তা'আলা ৭ বার কসম করেছেন। দেখুন, কোনো মহান ব্যক্তি যদি কোনো ব্যাপারে কোনো কথা একবার বলে দেন, তাহলে তা-ই যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যদি তিনি এভাবে কসম করে বলেন, তাহলে তো কথাটি মজবুত ও দৃঢ়তর হয়ে যায়। আর যদি ৭ বার কসম করে কোনো মহান ব্যক্তি কোনো বিষয়ে কথা বলেন, তাহলে তার কথা কতটুকু মজবুত হবে তা ভেবে দেখুন।

---

১. সূরা শাম্‌স : আয়াত ১-৯

আল্লাহ ৭বার কসম করে বলছেন, যে নিজের আত্মাকে, নিজের ব্যক্তিত্বকে পরিশুদ্ধ করে নেয়, সেই সফলকাম। অর্থাৎ– যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করল না, সে ব্যর্থ। বলুন, এই তাযকিয়ায়ে নফ্সের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কত বেশি! অথচ আজ আমরা তাযকিয়ার ব্যাপারে, আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে বড়ই উদাসীন হয়ে আছি, বড় গাফেল হয়ে গেছি।

প্রকৃত সাফল্যের মাপকাঠি

বাস্তবতা এই যে, তাযকিয়া আমাদের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। আমাদের সাফল্যের মাপকাঠি তাযকিয়ায়ে নফ্স। কুরআনুল কারীমে مفلحون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটি তিন বিষয়ে ব্যবহার করা হয়েছে।

১.

তাওবাকারীদের জন্য। ইরশাদ হচ্ছে।

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই তাওবা করো যেন আল্লাহর দরবারে তোমরা সফল হতে পার।'[১]

তো তাওবা দ্বারাও মানুষের সাফল্য আসে।

২. তাযকিয়া হাসিলকারীদের জন্য। ইরশাদ হচ্ছে–

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ

'যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করল, সে সফল হয়ে গেল।'[২]

৩. নামায দ্বারাও মানুষের সাফল্য অর্জিত হয়। ইরশাদ হচ্ছে–

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝٢

'সফল হয়ে গেছে মুমিনরা, যারা নিজেদের নামাযে বিনম্র করেছে।'[৩]

তো তিনটি জিনিস সাফল্য এনে দেয়। গুনাহ থেকে তাওবা করা, তাযকিয়ায়ে নফ্স এবং বিনয়াবনত হয়ে নামায আদায় করা। এখন যদি এই বিন্যাস গ্রহণ না করা হয়, তাহলে সাফল্য পাওয়া যাবে না।

---

১. সূরা নূর : আয়াত ৩১
২. সূরা আ'লা : আয়াত ১৪
৩. সূরা মুমিনূন : আয়াত ১, ২

'ফালাহ' কী

'ফালাহ' মানে বন্ধ দরজা খোলা। কৃষককে আরবিতে فَلَّاح (ফাল্লাহ) বলা হয় এজন্য যে, সে জমিন চাষ করে হাল দিয়ে মাটি খুলে দিয়ে তাতে বীজ বপণ করে। যে-বান্দার ঠোঁট খোলা, তাকে আরবিতে বলা হবে رَجُلٌ أَفْلَحُ (ঠোঁটখোলা মানুষ)। তো দেখা গেল, শাব্দিক অর্থ হচ্ছে উন্মুক্ত করা, উন্মোচিত করা। কিন্তু এর অর্থ কী? সাফল্য ও সৌভাগ্যের দরজা খোলা। খুলে নেওয়া বা দেওয়া। কামিয়াবির দরজা খুলে নেওয়া বা খুলে দেওয়া। বরকতের দরজা খুলে নেওয়া বা খুলে দেওয়া।

যে তাওবা করবে, আত্মশুদ্ধি করবে এবং খুব বিনয়ের সাথে নামায আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য বরকতের দরজা খুলে দেবেন। তাকে এমন কামিয়াব করবেন, যার পর আর কামিয়াবি নেই। তাকে এমন সাফল্য দান করবেন, যার পর ব্যর্থতা নেই। তাকে এমন ইজ্জত দান করবেন, যার পর অপমান নেই। তাকে এমনভাবে কবুল করবেন, যার পর আর বঞ্চনা নেই। একেই বলা হয় 'ফালাহ'। একেই বলা হয় সাফল্য ও কামিয়াবি।

তাযকিয়া হাসিলের তরিকা

এই সাফল্য মানুষের তাযকিয়ায়ে নফ্সের মাধ্যমে অর্জিত হয়। তো আমরা এই তাযকিয়ায়ে নফ্স হাসিল করব কীভাবে? এর জন্য মেহনত করতে হবে। ওলামায়ে কেরাম এর দুটি পথ বলেছেন। একটি হলো এই দুনিয়ায়, অন্যটি আখেরাতে।

জমিনের নাপাকি দূর করার পথ

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবি (রহ.) বলেছেন, যদি একটি জমিন নাপাক হয়, মল-মূত্র ও নাপাক বস্তু জমিনকে অপবিত্র করে দেয়, তাহলে তা পবিত্র করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে।

প্রথম পদ্ধতি : একটি পদ্ধতি তো এই যে, জমিনের সেই নাপাকটা তীব্র রোদে শুকিয়ে বা পুড়ে মাটির সাথে মিশে যায়, বিলীন হয়ে যায়। তার কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। সামান্য গন্ধ বা রং কিছুই পাওয়া যায় না। তো যখন এভাবে একেবারে নাপাকের নাম-নিশানা বিলীন হয়ে যাবে, ফোকাহায়ে কেরাম বলেন, তখন জমিনটি পবিত্র হয়ে যাবে যদিও প্রথমে তার ওপর নাপাকি ছিল। কিন্তু সূর্যের উত্তাপ জমিনের নাপাকি দূর করে দিয়েছে

এবং তাকে পবিত্র করে দিয়েছে। এটি একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে নাপাকিমিশ্রিত জমিন পবিত্র হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : নাপাক জমিনে তীব্রভাবে বৃষ্টি হয়। এমন বৃষ্টি হয় যে, বৃষ্টির ধারা সমস্ত নাপাকি ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলে। তারপর যখন জমিনটি শুকিয়ে যায়, ফোকাহায়ে কেরাম বলেন, তখন ওই জমিন পাক হয়ে যায়। জমিন পবিত্র হওয়ার দুটি তরিকা আমরা দেখতে পেলাম।

আত্মার জমিন পবিত্র করার পদ্ধতি

মানুষের আত্মা ও হৃদয় জমিনেরই মতো। এই জমিন পবিত্র করারও দুটি পদ্ধতি আছে।

১. শায়খের সোহবত : একটি পদ্ধতি তো এই যে মানুষটি কোনো একজন কামেল শায়খের সোহবত অবলম্বন করবে। পূর্ণ তালেবুল ইল্‌ম হয়ে তাদের থেকে ফয়েজ নেবে। তখন আল্লাহ তা'আলা শায়খের তাওয়াজ্জুহর বরকতে তার দুনিয়ার হৃদয়ের জমিন বদলে দেবেন। ফলে হৃদয় পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই তো ইরশাদ হচ্ছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।'[১]

এখানে হুকুম দেওয়া হচ্ছে, তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাকো। কোনো বান্দা কোনো শায়খের সাথে সম্পর্ক গড়বে। তারপর আর গাফলতি করবে না। এমন যেন না হয় যে, ডাক্তারের সাথে সম্পর্ক রাখা হলো বটে; কিন্তু ওষুধ খেয়ে যেসব জিনিস তার জন্য নিষিদ্ধ, সেই বিধিনিষেধ মেনে চলছে না। মনে করুন, কারও ডায়াবেটিস হলো। ডাক্তার থেকে সে প্রতিদিন ওষুধ আনে। ওষুধও সেবন করে আবার মিষ্টি ইত্যাদিও খায়। ডাক্তার তাকে বলবেন, আপনি সুস্থ হতে পারবেন না। ওষুধ ব্যবহার করা যেমন জরুরি তেমনিভাবে নিষিদ্ধ খাবার পরিহার করাও জরুরি।

হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

اَلْوِقَايَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْعِلَاجِ

'চিকিৎসা থেকেও উত্তম হচ্ছে নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করা।'

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৯

এমনিভাবে যদি শায়খের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, তাহলে সম্পর্ক স্থাপনের পর শায়খের বলে দেওয়া মা'মুলাত আদায় করবে। তাঁর দেখানো পথেই নিজেকে পরিচালিত করবে। এ তো গেল একটি কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, নিজেকে উদাসীনতা ও গুনাহ থেকে বাঁচাবে। যদি নিজেকে বাঁচানো না যায়, তাহলে শায়খের ফয়েজ-বরকত আসবে বটে; কিন্তু তা নিজের কোনো উপকার করবে না; বরং তা বিনষ্ট হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, বাটিতে বা পাত্রে আপনি পানি ঢালছেন ঠিক; কিন্তু বাটি ও পাত্র নিচ দিয়ে ছিদ্র। তো আপনি যতই পানি ঢালবেন, পানি কিন্তু বাটি বা পাত্রে বিদ্যমান থাকবে না। বরং তা নষ্ট হয়ে যাবে, পড়ে যাবে। কারণ, পাত্রটি ছিদ্র।

তেমনি আপনার ওপর তো আপনার শায়খের ফয়েজ ও বরকত বর্ষিত হচ্ছে ঠিক; কিন্তু আপনার ভেতরকার পাত্র ধারণক্ষমতাসম্পন্ন নয়। আপনার ভেতরকার পাত্র তো ছিদ্র। তাই কেউ যদি শায়খের সংস্পর্শে আসার পরও নিজের মাঝে কমতি দেখে, অপূর্ণতা দেখে, বরকত ও ফয়েজহীনতা দেখে, তাহলে নিজের ত্রুটির দিকে তাকাবে। নিজের ক্ষমতাহীন পাত্রের দিকে তাকাবে। আবিষ্কার করতে চেষ্টা করবে, নিজের কোনো অঙ্গনে ত্রুটি আছে, যার কারণে শায়খের সমস্ত ফয়েজ ও বরকত বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যে-ত্রুটির কারণে, নিজের ছিদ্র পাত্রের কারণে ফয়েজ ও বরকতটুকু হারিয়ে যাচ্ছে, তা নিজেই খুঁজে বের করে এর প্রতিকার করতে সচেষ্ট হবে। নিজের আমলকে ঠিক করে নেবে, গুনাহ থেকে বিরত থাকবে। উদাসীনতা, গাফলত থেকে আত্মরক্ষা করবে।

তো তাযকিয়ায়ে নফ্স হাসিল করার একটি পদ্ধতি তো এই যে, একজন মানুষ আল্লাহর কোনো খাস বান্দার ফয়েজ ও বরকত প্রাপ্ত হবে। তার সোহবতে, তার সান্নিধ্যে থাকবে এবং আত্মাকে আগাছা-পরগাছামুক্ত করতে চেষ্টা-সাধনা চালাবে।

২. অধিক পরিমাণে যিকির করা : দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করবে। আল্লাহর এই প্রাণ উজাড় করা যিকিরের বরকতেই আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। ফলে এই অফুরন্ত দানে ও বরকতে হৃদয়ভূমি একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। আত্মার অন্ধকার দূর হয়ে যায়। কলবের কালিমা মুছে যায়। তাই তো ইরশাদ হচ্ছে–

ذِكْرُ اللّٰهِ شِفَاءُ الْقُلُوْبِ

'আল্লাহর যিকির আত্মার নিরাময়।'

তাযকিয়া হাসিলের দুটি পদ্ধতি রয়েছে এই দুনিয়ায়। জ্ঞানী-গুণীর উভয় পদ্ধতিই প্রয়োগ করা উচিত। আপনি যখন ডাক্তারের কাছে যাবেন, তখন ডাক্তার যদি দেখেন, আপনার রোগের জন্য দুটি ওষুধ রয়েছে। দুই প্রকারের ওষুধ ও চিকিৎসাই প্রদান করবে। ডাক্তার ব্যবস্থাপত্রে উভয় ওষুধের নামই লিখে দেবেন। আজকাল তো ১০/১২ রকম ওষুধও ডাক্তার প্রদান করে থাকেন। আবার কোনো ওষুধ যদি দ্রুত কাজ করবে, বেশি উপকার দান করবে মনে করে, তাহলে ডাক্তার বলে দেন, এই ওষুধটি বেশি ফলদায়ক। বলে দেন, এই ওষুধটি দ্বারা দ্রুত সুস্থতা এসে যাবে।

তো আত্মার রোগের ওষুধও দুটি। একটি হলো যিকির, আরেকটি শায়খের সোহবত। সোহবত ও যিকির একটি আরেকটির সহায়ক। উভয়টি যথাসময়ে একসাথে ব্যবহার করতে হবে। সঠিকভাবে উভয়টিই প্রয়োগ করতে হবে। তাহলেই আল্লাহ অতি দ্রুত আত্মার রোগের শেফা দান করবেন। অভ্যন্তরীণ ব্যাধি থেকে মুক্তি দান করবেন।

আখেরাতে তাযকিয়ায়ে নফ্সের ব্যবস্থা

যদি কোনো মানুষ মেহনত-মোজাহাদা করে এই দুনিয়া থেকে তাযকিয়া হাসিল করে যেতে না পারে, মানুষটির মাঝে যদি সকল প্রকার আত্মার ব্যাধিই বিদ্যমান থাকে– হিংসা থাকে, বিদ্বেষ থাকে, পরনিন্দা থাকে, রাগ থাকে, কুদৃষ্টি থাকে, কৃপণতা থাকে, এমন সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ রোগ তার মাঝে বিদ্যমান থাকে আর এমন অবস্থায় সে দুনিয়া থেকে চলে যায়, তবে সে যদি কালেমাওয়ালা হয়, কালেমা নিয়ে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত আখেরাতে এই কালেমাওয়ালা মানুষটির জন্য তাযকিয়ার ব্যবস্থা করবেন, আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করবেন।

আখেরাতের চিকিৎসালয়

দুনিয়ায় কোনো মানুষ অসুস্থ হয়ে গেলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আত্মার ব্যাধির চিকিৎসার জন্য আল্লাহও আখেরাতে হাসপাতাল বানিয়ে রাখবেন। আর সেই হাসপাতালের নাম হচ্ছে জাহান্নাম! এই জাহান্নাম আত্মার ব্যাধির চিকিৎসার হাসপাতাল।

ইমার্জেন্সি রুম কবর

আপনি নিশ্চয় দুনিয়ার হাসপাতালে গিয়েছেন। সেখানে দেখবেন, একটি রুম আছে ইমার্জেন্সি রুম। কোনো রোগী গেলেই আগে ওই রুমে নিয়ে

যাওয়া হয়। সেই রুমে প্রাথমিক চেকআপ হয়। সেখানেই ওষুধ প্রয়োগ শুরু হয়ে যায়। সেখানকার কর্মরতরা বলেন, বড় ডাক্তার আসছেন, এসে তিনি আপনার বিস্তারিত বিবরণ শুনবেন। তখন বিস্তারিত চেকআপও হবে। তখন পূর্ণ ওষুধ দেওয়া হবে। রোগীকে এখন ভর্তি করুন। তারপর বড় ডাক্তার তাকে দেখবেন।

আখেরাতের মুআমালাও এমনই। যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তাকে সর্বপ্রথম কবর নামক ইমার্জেন্সি রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। কবরের ইমার্জেন্সি রুমে দুজন কর্মকর্তা ফেরেশতা আগমন করে। দুজনের নাম যথাক্রমে মুনকারও নাকীর! তাঁরা তিনটি বিষয়ে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করবে–

(১) مَنْ رَّبُّكَ

তোমার রব কে?

(২) مَنْ نَّبِيُّكَ

তোমার নবী কে?

(৩) مَا دِيْنُكَ

তোমার দীন কী?

যে এই তিনটি প্রশ্নে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারবে, তার খবর হয়ে যাবে, তার সাথে কী মুআমালা করা হবে। আর যদি গালেফ থাকে, গুনাহগার হয়, সে জবাব সঠিকভাবে দিতে পারবে না। জবাব না দিতে পারলে তার কবর জাহান্নামে পরিণত হয়ে যাবে।

আর যদি দুনিয়ায় বাতেনি রোগ থেকে শেফাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, অভ্যন্তরীণ ব্যাধি থেকে আরোগ্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে তার কবরকে জান্নাতে পরিণত করে দেওয়া হবে। যেমন– একটি মানুষ যদি সুস্থসবল হয়, তার সকল টেষ্টে সে সুস্থ প্রমাণিত হয়, তাহলে ডাক্তার চেকআপ করানোর পর বলেন, আপনার সবই ঠিকঠাক আছে। আপনি গিয়ে এসি রুমে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনার রিপোর্ট পূর্ণাঙ্গ করে নিয়ে আসছি। তো যখন ফেরেশতাগণ নেক লোকদের প্রশ্ন করবেন, তখন সে সহজেই জবাব দিয়ে দিতে পারবে। আর সাথে-সাথেই তার কবরটিকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করে দেওয়া হবে। বলা হবে, নিন; আপনি এই স্থানটায় বসে আরাম করুন।

نَمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُوْس

'নতুন দুলার মতো ঘুমাও।'

বেশ কষ্ট করে এসেছ। তোমার শরীরটা ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত! আরাম করো কেয়ামতের দিন আসা পর্যন্ত। আখেরাতের দিন পর্যন্ত তুমি আরাম করতে থাকো।

যদি বান্দা গুনাহগার হয়, যদি পাপাচারী, অন্যায়কারী হয়, রুগ্‌ণ হয়, তাহলে তো তাকে কিছু ব্যবস্থা দিতেই হবে যে, তার মাঝে অসুস্থতা বিরাজ করছে, রোগব্যাধি বিদ্যমান রয়েছে। দুনিয়ায় যখন মানুষ অসুস্থ হয়, হাসপাতাল যাওয়ার পর তার রোগ ধরা পড়ে, তখন চিকিৎসা প্রদান করা হয়, ওষুধ দেওয়া হয়, রোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কারও মাথাব্যথা হলে মাথাটা টিপে দিতে হয়। পা ব্যথা হলে বা কোমর ব্যথা হলে টিপে দিতে হয়ে। তো কবরে গেলে কবরের মাটিও তাকে চেপে ধরবে। তারই নাম কবর সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া। মাটি তাকে কঠিনভাবে চাপ দেবে, সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে পাঁজরের হাঁড় একটি আরেকটিতে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে। হাঁড়গোড় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। সেদিন কবর বলবে, আমার সবচেয়ে বেশি ঘৃণা তোমার প্রতি ছিল। কারণ তুমি অবাধ্য ছিলে। আজ আমার হাতে এসেছ; দেখো আমি তোমাকে কেমন করি? কবর তাকে প্রচণ্ড জোরে চাপ দেবে। সংকীর্ণ হয়ে যাবে কবরের পেট। এমন হবে যে, পাঁজরের একটা হাঁড় অপর হাঁড়ে ঢুকে পড়বে। অত্যন্ত কঠিন এক পরিস্থিতি হবে।

কবরে গ্লুকোজের বোতল

তারপর এভাবে কবরের দুই প্রান্ত মিলিত হয়ে চাপ দেওয়ার পর দুনিয়ার ইমার্জেন্সি রুমে যেভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে প্রাথমিক পর্যায়ের ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, মূল ডাক্তার আসার পূর্বে তাকে কিছু ওষুধ দেওয়া হয়, তেমনি কবর নামক ইমার্জেন্সি রুমে আল্লাহর পক্ষ থেকে গুনাহগার বান্দাকে প্রাথমিক ওষুধ প্রয়োগ করা হবে। হাদীছের দিকে তাকালে বোঝা যায়, বেনামাযীর কবরে বিশাল একটা বিষাক্ত সাপ নিয়োগ করে দেওয়া হবে। সে ফজর নামাযের কারণে ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত থেকে-থেকে দংশন করতে থাকবে। বিষে তার শরীরটা নীল হয়ে যাবে। তারপর এই ব্যথা-বেদনা চলে যাবে। সাপ আবার তাকে দংশন করতে থাকবে। এভাবে আবারও তার সমস্ত শরীরে সাপের বিষ ক্রিয়া করতে থাকবে, তাকে পীড়ন দিতে থাকবে। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

কবরে প্রহার

অন্যান্য অপরাধের জন্য শায়েস্তা করতে আসবেন আরেক ফেরেশতা। তার হাতে থাকবে লৌহগদা। এর দ্বারা প্রচণ্ডভাবে পিটানো হবে। কেয়ামত পর্যন্ত এই ফেরেশতা তাকে প্রহার করে যাবে অবিরতভাবে।

কেয়ামতের দিনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ সুওয়াল

কেয়ামতের দিন মানুষ আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে তার সারা জীবনের ইতিহাস জিজ্ঞেস করবেন। সারা জীবনের সমস্ত কর্মের ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হবে। যেমন– একজন ডাক্তার রোগীকে জিজ্ঞেস করে, কখন থেকে অসুস্থতা বোধ করছে, কীভাবে হয়েছে, কেমন লাগছে। আল্লাহ তা'আলাও তেমন করে চারটি প্রশ্ন করবেন। প্রথম প্রশ্ন হবে, এই হে আমার বান্দা! তুমি তোমার জীবন কীভাবে কাটিয়েছ বলো। নেক কাজ করে ভালো পথে জীবন কাটিয়েছ, নাকি বদ কাজ করে ভ্রান্ত পথে নিজেকে পরিচালিত করেছ?

তারপর জিজ্ঞেস করবেন, তোমার যৌবনকে কীভাবে কাটিয়েছ? যৌবনের ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হবে। আজকের এই জওয়ানি, এই মাস্তানি, এই উন্মাদনার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে– বলো, আমি তোমাকে যৌবন দান করেছি, যৌবনকে তোমার মাঝে আমানত রেখেছি। এই আমানত তুমি নষ্ট করে দিয়েছ, না কাজে লাগিয়েছ। তুমি এর মূল্যায়ন করেছ, নাকি অবমূল্যায়ন করেছ? তারপর আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি সম্পদ কোথা থেকে কোন পথে উপার্জন করেছ? শেষ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, তুমি তোমার এলেম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছ? এবার এই চার প্রশ্নের জবাব দ্বারাই স্পষ্ট হয়ে যাবে, এ বান্দার জীবন কোন পথে কীভাবে অতিবাহিত হয়েছে। কীভাবে সে তার দুনিয়ার জিন্দেগি কাটিয়েছে?

জাহান্নামের হাসপাতালের স্তর

তিনিই প্রকৃত ডাক্তার, যিনি পরাক্রমশালী পরোয়ারদেগারে আলম। ইরশাদ হচ্ছে–

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

'যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই শেফা দান করেন।'[১]

---

১. সূরা শু'আরা : আয়াত ৮০

তিনি বান্দার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করে দেন। তিনি তার চিকিৎসা যেভাবে করবেন, সেভাবে বিচিত্র রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

আজকের দুনিয়ার দিকে লক্ষ করে দেখুন। হাসপাতালগুলোতে নানারকম বিভাগ থাকে। কিছু থাকে Ordinary বা সাধারণ বিভাগ। এমন ওয়ার্ডে যে কেউ প্রবেশ করতে পারে; কোনো বারণ বা নিষেধাজ্ঞা থাকে না। আবার আরেকটি বিভাগের নাম E. C. U. অর্থাৎ- Extensive Care Unit এটি একেবারে সুরক্ষিত ওয়ার্ড। হার্টের রোগীদেরই সাধারণত এখানে রাখা হয়। একেই সংক্ষেপে E. C. U. বলা হয়। দীর্ঘ দিনের রোগাক্রান্ত কিছু মানুষ থাকে, যারা দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে না। তাদের যে বিভাগটিতে রাখা হয়, তাকে বলা হয় Tertiary Care Unit তো এখানে সাধারণত টি. বি. রোগে আক্রান্তদের রাখা হয়। যাদের দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে হয়, তাদেরকেই এখানে, এই বিভাগে ভর্তি করানো হয়।

তো দেখুন, হাসপাতালের রয়েছে নানা রকমের বিচিত্র বিভাগ ও ইউনিট। তেমনি জাহান্নামের বিচিত্র রকম শ্রেণি ও বিভাগ থাকবে। কারণ, জাহান্নামও তো একটি হাসপাতাল।

সর্বনিম্ন শ্রেণি

তো জাহান্নামের বিভিন্ন ইউনিট থাকবে, বিভিন্ন স্তর থাকবে, শ্রেণিবিন্যাস থাকবে। যারা মুশরিক, কাফের, মুনাফিক আল্লাহ তাদের সর্বনিম্ন স্তরে রাখবেন।

ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

'মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।'[১]

তাদের বলা হবে, তোমাদের এই রোগের নিরাময় নেই! কাজেই তোমাদের জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে রেখে দেওয়া হবে। দেখুন, আমি যখন সফরে যাওয়ার সময় সামানা গুছিয়ে নিই, তখন ব্যাগের ওপরিভাগে বেশি জরুরি জিনিসগুলো রাখি, যেন প্রয়োজনের সময় দ্রুত বের করতে পারি। আর যে জিনিসের জরুরত কম হয়, তা ব্যাগের নিচের দিকে রাখি।

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১৪৫

আল্লাহও মুনাফিকদের একেবারে নিচে ফেলে রাখবেন। কারণ, তাদের কোনোদিন জাহান্নাম থেকে বের করতে হবে না। মুনাফিকদের জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না। তারা চিরকাল জাহান্নামেই থাকবে। তারপর এদের ওপরে কাফেরদের রাখা হবে, মুশরিকদের রাখা হবে, অগ্নিপূজারিদের রাখা হবে। তারপর ইহুদিদের রাখা হবে। তারপর খ্রিষ্টানদের রাখা হবে। এভাবে একের ওপর অন্যকে রাখতে রাখতে সবার ওপর যে-স্থানটি হবে, সেটিকে জাহান্নাম বলা হবে। এখানে এমনসব মানুষকে রাখা হবে, যারা কালেমা পড়েছিল; কিন্তু নিজের নফসের অনুসরণ করে-করে গুনাহে লিপ্ত ছিল। তাদের জাহান্নামের সবচেয়ে ওপরের ইউনিটে রাখা হবে। তাদের বলা হবে, তোমাদের রোগ তো দ্রুতই আরোগ্য হয়ে যাবে। তাই তোমরা এখানে সবার ওপরেই থাকো। রোগ দূর হলেই তোমাদের হাসপাতাল থেকে স্থানান্তর করে নেওয়া হবে।

তো দেখুন, এভাবে বিভিন্ন প্রকারের ওয়ার্ড থাকবে জাহান্নামে।

স্পেশাল রুম

তো প্রত্যেক গুনাহগারকে তার রোগ অনুযায়ী, তার অন্যায় অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট দেওয়া হবে। আপনি দেখে থাকবেন হয়তো, হাসপাতালে ছোট-ছোট বিভিন্ন কামরা তৈরি করা থাকে। কিছু অসুস্থদের জন্য আলাদা বেড তৈরি করা থাকে। তাদের অচ্ছুৎ রোগ থাকে। তাই তাদের বেড আলাদা করে দেওয়া হয়, যেন এদের কারণে অন্যরাও অসুস্থ না হয়ে পড়ে। তো জাহান্নামেও এমনটি হবে। এত ছোট জায়গা দেওয়া হবে যে, বলা হয়েছে مَكَانًا ضَيِّقًا এটি কুরআনের শব্দ। এত ছোট জায়গা দেওয়া হবে যে, তার জন্য ওঠাবসাও বেশ কষ্টকর হয়ে উঠবে। অসহ্য হয়ে সে বলবে–

دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا

'তখন তারা মৃত্যুকে আহ্বান জানাবে!'[১]

তাকে লক্ষ করে বলা হবে–

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا

'আজ একটিমাত্র মৃত্যু কামনা করো না; বরং বহু মৃত্যু কামনা করো।'[২]

---

১. সূরা ফুরকান : আয়াত ১৩

২. সূরা ফুরকান : আয়াত ১৪

কবির ভাষায়–

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے
مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

'আজ তো শঙ্কিত হয়ে বলছ, মরে গেলেই তো মুক্তি পেতাম; কিন্তু মরেও যদি মুক্তি না পাও, তবে কোথায় যাবে? তো এমন ছোট জায়গায় তাকে রাখা হবে শুধু কষ্ট দেওয়ার জন্যই।

জাহান্নামের খাবার

জাহান্নামে বান্দাকে খাবার দেওয়া হবে। দেখুন, দুনিয়ায় অসুস্থদের কিছু সুনির্ধারিত খাবার প্রদান করা হয়। তারা কিন্তু মজাদার কোনো খাবার খেতে পারে না। অতি সাধারণ খাবার দেওয়া হয় রোগীদের। বেছে-বেছে নির্ধারিত কিছু খাবারই তাদের দেওয়া হয়। অন্যদের জন্য এসব খাবার বরং বিস্বাদও বটে। অনেক সময় তো দেখা যায়, আমরা এ খাবার খেতেও পারি না। ঠিক তেমনিভাবে জাহান্নামে সুনির্ধারিত কিছু খাবার প্রদান করা হবে। জাহান্নামের এই রোগীদের বিস্বাদ খাবার দেওয়া হবে। জাহান্নামিদের ক্ষুধা লাগবে। ফেরেশতার কাছে জাহান্নামিরা খাবার চাইবে। ফেরেশতা তাদের যাক্কুম নামক ফল দেবে। কুরআনুল কারীমে এ-ব্যাপারটির বর্ণনায় ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾

'নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ। গুনাহগারের খাবার হবে। পেটের ভেতর তা গলিত তাম্রের মতো ফুটতে থাকবে।'[১]

তো দেখুন, যাক্কুম গাছের ফল খাওয়ানো হবে। ফলটা অত্যন্ত তিক্ত হবে, কন্টকপূর্ণ হবে। এটা ভক্ষণের সাথে-সাথে পেটটা মোচড় দিয়ে ফুটতে থাকবে। দুনিয়ার রোগের ওষুধের মতোই জাহান্নামির এই ওষুধ বড় তিক্ত হবে। দেখবে, গাছের রস ইত্যাদি মিশ্রিত করে আমাদের মা-চাচিরা অনেক সময় বিভিন্ন ওষুধ তৈরি করেন। তা অত্যন্ত তিক্ত হয়ে থাকে। তবুও রোগমুক্তির জন্য তারা তা প্রয়োগ করেন। তো তিক্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা তা ভক্ষণ করেন বা বাচ্চাদের সেবন করান।

তো কেন এমন করেন? কারণ, এই তিক্ততা উপকারী। যেসব মানুষের ডায়াবেটিস আছে, তারা করলা খেয়ে থাকেন। অন্যদের কাছে তা খুবই মন্দ

---

১. সূরা দুখান : আয়াত ৪৬

লাগে। কিন্তু ডায়াবেটিসের রোগী তা দিব্বি খেয়ে বেড়ায়। তো আল্লাহ তা'আলাও জাহান্নামে যাক্কুম ভক্ষণ করাবেন। এটি করলারই মতো। তবে তাতে তিক্ততা বেশি হবে যে, যদি এই যাক্কুম সামান্য পরিমাণও মুখে লাগানো হয়, তার তিক্ততা কয়েকদিনেও দূর হবে না। তো এই তিক্ত ফলই জাহান্নামে জাহান্নামিদের খাবার হিসেবে পেশ করা হবে।

জাহান্নামের পানীয়

ওই খাবার গ্রহণের পর জাহান্নামি তীব্র পিপাসার্ত হয়ে বলবে, আমার পিপাসা পেয়েছে, আমাকে পানি দাও। কিন্তু রুগ্‌ণ ও আক্রান্ত ব্যক্তিকে তো যেকোনো পানীয়ই পান করতে দেওয়া হয় না। বরং সর্দি ও জরাক্রান্ত ব্যক্তিকে ঠান্ডা পানি দেওয়া হয় না। ডায়াবেটিসের রোগীকে মিষ্ট কোনো জিনিস পান করতে দেওয়া হয় না। মিষ্ট শরবত তাকে পান করতে দেওয়া হয় না। বরং রোগীদের ভেবেচিন্তে সুনির্দিষ্ট কোনো পানীয় পান করতে দেওয়া হয়।

এমনিভাবে জাহান্নামিরা যখন কোনো কিছু পান করতে চাইবে, তাকে ঠান্ডা পানি দেওয়া হবে না। হাদীছে পাকে এসেছে, যখন ওই বান্দা পানি চাইবে, তখন ফেরেশতা পান করানোর জন্য পেয়ালায় কিছু পানীয় নিয়ে আসবে। দেখা যাবে, পেয়ালায় পুরো জাহান্নামিদের রক্ত, পুঁজ আর পানি। এগুলোই জমা করে পেয়ালায় ভরে-ভরে জাহান্নামিদের পান করতে দেবে।

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۝ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝

'এবং ক্ষতনিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত কোনো খাদ্য নেই। পাপাচারী ও অন্যায়কারী গুনাহগার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না।'[১]

দেখুন, কুরআনেই রয়েছে যে, তাদের খাবার হবে ক্ষতস্থাননিঃসৃত পুঁজ। এখানে غِسْلِين শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। غِسْلِين মানে জাহান্নামিদের শরীরের পুঁজ, রক্ত ও পানি।

সেখানে তাদের খাবার হবে এগুলো। কারণ তারা দুনিয়ায় এমন কাজই করে এসেছে যে, তাদের জন্য এই খাবারই উপযুক্ত। তাদের আত্মার রোগের কারণে জাহান্নামের চিকিৎসালয়ে তাদের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে এই খাবার। দুনিয়ায় যদি আত্মার এসব রোগব্যাধি, এসব গুনাহ ছেড়ে সুন্দর আমল করতে, তাহলে এই পুঁজ আর বিগলিত পানি ও রক্ত খেয়ে জাহান্নাম

---

১. সূরা হাক্কা : আয়াত ৩৬, ৩৭

নামক হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হতো না। গুনাহ দূরীকরণের জন্যে এই শাস্তির সম্মুখীন হতে হতো না। তুমি যা করেছ, তা-ই এখানে এই আখেরাতে প্রাপ্ত হতে যাচ্ছ। তুমি রক্ত, পুঁজ, পানি খাওয়ার উপযোগী কাজ করে এসেছ। তাই এগুলোই ভক্ষণ করো; এগুলোই তুমি সেবন করো। তো এভাবে জাহান্নামিকে তার গুনাহ অনুপাতে শাস্তির মেয়াদের শেষ দিন পর্যন্ত দেওয়া হবে। এভাবেই সে জাহান্নামে কালাতিপাত করতে থাকবে।

জাহান্নামের হাসপাতালের ইউনিফর্ম

দুনিয়ার হাসপাতালগুলোতে কর্মকর্তারা প্রবেশ করতে হলে একটি বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান করতে হয়। আর এই পোশাক না পরলে তাকে গেটেই বলে দেওয়া হয়, ভাই! হাসপাতালের পোশাক পরে এসো; এই সাধারণ পোশাকে তুমি এখানে কাজ করতে পারবে না। তো আল্লাহর সেই জাহান্নাম নামক হাসপাতালেরও একটি নির্ধারিত পোশাক আছে। সেই পোশাক পরেই জাহান্নাম নামক হাসপাতালে প্রবেশ করতে হয়। কেমন সেই পোশাক? ইরশাদ হচ্ছে–

سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ

'তাদের জামা হবে আলকাতরার।'[১]

আর

وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ

'তাদের চেহারাগুলোকে ঢেকে নেবে আগুন।'[২]

আলকাতরা এমন একটা পদার্থ, যা বহু দিন টিকে থাকে। কোথাও যদি তা রেখে দেওয়া হয়, তাহলে বহুকাল পর্যন্ত গন্ধ ছড়াতে থাকে। আর জাহান্নামের পদার্থ তো অনেক মারাত্মক হবে। ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, যদি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে, সমস্ত পশু-পাখিকে, জল ও স্থলের সমস্ত প্রাণীকে এক জায়গায় নিয়ে আসা হয়; তারপর সবগুলোকে মৃত্যু দেওয়া হয় এবং এখানেই সবগুলো পচে-গলে যায়, এই গলনের ফলে যে দুর্গন্ধ তৈরি হবে, তার চেয়ে বহুগুণ তীব্র ও মারাত্মক অসহ্য দুর্গন্ধ হবে জাহান্নামিদের পোশাক।

---

১. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৫০

২. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৫০

মানুষ দুনিয়ার মধ্যে সামান্য ঘামের গন্ধ থেকে মুক্তির জন্য কত রকম স্প্রে ব্যবহার করে। জার্মানি স্প্রে, ইতালি, ইউরোপ, আমেরিকা লন্ডন ও সিঙ্গাপুরের স্প্রে ব্যবহার করে শুধু গায়ের গন্ধ দূর করবার জন্য। কিন্তু দেখুন, জাহান্নামে এমন কাপড় পরিধান করানো হবে, যার মধ্যে এমন খারাপ দুর্গন্ধ হবে যে, সারা দুনিয়ার প্রাণীকুলকে গলিত করলেও এত খারাপ দুর্গন্ধ হবে না। বুঝুন এবার জাহান্নামিদের পোশাক কেমন হবে আর কেমন হবে তাদের গায়ের গন্ধ।

পর্দাহীন নারীর সাজা

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! সবরকম গুনাহের জন্যেই আযাব দেওয়া হবে। পর্দা না করার কারণে, পর্দামতো না চলার কারণেও আযাব দেওয়া হবে। কোনো-কোনো জাহান্নামি এমন থাকবে, যাদের কাপড়ই দেওয়া হবে না পরিধানের জন্য। যেমন– দুনিয়ার হাসপাতালগুলোতে আমরা দেখছি, যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের কোনোরূপ পোশাকই পরিধান করানো হয় না। তাদের শরীরে Pickups লাগিয়ে দেওয়া হয়। একটি কাপড় তার শরীরের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অপারেশনের জন্য নিতে হলে রোগীর সাধারণ পোশাক রেখে দেওয়া হয়। শুধু এক খণ্ড স্বাভাবিক কাপড় তার শরীরের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এমন একটা দৃশ্য, এমন একটা অবস্থা জাহান্নামেও সৃষ্টি হবে।

ভালো করে শুনুন। হৃদয়ের কান দিয়ে শ্রবণ করুন। আমি এই কথাটি নিজের জিম্মাদারিতে বলছি। হাদীছসমূহে এসেছে, যে-নারী দুনিয়ায় পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করবে, কেয়ামতের দিন তাদের রূহকে উলঙ্গ করে মানুষের সামনে দিয়ে নেওয়া-আনা করবে। তাদের শায়েস্তার জন্য তা করা হবে। আজ পুরুষকে যদি বলা হয়, লোকদের সামনে তোমাকে বিবস্ত্র করে দেওয়া হবে, একথা শুনেই সে লজ্জিত হয়ে যায়। পুরুষ বলে, জমিন ফেটে যাক, আমি তার ভেতর চলে যাব। আমাকে লোকদের সামনে লজ্জিত না করা হোক। নারীদের জন্য তো এটা আরও বেশি লজ্জাজনক। নারীরা তো এমন ক্ষেত্রে আরও বেশি লজ্জা বোধ করবে। নারীকে যদি এমন কথা বলা হয়, তাহলে সে আত্মহননের পথ খুঁজবে।

দেখুন, সকল আত্মীয়ের সামনে, সকল পরিচিত মানুষের সামনে তাকে শায়েস্তা করার জন্য কেয়ামতের দিন বিবস্ত্র করে ফেলা হবে। কেমন লাগবে তখন? কেমন হবে সেই ব্যাপারটা? এরা হবে সেসব মহিলা, যারা আল্লাহর হুকুম পর্দার ব্যাপারে নাফরমানি করেছে আর দুনিয়ায় পর্দাহীনভাবে ঘুরেছে।

আজ কেয়ামতের দিন সে-কারণেই তাদের এভাবে অপমানিত করে সাজা দেওয়া হচ্ছে। জাহান্নামে এভাবেই তাদের বিবস্ত্র করে রাখা হবে।

আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে মাহরুম হবে

ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনুন। হাদীছ শরীফে এসেছে, যে-নারী একথা ভেবে ঘুরবে যে, তাকে কোনো পরপুরুষ দেখতে পাবে, তাকে পছন্দ করবে, তার সাথে সম্পর্ক গড়বে, তার সাথে আমোদ-প্রমোদ ও গল্প করবে; সেজন্য সে সাজগোজ করে, সুসজ্জিত হয়, নিজেকে অন্যের সামনে প্রদর্শন করে, ভাবে আমাকে লোকেরা দেখবে, আমার দিকে ব্যাকুল হয়ে তাকাবে, আমাকে তারা কামনা করবে, আমার রূপ দেখে মুগ্ধ হবে; বাজারে শপিং করতে যায়। খুব সজ্জিত হয়ে পর্দাহীনভাবে মার্কেটে যায়। ঘরে স্বামীর সামনে সাধারণ পোশাক পরে, মেকাপ ছাড়া থাকে আর বাইরে বেরুবার সময় মেকাপ করে সেজেগুজে বের হয় অন্যকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য। এই অভ্যাসগুলো আজকের নারীদের মধ্যে অনেক বেশি দেখা যায়। তারা যে এসব করে মারাত্মক ভুল করছে, সেই চিন্তাই তারা করছে না। কেয়ামতের দিনে এমন নারীদের সাজাদানের ব্যাপারে হাদীছে ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ তাদের এই শাস্তিও দেবেন যে, তাদের দিকে আল্লাহ তা'আলা মহব্বতের নজরে তাকাবেন না। রহমতের দৃষ্টি দেবেন না তাদের প্রতি। তিনি বলবেন, তোমরা দুনিয়ায় এজন্য সাজসজ্জা গ্রহণ করতে যেন তোমাদেরকে পরপুরুষরা দেখে, তোমাদের দিকে তাকায়, তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আজ তোমাদের দিকে আমি মহব্বতের নজরে দেখব না। আজ তোমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেব না। চলে যাও; আমার সামনে থেকে চলে যাও! তখন খুব বুঝে আসবে, ভালো করে বুঝে আসবে, আহ দুনিয়ায় কী করেছি! হাদীছে আরও ইরশাদ হয়েছে, যে-নারী বেপর্দাভাবে ঘরের বাইরে যাবে। যতক্ষণ ঘরে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ফেরেশতা তাদের লা'নত দিতে থাকে। দেখুন, কত মারাত্মক ব্যাপার! বেপর্দায় ঘোরা, পরপুরুষের সাথে দেখা দেওয়া কত মারাত্মক অন্যায়!

দেখুন, দুনিয়ায় এমন কিছু রোগী থাকে, যাদের আমরা মানসিক রোগী বলি। তাদের জ্ঞান ও ব্রেন ঠিক থাকে না। এরা বিকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন। এদের উন্মাদ বা পাগল বলা হয়। এরা নিজেরা হাসপাতালে যায় না। লোকজন ধরে জোর করে তাকে হাসপাতাল নিতে হয়। এদের খুব কষ্ট করে চিকিৎসা প্রদান করতে হয়। তেমনিভাবে আখেরাতেও জাহান্নাম নামক হাসপাতালে এমন রোগীদের আনা হবে। কেয়ামতের দিন এমন কিছু লোক পাওয়া যাবে, যখন

তাদের জাহান্নামের হুকুম দেওয়া হবে, তাদের ধরার জন্য ফেরেশতারা আসবে, তাদের ধাক্কাতে-ধাক্কাতে জাহান্নামে ফেলবে। দেখুন, কাউকে শান্তভাবে জেলে নিয়ে যাওয়া হয় আবার কাউকে অপমান করার জন্য ধাক্কাতে-ধাক্কাতে জেলে নেওয়া হয়। আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ إِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا

'সেদিন তাদের হাজান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে-মেরে নিয়ে যাওয়া হবে।'[১]

আয়াতটি পড়লে সহজেই বোঝা যায় কেমন ধাক্কা দেওয়া হবে। দেখুন, কুরআনের শুধু শব্দের প্রভাব কত! অর্থগত একটি প্রভাব তো আছেই। শোনার প্রভাবও আছে। শুনেই বোঝা যায় আয়াতটিতে কী বলতে চাওয়া হচ্ছে। দেখুন কেমন করে বললেন আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা।

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ إِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا

'তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে অপমানিত করে-করে জাহান্নামে ফেলবে। কত ভয়ংকর ব্যাপার! কত কঠিন কথা!

চামড়া পরিবর্তনের আযাব

জাহান্নামে কিছু মানুষকে এমন শাস্তি দেওয়া হবে যে, চামড়া পুড়িয়ে দেওয়া হবে। এতে তাদের খুব কষ্ট হবে। যখন তাদের চামড়া পুড়ে যাবে, আল্লাহ তাকে নতুন চামড়া দান করবেন। আবার চামড়া জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। আবার নতুন চামড়া লাগানো হবে। এভাবে তাকে শায়েস্তা করা হতে থাকবে।

ইরশাদ হচ্ছে–

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ

'তাদের চামড়াগুলো যখন পুড়ে যাবে, তখন আমি আবার তা পরিবর্তন করে অন্য চামড়া লাগাব, যেন তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে।'[২]

তো এভাবে চামড়া বারবার পরিবর্তন করা হবে। বারবার পোড়া হবে। আবার নতুন চামড়া পরানো হবে।

---

১. সূরা তূর : আয়াত ১৩

২. সূরা নিসা : আয়াত ৫৬

জাহান্নামিদের দেহাবয়ব

জাহান্নামে মানুষের শারীরিক গঠন দুনিয়ার আকৃতির মতো এত ছোট হবে না। বরং বহুগুণ বড় হবে একেকজন মানুষের আকৃতি। দুই কাঁধের মধ্যখানের ব্যবধান হবে বেশ দীর্ঘ। দাঁতগুলো হবে বড়-বড় পাহাড়ের মতো। মাথা হবে অনেক বড়। শরীরটাকে এত বড় ও সুদীর্ঘ করে দেওয়া হবে, যেন বিশাল এই দেহে বেশি পরিমাণে আগুন আচ্ছন্ন করে তাকে অধিক শায়েস্তা করতে পারে। তাকে যেন বড় শরীরে বেশি শাস্তি দেওয়া যায়।

মুহাদ্দিছীনে কেরাম লিখেছেন, ডাক্তারদের বিশ্লেষণ তো এই যে, মানবদেহে যে-রক্ত তৈরি হয়, ১১৯ দিন পরপর পূর্বের রক্ত নিঃশেষ হয়ে শরীরে নতুন রক্ত জন্ম নেয়। প্রত্যেক নতুন সৃজিত রক্তের মেয়াদ মাত্র ১২০ দিন। রক্তের যে-ফোঁটাটা আজ জন্ম নিল, ১২০ দিন পর তার স্থলে জন্ম নেবে নতুন আরেক ফোঁটা রক্ত। এভাবে সমস্ত রক্ত পর্যায়ক্রমে নতুন-নতুনভাবে জন্মাতে আর নিঃশেষ হতে থাকে। মনে করুন, আজ যে আমার শরীরটা আছে, তার আকৃতি আজ যেমন, কয়েক বছর আগে কিন্তু এমন ছিল না। আবার কয়েক বছর পর এমন থাকবে না। শরীরের প্রতিটি অংশই নুতন রূপ লাভ করেছে। যদি কারও বয়স একশত বছর হয়, তাহলে জীবনে কতবার তার শরীরে রক্ত পরিবর্তন হয়েছে, কত পরিবর্তন এসেছে তার দেহে সে হিসাব কার কাছে আছে? বহুবার তো শরীরের মূল গঠন পরিবর্তন হয়ে গেছে। যখন দুনিয়াতেই এতবার পরিবর্তন হতে পারে, তাহলে তো আল্লাহ্ তা'আলা আখেরাতে দুনিয়ার শরীরের স্ট্রাকচার পরিবর্তন করে কয়েকগুণ বড় করতে পারেনই।

দেখুন, আল্লাহ কত ধাপে তার দেহে কত পরিবর্তন দান করেছেন! অথচ বান্দা প্রতিটি ধাপেই তার মাওলার সাথে অবাধ্যাচরণ করেছে। তো প্রত্যেক ধাপের জন্যই তো সাজা দেওয়া দরকার। যত ধাপে বান্দা মাওলার নাফরমানি করেছে, সেজন্য তার দেহকে এমন বৃহৎ ও বিশাল করে তাতে শাস্তি দেবেন। যেন শাস্তির সীমা বড় বেশি বিস্তৃত হয়।

জাহান্নামের একটা বিশেষ ওয়ার্ড

দেখুন, দুনিয়ায় যারা হৃদরোগে আক্রান্ত, যাদের হার্টে সমস্যা, তাদের ওয়ার্ড সম্পূর্ণ আলাদা ও পৃথক থাকে। এই ওয়ার্ডের নাম Cardiac depart ment মানে এখানে শুধু হৃদরোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। তো হৃদয় হচ্ছে সারা শরীরের কেন্দ্র। তাই এর চিকিৎসাও সেই রূপ বিশেষভাবে

নেওয়া হয়। তো আল্লাহর সেই দরবারেও জাহান্নামের মধ্যে একটি স্থান আছে, যেখানে বিশেষ রোগীদের বিশেষ জাহান্নামিদের রাখা হবে। সেই ডিপার্টমেন্টের নাম 'ওয়ায়েল'। কুরআনের ভাষায় এই ওয়ার্ডকে ওয়ায়েল দোযখ বলা হয়। এ ওয়ায়েল নামক ওয়ার্ডে পাঠানো হবে ওই লোকদের, যারা মানুষের মনে আঘাত দিত, কষ্ট দিত। মানুষের দোষ খুঁজে বের করে-করে তাকে কষ্ট দিত আর সেই দোষ অন্যের মাঝে বলে বেড়াত। একের দোষ অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিত। এতে লোকটির ভীষণ কষ্ট হতো। তো দোষ তালাশ করা এবং দোষ প্রকাশ করা এমন গুনাহ, যে গুনাহের কারণে জাহান্নামের একটা বিশেষ প্রকোষ্ঠ ওয়ায়েল নামক ওয়ার্ডে শাস্তি প্রদান করা হবে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

'পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারী প্রত্যেকের জন্য রয়েছে ওয়ায়েল নামক দোযখ।'[১]

সেই ওয়ায়েল নামক দোযখের অবস্থা এই যে–

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ

'এটা আল্লাহর প্রজ্বালিত আগুন।'[২]

সেই আগুনের বৈশিষ্ট্য কী হবে? সেই আগুনের গোলা সরাসরি বান্দার আত্মায় গিয়ে, তার হৃৎপিণ্ডে গিয়ে আঘাত হানবে আজকের যুগের রকেট, মিসাইল যেমনটা করে থাকে। যে-নিশানায় তাকে পাঠানো হয়, যে-লক্ষে তাকে ছোড়া হয়, তার ওপর গিয়ে আঘাত হানে। তো এই আগুন হবে আল্লাহর প্রজ্বালিত আগুন। তার অঙ্গার রকেটের মতোই হবে। এই অঙ্গার বান্দার কলব ও হৃদয়কে লক্ষ করে আঘাত হানবে। বলা হবে, হে বান্দা! তুমি অন্যের হৃদয়কে জ্বালিয়েছ; আজ তোমার চিকিৎসা এই যে, তোমার হৃৎপিণ্ডকে আগুনে জ্বালানো হবে,

الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ

'যা হৃদয় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে।'[৩]

---

১. সূরা হুমাযা : আয়াত ১
২. সূরা হুমাযা : আয়াত ৬
৩. সূরা হুমাযা : আয়াত ৬

তো কুরআনেরই শব্দ যে, সেই আগুন বান্দার হৃদয়ে আঘাত হানবে। এবার বুঝুন, মানুষ গভীরভাবে উপলব্ধি করবে, তার আত্মায় আগুন জ্বলছে। বলা হবে, তুমি মানুষের মনে কষ্ট দিতে। আজ তোমাকে সেই অপরাধের কারণে হৃদয়ে আযাব দেওয়া হচ্ছে।

যে যাকাত দেবে না তার শাস্তি

জাহান্নামে বিভিন্ন অপরাধীকে বিভিন্নভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। যারা অনেক বেশি অলংকার ব্যবহার করবে; অথচ যাকাত দেবে না, তাদের এক প্রকার শাস্তি প্রদান করা হবে। যে-পুরুষের কাছে মালসম্পদ থাকে; অথচ সে তার যাকাত আদায় করবে না, তাকেও শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাহ সেই লোকদের স্বর্ণালংকার একত্র করে জাহান্নামে গরম করবেন। তারপর যা করবেন, সে ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে–

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ

'সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট দগ্ধ করা হবে।'

وَجُنُوْبُهُمْ

'তাদের পার্শ্বদেশ দগ্ধ করা হবে।'

وَظُهُوْرُهُمْ

'তাদের পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করা হবে।'

هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ

'(সেদিন বলা হবে) এগুলো তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে।'

فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

'সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ করো– জমা করে রাখার স্বাদ।'[১]

নিষিদ্ধ পথে গমন ও ব্যভিচারের শাস্তি

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! দুনিয়ায় কোনো-কোনো চিকিৎসার জন্য ইনজেকশন প্রয়োগ করতে হয়। Injection পুশ করতে হয়। একে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ, শিশু-কিশোর সকলে ভয় পায়। শায়খ আবদুল কাদের

১. সূরা তাওবা : আয়াত ৩৫

জিলানি (রহ.) গুনিয়াতুত তালিবীন-এর মধ্যে লিখেছেন, জাহান্নামে আল্লাহ তা'আলা গর্ত তৈরি করে রাখবেন। সেই গর্তের মধ্যে ব্যভিচারী ও কুকর্মকারীদের রাখা হবে। যারা নিজেদের কামরিপুর তাড়নায় অন্ধকার ও নিষিদ্ধ পথে বিচরণ করেছে, অন্যায়ভাবে নিজের কুপ্রভৃত্তির চাহিদা নিবারণ করেছে, জৈবিক স্বাদ উপভোগ করেছে, আল্লাহ তা'আলা এমন অপরাধীদের সেই গর্তে নিক্ষেপ করবেন। গর্তের দরজা বন্ধ করে দেবেন। সেই গর্তে রয়েছে বিষধর বিচ্ছু। বিচ্ছুদের শরীর অনেক বড় বড় হবে। বড় একটা পাহাড়ের মতো হবে তার দেহ।

বর্ণিত আছে, একটা বিচ্ছুর পায়ের যে গিরা আছে, তাই হবে সামান বোঝাইকরা উটের সমান। এই বিচ্ছু ওই অপরাধী, পাপাচার ও যেনাকার বান্দার ওপর এমনভাবে চড়াও হবে, মৌমাছিরা যেমন তার মৌচাক ঘিরে নেয়। মানুষটির পুরো দেহ সে তার আওতায় নিয়ে নেবে। এক জোটে সব বিচ্ছু তাকে দংশন করতে থাকবে। ইনজেকশন দিতে থাকবে আর বলতে থাকবে তোমার অন্যায় এমন ছিল, তোমার পাপ এমন ছিল। নাও; আজ তার সাজা ভোগ করো। তোমার রোগ এই ছিল। নাও; আজ তার চিকিৎসা নাও! এভাবে দংশন করতে-করতে ব্যভিচার ও কুকর্মকারীর সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত ও বিষাক্ত করে ফেলবে। সে কাতরাতে থাকবে।

তার সমস্ত দেহ বিগলিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। কত কাকুতিমিনতি করে আশ্রয় চাইবে, অন্যকে ডাকবে; কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা সাজা দেবেন। বলবেন, তুমি নিষিদ্ধ পথে তোমার জৈবিক তাড়না, মনের কামনা-বাসনা পূর্ণ করেছ। নাও; আজ সাজা ভোগ করো। আজ মজা নাও। এমন গুনাহ তুমি করেছ, যার জন্য আজ অঙ্গে-অঙ্গে, হাড়ে-হাড়ে, তিলে-তিলে তার মজা উপভোগ করো। মজা বোঝো। আজ সেই রোগ থেকে তোমাকে এই ইনজেকশনের মাধ্যমে, এই অবিরত আঘাতের মাধ্যমে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। তোমার গুনাহ মোচন করা হচ্ছে। এই শাস্তির মাধ্যমে তোমাকে পবিত্র করা হচ্ছে। তোমাকে তাযকিয়া করানো হচ্ছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে কথাবার্তার পথ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

জাহান্নামিরা আর্তনাদ করে-করে বলবে, আমাকে মূল ডাক্তার মহাচিকিৎসক আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলতে দাও। কিন্তু আল্লাহ বলবেন, যারা কাফের, মুশরিক, পাপাচারী, আমি তাদের সাথে কথা বলব না। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ

'তাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না।'[১]

তারা বলবে–

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ

'হে আমাদের রব! আমাদের ওপর আমাদের দুর্ভাগ্য প্রবল হয়ে গিয়েছিল। আমরা তো ছিলাম পথহারা জাতি।'[২]

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ

'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এখান থেকে বের করে নাও। আমরা যদি এর পর আর গুনাহ করি, তখন আমরা বড়ই জালেম হব। (এবারের জন্য আমাদের এখান থেকে মুক্তি দাও।)'[৩]

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ

'আল্লাহ বলবেন, এখানেই পড়ে থাকো! তোমরা আমার সাথে কথা বলো না।'[৪]

কোনো বড় ব্যক্তি যখন খুব অসন্তুষ্ট হন, তখন বলেন, এখান থেকে চলে যাও। আমি তোমাকে আমার সামনে দেখতে চাই না। ঠিক এমনিভাবে, এই আয়াতে কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের বলা হবে, সরে যাও আমার সামনে থেকে। পড়ে থাকো জাহান্নামে; আমি তোমাদের চেহারা দেখতে চাই না। তোমাদের সাথে আমি কথা বলতে চাই না। তোমরা তো এমন ছিলে যে, আমার আম্বিয়া কেরাম তোমাদের কাছে গিয়েছিল। তোমাদের কাছে সত্যের পয়গাম নিয়ে হাজির হয়েছিল; কিন্তু তোমরা তাদের অমান্য করেছ। তোমরা তাদের সাথে বরং বিদ্রূপ করেছ। আমার নেক বান্দারা তোমাদের কাছে গিয়েছিল। তোমরা তাদের কথা উড়িয়ে দিয়েছ, কোনো গুরুত্ব দাওনি।

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا

'আমার বান্দাদের একটি দল ছিল, যারা দু'আ করত, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা ঈমান এনেছি; তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও।'[৫]

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৭৭
২. সূরা মুমিনূন : আয়াত ১০৬
৩. সূরা মুমিনূন : আয়াত ৮৮
৪. সূরা মুমিনূন : আয়াত ১০৭
৫. সূরা মুমিনূন : আয়াত ১০৯

তারা আমার ঈমানদার বান্দা। আজ আমার এই বান্দারা বড় বেশি খুশি হবে। তারা তাদের ভালো কাজের বিনিময় পাবে। আর ওই বদকার বান্দারা নিজের পাপের সাজা ভোগ করবে। তাই আল্লাহ কাফের, মুশরিক, মুনাফিক পাপাচারী ও অবাধ্যদের সাথে কেয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তারা সারা জীবন জাহান্নামেই থাকবে, চিরজীবন তারা জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে।

যে-রোগের কোনো চিকিৎসা নেই

দেখুন, কেউ যদি এইড্‌স বা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়, তাহলে তার কোনো চিকিৎসা হয় না। সামান্য চিকিৎসা হলেও তা স্থায়িভাবে সুস্থতায় পৌঁছায় না। এর সুনিশ্চিত কোনো চিকিৎসা নেই। হাসপাতালে নেওয়া হয়, তাকে দীর্ঘ চিকিৎসা দেওয়াও হয়। কিন্তু একেবারে সুস্থ করা যায় না। তো হয় হাসপাতালে থেকে-থেকেই সে এই রোগে মৃত্যু বরণ করে কিংবা বাড়িতে মৃত্যু হয়ে যায়। সে রোগ থেকে পরিত্রাণ পায় না। তেমনি কিছু জাহান্নামি কেয়ামতের দিন কোনোভাবেই পরিত্রাণ পাবে না জাহান্নাম থেকে।

জান্নাতে প্রবেশের শর্ত

একথা ভালো করে মনে রাখুন যে, জান্নাতে যাওয়ার জন্য অভ্যন্তরীণ সকল রোগ থেকে মুক্ত থাকা শর্ত। হয়তো এই দুনিয়ায়ই সমস্ত বাতেনি বিমার, অভ্যন্তরীণ ব্যাধি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবে। নিজের তাযকিয়া করবে, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে। যদি দুনিয়ায় অভ্যন্তরীণ রোগ থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ না করা হয়, তবে কেয়ামতের দিন পরিশুদ্ধ করতে হবে। সেদিন জাহান্নামের শাস্তির মাধ্যমেই অভ্যন্তরীণ রোগ হতে মুক্তি মিলবে। জান্নাতে কোনোভাবেই এসব আত্মার রোগী গুনাহের রোগী ও অভ্যন্তরীণ রোগীরা প্রবেশ করতে পারবে না। জান্নাত তো পবিত্র স্থান। সেখানে গুনাহের নাপাকি ও দুর্গন্ধ নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না। তাই জান্নাতে যেতে হলে পবিত্র হয়েই যেতে হবে। প্রত্যেক কালেমাওয়ালা, ঈমানওয়ালা মানুষই জান্নাতে যাবে ঠিক; কিন্তু গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে তারপর যাবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে জান্নাতের ব্যাপারে বলেছেন–

وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ

'জান্নাত এমন একটা স্থান, যেটি ওই ব্যক্তিদের প্রতিদান, যারা নিজেদের পবিত্র করেছে, নিজেদের তাযকিয়া করেছে।'[১]

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ৭৬

জান্নাত তাযকিয়া অর্জনকারীদের স্থান। অন্যদের এখানে কোনোভাবেই ঠাঁই হবে না। অন্যরা কোনোভাবেই জান্নাতে স্থান পাবে না।

রোগাক্রান্তদের প্রবেশ নিষেধ

আজকের পৃথিবীর দিকে তাকান। এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হলে মেডিকেলটেষ্ট করাতে হয়। এতে উত্তীর্ণ হলেই দেশটিতে যাওয়া যায়। আমার পরিচিত এক যুবক ছিল। সে পড়াশোনায়ও ভালো ছিল। তার উঁচু মানের ডিগ্রিও ছিল। ভালো একজন ইঞ্জিনিয়ার সে। আবুধাবিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পোষ্টে সে চাকরি পেল । কিন্তু সেই দেশে গমনের সময় তাকে বলা হলো, আপনার মেডিকেল টেষ্ট লাগবে, ডাক্তারি রিপোর্ট লাগবে। আমরা দেখব। যদি রিপোর্ট ভালো আসে, তাহলে আমাদের দেশে আসতে পারবেন, অন্যথায় আসতে পারবেন না। তো নিয়মমতো তার চেকআপ হলো। সেখানে একটা রোগ ধরা পড়ল। এই রিপোর্ট যাওয়ার পর ওই দেশে তাকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো না। তাকে বলা হলো, এই রোগ নিয়ে আমাদের দেশে আসা যাবে না।

আবার দেখুন, আপনি হজ করার জন্য সৌদি আরব যাবেন। আপনাকে হজে যাওয়ার পূর্বে দুটি টীকা প্রয়োগ করতে বলবে। হাজী সাহেবানকে হাজী ক্যাম্পে টিকা দেওয়া হয়। বলুন তো টীকা কেন দেওয়া হয়? কারণ, এর দ্বারা শারীরিক ভাইরাস দূর করা হয়। যেন বলা হলো, তোমার শরীরটাকে সুস্থ অবস্থায় নিয়ে আমাদের দেশে আগমন করতে হবে। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারেরও একই বিধান। হে আমার বান্দা! দুনিয়ায় চিকিৎসা করে এসো। যদি চিকিৎসা করিয়ে না আস, তাহলে যদি অন্তত কালেমাওয়ালা হও, তবে জাহান্নাম নামক হাসপাতালে টীকা দিয়ে সুস্থ করেই তারপর তোমাকে জান্নাত দেওয়া হবে। অভ্যন্তরীণ রোগব্যাধি ও গুনাহ নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না।

ভালো করে চিন্তা করুন

আমার প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! এবার চিন্তা করুন, ভেবে দেখুন। আমাদের জন্য সহজ পথ কোনটি ভালো করে ভেবে দেখুন। দুনিয়ায় সহজে আল্লাহর যিকির করব। সুন্নাতের ইত্তেবা করব, নেক কাজ করব। নিজেদের অভ্যন্তরীণ রোগের চিকিৎসা করাব। মৃত্যুর পর কবরকে আমাদের জন্য জান্নাত বানিয়ে দেওয়া হবে। কবরে গেলেই জান্নাতের নেয়ামত-আকীর্ণ প্রান্তরে আমাদের

নিয়ে যাওয়া হবে। এটি তো সহজ পথ। আর যদি আল্লাহ না করুন উল্টোটা করি– সঠিক পথে, সুন্দরভাবে জীবন যাপন না করি, তাহলে তো কবরে গেলেই ওষুধ শুরু হবে। কবরে গেলেই তো শুরু হবে আযাব।

আমরা মানুষরা তো দুনিয়ার সামান্য গরমই সইতে পারি না। সেই কঠিনতম দিন সবচেয়ে কঠিন গরম জাহান্নামের আগুন কী করে সহ্য করব? আমরা তো বড় নেয়ামতপ্রিয়। সামান্য গরমে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। স্ত্রী সাহেবা যদি গরমের সময় শীতল পানি এনে দেয়, আমরা প্রাণ ভরে তা পান করি। আজ ঠান্ডা পানি চাই। সেদিন জাহান্নামে কী দেওয়া হবে তা কল্পনা করুন। সেখানে তো পান করার জন্য দেওয়া হবে উত্তপ্ত গরম পানীয়। আর পুঁজ, রক্ত ও পচা-গলা দুর্গন্ধ পানি।

হে দুনিয়ার শরাব পানকরীরা! কেয়ামতের সেই কঠিন শরাবের কথা সামান্যের জন্য হলেও চিন্তা করো। হে দুনিয়ার সুবাসিত পরিবেশে জীবন যাপনকারীরা! জাহান্নামের পরিবেশের কথা সামান্য চিন্তা করো। হে দুনিয়ার জলসায় অট্টহাসিতে উন্মত্ত দল! কবরের নির্জনতার কথা সামান্য চিন্তা করো, যেখানে মানুষ মৃত্যু কামনা করবে; অথচ মৃত্যু আর হবে না। তো সেজন্যই আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি হচ্ছে তাযকিয়া হাসিল করা। আল্লাহর কাছে প্রাণ ভরে দু'আ করা উচিত, হে আল্লাহ! আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে দিন। যখন আমাদের মৃত্যুর সময় চলে আসবে, তখন আমাদের মৃত্যুকে সহজ করে দিন। আমাদের কবরকে জান্নাতে পরিণত করে দিন। আপনি আমাদের হেফাজত করুন, নিরাপদ রাখুন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

গীবত ও নাশোকরি

'এর জন্য কুরআনে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ①

'পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারী প্রত্যেকের জন্যে দুর্ভাগ্য।'[১]

অর্থাৎ– গীবত ও অপবাদ প্রদানকারীর জন্য দুঃসংবাদ রয়েছে।

همزة এবং لمزة এখানে দুটি শব্দ আছে। উভয়টি কেই স্মরণ রাখা চাই। যেন কখনও এমন না হয়ে যায় যে আমাদের মাঝে উভয়টি বিদ্যমান হয়ে যায়। একটা হচ্ছে গীবত– দোষ তালাশ করা। আরেকটা হচ্ছে এই দোষ বলে বেড়ানো। দোষ তালাশকারী হওয়া আর দোষ বলে বেড়ানো পৃথক-পৃথক দুটি বিষয়। পৃথক-পৃথক ব্যাধি। কিছু মানুষের মাঝে এই উভয় রোগই বিদ্যমান আছে। তো দোষ তালাশকারী আর দোষ প্রচারকারী উভয় ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করেই এখানে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেয়ামতের দিন দোষ তালাশকারী ও দোষ প্রচারকারী উভয়ের জন্য কী শাস্তি রয়েছে? আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে তার জন্য একটি বিশেষ জায়গা তৈরি করবেন। এর নাম হচ্ছে 'হাবিয়া'। তার মাঝে আগুনের স্তম্ভ হবে। ওই বান্দাকে শিকলে বেঁধে এই স্তম্ভের সাথে আবদ্ধ করা হবে। আগুনের অঙ্গার থাকবে। সেই অঙ্গার তার ওপর নিক্ষেপ করা হবে। তার হৃৎপিণ্ডে, তার কলবে, তার দিলে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানবে। এযুগে মিসাইল যেভাবে আঘাত হানে, সেভাবেই আঘাত হানবে। তার দিলকে, তার অন্তরকে নিশানা বানিয়ে আঘাত হানবে।'

---

১. সূরা হুমাযা : আয়াত ১

গীবত ও নাশোকরি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ﴿١٧﴾ اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى ﴿١٩﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

মানুষ ভালো মন্দের সমষ্টি

আল্লাহ তা'আলা মানুষের মাঝে ভালোও রেখেছেন, মন্দও রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۔ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا

'শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর। এরপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।'[১]

আল্লাহ মানবজাতিকে ভালো-মন্দের সমষ্টি বানিয়েছেন। তার জন্য ভালো-মন্দ উভয় পথকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ

'বস্তুত আমি তাকে দুটি পদ প্রদর্শন করেছি।'[২]

আর তিনি নীতি ঠিক করে দিয়েছেন যে, যেব্যক্তি ভালো ও কল্যাণকে প্রবল করবে, সত্য ও ন্যায়কে ধারণ করবে, সে কামিয়াব হবে। আর যেব্যক্তি

---

১. সূরা আশ-শাম্‌স : আয়াত ৭, ৮

২. সূরা বালাদ : আয়াত ১০

নিজের জন্য অসত্য ও অন্যায়কে এবং মন্দ ও নিকৃষ্ট বিষয়কে আবশ্যক করে নিল, সে হতভাগা ও ধ্বংসপ্রাপ্ত।

ইচ্ছেটা মানুষেরই

জীবনের লাগাম মানুষের হাতে। সে চাইলে নেককারগণের সোহবতে এসে নিজের আচার-অভ্যাসকে ভালো ও উন্নত করে নেবে। আর ইচ্ছে করলে বদকার-গুনাহগারের সংস্পর্শে থেকে নিজেকে কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত করে নেবে। আরে ভাই! ভালো মানুষও যদি উদাসীন বদদীন মানুষের সান্নিধ্য গ্রহণ করে, তাহলে তার প্রভাব তার মাঝে প্রচণ্ডভাবে প্রতিভাত হতে শুরু করে। আবার উদাসীন বদদীন মানুষ যদি নেককার-পরহেযগার ব্যক্তিদের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়, তাহলে সত্য ও ন্যায়ের আলো তার মাঝেও বিকশিত হয়। তাই সব সময় চাইবে নিজেকে ভালো, কল্যাণ ও উন্নতির পথে পরিচালিত করবে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ক সঙ্কেত

আল্লাহ রব্বুল ইযযাত তার পেয়ারা হাবীব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন লোকদের সঙ্গ নিতে নিষেধ করেছেন, যারা ঈমান আনয়ন করেনি, যারা উদাসীন, যারা গাফলতের অন্ধকারে ডুবে আছে যেন তাদের বদনসিবি আপনাকে স্পর্শ না করে। ইরশাদ হচ্ছে–

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدٰى

'সুতরাং যে কেয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, সে যেন আপনাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে। অন্যথায় ধ্বংস হয়ে যাবে।'[১]

فَتَرْدٰى এর মর্ম ও বিশ্লেষণ বলতে গেলে অন্তর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। আল্লাহ কীভাবে সতর্ক করে দিচ্ছেন! যে, এ পথে হাঁটলে আপনি বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবেন, আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।

আল্লাহ এমনই মহান। তাঁর সমস্ত বিষয়ই বড়। তাঁর যখন রাগ হবে, তখন কেউ তার সম্মুখে আসতে পারবে না। তাই আগে সতর্ক করে দিচ্ছেন। নবীজিকে খোদ আল্লাহই বলে দিচ্ছেন–

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ১৬

وَ لَوْ لَاۤ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ﴿۷۴﴾ اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿۷۵﴾

'আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দিগুণ শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতাম। এ সময় আপনি আমার মোকাবেলায় কোনো সাহায্যকারী পেতেন না।'[১]

আমি আর তুমি কোন খেতের কচুগাছ? কোন ভূমির গাজর-মুলা? আমাদের কতটুকু মূল্য আছে? খোদ আল্লাহ তাঁর হাবীবকেই এমনভাবে সতর্ক সঙ্কেত শুনিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, সামান্যও যদি আপনি তাদের প্রতি ঝুঁকে যেতেন, তবে দেখতেন আমি আপনার সাথে কী মুআমালা করতাম। ইরশাদ হচ্ছে–

فَاسْتَقِمْ كَمَاۤ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ

'অতএব আপনি এবং আপনার সাথে যারা তাওবা করেছে, সবাই সোজা হয়ে যান।'[২]

আপনি দীন ও শরীয়তের ওপর পূর্ণভাবে অটল-অবিচল থাকুন।

وَمَنْ تَابَ مَعَكَ.

'আপনার সাথে ঈমান আনয়ন করেছে যারা।'

কী অর্থ এই কথাটির? তো এখানে সোজা পথে, সরল পথে, সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতে বলা হচ্ছে সমগ্র উম্মাহকে। এই হুকুমকে যদি না মানা হয়, ভ্রান্ত পথে, বাঁকা পথেই যদি পথ চলা হয়, তাহলে তোমরা অবাধ্য! আর শোনো, আমি তোমাদের ঢিল দেব। তোমাদের সামান্য ছাড় দেব যেন তোমাদের ঘাড়ে তোমাদের গুনাহের বোঝা মজবুতভাবে স্থির হয়ে যায়। তোমাদের মাথাপিছু বেশি থেকে বেশি গুনাহ এসে যায়। আমি তোমাদের সেজন্যই বেশি ছাড় দিচ্ছি, বেশি ঢিল দিচ্ছি।

---

১. সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত ৭৪, ৭৫

২. সূরা হূদ : আয়াত ১১২

অঙ্গীকার পূর্ণ করা চাই

আমরা কালেমা পড়ে আল্লাহর নিকট অঙ্গীকার করেছি, হে আল্লাহ! আমরা তোমার হুকুমমতো জীবন যাপন করব। আর একথা স্মরণ রাখা চাই যে, নিজের সাথে অঙ্গীকার করে যদি আবার এই অঙ্গীকার নষ্ট করে ফেলে, তাহলে তা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে যায়। আজকাল বলা হয়, হযরত! আমার অন্তরে আছর হয় না, হৃদয়ে প্রভাব পড়ে না। আপনি কুরআনের সামনে দাঁড়ান, কুরআনকে প্রশ্ন করুন। এমন জাতি পূর্বেও অতিবাহিত হয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার নষ্ট করে ফেলেছিল। তার ফলে তারা আল্লাহর ক্রোধের লক্ষ্যস্থলে পতিত হয়েছিল। ইরশাদ হচ্ছে–

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ

'যখন তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, আমি তাদের ওপর লা'নত বর্ষণ করেছি, আমি তাদের আত্মাকে শক্ত করে দিয়েছি।'[১]

তাহলে বোঝা গেল, আহকামে ইলাহীকে লঙ্ঘন করলে, আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদাকে নষ্ট করলে অন্তর শক্ত ও পাষাণ হয়ে যায়। অথচ মানুষটি জানে ও বোঝে যে, এটি আল্লাহর হুকুম। অত্যন্ত সাধারণ বিষয় মনে করে সাময়িকের সামান্য মজায় ডুবে সে আল্লাহর হুকুমের সাথে ধৃষ্টতা দেখায়!

গীবত একটা কবীরা গুনাহ

আমাদের মধ্যে কে জানে যে, গীবত একটা কবীরা গুনাহ? একটা জঘন্য অপরাধ! এ এমন একটা কঠিন বিষয়, যার ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে–

فَإِنَّ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

'গীবত ব্যভিচারের চেয়েও গুরুতর অপরাধ।'[২]

তাই নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখা উচিত। যার জিহ্বা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তার জিহ্বাব তাকে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করে। তাই তো বলা হয়ে থাকে–

جِرْمُهُ صَغِيرٌ وَجُرْمُهُ كَبِيرٌ

'জিহ্বার আকৃতি খুব ছোট; তবে তার পাপ অনেক বড়।'

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১৫৫

২. কানযুল উম্মাল : হাদীছ ৮০৬২

হযরত আবুবকর (রাযি.) মাঝেমাঝে নিজের জিহ্বাটা টেনে ধরতেন। এমনকি উপস্থিত লোকেরাও শঙ্কিত হয়ে যেতেন। তারা বলতে শুরু করতেন, আমীরুল মুমিনীন! এমন না করা চাই। কিন্তু হযরত বলতেন, আমি কেন এমন করব না? এ-ই তো সেই জিহ্বা, যা বান্দাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে!

গীবত কাকে বলে

আজ তো আমাদের জবান কেঁচির মতো চলছে। মজা নিচ্ছি আর এদিকের-ওদিকের নানা কথা বলে বেড়াচ্ছি। যখন বারণ করা হয়, তখন বলা হয়, আমরা তো সত্যই বলছি। আরে ভাই! সত্যটাই তো গীবত হয়ে যাচ্ছে! যদি তুমি মিথ্যেটা বলতে, তা হতো অপবাদ আর শাস্তি পেতে অপবাদের। কারও অনুপস্থিতিতে তার ব্যাপারে এমন কথা বলা, যদি সে সেই কথাটি শোনে, তাহলে সে তা অপছন্দ করবে। এমন কথাকেই গীবত বলা হয়। আর একেই হারাম বলা হয়েছে। তো এই গীবত মুখের উচ্চারণের মাধ্যমেও হয়। যেমন– কাউকে খারাপ বলল, কাউকে বেঈমান বলল। এতে লোকটিকে অপমানিত করল।

আজ তো সহজেই একথা বলে দেওয়া হয়। কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহ যখন আদালতের কাঠগড়ায় হাজির করবেন, বলবেন, কেন অমুক ব্যক্তিকে হীন বলেছ, কেন তাকে কমিনা বলেছ? কেন বেঈমান বলেছ? সেদিন প্রমাণ করতে হবে। সেদিন বোঝা যাবে, নিজে কেমন লোক। সেদিন নিজের সকল অবস্থা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। আজ আমরা জবানে কথা বলছি। নিজের কানও কি শুনছে না সে কথা? অবিরত সেই খারাপ কথা বলেই চলছি। এই কাজ শুধু সময় কাটানো আর গল্পগুজবের মাধ্যমে আনন্দ ভোগই না, বরং এ জাহান্নামের পথ প্রস্তুত করছে। জাহান্নাম ক্রয় করে নেওয়া হচ্ছে। যতক্ষণ বসে-বসে ওইসব কথা বলা হচ্ছে, তাতে শুধু সময় কাটানোই নয়, এই সময়টিতে জাহান্নাম ক্রয় করা হচ্ছে!

মহিলাদের গীবত ও নাশোকরির অভ্যাস

সবার মাঝে তো আছেই– বিশেষ করে এই অভ্যাসটি নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। একটু আলোচনা করা যাক। যদি কারও সামান্য প্রশংসা তাদের সামনে করা হয়, তারা আবশ্যিকভাবে সেই ব্যক্তির ব্যাপারে খারাপ কোনো কথা শুনিয়ে দেবেই। তারা কারও প্রশংসা সহ্য করতে পারে না। শুধু নিজের প্রশংসাটাই সর্বদা কামনা করে। ঘরের বউদের দেখুন, অবিরত

শাশুড়ির গীবত করে চলছে। আবার শাশুড়িদের দেখুন, অবিরত বউদের গীবত করে চলছে। আমি যখন বউ ছিলাম, তখন আমি ভালো শাশুড়ি পাইনি। এখন আমি শাশুড়ি হয়েছি, তাই বউকে আমার ভালো লাগে না। এমন কঠিন অবস্থা আমাদের মাঝে বিরাজ করছে সর্বত্র।

এদিকে শয়তান তালি বাজাতে থাকে। মহিলাদের একটা অভ্যাস হলো, নতুন কাউকে পেলে পাঁচ মিনিটেই নিজেদের ঘরের সব কথা বলে দেয় তার কাছে। নিজের সব অবস্থা তার কাছে তুলে ধরে। খানাপিনা সবই তাকে বলে। পেটে যা আছে, তার খবরও দিয়ে দেয়। আবার দেখুন, যদি কোনো মহিলার তার স্বামীর সাথে সামান্য বিতণ্ডা হয়, তাহলে তো আর কথা-ই নেই– গীবতের বন্যা শুরু হয়ে যায়। সারাটা দিনই বকবক করতে থাকে। গীবত করতে থাকে সবার কাছে।

যে-নারীর মাঝে দুটি বিষয় না থাকবে, সেই হবে সৌভাগ্যবতী।

১. গীবত বা পরচর্চা।

২. নাশোকরি বা অকৃতজ্ঞতা।

এমন হলে ৩০-৪০ এমনকি পঞ্চাশ বছরও স্বামী-স্ত্রী বড় সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। আজ তো দেখা যায়, পারিবারিক জীবনে দুজনের বার্ধক্য এসে যায়। তখনও সামান্য কোনো কথার কারণে অনেক স্ত্রী স্বামীকে বলে বসে, তোমার ঘরে এসে আমি কী পেলাম? তুমি তো যা করছে সবই তোমার সন্তানদের জন্য করেছ। আমার জন্য তো কিছুই করনি। স্বামী বলে, আমি তো তোমাকে জুতা কিনে দিলাম। স্ত্রী উত্তরে বলে, জুতা দিয়েছ; না দেওয়া আরও ভালো ছিল। স্বামী বলে, তোমাকে পোশাক দিয়েছি। স্ত্রী বলে, তেনা দিয়েছ। সে বলে, তোমাকে অমুক-অমুক জিনিস কিনে দিলাম। স্ত্রী বলে, দিয়েছ, দুনিয়ার টোকানো-ফালানো কমদামি অসুন্দর জিনিসই তো দিয়েছ; ভালো কিছু তো দিতে পারনি। তো দেখুন, নাশোকরিমূলক কথার সীমা কতটুকু?

আল্লাহর নবী তো হাদীছে বলে দিয়েছেন–

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ

'যে মানুষের অবদান স্বীকার করে না, সে আল্লাহর শোকর আদায় করে না।'[১]

---

১. তিরমিযি : হাদীছ নং ১৮৭৮

যে-দম্পতি একজন আরেকজনকে সহায়তা করবে, তারা-ই সুখে থাকবে। আজ এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে, আপনি আপনার স্ত্রীকে যদি বলেন, তুমি প্রতিদিন ইশরাক নামায পড়বে, তাহলে স্ত্রী বলে উঠবে অমুক তো পড়ে না– আমি কেন পড়ব? অথচ উচিত ছিল, দিনের ক্ষেত্রে নিজের চেয়ে যে ভালো, তার দিকে তাকানো আর দুনিয়ার ক্ষেত্রে নিজের চেয়ে নিচের দিকে তাকানো। অথচ আজকে তার উল্টোটা করা হচ্ছে। আজ গীবত তো স্বতন্ত্র একটি কর্মে পরিণত হয়েছে। ফলে সামান্য সময়ের ভেতর মানুষ নিজের জন্য এমন জাহান্নাম খরিদ করে ফেলে, যে-জাহান্নাম তাকে দুনিয়ার এই মজার স্বাদ দেখাবে, বান্দার আমলগুলো সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

গীবতের দ্বারা বান্দার হক নষ্ট করা হয়

খুব ভালো করে স্মরণ রাখুন। গীবত এমন একটি বিষয়, যা হুকূকুল ইবাদের অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়ায় যাদের গীবত করা হবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ সেই হকদারদের বলবেন, তোমরা তাদের আমলনামা থেকে গীবতের বিনিময় নিয়ে নাও। আহ! কেয়ামতের দিন তো এমন একটা দিন, যেদিন একটি-একটি নেকির জন্য বান্দারা ছোটাছুটি করতে থাকবে। সেদিন লোকদের জন্য সুযোগ আসবে। তারা বলবে, অমুক আমার গীবত করেছে; তার আমলনামা থেকে আজ নেকি পাব।

তো বান্দা যার গীবত করেছে, সে তার আমলনামা থেকে নেকি নিতে শুরু করবে। ওই ব্যক্তি তাকে বারণ করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু সে বিরত থাকবে না। বলবে না, আমি আরও নিতে চাই। তুমি আমার গীবত করেছ, সারা জীবনের আমলগুলো (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে) ওই ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে। হক আদায়কারী সেদিন চাইতেই থাকবে। চাওয়া তার শেষই হবে না।

প্রকৃত গরিব কে

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি জান, কেয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি গরিব হবে? বলা হলো, হে আল্লাহর নবী! যার কাছে মালসম্পদ নেই, সে-ই তো গরিব। ইরশাদ হলো, না বরং যে দুনিয়ায় বেশি নেক আমল করেছে; কিন্তু মুখে কারও দোষচর্চা করেছে, কারও বিরুদ্ধে নানা কথা বলেছে, কারও অন্তরে কষ্ট দিয়েছে। কেয়ামতের দিন হকদাররা আসবে। আল্লাহ সেই হকদারদের সুযোগ দেবেন। তারা ওই গীবতকারীদের আমলনামা থেকে নেকসমূহ নিয়ে নেবে। এত নেবে যে, তার আমলনামা

শূন্য হয়ে যাবে। তখনও হকদার বাকি রয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা হকদারদের গুনাহগুলো নিয়ে গীবতকারীর ঘাড়ে দিয়ে দেবেন।

তো দুনিয়া থেকে নেক কামাই করে আসবে আর কেয়ামতের দিন গুনাহ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। সব কিছুই অন্যরা নিয়ে যাবে। কারণ, জিহ্বাকে সে ভুল কাজে ব্যবহার করেছে। জবানের মজা, জিহ্বার স্বাদ তো খুব ভোগ করা হয়েছে। সেদিন নিজের মাথার ওপর আযাবের গাট্টি নিয়ে উঠবে। মানুষ সেদিন পেরেশান হবে আর বলবে, হায়! যদি দুনিয়ায় আমরা ওইসব কাজ না করতাম।

জোড়ানো কঠিন খোয়ানো সহজ

গীবত কখনো-কখনো ইশারা-ইঙ্গিতেও হয়ে যায়। হাতে ইশারা করলেও তাতে হয়ে যায় বড় ধরনের গীবত। তাই নিজেকে এর থেকে রক্ষা করা চাই। ভালো-ভালো মাহফিল-মজলিসের মাধ্যমে যে-নূর অর্জিত হয়, তা একটা মুহূর্তের গীবতের কারণে হারিয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। এই নূর অর্জন করা খুবই কঠিন কাজ; কিন্তু খোয়ানো, বিনষ্ট করা অত্যন্ত সহজ। আজ আমাদের ইবাদাতের বিশাল ভান্ডার তো নেই-ই। তার মধ্যে আবার গীবত করে সব ধ্বংস করে দিচ্ছি। যদি গীবত করতেই থাকি, তবে আর আমাদের ঝোলায় থাকবে কী?

গীবত একটা মহামারির রূপ নিয়েছে

গীবত আজ মহামারির রূপ নিয়েছে। যেখানে কয়েকজন শিক্ষক আছে, সেখানেই একজন আরেকজনের গীবত করছে। যেখানে কয়েকজন ভাই আছে, সেখানে একে অন্যের গীবত করছে। নিজের স্ত্রীদের সাথে বসে-বসে গীবত করে যাচ্ছে। পড়শীদের মাঝে গীবত চলছে। গীবত এমন একটা রোগ, যা মানুষের মাঝে বিভাজন তৈরি করে দেয়। তাই তো এর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। অন্তরের মাঝে তা বিভক্তি সৃষ্টি করে। মানুষের মাঝে বদগুমানি ও খারাপ ধারণা তৈরি হয়ে যায়। পরস্পর দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়।

وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ

'আর আল্লাহ যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা তারা ছিন্ন করে আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে।'[১]

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২৭

গীবত ও অপবাদের শাস্তি

এর জন্য কুরআনে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

'পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারী প্রত্যেকের জন্যে দুর্ভাগ্য।'[১]

অর্থাৎ– গীবত ও অপবাদ প্রদানকারীর জন্য দুঃসংবাদ রয়েছে।

همزة এবং لمزة এখানে দুটি শব্দ আছে। উভয়টি কেই স্মরণ রাখা চাই। যেন কখনও এমন না হয়ে যায় যে আমাদের মাঝে উভয়টি বিদ্যমান হয়ে যায়। একটা হচ্ছে গীবত– দোষ তালাশ করা। আরেকটা হচ্ছে এই দোষ বলে বেড়ানো। দোষ তালাশকারী হওয়া আর দোষ বলে বেড়ানো পৃথক-পৃথক দুটি বিষয়। পৃথক-পৃথক ব্যাধি। কিছু মানুষের মাঝে এই উভয় রোগই বিদ্যমান আছে। তো দোষ তালাশকারী আর দোষ প্রচারকারী উভয় ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করেই এখানে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেয়ামতের দিন দোষ তালাশকারী ও দোষ প্রচারকারী উভয়ের জন্য কী শাস্তি রয়েছে? আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে তার জন্য একটি বিশেষ জায়গা তৈরি করবেন। এর নাম হচ্ছে 'হাবিয়া'। তার মাঝে আগুনের স্তম্ভ হবে। ওই বান্দাকে শিকলে বেঁধে এই স্তম্ভের সাথে আবদ্ধ করা হবে। আগুনের অঙ্গার থাকবে। সেই অঙ্গার তার ওপর নিক্ষেপ করা হবে। তার হৃৎপিণ্ডে, তার কলবে, তার দিলে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানবে। এযুগে মিসাইল যেভাবে আঘাত হানে, সেভাবেই আঘাত হানবে। তার দিলকে, তার অন্তরকে নিশানা বানিয়ে আঘাত হানবে। এই আগুনের ব্যাপারে বলা হচ্ছে–

نَارُ اللّٰهِ الْمُوقَدَةُ

'সেই আগুন হবে আল্লাহর তৈরী আগুন।'

স্পেশালভাবে এ আগুণ তৈরি কৃত। তাকে বলা হবে তুমি আল্লাহর বান্দার অন্তরকে জ্বালিয়ে দিয়েছ আজ তোমাদের অন্তর জ্বালিয়ে দেওয়ার সময়। এই আগুণ সেই কর্মের লক্ষে তৈরি করা হয়েছে।

الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ

'যে মানুষের হৃদয়কে জ্বালিয়ে দেবে।'[২]

---

১. সূরা হুমাযা : আয়াত ১

২. সূরা হুমাযা : আয়াত ৭

সারা অঙ্গের কথা, সারা দেহের কথা এখানে বলা হয়নি। বলা হয়েছে শুধু অন্তরের কথা, হৃদয়ের কথা; কলবের কথা, হৃৎপিণ্ডের কথা। তোমরা মানুষের অন্তরকে জ্বালাতে। আজ জাহান্নামে তোমাদের হৃদয়কে নিশানা বানিয়ে জ্বালানো হবে। স্মরণ রাখবে, তোমার জবান থেকে গীবতের যে-বাক্যই বের হচ্ছে, তার বদলে অগ্নির কোনো-না-কোনো অঙ্গার এসে তোমার আত্মাকে পুড়িয়ে দেবে। আরে! আমরা তো গীবত করে কারও ক্ষতি করছি না; বরং নিজেরই ক্ষতি করছি আমরা! ওই অগ্নিটুকরোগুলো জমা করে চলছি।

আজ তো সহজেই গীবত করছি; তবে এর শাস্তি সহ্য করা আমাদের জন্য বড় কঠিন বিষয়। আজ সোফায় বসে গরম চা মুখে নিয়ে দারুন মজা করে-করে খুব আরাম করছি, গীবত করছি, ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করছি। স্বামী স্ত্রীকে বলে, নামায পড়ো। স্ত্রী সাথে-সাথে বলে ওঠে, তোমার বোনও তো নামায পড়ে না। এটাও তো গীবত হয়ে গেল। আজ রাজনৈতিক দলগুলো একে অন্যের গীবত করে যাচ্ছে লাগামহীনভাবে। অমুক এই করেছে, তমুক ওই করেছে। গীবত এমন হয়ে গেছে যে, কত বড় বোঝা মাথায় তুলে নিচ্ছে নিজেই কল্পনা করতে পারছে না।

আরে! তোমরা তো রাষ্ট্রের ক্ষমতায়ও নেই, বিরোধী দলেও নেই। তোমরা তো ঘরের বউ। ডাল-রুটির ক্ষমতাটুকুই তো তোমাদের। কেন বসে-বসে বড়-বড় কথা ছড়াচ্ছ? অমুক এই করেছে, তমুক ওই করেছে। আজ তো গীবত করছ। কাল যে জবাব দিতে হবে মনে আছে তো? একদিন এসব কর্মের প্রতিদান আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত প্রদান করবেন। যেদিন আল্লাহ বদলা নেবেন, সেদিন কী করবে?

গীবত মৃত জন্তুর গোশত খাওয়ার মতো

তাই তো বলা হয়েছে, গীবত করা এমন যেন মানুষ কোনো মৃত জন্তুর গোশত খাচ্ছে। মাদীনায় দুজন নারী রোযা রেখেছে। একে অন্যের সাথে গীবত করছিল তারা। লোকেরা নবীজির খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাদের ব্যাপারে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা রোযা রেখেছে; কিন্তু এদের খুব কষ্ট হচ্ছে। মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। এখন এরা রোযা ভাঙতে পারবে কিনা? নবীজি বললেন, ওরা তো রোযা আগেই ভেঙে ফেলেছে। জিজ্ঞেস করা হলো, কীভাবে ভাঙল? ইরশাদ হলো, তোমরা কুলি করো। নবীজির মোজেযায় কী হলো? যখন তাদের কুলি করানো হলো, তখন তাদের মুখ থেকে গোশতের

টুকরা বেরিয়ে এল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো কী? নবীজি পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ

'তোমাদের কেউ কি মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে কি?'[১]

গীবত নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতো। ভাবুন, মুরদার গোশত খাওয়া কি সহজ ব্যাপার? যেখানেই যে গীবত করছে, তার সামনে মুরদার গোশত দাও তো; দেখো সে তা খায় কি-না? দেখো কত অপছন্দ করবে সে! কামরায় যদি একটা ইঁদুর মরে যায় এবং পচে যায়, তার থেকে কেমন দুর্গন্ধ ছড়াবে বলুন? রাস্তার পাশে মৃত কোনো জন্তু পড়ে থাকলে সেই পথ দিয়ে কেউ যেতে চায় না। কারণ হলো দুর্গন্ধ। কেয়ামতের দিন মৃত প্রাণীর গোশত খেতে হবে। খুব বেশি দুর্গন্ধ হবে সেই গোশত।

আজ তো মজাদার তরকারিও ভালো লাগে না। কেয়ামতের দিন দুর্গন্ধ গোশত, মরা প্রাণীর পচা-গলা গোশত কেমন হবে, কেমন লাগবে একটু চিন্তা করে দেখুন। আজ দেখা যায়, একই ক্লাশের ছাত্রীরা তাদের সঙ্গিনীদের গীবত করছে। একই ক্লাশের ছাত্ররা গীবত করে চলছে সাথিদের। যেখানেই আমরা সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করছি, সেখানেই গীবত করে চলছি। আরে ভাই! কেন এভাবে নিজেরা পরস্পর একত্র হলেই অন্যের গীবত করি, তৃতীয় ব্যক্তির দোষচর্চা করি!

ইসলামে মুমিনের মর্যাদা

শরীয়ত মুমিন বান্দার খাতিরে তার সম্মানকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করেছে। আর সেজন্যই গীবত নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেন কখনও দুই বান্দা পরস্পরে কথাবর্তার ছলেও অন্য বান্দার দোষ চর্চায় লিপ্ত হয়ে না পড়ে। কারও ব্যাপারে কেউ যেন বদগুমানি ও খারাপ ধারণা না করে। কেউ যেন কাউকে টার্গেট না বানায় যে, আমার গীবত করেছে অমুক। তোমরা দু-চারজনে বসে নিজস্ব যে-কথা-ই বলতে চাও বলো; কিন্তু তৃতীয় কারও মন্দ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ো না। এতে কারও অন্তরে বদ চিন্তা আসবে না, তোমাদের দেখে কেউ ভাববে না, ওরা বসে-বসে কী করছে। কার ব্যাপারে

---

১. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১২

যেন কথা বলছে। যা করবে নিজের বিষয়েই করবে। অন্যের বিষয়কে নিজেদের আলোচনায় জড়াবে না। এটিই মুমিন বান্দার একরাম। এটিই মুমিন বান্দার সম্মান রক্ষা।

মুমিন বান্দার বড় সম্মানের আসন রয়েছে আল্লাহর দরবারে। তাই তো মুমিনের গীবত করাকে আল্লাহ্ হারাম করে দিয়েছেন। এটিই তার ইজ্জতের হেফাজত। যদি কারও অন্যায় থাকে, অপরাধ থাকে, তবে তার কাছে গিয়েই তাকে অন্যায় ত্যাগ করতে বলো। তাকে তার ভুল সংশোধন করে নিতে বলো। কিন্তু তোমাকে তো এই অনুমতি দেওয়া হয়নি যে, তুমি অন্যের কাছে তার দোষগুলো বলে বেড়াবে? তাই সাবধান হও।

কেয়ামত দিনের ভয়াবহতা

কেয়ামতের দিনটি হবে মানুষের জন্য অত্যন্ত কঠিন দিন। সেদিন দুগ্ধদানকারিণীরা তাদের পোষ্যদের ভুলে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ۝١

'হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। আর জেনে রাখো, কেয়ামতের প্রকম্পন একটা ভয়ংকর ব্যাপার।'[১]

আল্লাহ তো এই দিনের ব্যাপারে شئ عظيم শব্দ ব্যবহার করেছেন। বড় কোনো ব্যক্তি যদি কোনো জিনিসকে বড় বলে, সেটি বড়ই হয়ে থাকে।

আরও ইরশাদ হচ্ছে–

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۝٢

'যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত ঘটাবে আর মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুত আল্লাহর আযাব খুবই কঠিন।'[২]

আজ আমরা মানুষের দোষ বলে বেড়াচ্ছি। অথচ কেয়ামতের দিন আল্লাহ সত্যবাদীদেরও তাঁর সম্মুখীন করে তাদের সত্য ও ন্যায়ের বিষয়ে

---

১. সূরা হজ : আয়াত ১

২. সূরা হজ : আয়াত ২

জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সেই দিনটি কেমন ভয়াবহ হবে তা আমাদের পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব।

لِيَسْئَلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ

'কেয়ামতের দিন সত্যবাদীদের আমি তাদের সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব।'[১]

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহ.) একবার দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। কেউ একজন বিষয়টা লক্ষ করল। কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল। শুনল, তিনি বলছেন, হে আল্লাহ! আপনি কুরআনে যাদের সত্যবাদী বলেছেন, তাদের সম্পর্কেই বলেছেন, আপনি তাদের সত্যতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। পরওয়ারদেগার! তাহলে আমাদের মতো এই মিথ্যাবাদীদের কী দশা হবে? আমাদের অবস্থা কেমন হবে? সত্যবাদীদেরও বিচারের সম্মুখীন হতে হলে আমরা তো একেবারেই শেষ!

গীবত থেকে ক্ষমা পাওয়ার উপায়

শুধু মুছল্লায় বসে কেঁদে বুক ভাসালে গীবতের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে না। এমন নয় যে, আপনি মুছল্লায় বসে তাওবা করে নেবেন আর তা মাফ হয়ে যাবে। কক্ষনো এমন নয়। বরং গীবতের গুনাহ মাফ পেতে হলে সেই ব্যক্তি থেকেই, সেই হকদার থেকেই ক্ষমা চাইতে হবে, যার গীবত করে তার হক নষ্ট করা হয়েছে। এটি কোনো বিষয়ই নয়। চলুন আজ আমরা নতুনভাবে অঙ্গীকার করি। আজ আমাদের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলি, তাওবা করি। যাদের গীবত করেছি, তাদের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। এতেই আমরা মুক্তি পেতে পারি। অন্যথায় কেয়ামতের দিন এরা হকদার হয়ে দাঁড়াবে। এখন একটু চিন্তা করুন যে, আমরা তো অনেক এমন মানুষেরও গীবত করেছি, যাদের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে অক্ষম। তাই খুব সতর্ক থাকুন। কেয়ামতের দিন তো বোঝা মাথায় নিয়ে উঠতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

'আল্লাহ তাদের ওপর জুলুম করেননি; বরং তারা নিজেরা-ই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে।'[২]

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৮

২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১১৭

তাই এই বিষয়টিকেই নিজেদের জীবনের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করুন যে জীবনে তৃতীয় কারও আলোচনা তুলবই না।

গীবত থেকে বাঁচার পথ

এখানে একটি আশ্চর্য কথা এই যে, গীবত করা একটা কবীরাহ গুনাহ। গীবত শোনাও কবীরা গুনাহ। তো যদি গীবতকারী-ই না থাকে, তাহলে গীবত শুনতেও হবে না। তাই এর থেকে বাঁচার পথ এটি যে, যদি কেউ এমন অপছন্দনীয় কথা বলে, যা আপনি পছন্দ করছেন না, তাহলে আপনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলে দিন, ভাই! এমন কথা বলা ঠিক নয়। যদি আপনি বোঝেন, এমন কথা বললে লোকটি নারাজ হয়ে যাবে, তাহলে এ-ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যার গীবত করা হচ্ছে, আপনি তাঁর ব্যাপারে ভালো ও উত্তম কোনো কথা বলে দিন। আপনি যদি কোনো ভালো ও উত্তম কথা তার ব্যাপারে বলেন, তাহলে আপনি গীবত শ্রবণকারীদের মধ্য থেকে হবেন না। কারণ, আপনি ওই ব্যক্তির দোষের মোকাবেলায় গুণের উল্লেখ করে দোষটাকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন।

মনে করুন, কারও বড় ধরনের গীবত করা হলো। আপনার অন্তর বলছে, কথা তো সত্যই বলা হচ্ছে, তাহলে আপনি লোকটির ব্যাপারে একটি ভালো ও উত্তম কথা বলে দিন। এতে আপনি গীবতের শ্রোতা থাকবেন না। আপনি হয়ে যাবেন প্রতিবাদকারী। এক ঘণ্টার গীবতের প্রতিবাদ আপনার একটি বাক্যের দ্বারাই হয়ে যেতে পারে। এভাবে নিজেদের যথাসম্ভব গীবত থেকে বিরত রাখুন। গীবতের সমর্থন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। গীবত করা থেকে বেঁচে থাকুন।

গীবত থেকে আত্মরক্ষার আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে, মনে করুন, কেউ অন্যের ব্যাপারে অনেক কিছু বলল। আপনি বলুন, বাস্তবিক অবস্থা তো আল্লাহই জানেন। লোকটি তো আমাদের দৃষ্টিতে ভালোই মনে হয়। আচ্ছা আপনার অভিজ্ঞতা ওই রকম। আমার অভিজ্ঞতা অবশ্যই ভিন্ন রকম। আমার দৃষ্টিতে লোকটি ভালো। মোটকথা, এমন একটি কথা অন্তত বলে দাও, যার দ্বারা সেই গীবতের, সেই নিন্দামূলক বাক্যের প্রত্যাখ্যান হয়ে যায়। এই প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে আপনি গীবত শ্রবণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। গীবত শোনাকে এমনভাবে ভয় করবে, যেমন মানুষ হিংস্র প্রাণীর নিকট যেতে ভয় করে। মানুষ কেন হিংস্র প্রাণীকে ভয় করে? কারণ, হিংস্র প্রাণী তার ক্ষতি করতে পারে বলে তার বিশ্বাস! তেমনিভাবে যার গীবত করা

হয়, সেই বান্দা কেয়ামতের দিন গীবতকারী এবং গীবত শ্রবণকারী সকলের ক্ষতি সাধন করবে। সে নেকসমূহ নিয়ে যাবে। নেক না থাকলে তার গুনাহ গীবতকারী ও গীবত শ্রবণকারীর ঘাড়ে তুলে দেবে।

সৎকর্মশীলদের নিদর্শন

আমাদের সালাফে সালেহীনের আখলাক তো ছিল এই যে, তাঁরা গীবত থেকে অনেক দূরে থাকতেন। একটা শব্দও মুখে আনতেন না, যা অন্যের অপছন্দ হয়।

এমনকি কোনো বান্দা যদি মোটা হতো, তাহলে তার অগোচরে তাকে মোটা বলতেন না। কারণ, মানুষকে মোটা বললেও সে রাগ করে। তারা বরং এমন মানুষের বেলায় বলতেন, লোকটি সবল মানুষ। কারণ, সবল শব্দ শুনে সকলেই খুশি হয়। তাঁরা কথাবার্তায় এমন সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আপনি যদি এমন কোনো কথা বলে ফেলেন, যা তার গীবত হয়ে যায় এবং আপনার উপলব্ধি হয়, সাথে-সাথেই লোকটির ব্যাপারে ভালো কোনো কথা বলে দিন। ফলে এতে একথা ফুটে উঠবে যে, আপনার কথাকে আপনি প্রত্যাহার করে নিলেন।

সরাসরি মাফ নিতে না পারলে দায়মুক্ত হওয়ার উপায়

যদি এমন হয় যে, আপনি এমন লোকের গীবত করেছেন, যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে, এখন আপনি কী করবেন? ওলামায়ে কেরাম এরও পথ বলে দিয়েছেন। ১. তাদের জন্য গুনাহ মাফের দু'আ করবে। ২. তাদের পক্ষ থেকে কিছু অর্থ সদকা করে দেবে আর মনে-মনে নিয়ত করবে, হে আল্লাহ! এই সদকার ছাওয়াব আপনার ফজল ও রহমতে এত বেশি দান করুন যেন কেয়ামতের দিন আমার কাছে কেউ হক দাবি করলে তাদের জন্য এই ছাওয়াব যথেষ্ট হয়ে যায়। তো আল্লাহর পথে কিছু খরচ করবে। মসজিদের উন্নয়নের কাজে, মাদরাসার উন্নয়নখাতে নেককার গরিব মানুষের সাহায্য করে নেক কামাই করবে। এই নিয়তে করবে যে, যেন কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এর ছাওয়াব সেসব হক দাবিদারদের দান করেন। আর সামনে গীবত করবে না বলে পূর্ণ তাওবা করে গীবতের পথ পরিহার করে চলবে।

যাদের গীবত করা হয়েছে, যদি তাদের কাছে পৌঁছা সম্ভব না হয়, তার থেকে মাফ নেওয়ার পন্থাও এটিই। যেমন– একজন ভিন পুরুষ ভিন নারীর

গীবত করল। এখন তার থেকে মাফ চাওয়াও তো সম্ভব নয়। কিংবা নারী গীবত করেছে কোনো পুরুষের। তো সেও তো পুরুষ থেকে মাফ চাইতে পারবে না বা যার গীবত করেছে, সে এখন দূরে কোথাও চলে গেছে কিংবা মাফ চাইতে মন চাচ্ছে ঠিক; কিন্তু লোকটির সন্ধ্যান তার নিকট নেই। এসকল অবস্থাতেই এই পদ্ধতিতেই মাফ নেবে যে লোকটির জন্য গুনাহ মাফের দু'আ করে দেবে। আল্লাহ যেন তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন সেই দু'আ করবে। এতে কেয়ামতের দিন লোকটি আপনাকে মাফ করে দেবে।

আরেকটি পন্থা হচ্ছে, লোকটির পক্ষ থেকে কোনো নেক আমল করবে, সদকা করবে, ভালো কাজ করে দেবে যেন আল্লাহ আপন রহমতে এর বিনিময় দিয়ে দেন।

গীবত থেকে মাফ পাওয়ার আরেকটি পথ। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, আপনি কারও গীবত করলেন। ভাই ভাইয়ের গীবত করল। এখন যদি একজন আরেকজনকে গিয়ে বলে, আমি তোমার গীবত করে ফেলেছি। এতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। আগেই ভালো ছিল, সম্পর্ক ঠিক ছিল। এখন তো শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাই এমন বলবে না যে, আমি তোমার গীবত করেছি; বরং এভাবে তার থেকে মাফ চেয়ে নেবে যে, ভাই! আমি তো মানুষ! একের ওপর অন্যের হক থাকে। তোমার যদি কোনো হক আমার ওপর থেকে থাকে তুমি আমাকে মাফ করে দাও। ব্যস; এতটুকুই যথেষ্ট। গীবতের নাম নিয়ে মাফ চাইতে হবে না। সাধারণভাবে 'তুমি আমাকে মাফ করে দাও' এমন করে ক্ষমা চাইলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। খুব মহব্বত নিয়ে বলবেন। দেখবেন, আপনার কথা শুনেই লোকটি আপনাকে বলবে, আরে ভাই, কোনো সমস্যা নেই; মাফ করে দিলাম। এতে আপনিও সহজে মুক্তি পেয়ে যাবেন। আপনার বোঝাও হালকা হয়ে যাবে।

হযরত শিবলি (রহ.)-এর হক মাফ করানোর অভিনব পদ্ধতি

ভাই! অনেক হকের বোঝা আপনার মাথায় থাকা সাধারণ কোনো বিষয় নয়। যখন এই হক আদায় করার সময় আসবে, কেয়ামতের দিন খবর হবে, কেমন বোঝা আপনি মাথায় নিয়েছেন। হযরত শিবলি (রহ.) একটি এলাকার বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওবা করার তাওফীক দিয়েছেন। দুনিয়ার বাদশাহি থেকে তার মন বিমুখ হয়ে গিয়েছিল। তিনি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে হযরত জুনাইদ বাগদাদি (রহ.)-এর দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদি (রহ.) বললেন, দেখুন, যতক্ষণ

পর্যন্ত বান্দার ঘাড়ে অন্যের হক বাকি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য পাওয়া যায় না। তাই আপনি যান। লোকদের থেকে হক মাফ করিয়ে আসুন।

হযরত শিবলি (রহ.)-এর অন্বেষণ-পিপাসা ছিল তীব্র। তাঁর তলব ছিল সত্য। তিনি ফিরে এলেন। নিজের রাজ্যের নিকটবর্তী একটি স্থানে এলেন। তিনি তীব্রভাবে অনুভব করছেন, আমি যে এলাকার বাদশাহ ছিলাম, সেই এলাকার লোকদের কাছেই আমি এখন মাফ চাইতে যাচ্ছি। তিনি শহরে প্রবেশ করতেই দেখলেন, কয়েকটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। তারা বলতে লাগল, এ তো ওই পাগল, যে একদিন বাদশাহ ছিল। সে বাদশাহি ছেড়ে দিয়েছে। তাকে তারা অপমান করল। কেউ শিবলির চুল নিয়ে, কেউ কাপড় নিয়ে টানাটানি করল, কেউ তাকে আঘাত করল। তিনি লোকদের দরবারে ঘুরে-ঘুরে মাফ চাচ্ছেন। লোকেরা তাকে অপমান করল। কেউ তাকে আঘাত করল। কেউ তাকে বলল, আমি তোমাকে মাফ করতে পারি যদি তুমি এখানে গরমের মধ্যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক। কেউ বলল, আমার ঘরে দেওয়ালের কাজ চলছে, তুমি এসে কাজ করে দাও; তারপরই মাফ পাবে। এভাবে তিনটি বছর পর্যন্ত তিনি নিজেকে মানুষের হক ফিরিয়ে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। যারা মরে গিয়েছিল, তাদের স্বজনদের থেকে মাফ চেয়ে নিয়েছিলেন। তিন বছরের মধ্যে কোনো মানুষ এমন ছিল না, যার হক তার কাঁধে বাকি রয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি আবার হযরত জুনাইদ বাগদাদির নিকট এলেন। মাত্র কয়েকদিনের সোহবতেই হযরত শিবলি এত বড় আল্লাহওয়ালা হয়ে গেলেন।

তো এখন আমরা যদি চাই, আমরাও এমন মহা নেয়ামতের মালিক হয়ে যাই, তাহলে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে। কী কাজ? হাঁ; বসুন– সূচিপত্র তৈরি করুন। একদিন লাগুক, দুদিন লাগুক আর যত দিনই লাগুক তা অর্জন করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। ভেবে দেখুন কার কার গীবত করেছেন। কার-কার হক নষ্ট করেছেন। কার কাছে আপনি ঋণী হয়ে আছেন। কার বোঝা মাথায় বহন করে ফিরছেন। এর একটি তালিকা তৈরি করুন। তারপর প্রত্যেকের থেকে কৌশলে মাফ চেয়ে নিন। তখন আমরা আল্লাহর দিকে অতিদ্রুত পৌঁছে যেতে পারব। তাঁর নৈকট্য মেনে নিতে পারব। এই গীবত ও হকসমূহ আমাদের পায়ে জিঞ্জিরের মতো আঁকড়ে আছে। আমার আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে বাধা দিচ্ছে। এই গীবত তখন বাধা দিতে পারবে না, যখন গীবত থেকে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারব।

অবৈধ খেজুর আবদালের স্তর অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়াল

হুক্কুল ইবাদের প্রভাব কত গভীর, কত কঠিন দেখুন। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম শীতের লম্বা রাতে মসজিদে এলেন। নফল পড়তে-পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলেন। ফরশ বিছানো ছিল। তিনি তাতে শুয়ে পড়লেন। নিদ্রা তার ওপর ছেয়ে গেল। তিনি দেখতে পেলেন, এক উজ্জ্বল চেহারার ব্যক্তি কামরায় প্রবেশ করলেন। তিনি মজমা জমালেন। তার চার পাশে মানুষের সমাগম। তারা পরস্পরে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। তাদের মধ্যে থেকে একজন বললেন, এখানে তো আমরা ছাড়া অন্য কাউকেও দেখতে পাচ্ছি। তাদের আমীর বললেন, হাঁ; এখানে ইবনে আদহাম পড়ে আছে। সে তো ওলী হতে চাচ্ছে। কিন্তু সে কী করে ওলী হবে, অথচ সে অমুক বান্দার খেজুর তার অনুমতি ছাড়া ভক্ষণ করেছে। সে কীভাবে ওলী হবে?

তারা একথা বলে গেল। ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন, আমার সাথে-সাথে স্মরণ হয়ে গেল, আমি একবার খেজুর ক্রয় করেছিলাম। যখন আমি চলতে লাগলাম, দেখলাম আমার পায়ের কাছেই একটা খেজুর পড়ে আছে। আমি ধারণা করলাম, এটি আমার ভাগেরই খেজুর। আহ! এ তো দোকানদারের অংশ ছিল। আর সেই খেজুর আমি খেয়ে ফেলে অন্যের হক ভক্ষণের গুনাহে জড়িয়ে গেলাম! তিনি বলেন, পরদিন আমি গিয়ে তার কাছে মাফ চেয়ে নিলাম। আমি তার থেকে মাফ চাইতেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে অবদালের মর্যাদায় টেনে নিলেন। একটা খেজুরের কারণে আমি প্রথমে আবদাল হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম।

অনুমতি ছাড়া মাটি নেওয়ার কুফল

একব্যক্তির মৃত্যু হলো। কেউ একজন স্বপ্নে দেখল, কে যেন তাকে বলছে, তোমার হালত বলো তো। সে বলল কী বলব? আমি এমন একটা কাজ করতাম, যাকে খুব সাধারণ মনে করতাম। কিন্তু পরওয়ারদেগার আলম আমাকে ওই কাজের কারণেই পাকড়াও করলেন। লোকটি বলল, কাজটা কী? সে বলল, আমি আমার প্রাকৃতিক প্রয়োজন থেকে অবসর হয়ে টয়লেট থেকে বের হলে হাত ধোওয়ার জন্য মাটির প্রয়োজন হতো। তখন তো সাবান ছিল না। মাটি দিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া হতো। বলল, আমি আমার প্রতিবেশীর ঘরে দেওয়ালের পাশ থেকে হাত ঘষে মাটি নিয়ে নিতাম। অথচ আমি তার থেকে এর অনুমতি নিইনি। আমাকে বলা হলো, কেন তুমি অনুমতি ছাড়া অন্যের মাটি নিতে? আমি তোমার ওই হাতকে শায়েস্তা করব।

এখন আমার হাতকে জাহান্নামের আগুনে ফেলা হয়। এর কষ্ট সারা শরীরে অনুভূত হয়। আমার হাতকে আগুনে জ্বালানো হয়, যার ফলে পুড়ে যায় আমার পুরো দেহ। বলা হয়, কেন অনুমতি ছাড়া প্রতিবেশীর দেওয়াল থেকে মাটি নিতে?

ফকীহ আবুল্লাইস সমরকন্দির তাকওয়া

ফকীহ আবুল্লাইস সমরকন্দি (রহ.) সফরে বের হলেন। তাঁর স্বাভাবিক সামানা যা হতো, তার চেয়ে চারগুণ বেশি হতো মাটির চাকা। কেউ একজন বলল, হযরত! আপনার তো সামানাও এত নেই যতগুলো ঢেলা আছে? এসব কী জন্য? তিনি বললেন, পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিলাম। আমি চাচ্ছি না, মানুষের অনুমতি বিনে তার ক্ষেতের মাটি ঢিলা হিসেবে ব্যবহার করব। অবশ্য ফতাওয়ামতে এর অনুমতি আছে। কিন্তু তাকওয়া তো ভিন্ন জিনিস। এটিই তো সতর্কতা।

আজ আমরা করছি কী? আমরা সামান্য একটু সময়ের ভেতরেই কোন বিষয়কে কোন দিকে নিয়ে যাই, কোন মুআমালাকে কেমন করে ফেলি তা নিজেরাই টের পাই না। কোথাকার কথা কোথায় পৌঁছিয়ে দিই, নিজেরাই জানি না। একটু চিন্তা করে দেখুন আজ আমরা কী করছি?

جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ
جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ

'যেমন কর্ম তেমন ফল না মানলে করে দেখ
জান্নাতও আছে, জাহান্নামও আছে না মানলে মরে দেখ।'

একটু চিন্তা করে দেখুন, আজ যে-কর্ম করছেন, কাল তার জবাব দিতে হবে। তাই তো ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا

'তোমরা একে অন্যের গীবত করো না।'[১]

---

১. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১২

নাশোকরির ফলে আল্লাহ থেকে দূরত্ব

আরেকটা বিষয় হচ্ছে আল্লাহর নাশোকরি বা অকৃতজ্ঞতা। আল্লাহ আমাদের যে-নেয়ামতই দিয়ে থাকেন, তার শুকরিয়া আদায় করা আমাদের জন্য আবশ্যক। তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা চাই। হযরত মূসা (আ.)-এর জাতি বলল, হে আল্লাহর নবী! আমরা কীভাবে বুঝব আল্লাহ আমাদের ওপর সন্তুষ্ট আছেন, নাকি নারাজ। ব্যাপারটা জানতে তিনি তূর পর্বতে গমন করলেন। আল্লাহকে প্রশ্ন করলেন। বলা হলো, হে আমার দোস্ত! উম্মতকে বলুন, তোমরা আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকো আর তাতেই বুঝে নাও, আমিও তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট আছি। আর আমার ওপর তোমাদের মন যদি অসন্তুষ্ট থাকে, তাহলে আমিও তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট।

আজ দেখুন, আমরা আল্লাহর সিদ্ধান্তে কত অসন্তুষ্ট! আমরা বলছি, আমাকে এটা দেওয়া হয়নি, ওটা দেওয়া হয়নি!

তাই তো হাদীছে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় যে-বান্দাকেই সামান্যতম রিযিক দান করবেন, আর সেই সামান্য নিয়েই বান্দা আল্লাহর ওপর রাজি হয়ে যায়, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার অল্প আমলের ওপরই সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন যে, তুমি আমার দেওয়া সামান্যর ওপরই সন্তুষ্ট ছিলে; আমিও তোমার সামান্য আমলের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।

অতীতকে ভুলে যেয়ো না

তো আমাদের উচিত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখুন। আল্লাহর আযমত ও মহব্বত হৃদয়ে ধারণ করে রাখুন। নিজের সময়কে ভুলে যাবে না। দেখুন, এমন কথা মানুষ কখন বলে, যখন বান্দা নিজের সময়কে ভুলে যায়। মানুষ নাশোকরিমূলক কথা তখনই বলে, যখন নিজেকে, নিজের অতীতকে ভুলে যায়। সে ভাবছেও না, আমি যা বলছি, তার বিপদ যদি আমার ওপর আসে, তবে তো আমি ধ্বংস হয়ে যাব।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ

'হে মানবজাতি! তোমার অবাধ্যতার ফল তোমাদের ভোগ করতে হবে।'[১]

যে-গুনাহ করবে, সে-ই তার আপদে পতিত হবে। আপনি কারও ক্ষতি করছেন না। নিজের ক্ষতিই নিজে করছেন। আপনাকেই আপনি আযাবে নিপতিত করছেন। তাই অকৃতজ্ঞতামূলক কোনো কথা মুখে না আনা উচিত।

---

১. সূরা ইউনুস : আয়াত ২৩

অকৃতজ্ঞতার আযাব

এক অফিসারের ঘটনা বলছি। লোকটির কাছাকাছি স্থানেই মসজিদ। ফজরের আযান হলো। সে জাগ্রত হলো। পরদিন সে মুআয্যিনকে ডেকে বলে দিল, ফজরের আযান মাইকে দেবে না; আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয়। মুআয্যিন বলল, লোকেরা তো আযান শুনেই মসজিদে আসবে; আপনিও তাড়াতাড়ি উঠে যাবেন যেন ফজরের পর প্রাতঃভ্রমণে যেতে পারেন। লোকটি বলল, আমার মুখে-মুখে কথা বলছ?

মুআয্যিন পরদিনও মাইকেই আযান দিল। এবার যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হলো, লোকটি মুআয্যিনকে কষে একটা চড় মারল, আমি বলিনি তোকে মাইকে আযান না দিতে? ব্যাপারটা আল্লাহর সহ্য হলো না। সাথে-সাথে তার দুটি হাত প্যারালাইস্ড হয়ে গেল। এবার আর অফিসার তার অফিসারের কাজ করতে পারে না। তাকে অফিসারের পদ থেকে বরখাস্ত করা হলো। সে তো বুঝতে পারেনি কী কাণ্ডটা করল। এবার তার সব দম্ভ খতম হয়ে গেল। ফকির হয়ে গেল। এবার তো ঘরের স্ত্রীর সাথে ক্যাটক্যাট শুরু করল। স্ত্রীকে জ্বালাতন করতে লাগল। ঘরে বসে গেল। সারাদিন ঘরে থেকে স্ত্রীকে গালিগালাজ করে। স্ত্রী বেচারী স্বামীর খেদমত করে। তাকে খানা খাইয়ে দেয়, কাপড় পরিয়ে দেয়। সব কিছু করে দেয়। তবুও স্বামী তাকে গালি দেয়, কটুকথা বলে।

কিছুদিন এভাবে চলল। দারিদ্র্য তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। সে বলল, আমি তো শেষ হয়ে যাচ্ছি। সে তার ভাইকে চিঠি লিখল, আমি বড় সমস্যায় আছি; তোমার কাছে আমাকে নিয়ে যাও। ভাইও তাকে নিয়ে যেতে এল। সে এসে বাচ্চাদেরসহ নিয়ে চলে গেল। ইতিমধ্যে তার দুটি পা-ও প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হলো। এবার তো জিন্দা লাশের জীবন। না হাত সচল আছে, না পা সচল আছে!

ভাইয়ের বাসায় এল। এখন তার খেদমত কে করবে? না খেতে পারে, না পান করতে পারে, না নিজের প্রয়োজন সারার জন্য হাত নাড়তে পারে। তাকে কে গোসল দেবে? কে শিশুর মতো তার নাপাক ধুয়ে দেবে। কে তার কাপড় পরিবর্তন করিয়ে দেবে? ভাইয়ের স্ত্রী-বাচ্চারাও অল্প কদিনের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারা বলে দিল, আমাদের দ্বারা তো এ-কাজ হবে না।

একদিন কোনো এক কথায় লোকটি ভাইয়ের স্ত্রীর প্রতিও নারাজ হয়ে গেল। লোকটি তো এমনিতেই দাম্ভিক ছিল। ভাইয়ের স্ত্রীকে কড়া কথা বলে

দিল। ভাইয়ের স্ত্রী অসন্তুষ্ট হলো। শুনে ভাইও অসন্তুষ্ট হলো। তারা সহ্য করতে পারল না। তখন গরমের মৌসুম ছিল। তাকে সকলে মিলে একটা চৌকিতে তুলে ঘরের বাইরে তপ্ত রোদে রেখে এল। এবার তো তীব্র রোদে তার দেহ পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। পিপাসায় কাতর হয়ে গেল। খাবারের প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু এখন কে তাকে খাওয়াবে, পান করাবে?

এবার লোকটি কাঁদতে লাগল, কেউ আমাকে খাবারের কিছু দাও, আমাকে পানি পান করাও। একব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। লোকটি তাকে দুটি টাকা দিল। সে বলল, আমি তো টাকা চাইনি। আমাকে খাবার দাও। আমার ক্ষুধা পেয়েছে। লোকটি তার জন্য খাবার আনল। বলল, এই নাও; খাও। অসুস্থ লোকটি বলল, আমার হাত তো কাজ করে না। দাতা লোকটি বলল, আমার হাতে এত সময় নেই যে, তোমাকে খাইয়ে দেব। আমি গেলাম।

প্যারালাইসিসে আক্রান্ত দাম্ভিক লোকটি কাঁদতে লাগল, আমাকে খাইয়ে দাও। কিন্তু লোকটির আকুতি শুনে দাতা রুটিটা তাকে ধরিয়ে দিয়ে গেল। লোকটি তা বাঁকা পায়ের ফাঁকে রুটিটি রেখে কুকুরের মতো টেনে-টেনে খেতে লাগল। অফিসার এখন খাবার খাচ্ছে পায়ের দ্বারা কুকুরের মতো। তাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে–

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ

'আযাব এমনই! আর আখেরাতের আযাব বড়ই ভয়ংকর।'[১]

মানুষ যখন আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের নাফরমানি করে, তাঁর নেয়ামতের নাশোকরি করে, তখন আল্লাহও তার সাথে তেমনই কাণ্ড করেন। তাই নিজের অবস্থা ভুলে না যাওয়া উচিত। মুখ চালানো তো সহজ। তবে এর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তার মোকাবেলা করা বড়ই কঠিন। কেয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি দুনিয়ায় আমার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেছিলে? তাই বলছি, আজও সময় আছে; মানুষের মতো মানুষ হও। নিজের দিকে তাকাও। নিজের কাজের খবর নাও। যত গীবত করেছ, তার একটা সূচি তৈরি করো। তারপর সবার থেকে ক্ষমা চেয়ে নাও। মাথার বোঝা সময় থাকতেই হালকা করে নাও। এমন যেন না হয় যে, জীবনপ্রদীপ নিভে যাবে আর তুমি মৃত্যুর দুয়ারে আছড়ে পড়বে, অথচ তোমার গুনাহগুলো রয়ে যায়! এমন যেন না হয়।

---

১. সূরা কলম : আয়াত ৩৩

আল্লাহর অবাধ্য না হওয়া চাই। আজ তো মানুষ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না। আমাদের মাঝে কয়েকজন মানুষ আছে, যাদের জবান থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে আলহাম্‌দুলিল্লাহ বের হয়। কজন ইচ্ছা-অনিচ্ছায়ও আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকে। হে আল্লাহ! এত কিছু আপনি আমাদের দিয়েছেন। আমরা এর উপযোগী ছিলাম না। আমাদের উচিত আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হওয়া, আল্লাহর ইবাদাত করা, আল্লাহকে মান্য করে চলা।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত মাওলানা বদরে আলম (রহ.) একটি হাদীছ রেওয়ায়াত করেছেন। বনী ইসরাঈলে তিনজন রুগ্ন ব্যক্তি ছিল। তাদের একজন ছিল অন্ধ। একজন ছিল কুষ্ঠরোগী। একজন ছিল টেকো। শ্বেতরোগীর চেহারায় ও শরীরে ছিল সাদা-সাদা দাগ। একব্যক্তি এসে তাকে বলল, কী অবস্থা তোমার? সে বলল, আপনি তো দেখছেনই আমি শ্বেতরোগী। আমার চেহারা বিশ্রী। আমার পাশে কেউ বসতে চায় না। কেউ সোজা মুখে আমার সাথে কথা বলে না। আমার জীবন সংকটপূর্ণ। আমি পেরেশান। আগত লোকটি তাকে দু'আ করে দিল। আল্লাহ তাকে একটা উটনি দান করলেন। উটের বংশ বৃদ্ধি হয়ে এমন হলো যে, লোকটি সময়ের সেরা ধনী হয়ে গেল। আর তার রোগও দূর হয়ে গেল। আল্লাহ তাকে সুদর্শন করে দিলেন।

ওই আগত অপরচিত লোকটি সেই লোকটির কাছেও গেল, যার মাথায় চুল নেই, টাকরোগে আক্রান্ত, যার কারণে লোকেরা তাকে দেখলেই উপহাস করত। আর লোকটি দরিদ্রও ছিল। আগত লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করল, কী খবর তোমার ভাই? লোকটি বলতে লাগল, আমি আর কী বলব। সবাই আমাকে নিয়ে তামাশা করে, আমাকে নিয়ে উপহাস করে। বহু ওষুধ খেয়েছি; কিছুই হয়নি। আগত ব্যক্তি একেও দু'আ করে দিল। ফলে তার রোগ ভালো হয়ে গেল। সে-ও ধনী হয়ে গেল। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে গাভী দান করা হলো। তার জীবন অত্যন্ত স্বচ্ছল হয়ে গেল।

আগত ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গেল। এই লোক ছিল অন্ধ। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কী খবর তোমার? অন্ধ বলল, আমি আর কী বলব। দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমার চোখ অন্ধ। সে তাকে দু'আ করে দিল। আল্লাহ তাকে দৃষ্টিশক্তি দান করলেন। দান করলেন একটা বকরিও। বকরির বংশ বৃদ্ধি পেল। লোকটি ধনী হয়ে গেল।

লোকগুলো বেশ আয়েশ-আরামেই জীবন যাপন করছিল। কিছুকাল পর সেই আগত ব্যক্তি আবার এল। লোকটি বলল, দেখো, আমি বড় অভাবী। বড় অসহায়। দারিদ্রের মঝে কাটছে আমার জীবন। আল্লাহ তো তোমাদের অনেক দিয়েছেন। আমাকে কিছু দান করো। তোমাদের কাছেও তো আগে কিছু ছিল না। আল্লাহই এখন তোমাদের স্বচ্ছল বানিয়েছেন।

একথা শুনে লোকটি রাগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করল। বলতে লাগল, তুমি এসব কী বলছ। আমার দাদা ধনী ছিলেন। আমার বাবা ধনী ছিলেন। আমি বিত্তবান পিতার বিত্তবান ছেলে। তুমি এসব কী বলছ যে, আমার কিছু ছিল না? বের হও এখান থেকে। লোকটি তাকে গালিগালাজ করল। আগত ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তোমাকে তেমন করে দিন যেমন তুমি পূর্বে ছিলে। ফলে লোকটির কুষ্ঠরোগ আবার এসে গেল। সমস্ত সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল।

এবার আগত সেই লোকটি দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট এল এবং আগের মতো কাকুতিমিনতি করে তার কাছে আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য চাইল। লোকটি শুনে তো আগুনের মতো জ্বলে উঠল। আমি এই, আমি সেই। তুমি বলছ আমার কিছু ছিল না। বের হও। আমার কথায় লোকেরা ওঠে-বসে আর তুমি আমাকে অপমান করছ। যাও; ভাগো এখান থেকে!

আগত মেহমান তাকে বলল, ঠিক আছে; তুমি যেমন ছিলে আল্লাহ তোমাকে তেমন করে দিন। সাথে-সাথে টাকওয়ালা লোকটি আবার টেকো হয়ে গেল। তার ধনসম্পদ সব ধ্বংস হয়ে গেল।

এবার লোকটি তৃতীয় ব্যক্তির কাছে এল। তার কাছেও পূর্বের মতো কাকুতিমিনতি করে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করল। তাকে তার অসহায়ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। আগত লোকটি কথা বলতেই সাথে-সাথে এই লোকটি দাঁড়িয়ে গেল। সে বলল, ভাই! তুমি যা বলেছ, সত্যই বলেছ। একসময় আমি অন্ধ ছিলাম, দরিদ্র ছিলাম। আল্লাহর এক বুযুর্গ বান্দার দু'আয় আল্লাহ আমাকে এসব দান করেছেন। এসব তো আল্লাহর মাল। তোমার যা মন চায়, এখান থেকে নিয়ে নাও। যে বকরিটা তোমার ভালো লাগে নিয়ে যাও।

এবার লোকটি বলল, তোমার মালসম্পদ তোমারই থাকুক। আল্লাহ এতে আরও বরকত দান করুন। আমি ফেরেশতা, তারা দুজন তাদের আসল সময়টার কথা ভুলে গেছে। তুমি তোমার সেই দরিদ্র অবস্থার কথা ভোলনি। আল্লাহ তোমার সম্পদে আরও বরকত দান করুন। আমাকে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা নিতে পাঠিয়েছেন। তুমিই শুধু উত্তীর্ণ হতে পেরেছ।

নেয়ামতের কদর করা উচিত

তো আল্লাহ তা'আলা ওই ব্যক্তিকে পছন্দ করেন, যে নিজের দুঃসময়কে মনে রাখে, আল্লাহর নেয়ামতের মূল্যায়ন করে। এতে আল্লাহ নেয়ামতে আরও বরকত দান করেন। ও হে মা ও বোনেরা! তোমরা আজ তোমাদের সন্তানদের দেখে শুকরিয়া আদায় করছ না। এটি কি বাজার থেকে কেনা সম্পদ? এ তো আল্লাহ দিয়েছেন। আল্লাহ কাউকে ছেলে দান করেন, কাউকে দান করেন মেয়ে। কাউকে সুশ্রী বানান। তোমার চোখজুড়ানো সুন্দর সন্তান দান করেন আল্লাহ। হৃদয়-মন শান্ত হয়ে যায় সন্তানের দিকে তাকালে। চাওয়া ছাড়াই আল্লাহ এমন সন্তান দান করলেন। তারপরও নাশোকরি করছ। যাদের সন্তান নেই, তাদের দিকে তাকাও। সব কিছু আছে; কিন্তু সন্তান নেই, যেন তাদের কিছু নেই। সোনার ঘরদোর হয়ে লাভ হবে কি যদি বংশধারা না থাকে? অথচ আজ মেয়ে জন্ম নিলে মানুষ নারাজ হয়। কেউ একটু কালো সন্তান হলেই নারাজ হয়। খবরদার! সাবধান! আল্লাহর গজব এসে যেতে পারে। সন্তান না থাকলে তো ঘরবাড়ি সবই বিরান-বিরান লাগে। সন্তান আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত। আল্লাহর শুকরিয়া কেন আদায় করছ না? কেন এমন অকৃতজ্ঞ হয়ে গেলে? আল্লাহ তোমাকে সুস্থ সবল দেহ দিয়েছেন। তোমাকে ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যম দিয়েছেন। সন্তান দিয়েছেন, সংসার দিয়েছেন।

কেন শুকরিয়া আদায় করছ না? নিজের জীবনের মূল্য দিচ্ছে না কেন? দেখছ না, কত মানুষ ছেঁড়া জামা পড়ছে। তাদের থেকে তো আল্লাহ তোমাদের অনেক ভালো রেখেছেন। তোমার জন্যও তো আল্লাহ ভিক্ষাবৃত্তি লিখে রাখতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তো তোমাকে সুখে রেখেছেন। শান্ত-শীতল পরিবেশের ঘরে থাকতে দিয়েছেন। এর কদর কেন করছ না? কেন মূল্য দিচ্ছ না? নিজের পছন্দমতো সবই তো পাচ্ছ। কিসের অভাব আছে বলো। তোমার সন্তান তো তোমাকে মা বলে ডাকছে। কেন সেই আদরের সন্তানকে অপছন্দ করছ?

কেউ কন্যা হলে নারাজ হয়ে যায়। কেউ অসুন্দর সন্তান জন্ম নিলেই রাগ হয়ে যায়। এটা তো আল্লাহর সাথে রাগ দেখানো। আল্লাহর নেয়ামতের অবমূল্যায়ন না করা চাই। আল্লাহ আমাদের যোগ্যতা থেকেও বেশি দান করেছেন। যদি আল্লাহ আমাদের মেপে-মেপে দান করতেন যে, তোমরা আমার ইবাদাত যতটুকু করছ, নেয়ামতও ততটুকুই পাবে। এমন নীতিতে

দান করলে তো আমরা কত আগেই না খেয়ে মারা যেতাম। যত নেয়ামত আল্লাহ তা'আলা আমাদের দিয়েছেন, তার কোনটির উপযুক্ত আমরা? তাই গীবত করে নিজের আমল নষ্ট করো না। আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো। আল্লাহর ভয়ে ভীত মানুষকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ জাহান্নামে ফেলবেন না।

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ۝

'যে আল্লাহকে ভয় করবে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করে চলবে, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।'[১]

কেয়ামতের দিন এমন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ মেহেরবানি করবেন। আমরা তো আল্লাহর বান্দা। বান্দার মতোই জীবন যাপন করা উচিত। কেন আমরা নিষিদ্ধ পথে পা বাড়াব।

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ

'আল্লাহর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।'[২]

আল্লাহ আমাদের ওপর রহমত নাযিল করুন। আমাদের আত্মার ব্যাধিগুলো দূর করে দিন। আমাদের মানুষের মতো মানুষ বানিয়ে দিন। মানুষের মতো জীবন দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

---

১. সূরা নাযি'আত : আয়াত ৪০, ৪১

২. সূরা বরূজ : আয়াত ১২

মানুষ ও মাটি

'তা দেখুন, মাটিই আমাদের মূল। আমরা ফিরে যাব আসল ও মূলের দিকেই; চাই যত বড়ই হোক না সে। রাজা হোক বা প্রজা, নেতা হোক আর যে-ই হোক। যখনই মানুষ মরে, তাকে মাটিতেই দাফন করে দেওয়া হয়। তাই আমাদের উচিত আমাদের মূলকে মনে রাখা। আমরা মাটি, আমরা হয়েও যাব মাটি। প্রত্যেক জিনিসই তো তার মূলের দিকে ফিরে যাবে। তাই আমাদের উচিত নিজেদের আসলের দিকে লক্ষ রাখা। নিজের মধ্যে মাটির গুণগুলো তৈরি করে নিন। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, মাটিতে চারটি গুণ আছে। যে মানুষের মাঝে এই গুণগুলো পয়দা হয়ে যাবে, সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে নিল। আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক হয়ে যাবে, সে-ই সফল হয়ে যাবে।'

মানুষ ও মাটি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ۝ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ۝

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

মানুষ মাটি থেকে সৃষ্টি

মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের নায়েব হিসেবে প্রেরিত হয়েছে। মানুষ আল্লাহর খলীফা, তাঁর প্রতিনিধি, তাঁর গুণাবলি প্রকাশের মাধ্যম। আল্লাহ এই মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।

اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ

'আমি তাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।'[১]

তো মাটি থেকে খামিরা তৈরি করা হয়েছে। তাই মাটিই আমাদের ভিত্তি। মৃত্তিকা-ই আমাদের মূল। আমাদের মূল কোনোভাবেই অগ্নি বা অন্য কিছু নয়।

শয়তান আগুন দ্বারা সৃষ্টি

শয়তানকে আল্লাহ তা'আলা আগুন দিয়ে তৈরি করেছেন। আল্লাহ শয়তানকে আদেশ করেছিলেন আদমকে সেজদা করো। শয়তান নানা রকম বাহানা করতে লাগল।

---

১. সূরা ছফফাত : আয়াত ১১

সে বলল–

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ

'আমি তার চেয়ে উত্তম।'

خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ

'আমাকে তো আপনি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।'[১]

আগুনের চেয়ে মাটির উপকারিতা বেশি

ওই কাণ্ডটা তো ছিল শয়তানের দাম্ভিকতা। অথচ আগুনের চেয়ে মৃত্তিকারই উপকারিতা বেশি। আগুনে ও মাটিতে মৌলিক পার্থক্য আছে। আগুন মানুষের উপকার করে, আবার ক্ষতিও করে। আগুন সব কিছুই জ্বালিয়ে দেয়। চাই তা ভালো হোক আর বন্দ হোক এটাই আগুনের ধর্ম। ঘরে যদি কখনও আগুন লাগে, তাহলে সেখানে ভালো-খারাপের কোনো পার্থক্য থাকে না। সব কিছুই পুড়িয়ে ফেলে। আর আপনি যদি চিন্তা করেন, তা হলে দেখবেন মানুষ মাটি ছাড়া বাঁচতেই পারবে না। আগুন ছাড়াও মানুষের জীবনযাপন সম্ভব; কিন্তু মাটি ছাড়া নয়। কত পশু পাখি আছে, কত সৃষ্টিজীব আছে, আগুন যাদের কোনো দিনই প্রয়োজনে আসে না। পানিতে বাস করে কত মাখলুক; তাদেরও একই অবস্থা। তাদের খাদ্য জমিন থেকে উদ্‌গত হয়। তা খেয়ে জীবন পার হয়ে যায়।

তো আগুন যদি না-ও হতো, তবুও মানুষ জীবন ধারণে সক্ষম হতো। কিন্তু জমিন না হলে শুধু আগুনই যদি থাকে, তাহলে মানুষ বাঁচতেই পারবে না।

প্রত্যেক জিনিস তার মূল জিনিসের দিকেই ফিরে যায়

আমাদের মাশায়েখে কেরাম বলেছেন–

كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ

'প্রত্যেক জিনিস তার মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।'

বলুন ইবলীস কোন দিকে প্রত্যাবর্তন করবে? জাহান্নামের দিকে। আর সেই নিয়মে মানুষের উচিত হবে সে মাটির দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। কারণ,

---

১. সূরা ছোয়াদ : আয়াত ৭৬

মানবের মূল হলো মৃত্তিকা। সাধারণভাবে তো সবাই মাটির দিকে ফেরে না। কিন্তু একটা দিন এমন আসবে, যেদিন সকল কিছুই মাটির সাথে মিশে যাবে।

মুসলিম ও অমুসলিমের দাফনের ব্যবস্থা

আল্লাহ তা'আলার শান দেখুন; দুনিয়ার সর্বপ্রথম অন্যায় যেটি হয়েছিল, সেটি হচ্ছে হত্যা। হন্তারক ও নিহত উভয়েই পরস্পর ভাই ছিলেন। আর হত্যাকাণ্ডটা ছিল নারীঘটিত ব্যাপার নিয়ে। আর ছিল হিংসা। একের বিরুদ্ধে অন্যের মাঝে জ্বলে উঠেছিল হিংসার বারুদ। ভাবনা ছিল, পরিকল্পনা ছিল, আমি যদি তাকে হত্যা করতে পারি, তাহলে তার স্ত্রী হয়ে যাবে আমার স্ত্রী। হিংসা একটা জঘন্য অপরাধ। এর কবলে পড়ে হত্যা করে ফেলল ভাইকে ভাই। এবার খুঁজে পাচ্ছে না এই ভাইয়ের লাশটা কী করবে? আল্লাহ একটা কাক প্রেরণ করলেন। একে শিক্ষা দিলেন। কাক অন্য একটা কাককে হত্যা করল। তারপর হত্যাকারী কাক ঠোঁট দ্বারা গর্ত করে নিহত কাকটাকে সেই গর্তে লুকিয়ে ফেলল। এরই প্রেক্ষিতে ইরশাদ হচ্ছে–

يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ

'হায় আফসোস! আমি এই কাকটার মতোও হতে পারলাম না?'[১]

এরপর থেকেই মৃত মানুষকে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। এবার ইসলামের সৌন্দর্য দেখুন। মানুষকে তার অস্তিত্বের মূলের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু হিন্দু ধর্মের কেউ যখন মারা যায়, তাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তো জ্বালিয়ে দেওয়া আর মাটিতে ফিরিয়ে দেওয়া কিন্তু এক কথা নয়। তারা বরং মৃতের বউকেও আগুনে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য করত। চাই অল্প বয়স্কা হোক আর বৃদ্ধা হোক। স্ত্রীকেও বিনা অপরাধে চিতায় আত্মাহুতি দিতে হয়! এটা মানবতাবিরোধী একটা কর্ম। ইসলামের সৌন্দর্য তো এই যে, এর প্রতিটি বিধান মানুষের বোধগম্য। অন্য সব ধর্মে তাদের বিধানগুলো যুক্তি ও মানবতার বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। তাদের কথা যুক্তি ও বিচারের বাইরে চলে যায়। তো দেখুন, মানুষকে সম্মানের সাথে দাফন করা-ই সবচেয়ে উত্তম। তাই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেও প্রমাণিত হয়।

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৩১

মাটির গুণগুলো বরণ করে নিন

তো দেখুন, মাটিই আমাদের মূল। আমরা ফিরে যাব আসল ও মূলের দিকেই; চাই যত বড়ই হোক না সে। রাজা হোক বা প্রজা, নেতা হোক আর যে-ই হোক। যখনই মানুষ মরে, তাকে মাটিতেই দাফন করে দেওয়া হয়। তাই আমাদের উচিত আমাদের মূলকে মনে রাখা। আমরা মাটি, আমরা হয়েও যাব মাটি। প্রত্যেক জিনিসই তো তার মূলের দিকে ফিরে যাবে। তাই আমাদের উচিত নিজেদের আসলের দিকে লক্ষ রাখা। নিজের মধ্যে মাটির গুণগুলো তৈরি করে নিন। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, মাটিতে চারটি গুণ আছে। যে মানুষের মাঝে এই গুণগুলো পয়দা হয়ে যাবে, সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে নিল। আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক হয়ে যাবে, সে-ই সফল হয়ে যাবে। গুণগুলো এই–

প্রথম গুণ : লুকিয়ে রাখা, গোপন করা। মাটির প্রথম গুণ হলো, এটি মরার পরে মৃত মানুষকে গোপন করে নেয়। তো মাটির মাঝে গোপন করার গুণ আছে। তাই মানুষের মাঝেও গোপন করার সিপাত অর্জিত হওয়া চাই। আল্লাহ 'সাত্তার'। এর অর্থ হচ্ছে গোপনকারী। আল্লাহ তা'আলা চান আমার এই গুণটি আমার বান্দারা অর্জন করুক। আর আমাদের অবস্থা তো এমন যে, যখনই আমাদের কেউ পরস্পর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে, তখন একে অন্যের দোষচর্চায় লেগে যাই। মানুষের ভালো দিকগুলো খারাপ করে বলতে শুরু করি।

রহমত হোন, আপদ নয়

আমাদের তো উচিত, আমরা একে অন্যের জন্য দয়ালু হয়ে যাব, নির্দয় হব না। কিছু মানুষ আছে, যারা আল্লাহর বান্দাদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে যায়। তাদের সাথে জীবন কাটানোই বড় কঠিন হয়ে পড়ে। সর্বদা ঝগড়া-ফাসাদ লেগেই থাকে। ছোট-ছোট ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। দুজন ছাত্রকে যদি বলা হয়, তোমরা মিলেমিশে থাকো, ঝগড়া-ফাসাদ করো না; শিক্ষকদের বলুন, মিল মহব্বতের সাথে থাকুন; ভাইদের বলুন, তোমরা সুন্দরভাবে জীবন যাপন করো, দেখবেন এদের সবার মাঝে ঝগড়া-ফাসাদ সংঘটিত হচ্ছে। কয়েকজন মানুষকে একসাথে থাকতে বলুন; তাদের মাঝেও ঝগড়া হবে। অথচ উচিত হলো, পরস্পরে দয়া-মায়ার সাথে, মহব্বতের সাথে জীবন যাপন করা।

নবীজির চরিত্র

যে-মানুষ সুন্দর চরিত্রের হয়ে থাকে, সে নিজেকে সৌভাগ্যের এমন সোপানে আরোহিত করে নিতে সক্ষম হয় যে, সকলে তাকে মহব্বত করে। নবীগণের মাঝে এমন সুন্দর ও সুউচ্চ আখলাক বিদ্যমান ছিল। এই আখলাকই তাঁদের সৌভাগ্যের শীর্ষ চূড়ায় তুলে দিয়েছিল।

ইহুদি খারাপ নিয়তে নবীজির খেদমতে উপস্থিত হলো। নিয়ত ছিল আমি নবীকে কষ্ট দেব, দুঃখ দেব। ইহুদি মেহমান হিসেবে নবীজির কাছে অবস্থান করল। নবীজি তাকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করলেন। রাতে খাবার দিলেন এবং সুন্দর বিছানায় ঘুমাতে দিলেন। সে অনেক বেশি করে খেল। তার নিয়ত ছিল, যদি বেশি খাবার গ্রহণের কারণে নবীজি কিছু বলেন, তাহলে বলবে, তোমরা তো মেহমানের কদর করতে জান না।

আল্লাহর শান দেখো। নবীজি তাকে যা খাবার দিলেন, আল্লাহ তাতে বরকত ঢেলে দিলেন। লোকটি খেতে-খেতে ক্লান্ত হয়ে গেল; কিন্তু খাবার আর শেষ হলো না। লোকটির রাতে পেট খারাপ হয়ে গেল। সে নবীজির বিছানাপত্র নষ্ট করে ফেলল। লজ্জায় সে পালিয়ে গেল। নবীজি দিনের বেলা এসে এই অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে গেলেন। কিন্তু কাউকে না ডেকে নিজেই পানি দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করতে শুরু করে দিলেন। নবীজি চাইলেন, লোকটির এই কাণ্ডের কথা কেউ যেন না জানে।

তো নবীজির গোপন করার মানসিকতা লক্ষ করুন। কাউকে না জানিয়ে নিজেই লোকটির ময়লা পরিষ্কার করতে লাগলেন, যেন কেউ তার এমন আচরণের কথা জানতে না পারে। নবীজি পানিতে বিছানাপত্র ধৌত করছিলেন। এরই মধ্যে লোকটি এসে উপস্থিত হলো। তার তরবারিটা সে রেখে গিয়েছিল। এটি নিতে ফিরে এল। এসে সে যা দেখল, তাতে সে হতবাক হয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ শুধু তাকিয়ে থাকল। অথচ লোকটি ধারণা করেছিল, কেউ এখনও হয়তো টের পায়নি। এসে সে নবীজিকে একাজ করতে দেখল। আর বুঝল, নবীজি সামান্যও রাগান্বিত নন।

নবীজি তাকে দেখেই বললেন, আরে ভাই! তোমার কল্যাণ হোক। তোমার শরীর এখন কেমন আছে? লোকটি আশ্চর্য হলো। আমাকে বকা দেওয়ার বদলে এভাবে সম্মান করা হচ্ছে? লোকটি বলল, আপনি নিজেই ধৌত করছেন? কাউকে ডাকেননি? নবীজি বললেন, না; আমি চাচ্ছি, তোমার এই আচরণের কথা কেউ না জানুক। এতে তো তোমার প্রতি তাদের

ঘৃণা জন্মাবে। সে যখন দেখল, ইসলাম এমনই ধর্ম, তাই সাথে-সাথেই বিমুগ্ধচিত্তে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

আমাদের অবস্থা

আপনি যদি গভীরভাবে আমাদের এই বর্তমান অবস্থা নিয়ে ভাবেন আর চিন্তা করেন, আমাদের সাথে যদি এমন কাণ্ড করা হয়, তাহলে আমরা তার জন্য কতটুকু প্রস্তুত আছি। একটা রুমে কয়েকজন ছাত্র অবস্থান করছে। অসুস্থতার কারণে কোনো একজন তার জামাকাপড়, বিছানাপত্র ময়লা করে ফেলেছে। আমরা এখন কী করি? নাক ছিটকিয়ে তুলকালাম কাণ্ড করে ফেলি– তুমি কী করেছ? এমন করে মানুষ এমন হাজারো প্রশ্ন তুলে বকাবকি করে। আমাদের রুম থেকে বের হয়ে যাও। তুমি আমাদের সাথে আর থেকো না এমন ধমক দিই। অথচ আমরা চিন্তা করি না, প্রাকৃতিক এই প্রয়োজনের সম্মুখিন আমিও হই প্রতিদিন। আমিও হয়তো কোনো দিন কোনো কারণে এমন করে ফেলতে পারি। আমিও তো অসুস্থ হয়ে যেতে পারি। আমরা এসব ভাবি না।

আজ আমাদের আমল দেখুন আর সেই সরদারে দোজাহাঁ মুহাম্মাদে আরাবীর আমল দেখুন। পার্থক্যটা নির্ণয় করতে চেষ্টা করুন। আমরা তো বরং ভালো গুণগুলোকেও সমাজে খারাপভাবে উপস্থাপন করি মানুষের। মানুষের একটা দোষ পেলে আমরা তা নিয়ে হইহুল্লোড় শুরু করে দিই।

তো দেখুন, গোপন রাখা আল্লাহর গুণ। ইরশাদ হচ্ছে–

تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللهِ

'তোমরা আল্লাহর স্বভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাও।'

আল্লাহর স্বভাব কী? আল্লাহর সাত্তার গুণটি আমার মাঝে আনয়ন করা চাই। এক বুযুর্গ বলতেন, হে আমার বন্ধু! যেব্যক্তি তোমার প্রশংসা করল, সে মূলত আল্লাহরই প্রশংসা করল। কারণ, আল্লাহই তো তাঁর সাত্তার গুণের মাধ্যমে তোমার ভেতরকার দোষগুলোকে গোপন রেখেছেন।

ফেকাহর একটি মাসআলা

তো দেখুন, মাটির প্রথম গুণ হচ্ছে, মাটি তার নিজের মাঝে গোপন রাখে। গোপন রাখা-ই তার একটি নিয়ম। তাই ফোকাহায়ে কেরাম ও ইসলামি আইন শাস্ত্রবিদ বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যদি কোনো

মানুষের অবস্থা এমন হয় যে, সে শত্রুর কবলে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে; দুশমনরা তার সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়েছে, পোশাকটাও তার পরনে নেই। এখন তার নামায তো পড়তে হবে। কিন্তু সারা শরীরেই কাপড় নেই। কাছেধারে কোনো গাছও নেই যে, পাতা দিয়ে শরীর ঢাকবে। এখন এ-ব্যক্তি করবে কী? হাঁ; তার কাজ হলো, সে মাটির আশ্রয় নেবে। মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে। এই মাটি তার শরীর পবিত্র করে দেবে। তারপর লোকটির উচিত হবে, এক স্থানে নামাযের সূরতে বসে যাবে। নিজের চারপাশে এতটুকু মাটি একত্র করে নেবে, যেন তা সতরকে লুকিয়ে নেয়। এমন অবস্থা তৈরি করে তার পর সে নামায পড়তে পারবে।

দেখুন, মাটি মানুষকে কেমন করে লুকিয়ে নিচ্ছে। যদি পানি না পাওয়া যায়, তাহলে মানুষ অজু করে কীভাবে? হ্যাঁ; তখন সে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে। মাটি তাকে পবিত্র করে দেয়। মাটি যেন তাকে ধুয়ে দেয়। আমাদেরও উচিত, আমরা নিজেদের মাঝে এই গুণ সৃষ্টি করব। অন্যের দোষ নিজেদের সুন্দর গুণ দিয়ে ধুয়ে দেব। তাদের দোষ লুকিয়ে রাখব, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করব– অপমানিত করব না। তাই তো যারা নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করে, অন্যদেরও সংশোধনের চেষ্টা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন।

তো মাটির প্রথম গুণ হচ্ছে সে গোপন করে, লুকিয়ে রাখে।

দ্বিতীয় গুণ গ্রহণ করা : মাটির দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে গ্রহণ করা। উজাড় করে গ্রহণ করা। আপনি পানি ঢালবেন; মাটি তা গ্রহণ করে নেবে। আপনি অন্য কিছু তাতে নিক্ষেপ করবেন, তো মাটি তা গ্রহণ করে নেবে। যা-ই তাতে ফেলবেন, তা-ই সে গ্রহণ করবে। মাটির ভেতর গ্রহণ করে নেওয়ার অন্যন্য একটি গুণ আছে। আল্লাহর তাওফীকে এই গুণটিও আমাদের মাঝে এসে যাক।

আমাদের মাঝে গ্রহণ করে নেওয়ার মানসিকতা কোথায়

আজ আমরা বড় ধরনের মসিবতে পতিত হয়ে আছি। লোকদের মাঝে গ্রহণ করে নেওয়ার মানসিকতা নেই। আপনি মানুষটিকে একটি কথা বোঝাবেন; কিন্তু সে তা মেনে নেবে না, বুঝতেই চাইবে না। এক কানে শুনে অন্য কানে তা ফেলে দেয়। একব্যক্তি ছিল। লোকটির নাম ছিল গুল মুহাম্মাদ। লোকটির গুণ ছিল অবিচলতা। জমিন নড়লেও সে নড়ত না। আমাদেরও আজ অবিচলতার গুণ অর্জন করা উচিত। মানুষকে আমি

বোঝাব; কিন্তু আমার কর্মে থাকব অবিচল। আজ আমরা কেউ আমাদের সংশোধনের চেষ্টা করলে আমরা তার কথা না শুনে বরং লোকটিকে নানা রকম বিষাক্ত কথা শুনিয়ে দিই। অনেক সময় সরাসরিই তার মোকাবেলায় অবতীর্ণ হই। আর যে মেনে নেয়, গ্রহণ করে নেয়, তার মাঝে যোগ্যতা তৈরি হয়। তাই যারা আমাদের সংশোধন করতে চেষ্টা করবেন, তাদের সাদরে বরণ করে নেওয়া উচিত।

আবার দেখুন, বিদ্যালয়ের ছাত্রী বা শিক্ষিকাদের যদি বলা হয়, এই কাজটা এভাবে করুন, একাজ এভাবে করা সুন্নত, তো তারা তা করে না। কারণ, প্রত্যেকের ভাগ্য রয়েছে, তাকদীর রয়েছে, কপালের লিখন রয়েছে। তো যার ভাগ্য ভালো, সে-ই সুন্নতকে গ্রহণ করে নেয়, নিতে পারে। আর যার ভাগ্য খারাপ, সে নিতে পারে না। কিছু মহিলা আছে, জীবনেও তাদের কোনো কথা মানানো যায় না। তারা কোনো দিন কল্যাণকে গ্রহণ করে না। কত হতভাগিনী তারা! কত দুর্ভাগা তারা!

সাহাবা কেরামের চরিত্র

সাহাবা কেরাম সর্বদা নিজেদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। কোনো ভাই-বন্ধু যদি কোনো ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দিতেন, কোনো কর্মে সংশোধনি দিতেন, তা তারা বিনাবাক্যে মেনে নিতেন। তাতে তাঁরা খুশি হতেন, সংশোধনকারী ভাইকে নিজের কল্যাণকামী মনে করতেন। হযরত আলী (রাযি.) বলেন, যেব্যক্তি আমাকে আমার দোষের উপঢৌকন দেবে (আমার দোষ সংশোধন করে দেবে), আমি তার জন্য মাগফেরাতের দু'আ করব।

আজকের যুগে তো স্বামী স্ত্রীকে কিছু বলতে পারে না। স্ত্রী কিছু বলতে পারে না স্বামীকে। এমন অবস্থা এসে গেছে যে, কাউকে কিছু বলা হলেই বলে, আমি স্বাধীন; যেকোনো কাজের অধিকার আমার আছে। তুমি আমাকে বলার কে? সবাই বলে, আমার কাজ আমি করব, তাতে তোমার কী? তো কেউ কাউকে মানে না। ছেলেমেয়েরা মানেনা মা-বাবাবে। আবার দেখা যায়, স্বামী যদি তার স্ত্রীর কাজকে সংশোধন করে দিতে না পারে, তা হলে ভেতরে-ভেতরে জ্বলে মরে সে। আর স্ত্রী যদি স্বামীর কোনো কাজ অপছন্দ করে, সে তা সংশোধন করে দিতে পারে না বলে ভেতরে-ভেতরে স্ত্রী বেচারীও পুড়ে ছাই হয়। কেউ কাউকে মানে না। কেউ কারও কথা গ্রহণ করে না। সবাই চিন্তা করে, আমি তো স্বাধীন; আমি যা ইচ্ছে তা-ই করব। আজকে এই যে ভুল বোঝাবুঝি, এই যে বাড়াবাড়ি; এর কারণেই পারিবারিক

জীবনে শান্তি নেই। অথচ সাহাবা কেরামের অভ্যাস ছিল, যে-ই তাঁকে সংশোধন করে দিক বিনা দ্বিধায় খুশি হয়ে শুকরিয়া আদায় করে তা নিজের মাঝে বাস্তবায়নের চেষ্টা করত।

ফুলের পরশে মাটি সুরভিত

শেখ সাদী (রহ.) বলেন, আমি একবার গোসলখানায় গেলাম। দেখলাম, একটা মাটির চাকা পড়ে আছে। আগের যুগে যখন সাবান ছিল না, তখন মানুষ মাটি দিয়েই হাত ধুয়ে নিত। আমরা আমাদের বড়দের দেখেছি, তারা প্রকৃতিক প্রয়োজন সেরে মাটি দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নিতেন। চাকাটা থেকে খুশবু ছড়াচ্ছিল।

بدو گفتم تو مشکے یا عبیری
کہ از بوئے دل آویز تو مستم

'আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে মৃত্তিকা! তুমি মেশ্‌ক, নাকি আম্বর? তোমার খুশবুতে আমার হৃদয়ও সুরভিত হয়ে গেছে, আমার হৃদয় অভিভূত হয়ে গেছে।

بگفتا من گلے ناچیز بودم
و لیکن مدتے با گل نشستم

'সে বলল, আমি হলাম অধম মাটি। তবে আমি কিছুদিন ফুলের সান্নিধ্যে ছিলাম।'

তো দেখুন, বাগানের মাটি; তাতে ফুল ঝরে পড়েছিল। এই মাটিতে ফুল পড়েছিল। ফুলের ঘ্রাণ এই মাটি চুষে নিয়েছিল, গ্রহণ করে নিয়েছিল। ফলে মাটিও সুরভিত হয়ে গেছে। মাটি বলল–

جمال ہم نشین در من اثر کرد
وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

'আমার সঙ্গীর সৌন্দর্য আমার মাঝে প্রভাব বিস্তার করেছে। অন্যথায় আমার কি আর বিশেষত্ব আছে; আমি তো মাটিই।

প্রিয় ভাইয়েরা! মাটির মাঝে গ্রহণ করার যোগ্যতা ছিল। আর উত্তম গুণ নিজের মাঝে ধারণ করেছে, গ্রহণ করেছে। আজ আমরা মানুষ হয়েও যদি

ভালো গুণগুলো গ্রহণ না করি, তবে দেখুন আমরা কত হীন! চিন্তার বিষয় ভাই! চিন্তারই বিষয়!

শোনা ও মানার গুরুত্ব

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরাম থেকে এ কথার ওপর বাইআত নিয়েছেন যে–

اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا

'তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং আনুগত্য করে চলো।'

এটি সাধারণ কোনো বিষয় নয়। শুরুতে তালেমুল ইল্‌মরা বলত, এটি এমন কী কঠিন বিষয় যে, বাইআত নিতে হয় এর ওপর? এখন অবশ্য তাদের বুঝে এসেছে, এটি নিতান্ত ছোট বিষয় তো নয়ই, বড় থেকেও অনেক বড় বিষয় এটি।

اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا

'শোনো আর মানো।'

জানো আর আমল করার জন্য দু'আ করো, হে আল্লাহ! আমাদের ভালো ও উত্তম বিষয় শ্রবণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। কত মানুষ আছে, কোনো একটি বিষয় সে শুনেও শোনেনি এমন ভাব ধরে। এমনিতে তো শুনেছে দেখা যায়। কিন্তু সে শোনার মতো শোনেনি। কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ

'আল্লাহ যদি তাদের মাঝে কোনো কল্যাণ আছে বলে জানতেন, তবে তাদেরকে শুনবার জন্যে ক্ষমতা দিতেন।'[১]

তো তারা শুনত না। মানে শোনার মতো করে শুনত না।

জান্নাতিদের শ্রবণের কথা এভাবে আছে–

اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ

'তারা এমন যে, তারা মনোযোগের সাথে কথা শোনে এবং তার ভালোগুলোর ওপর আমল করে।'[২]

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ২৩
২. সূরা যুমার : আয়াত ১৮

মানুষ দেখে-দেখেই অনেক জ্ঞান অর্জন করে নেয়। অথবা অর্জন করে নেয় শুনে-শুনে। তাই তো মুহাদ্দিছীনের নিকট سماع حديث তথা হাদীছ শ্রবণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমনও যদি হয় যে, কারও বাবা বড় মুহাদ্দিছ। তিনি জীবনে হাজারো হাদীছ শুনেছেন এবং সকল হাদীছ তিনি একটি কাগজে একত্রিত করেছেন। মৃত্যুর সময় তার এই লিখিত কাগজের কিতাবটি তার সন্তানকে মানুষের উপস্থিতিতে দান করে গেলেন। সাক্ষ্যও দিলেন যে, বৎস! এই যে হাদীছ; এগুলো আমি আমার ওস্তাদগণের নিকট শুনেছি এবং এখানে এই কিতাবে একত্রিত করে সংরক্ষণ করেছি। আমি এগুলো তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। তারপর মুহাদ্দিছ সাহেব ইন্তেকাল করে চলে গেলেন। এখন ওলামায়ে কেরাম বলেন, ওই মুহাদ্দিছের সনদের ধারা ভেঙে গেছে। ওই সন্তান ওই কিতাবটির হাদীছ মানুষের নিকট রেওয়ায়াত ও বর্ণনা করতে পারবে না। সে যদি রেওয়ায়াত করেও, তাহলে ধারাপরম্পরা এখানে এসে কেটে যাবে।

কারণ কী? কারণ হচ্ছে, এই সন্তান তো কিতাব পেয়েছে ঠিক; কিন্তু তার বাবা থেকে সে কিতাবের হাদীছগুলো শোনেনি, ওস্তাদ থেকে শুনে নেয়নি। ফলে তার জন্য এই হাদীছ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ।

এটি শোনার গুরুত্ব।

নফসের হঠকারিতা শ্রবণে বাধা দেয়

যেকোনো দু'আর সময় এই দু'আটিও করবে যে, হে আল্লাহ! আমাদের এমন বানিয়ে দিন যেন আমরা যেকোনো কল্যাণের বিষয়ই শুনতে পারি এবং সাথে-সাথেই যেন তা আমল করতে পারি। আমাদের নফ্স যেন আমাদের বাধা না দেয়। আমাদের হঠকারিতা যেন আমাদের পথে প্রতিবন্ধক না হয়। আমাদের আমিত্ব, আমাদের মেজাজ যেন আমাদের বাধা না দেয়। যখন বান্দা কল্যাণের বিষয় মান্য না করে, তখন সে প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

এক বাচ্চা তার মাকে বলল, মা! খরগোশের তো পা তিনটা। আমি এই বিষয়টি নিয়ে চ্যালেঞ্জ ধরেছি। মা বললেন, আরে বেটা! তুমি তো হেরে যাবে। তুমি ভুল বিষয়ের বাজি ও চ্যালেঞ্জ ধরেছ। ছেলে বলল, মা! আমি হেরে যাব তো তখন, যখন মেনে নেব। আমি তো মানবই না। আমি বলতেই থাকব, খরগোশের পা তিনটা।

আজ আমাদের অবস্থাও তেমনই হয়ে গেছে। আমরা মান্য করছি না। একটি বিষয় আমাদের সামনেই আছে। আমরা তা নিয়ে বিতণ্ডা করার মধ্যে লেগে যাই। আরে ভাই! ভালো মানুষের মাঝে গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকে, মান্য করার যোগ্যতা থাকে। যেমন ক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়েছেন আল্লাহ মাটির মাঝে।

তৃতীয় গুণ উর্বরাশক্তি : মাটির তৃতীয় গুণটি হচ্ছে মাটি তার মাঝে আসা প্রত্যেকটি জিনিসকে উর্বর করে তোলে। মুমিনও এমন হওয়া চাই যে, মানুষটির কানে যদি কোনোরূপ কল্যাণকর কথা আসে, তাহলে সে তাকে প্রাণময় করে তুলবে, উর্বরাশক্তিতে বাস্তবায়িত করবে। সুন্দরভাবে এর ওপর আমল করে। যেমন– বীজ মাটিতে ফেললেই কয়েকদিন পর মাটি তাকে উর্বরা দেয় এবং তা থেকে চারা গজায়। সেই চারা বড় হতে শুরু করে। একদিন পত্রপল্লবে ছেয়ে যায়। একদিন ফুল দেয়, ফল দেয়।

আমাদেরও উচিত, আমরা আমাদের বড়দের কথায়, ওলামায়ে কেরামের কথায়, ওস্তাদগণের কথা শুনব, হৃদয়ে গেঁথে নেব। হৃদয়ের উর্বরা দিয়ে সেই কথার ওপর আমল করব। আমলটিকে প্রাণের উর্বরায় সজীব করে তুলব। কল্যাণকর বিষয়গুলোকে আমরা উর্বরাশক্তিতে প্রণময় করে তুলব। এ-বিষয়টি অত্যন্ত বিস্তারিত একটি বিষয়। এই একটি গুণ নিয়ে পৃথক একটি বয়ান উপস্থাপন করা যাবে। কিন্তু দীর্ঘ সফরের কারণে আজ শরীর চাইছে না। তাই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করছি। মাটির চতুর্থ গুণ নিয়ে কথা বলা যাক।

চতুর্থ গুণ বিনয় : মাটির চতুর্থ গুণ হচ্ছে, তার মাঝে রয়েছে বিনয় ও নম্রতা। সকলে এই মাটির ওপর জুতা নিয়ে হাঁটছে। জমিনে পা মারছে। জমিন ফল-ফসল দিচ্ছে, মানুষের জীবন ধারণের জন্যে খাদ্যসামগ্রী দিচ্ছে। আর মানুষের আমল দেখুন। মানুষ কী করছে? মানুষ এই মাটিতেই মলত্যাগ করছে আর মাটি সেগুলোকে ফল-ফুল বানিয়ে মানুষকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। তার বিনয় দেখুন। তার সুন্দর স্বভাব দেখুন। আমাদের মাঝেও যদি এমন গুণাবলি এসে যেত। এই বিনয়-নম্রতা আল্লাহর বড়ই পছন্দনীয়। শয়তানের মধ্যে আমিত্ব ছিল আর আমাদের পিতা হযরত আদম (আ.)-এর মাঝে বিনয় ছিল, যেটি মাটির মাঝে রয়েছে–

زمین کی طرح جس نے عاجزی وانکساری کی

خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسمان ہو کر

'যার মাঝে মাটির মতো নম্রতা আছে, খোদার রহমত সুবিশাল আকাশের মতো তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।'

যে মাটির মতো বিস্তৃত হয়ে যায়, আল্লাহর রহমত তাকে আসমানের মতো ছায়া দান করে। আমরা আমাদের মাঝে বিনয় বিনম্রতা তৈরি করা চাই। সবচেয়ে বেশি বিনম্রতা আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে ছিল। তারপর সবচেয়ে বেশি বিনম্রতা ছিল সাহাবা কেরামের মাঝে। এভাবে ধারাপরম্পরা আসতে-আসতে এই বিনম্রতা এখন আছে ওলামায়ে হক-এর মাঝে। আজও যাদের মাঝে ভালো গুণ আছে, তাদের মাঝেই আছে এই বিনয়ের গুণ।

সফরের কিছু সাধনা

দেখুন, গাছের যে শাখাটিতে ফুল বেশি থাকে, ফল বেশি থাকে সেই শাখাটি অন্য সব শাখার তুলনায় বেশি ঝুঁকে থাকে, নত হয়ে থাকে। তেমনি যে-মানুষটি নত হবে, বিনম্র হবে, আল্লাহ তার মাঝে সুন্দর আখলাকের ফল-ফুল দান করবেন। হযরত খাজা আবদুল মালেক সিদ্দীকি (রহ.) একবার ইন্ডিয়া সফর করছিলেন। একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছিলেন। সফরের পর সফর ছিল। তিনি বলেন, আমি একা ছিলাম। পরদেশি ছিলাম। লোকেরা তো ভাবছে, আহ! পীর সাহেব সফরে আছেন। বড় মজায় আছেন। এখানে না খাবার আমার পছন্দনীয়, না পানীয় আমার পছন্দনীয়। নিজের মতো করে শুতেও পারি না, আরামও করতে পারি না। অন্যরা এসব করিয়ে দিচ্ছে। কোনোদিন দুটি প্রোগ্রাম হয়। ঘুমের প্রয়োজন আছে। তারপরও প্রোগ্রাম করতে হবে। আল্লাহরই শান।

এখান থেকে যখন আমেরিকা যাই, সেখানে ঘুমের ব্যাপারটা থাকে না। কারণ, ওখানকার সাথে সময়ের ব্যবধান আছে। এখানে যখন রাত বারোটা বাজে, তখন ওখানে দিনের বারোটা। আর এখানে যখন দিন বারোটা বাজে, তখন ওখানে বাজে রাতের বারোটা। শরীরের তো খবর নেই সে কোথায় যাচ্ছে। শরীর চায় শুধু প্রতি পনেরো-ষোলো ঘণ্টা পর একটা ঘুম। একটা নির্দিষ্ট গতি নিয়েই শরীরটা চলছে। তাই সুনির্দিষ্ট সময়েই চোখে ঘুম আসে। সেই পনেরো-ষোলো ঘণ্টা পার হলেই ঘুমের বড় ধরনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু এখানে যখন ঘুমের সময়, সেখানে তখন জাগার সময়। মানুষ এখান থেকেও ওখানে গিয়ে রাত জেগে থাকে, দিনে ঘুমায়। আর আমাদের সকল কাজ হচ্ছে দিনের বেলা।

তো এখান থেকে যারা-ই যায়, দেহের গতি অনুযায়ী প্রথম-প্রথম কিছু দিন দিনের বেলায়ই ঘুমোতে হয়। কারণ, রাতে ঘুম আসে না। এটি আমাদের শরীরের সাথে সম্পৃক্ত একটি অংশ। তো দেখুন, যে মানুষটি কয়েকটা দিন হাতে নিয়েই গেল সে দেশে, কত কাজ এসে পড়ে সেখানে গেলে, কাউকে মজলিসে সময় দিতে হয়, কোথাও কিছু মানুষকে দীনের কথা বলতে হয়, কেউ নিজস্ব ব্যাপার নিয়েও সময় চায়। কেউ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়ে যায়। তো দিনরাত এত ব্যস্ততার ফাঁকে নিজের জন্য দুটা ঘণ্টা সময়ও থাকে না। অন্যরা তো ভাবছে, খুব আরামে আছি। দেশ-দেশান্তরে সফর করছি। ভুক্তভোগীই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

এটি আল্লাহর রহমত আর আমাদের মাশায়েখে কেরামের দু'আ। এতে আমি অধমের কোনো বিশেষত্ব নেই। তাদের দু'আর বরকতেই তাদের রেখে যাওয়া আমানত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহ আমাকে কবুল করেছেন। আমরা তো ডাকপিয়নের মতো। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো সাইকেলে চড়ে চলছি অবিরত। পৌঁছিয়ে দিচ্ছি মহাসত্যের পয়গাম। এদিক-সেদিক চারদিকে আমরা বার্তা ও চিঠি পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। তাই তো চিঠি বহনকারী সেই ডাক হরকরা আর আমাদের মাঝে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সে নিজের কাজ করে আর মানুষের বার্তা পৌঁছিয়ে দেয় মানুষের দোরগোড়ায়। অপরদিকে আমরা কাজ করি আল্লাহর। আল্লাহর কথা শুনিয়ে দেই বান্দার কানে-কানে। পৌঁছিয়ে দেই মানুষের দুয়ারে-দুয়ারে।

তো বলছিলাম বিনয়-বিনম্রতা নিয়ে। খাজা আবদুল মালেক সিদ্দীকি একাকী ছিলেন। তার বিষয়টি বলতে গিয়ে কথা এত লম্বা হয়ে গেছে। তো আমাদের হযরত বলতেন, আমার মাথার ওপর যে বোঝাটি আছে, তা কিন্তু তোমার মাথায় নেই। কেয়ামতের দিন আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে–

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ

'অবশ্যই-অবশ্যই আমি জিজ্ঞেস করব তাদের, যাদের কাছে তাকে পাঠানো হয়েছে আরও জিজ্ঞেস করা হবে তাকে, যাকে তাদের কাছে প্রেরণ করেছেন।'[১]

কুরআনের আয়াতটি মুখস্থ রাখা চাই। বলা হয়েছে, অবশ্যই-অবশ্যই আমি প্রশ্ন করব, তোমরা কি কথা শ্রবণ করার হক সঠিকভাবে পালন করেছ?

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৬

বার্তাবাহকদেরও জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি তোমাদের দায়িত্ব তথা বার্তা ও পয়গাম সঠিকভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছ? কেয়ামতের দিন পীর-মুরীদ সকলেই দাঁড়াবে। মুরিদদের জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের শায়খ তোমাদের কাছে দীনের যেসব কথা বলেছে, তা কি তোমরা আমল করেছ? সেদিন জবাব দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে। পীরদের জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের ইল্‌মের যে-নেয়ামত দান করা হয়েছে, তোমরা কি তার হক পূর্ণভাবে আদায় করতে পেরেছ? আমাদের শায়খ বলেন, উল্লিখিত আয়াতটি সর্বদা আমার হৃদয়ে থাকে। হযরতের ইন্তেকালের সময় যখন ঘনিয়ে এল, তখন সর্বদা চিকিৎসা চলছিল। হযরতের বড় ছেলে আবদুর রহমান কাসেমি (রহ.) বললেন, আব্বাজি তো সারাটা জীবনই নিজের দিকে খেয়াল রাখেননি; এখন নিজের কথা মনে হয়েছে। এখন খুব নিয়ম মেনে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তখন হযরত বললেন, বেটা! আল্লাহর কসম! আমার কাছে আমার দেহ-মন, শরীর-প্রাণ সবই প্রিয় সেই শুরু থেকে। সেজন্য সারাজীবন আমি আমার প্রাণকে প্রিয় করে রাখিনি। এর অর্থ কী? অর্থ হচ্ছে, সারা জীবন আমার প্রাণকে কষ্টের মধ্যে রেখেছি, যেন আখেরাতের আযাব থেকে প্রিয় প্রাণটিকে রক্ষা করতে পারি। তো আল্লাহওয়ালাদের কাছে তাদের প্রাণ বড় প্রিয় ছিল। কিন্তু তারা প্রাণটিকে ছোট কষ্টের মধ্যে ফেলে রেখেছিলেন, যেন বড় কষ্ট ও আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

ফলদার শাখা ঝুঁকে থাকে বেশি

তো দেখুন, আবদুল মালেক সিদ্দীকি (রহ.) যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, তখন ক্ষুধাও লাগছিল। খাবার ছিল অবশ্য। আল্লাহর শান দেখুন। রাস্তার পাশে ছোট একটা বরই গাছ ছিল। গাছে বরই ছিল। একটা শাখা রাস্তার ওপর ঝুঁকে ছিল। তিনি বলেন, আমি সেই গাছে এই ঝুলন্ত শাখাটিতে এত ফল দেখে অভিভূত হলাম। বললাম, আল্লাহ! ছোট একটা গাছ; কিন্তু কত বেশি ফল দিয়েছ তুমি তাতে! আমিও ছোট মানুষ; আমাকেও তুমি এমন সুস্বাদু ফল দাও, সুগন্ধ ফুল দাও এবং অধিক হারে দাও।

আমি দাঁড়িয়ে কেঁদে-কেঁদে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সুন্দর-সুন্দর গুণ দান করো। আমাকে নেককার ও পবিত্র বানিয়ে নাও। আমাকে ফল দাও। আমার মুরীদ বাড়িয়ে দাও। আমার কর্মের ফল বাড়িয়ে দাও। তিনি বলেন, সময়টা ছিল দু'আ কবুলের। আল্লাহ আমার এই দু'আ কবুল করেছেন। ওই স্থানটি থেকে সামনের গ্রামে যাওয়ার সাথে-সাথে তিনি

দুটি বিষয় লক্ষ করলেন। সারা গ্রামের সকল মানুষ তার হাতে হাত মিলিয়ে বাইআত গ্রহণ করল। সারা গ্রামের সকল মানুষের জীবনধারা বদলে গেল। আরেকটি বিষয় যা ঘটেছিল, তাদের মধ্য থেকে একজন আলেম এমন ছিলেন, যিনি সময়ের কুতুব ও বড় বুযুর্গ ছিলেন। এত বড় বুযুর্গ হলেন যে, হযরত বলেন, আল্লাহ আমাকে এই ফল দান করেছেন।

মানুষ বলে, অমুক শায়খের মুরিদ এত। অমুক শায়খের মুরিদদের মাঝে পরিবর্তন দ্রুত আসে। অমুক শায়খের মুরিদ শায়খকে খুব মহব্বত করে। অথচ তারা জানে না এর পেছনে কত তাহাজ্জুদের অশ্রু রয়েছে। কত দু'আর আরাধনা রয়েছে। মাশায়েখের কত বিগলিত চোখের পানি রয়েছে। যার কারণে এপথ সুগম হয়েছে। এ তো কলব ও হৃদয়ের ব্যাপার। এ তো শুধুই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। বান্দার নিজের ইচ্ছায় এসব হয় না। আল্লাহ যখন ইচ্ছে করেন, হৃদয় খুলে দেন।

বিনয়ের ফল

আলোচনা চলছিল মানুষের বিনয় অর্জন করার ব্যাপারে। কোনো এক কবি বলেছেন–

جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں
صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ

গুণের অধিকারীরা সর্বদা নত থাকেন, ঝুঁকে থাকেন। পানির পাত্র মাথা নত করেই অন্য পাত্র ভরে। কোনো একটি পানির পাত্র থেকে অন্য পাত্রে পানি পূর্ণ করতে হলে আগে পূর্ণ পাত্রটির মাথা নত করে দিতে হয়। তবেই সে অন্যকে পূর্ণ করতে পারে। তেমনিভাবে যদি কোনো ওস্তাদ ইচ্ছে করেন যে, আমি আমার ছাত্রদের ইল্‌মের নূর দ্বারা পূর্ণ করব, সুন্দর আখলাক শেখাব, তাহলে আগে ওস্তাদকেই মাথা নত করে দিতে হবে। নিজের গর্দানটা আল্লাহর সামনে ঝুঁকিয়ে দিতে হবে। এক কবি এই বিষয়টিকেই অন্যভাবে বলেছেন–

تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں صراحی سے
کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی

'সোরাহি থেকে বিনয় ও বিনম্রতা শিক্ষা নাও হে মানুষেরা! তার মাঝে পানির প্রাচুর্য আছে। আবার সে ঝুঁকেও যায় মাথা নত করে।'

পাত্র তার মাথা যতটুকু নত করে, তার থেকে পানি ততটুকুই পড়ে। এতে বোঝা যায়, বান্দা আল্লাহর সামনে ঝুঁকতে হবে। বান্দা যত ঝুঁকবে, আল্লাহ তার ইল্‌মকে তত বেশি মানুষের কাজে লাগাবেন। তাই আমাদের উচিত বিনয় শেখা, নম্রতা শেখা।

আমিত্ব মিটিয়ে দিতে হবে

আমিত্ব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। তাকাব্বুর থেকে আত্মরক্ষা করা চাই। আর মনে-মনে কল্পনা করবে, আমি একদিন মিটে যাব। একদিন আমি নাই হয়ে যাব। দুদিন আগে আর পরে। তাই আমার উচিত আগে-আগেই আমার আমিত্বকে মিটিয়ে দেব। আগেও আপনাদের বলেছি হে বন্ধুগণ! নিজের আমিত্বকে মিটিয়ে দিন। নিজের আমিত্বকে ভেঙে দিন। মনে রাখুন, যে তার আমিত্বকে না মেটাবে, তার আমিত্বকে আল্লাহ ধ্বংস করে দেবেন। আর যার আমিত্ব আল্লাহ মেটাবেন, তার তামাশা দেখবে সারা দুনিয়া। তাই আবারও বলছি, অহংকারকে ধুলোয় মিশিয়ে দিন। অহংকার থেকে, আমিত্ব থেকে নিজেকে দূরে রাখুন এবং ধ্বংসলীলা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। খাজা গোলাম ফরীদ (রহ.) বলেছেন–

میں کوں منج فقیرا ■ تے نکی کر کے کٹ

تے کھلے خزانے رب دے ■ تے جیویں چاہویں لٹ

'আমার আমিত্বকে একেবারে বাঁকা করে বেঁধে নাও। যখন তুমি তোমার আমিত্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, তখনই আল্লাহ তোমার জন্য খাজানা খুলে দেবেন। তুমি যা পার তা থেকে নিতে পারবে।'

তো যেভাবে মাটির মাঝে বিনয়-নম্রতা আছে, মানুষের উচিত সেই গুণটিকে অর্জন করা। তাহলে আল্লাহ ওই বান্দাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আল্লাহ আমাদেরও তার দানের খাযানা থেকে আঁজলা ভরে-ভরে নেওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

খুতুবাতে যুলফিকার
৩২তম খণ্ড

তাওবার হাকীকত

'আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের ওপর মেহেরবানি দেখুন। বান্দা যখন গুনাহ করে, তাহলে গুনাহ-লেখক ফেরেশতা সাথে-সাথে সেই গুনাহ লেখে না। আল্লাহ গুনাহের লেখক ফেরেশতাকে নেকের লেখকের অধীন করে দিয়েছেন। নেকের ইচ্ছে করলেই সাথে-সাথে নেক লিখে ফেলা হয়। কিন্তু গুনাহের ইচ্ছে করলেই তা লেখা হয় না। গুনাহে লিপ্ত হলেই তারপর তা লেখা হয়। কেউ গুনাহের ইচ্ছে করলে গুনাহের লেখক নেকের লেখকের নিকট অনুমতি চায়, জিজ্ঞেস করে, লিখব এর গুনাহ? নেকের লেখক বলে, অপেক্ষা করো। কতটুকু অপেক্ষা? ছয়টি প্রহর অপেক্ষা করতে হয়। ২৪ ঘণ্টায় প্রহর থাকে আটটি। ৬টি প্রহর পর্যন্ত প্রায় ১৬ ঘণ্টা অপেক্ষা করে।

মোটকথা, গুনাহ-লেখক ফেরেশতা ১৬ ঘণ্টা পরেও লিখতে পারে না। হতে তো পারে লোকটি তাওবা করে নেবে। এতে তো গুনাহ লিখে উল্টো আমার কাজ বেশি করতে হবে। লেখা বন্ধ রাখলেই তো বরং ভালো। দীর্ঘ সময় পরও যদি বান্দা লজ্জিত না হয়, তাওবা না করে, তারপরই গুনাহটা লিখে নেয়।'

তাওবার হাকীকত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

ইসলামের সৌন্দর্য

ইসলামের একটি সুন্দর দিক হচ্ছে, বান্দার জন্য আল্লাহ তাওবার দ্বার খুলে দিয়েছেন। হিন্দু ধর্মে তাওবা বলে কোনো নিয়ম নেই। যদি কোনো হিন্দু গুনাহ করে, তাহলে তাকে বোঝানো হয়, তুমি আগামী জনমে জন্তু হয়ে জন্ম গ্রহণ করবে। এতে লোকটি চিন্তা করে, জীব-জানোয়ার হয়েই যখন জন্ম গ্রহণ করতে হবে, ব্যস যা খুশি তাই করো। একটা গুনাহ, একটা অন্যায় খুলে দেয় হাজার-হাজার গুনাহ ও অন্যায়ের দরজা। সে চিন্তা করে, গুনাহের জন্য জানোয়ার যেহেতু হতেই হবে, তাহলে ভালো করে আরও জানোয়ারি কাণ্ড করে নিই। ফলে সে অন্যায়ের অথৈ সাগরে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

আর ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে, মানুষ যত বড় গুনাহগারই হোক সে যদি সত্য তাওবা করে রহমানের দুয়ারে ফিরে আসে, আল্লাহর দরবারে ফিরে আসে, তাহলে সে রক্ষা পাবে। জীবনের প্রতিটি বাঁকে তার জন্য এই দাওয়াত, এই আহ্বান ঘোষিত হচ্ছে যে, হে বান্দা! তুমি এখনও যদি তাওবা করে ফিরে আসতে পার, এখনও যদি অন্যায়কে ছেড়ে দিয়ে সত্যকে ধারণ করে নিজের জীবনকে সুসজ্জিত করে নাও, তাহলে তুমি রক্ষা পাবে। তুমি বেঁচে যাবে। এমনকি যদি কোনো কাফের-মুশরিকও অবাধ্যতার পথ পরিহার করে সত্যকে গ্রহণ করে নেয়, তাহলেও তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। তাওবার দরজা সদা উন্মুক্ত। এটি আল্লাহর একটি গুণ। তিনি বান্দার গুনাহ মাফ করেই খুশি হন, আনন্দিত হন।

'আযাব প্রদানকারী' অর্থে আল্লাহর কোনো নাম নেই

ওলামায়ে কেরাম ও ইসলাম বিশেজ্ঞ ব্যক্তিত্বগণ লিখেছেন, আল্লাহর গুণবাচক ৯৯টি নাম আছে। নামগুলোর কথা হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। সেই নামগুলোর মধ্যে একটিও এমন নেই, যার অর্থ দাঁড়ায় 'আযাব প্রদানকারী', 'শাস্তি দানকারী'। ৯৯টি নামই তাঁর এমন, যেগুলোর অর্থ রহমত দানকারী। দয়ালু, মেহেরবান, মাফকারী, রিযিকদানকারী ইত্যাদি। মানুষ মনে করে, جَبَّارٌ তো কঠিন অর্থের নাম। শুনুন ভাই! جَبَّارٌ আরবি শব্দ। এর অর্থ অনেক বিস্তৃত। অনেক শব্দই এমন আছে, যার অর্থ বিস্তৃত। তো আল্লাহর জন্য যে অর্থটি নেওয়া হয়েছে (পরাক্রমশালী) এতে কি বান্দার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোরতা করা হবে এমন কিছু বোঝা যায়? যায় না।

قَهَّارٌ অর্থ প্রবল পরাক্রম।

جَبَّارٌ অর্থ মহা প্রতাপশালী।

غَفَّارٌ অর্থ মাফকারী।

سَتَّارٌ অর্থ গোপনকারী।

حَلِيْمٌ অর্থ শক্তি থাকা সত্ত্বেও শাস্তিদানে বিলম্বকারী।

আল্লাহ কত বড় হালীম যে, বান্দা যত গুনাহ করছে, তিনি সবই দেখেন। দেখা সত্ত্বেও দ্রুত আযাব ও শাস্তি দিয়ে দেন না। আল্লাহর সবগুলো গুণবাচক নামই এমন।

رَزَّاقٌ رَحْمٰن رَحِيْمٌ كَرِيْمٌ

এমনসব নামের অর্থ তো আমরা জানি-ই। কিন্তু এমন কোনো নাম তো নেই, যার অর্থ শাস্তি দানকারী, আযাব দানকারী। কেন নেই এমন নাম?

ইসলামের শিক্ষা

ইসলাম আমাদের শিক্ষা দান করে–

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ

'গুনাহ থেকে তাওবাকারী সেই ব্যক্তির মতো যার কোনো গুনাহ নেই।'

যেমন– বোর্ডে কোনো বিষয় লিখে শিক্ষকরা আবার মুছে ফেলেন। তেমন গুনাহগুলোকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুছে দেওয়া হয়।

মানুষের জীবন বরবাদ হওয়ার কারণ তিনটি

অনেক সময় আপনাদের অন্তরে হয়তো প্রশ্ন জাগ্রত হয়, মানুষ কেন গুনাহ করে? শুনুন গুনাহের তিনটি রূপ আছে–

১. হারাম ভক্ষণ : প্রথমটি হচ্ছে হারাম ভক্ষণ। এই হারাম লোকমার ওপরই তো সকল কাজের ভিত্তি তৈরি হচ্ছে। যদি আপনার উপার্জনের সাথে সুদ-ঘুস ইত্যাদি যুক্ত থাকে, কারও অবৈধ মাল, কারও থেকে ধোঁকা প্রতারণা দিয়ে, চুরি-ছিনতাই করে আনা সম্পদ আপনার খাবারের সাথে যুক্ত থাকে, তাহলে তো কথা স্পষ্টই যে, এসব আপনার কার্যক্রমে আপনার আমল-আখলাকে প্রভাব ফেলবেই। আবার অনেক সময় দেখা যায়, আপনার উপার্জনের পন্থা হালাল ও বৈধ। কিন্তু জিনিসগুলো এমন ব্যবসায়ী থেকে কিনলেন, যাদের ব্যবসায় হারাম মিশ্রিত। আজকের হোটেল-রেস্টুরেন্টগুলোর অবস্থা-ই চিন্তা করুন। হারাম-হালালের কোনো ব্যবধান আছে কি তাদের কাছে? কোনো অনুভব-অনুভূতি আছে কি? এই যে হারাম বস্তুগুলো খাওয়ানো হচ্ছে, এগুলো তো মানবের আত্মার নূর ধ্বংস করে দিচ্ছে।

২. খারাপ লোকদের সংশ্রব : দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে খারাপ ও দুশ্চরিত্র মানুষদের পাশে থাকা। তাদের সাথে ওঠাবসা, গল্প-আড্ডা ইত্যাদিতে মত্ত থাকা। তাদের সাথে সময় কাটানো। বিপথগামী মানুষেরা সৎ মানুষদেরও বিপথে নিয়ে যায়, জীবনকে বরবাদ করে দেয়। এমন মানুষের সংস্পর্শে যাওয়া থেকে নিজেকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রাখবে।

৩. গুনাহ : তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে গুনাহে লিপ্ত হওয়া। গুনাহ বলতে সব ধরনের গুনাহ। বিশেষ করে এমন গুনাহ, যেগুলোর ধ্বংসলীলা অত্যন্ত মারাত্মক। এই তিনটি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে দেয়, মানুষের জীবনকে বরবাদ করে দেয়। মানুষের জীবনটা তো এমন পবিত্র হবে যে, তাতে গুনাহের সামান্যতম নাপাকিও থাকবে না।

إِنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ

'তোমার মাওলা যেন তোমাকে এমন কাজে লিপ্ত না দেখেন, যার থেকে তোমাকে বারণ করা হয়েছে।'

তোমার মাওলা তোমাকে যেন এমন স্থানে না দেখেন, যেখান থেকে তোমাকে বারণ করা হয়েছে। একথা সব সময় অন্তরে জাগরূক রাখা দরকার

যে, আমরা কখনও এমন কোনো কাজ করব না, যা আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। তাওবা তো আমাদের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক ব্যাপার। আমাদের এই সাধারণের ওপর তো আবশ্যক হচ্ছে গুনাহ থেকে বিরত থাকা। হযরত যুননূন মিছরি (রহ.) বলেছেন–

تَوْبَةُ الْعَوَامِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَتَوْبَةُ الْخَوَاصِ مِنَ الْغَفْلَةِ

'সাধারণ জনগণের তাওবা হচ্ছে গুনাহ থেকে। আর বিশেষ ব্যক্তিদের তাওবা হচ্ছে গাফলত থেকে।'

আচ্ছা; এমন কোনো মানুষ আছে কি, যে বলবে আমার কোনো গাফলত নেই? আমার মাথায় ওসওয়াসা আসে না? আমার মনে প্ররোচনা আসে না? কে আছে এমন বলুন তো শুনি। তাই বলছি, এখান থেকেও বোঝা যায়, তাওবা জনসাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ সকলেরই জন্য আবশ্যক বিষয়।

হযরত সাহ্‌ল তসতরি (রহ.)-এর সাথে একবার শয়তানের দেখা হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, সাহ্‌ল! তুমি বড় নেক কাজ করে করে ফিরছ। রাত জেগে নামায পড়, দিনে রোযা রাখ। কেয়ামতের দিন আমারই তো মাগফেরাত হয়ে যাবে; তোমার আর ইবাদাত করতে হবে কেন? সাহ্‌ল বললেন, না তো; তোমার তো মাগফেরাত হবে না। শয়তান বলল, আল্লাহর বাণী আছে–

إِنَّ رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

'আমার রহমত সর্ব জিনিসে ব্যাপ্ত।'

তো যদি প্রত্যেক জিনিসের ওপরই আল্লাহর রহমত ব্যাপ্ত থাকে, তাহলে আমি তো রহমতের ভাগী হয়ে যেতে পারব। আমিও তো একটা বস্তু। হযরত সাহ্‌ল বললেন, প্রত্যেকেরই মাগফেরাত হবে। তবে ঈমান থাকা জরুরি। শয়তান বলল, তুমি তো রহমতকে একটি সুনির্দিষ্ট গণ্ডির ভেতর নিয়ে এসেছ। অথচ আল্লাহর রহমত আরও ব্যাপ্ত।

হযরত সাহ্‌ল পেরেশান হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, এই হতভাগাকে কী জবাব দেবেন? আমাদের ওলামায়ে কেরাম এর জবাব এই দিয়েছেন যে, আল্লাহর রহমত সাধারণভাবে সবার জন্যই ব্যাপক। তবে কেউ যদি এই রহমতে প্রবেশই না করতে চায়, তাহলে রহমতের দোষ কী? শয়তান তো রহমতের ছায়াতলে আসতেই চায়নি। তাই শয়তানের মুক্তি হবে না। 'ফয়জুল বারী' গ্রন্থে এই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

তাওবার ব্যাপারে কিছু বিস্তারিত আলোচনা আছে। অধিকাংশ আলোচনা আপনারা জেনে গেছেন। আমি শুধু মুযাকারার সুরতে ফের আপনাদের সামনে বিষয়গুলো পুনরাবৃত্তি করছি যেন সকলেরই নতুন করে স্মরণ হয়ে যায়।

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

'আর আলোচনা করো। কারণ, আলোচনা মুমিনদের উপকার করে।'

তবে নতুন-নতুন অনেক বিষয়ও তো আসবে ইনশাআল্লাহ।

গুনাহের কালি মুছে যায় তাওবা দ্বারা

চলুন, আমরা তাওবা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। মানুষ যখনই গুনাহে লিপ্ত হয়, তখন তার আত্মার মাঝে, তার কলবের মাঝে এবং তার হৃদয়ের মাঝে একটি কালো দাগ পড়ে নুকতার মতো। হাদীছ শরীফে এসেছে–

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ

'যখন কোনো বান্দা গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটা কালো দাগ লেগে যায়। যদি বান্দা গুনাহ থেকে ফিরে আসে এবং এস্তেগ্ফার ও তাওবা করে নেয়, তখন অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়।'

যদি কোনো নেকের কাজ করে নেয়, তখন আবার দিল থেকে দাগটা মিটিয়ে দেওয়া হয়। শয়তান অনেক সময় এই ধোঁকা দেয় যে, তুমি তো এমন-এমন গুনাহ করেছ। বলো, তোমার নেক কাজের ফায়দাটা কী?

আরে ভাই! গুনাহের দাগ যখন অন্তরে লাগে, সাথে-সাথে নেকি নামক সাবান দ্বারা তা ধুয়ে ফেলো; তা হলেই তো হয়। যদি আমরা গুনাহ থেকে ফিরে না আসি, তাহলে নেক থেকে ফিরে আসব কেন? অনেক সময় প্ররোচনা আসে, তোমার পড়াশোনা করে ফায়দা কি হবে? তোমার দৃষ্টি তো পবিত্র নয়। তো শয়তান অন্তরে এমন ধারণা ঢালে। কারণ, শয়তান জানে, যদি ছেলেটা গুনাহ করে আবার পড়তে বসে যায়, তাহলে তার অন্তর থেকে গুনাহটা মুছে যায়। যেমন হাদীছে এসেছে, ইল্মের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা হাজার রাকাত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।

গুনাহ নেকি খেয়ে ফেলে

গুনাহ আপনার পূর্বকৃত নেকি খেয়ে ফেলে। ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِتَّقُوْا مَظَالِمَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

'তোমরা যথাসম্ভব জুলুম থেকে বেঁচে থাকো।'

فَاِنَّ الرَّجُلَ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِحَسَنَاتٍ يُرٰى اَنَّهَا سَتُنْجِيْهِ فَمَا يَزَالُ عِنْدَ ذَالِكَ يَقُوْلُ اِنَّ لِفُلَانٍ قِبَلَكَ مُظْلِمَةٌ اَمْحُوْا مِنْ حَسَنَاتِهٖ فَمَا تَبْقٰى لَهٗ حَسَنَةٌ

'বান্দা কেয়ামতের দিন এত-এত নেক নিয়ে আসবে যে, সে বলবে, আমি তো নাজাত পেয়েই গেছি। আমার এত-এত নেক আমল আছে। বলা হবে, তুমি তো অমুকের ওপর জুলুম করেছ। তো ওই যে জুলুম করলে, নেক দিয়ে তা পরিশোধ করো। এমন করতে-করতে লোকটির আর একটি নেকিও বাকি থাকবে না।'[১]

তো বোঝা গেল, আমরা যে-গুনাহ করছি, তা আমাদের নেকগুলো খেয়ে ফেলছে। হিংসার ব্যাপারেও এমন একটি বর্ণনা এসেছে–

اَلْحَسَدُ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

'আগুন যেমন শুকনা কাঠ খেয়ে ফেলে, হিংসাও তেমনি মানুষের নেক আমলগুলোকে খেয়ে ফেলে।'

আল্লাহর সামনে নাফরমানি

দেখুন, একটা ভয় তো এই যে, গুনাহ নেক আমলকে খেয়ে ফেলবে। তার চেয়ে বড় ভয়টা হলো, আমরা গুনাহের কাজ করছি সরাসরি মহান আল্লাহর সামনে। হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) বলেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا تَنْظُرُوْا اِلٰى صِغَرِ الذُّنُوْبِ وَلٰكِنِ انْظُرُوْا اِلٰى مَنِ اجْتَرَاْتُمْ

'গুনাহের ক্ষুদ্রতার দিকে তাকিও না। বরং অন্যায়টা যাঁর সামনে করছ, তাঁর দিকে তাকাও।'[২]

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০৩২৮

২. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০৪৯৪; হিলয়াতুল আওলিয়া : পৃষ্ঠা ৬৭৮

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেছেন, এটা দেখে না যে, গুনাহটা তো ছোট কিংবা বড়; বরং তুমি তাকাও সেই সুমহান সত্তার দিকে, যাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তুমি গুনাহটা করছ। ছোট গুনাহ হলে সামান্য ভয় হয় আর বড় গুনাহ হলে অন্তরে ভয় বেশিই লাগবে। মানুষ যদি তোমার অন্যায় দেখে ফেলে, তাহলে ছোট অন্যায় হলে ভয় কম পাও আর বড় কোনো অন্যায় হয়ে গেলে ভয় বেশি পাও। তো বান্দার সামনে গুনাহ করতে যদি এত ভয় পাও, তাহলে আল্লাহর সামনে গুনাহ করতে ভয় কত বেশি পাওয়া দরকার তুমিই বলো। গুনাহ তো তুমি ছেড়ে দেবে এজন্য যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। তুমি তো তোমার সন্তানের সামনে সাধারণ কোনো অন্যায়ও করতে পার না।

এক বুযুর্গ বলেছেন, আল্লাহ আমাকে ইলহাম করেছেন, হে আমার বান্দা! তুমি যখন কোনো গুনাহ কর, তখন সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে দাও যেন তোমার অন্যায় মানুষ দেখতে না পায়। কিন্তু আমি যে তোমাকে দেখছি, সেই দরজা তো বন্ধ করতে পারবে না। তুমি কি মনে কর, আমি তোমাকে দেখি না।

গুনাহের তিনটি প্রকার

হাদীছ শরীফে এসেছে, গুনাহের তিনটি প্রকার আছে–

(১) ذَنْبٌ يُغْفَرُ

এমন গুনাহ, যা মাফ করে দেওয়া হবে।

(২) ذَنْبٌ لَا يُغْفَرُ

এমন গুনাহ, যা মাফ করা হবে না।

(৩) وَذَنْبٌ يُجَازٰى فِيْهِ

এমন গুনাহ, যার বিনিময় দিতে হবে মূল্য দিতে হবে।[১]

যে-গুনাহ মাফ করা হবে না, তা হচ্ছে–

اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ

'আল্লাহর সাথে শরীক করা।'

যে-গুনাহ মাফ করা হবে, তা হচ্ছে এমন গুনাহ, যা বান্দা ও আল্লাহর মাঝে হয়েছে। যদি কোনো ভুল হয়ে যায়, তা হলে আল্লাহর থেকে ক্ষমা

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০৩১৩

চেয়ে নেওয়া। আল্লাহ মাফ করে দেবেন। যেমন– কেউ নামায পড়ল না। যে-গুনাহের মূল্য পরিশোধ করতে হবে, তা হচ্ছে দুই বান্দার পরস্পরের মধ্যকার বিষয়ে গুনাহ করা। যদি কারও হক তোমার ওপর থেকে থাকে, তাহলে সেই হক তাকে পরিশোধ করে দাও, তার থেকে মাফ চেয়ে নাও। অন্যথায় কেয়ামতের দিন বিনিময় পরিশোধ করতে হবে। তাই গুনাহ যত বেশি হবে, আল্লাহর আদালতে উপস্থিত হয়ে হিসাব দেওয়াও সেদিন তত কঠিন হবে।

কবীরা গুনাহে লিপ্তদের করুণ অবস্থা

হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.) বলেছেন–

إِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَؤُودًا لَا يَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ

'তোমাদের সামনে একটি ভয়ংকর উপত্যকা রয়েছে; বোঝা বহনকারী কেউ তা পার হতে পারবে না।'[১]

যেমন– বহু সময় মাথায় বোঝা বহনকারী ব্যক্তির পানির খাল অতিক্রম করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। তেমনি যার গুনাহের ওজন বেশি হবে, তার জন্য ওই ঘাট-দুর্গম সেই পথটি অতিক্রম করা তার জন্য তত বেশী কঠিন হবে। হযরত আলী (রাযি.) বলেছেন, বান্দা তিন প্রকার হয়ে থাকে।

(১) দরিদ্র

(২) অসুস্থ

(৩) তাওবাকারী।

দরিদ্রদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে–

اَلْفُقَرَاءُ أَصْدِقَاءُ اللهِ

'দরিদ্রগণ আল্লাহর বন্ধু।'

অসুস্থদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে–

وَالْمَرْضٰى أَحِبَّاءُ اللهِ

'অসুস্থরা আল্লাহর নিকট প্রিয়।'

তাওবাকারীদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে–

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০৩৪০

فَمَنْ مَّاتَ عَلَى التَّوْبَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ

'যেব্যক্তি তাওবার ওপর মৃত্যুবরণ করল, তার জন্য জান্নাত।'[১]

কারণ, এ লোকটি তো তাওবা করে গুনাহমুক্ত হয়েই গেছে।

গুনাহ লেখার ক্ষেত্রে অপেক্ষা

আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের ওপর মেহেরবানি দেখুন। বান্দা যখন গুনাহ করে, তাহলে গুনাহ-লেখক ফেরেশতা সাথে-সাথে সেই গুনাহ লেখে না। আল্লাহ গুনাহের লেখক ফেরেশতাকে নেকের লেখকের অধীন করে দিয়েছেন। নেকের ইচ্ছে করলেই সাথে-সাথে নেক লিখে ফেলা হয়। কিন্তু গুনাহের ইচ্ছে করলেই তা লেখা হয় না। গুনাহে লিপ্ত হলেই তারপর তা লেখা হয়। কেউ গুনাহের ইচ্ছে করলে গুনাহের লেখক নেকের লেখকের নিকট অনুমতি চায়, জিজ্ঞেস করে, লিখব এর গুনাহ? নেকের লেখক বলে, অপেক্ষা করো। কতটুকু অপেক্ষা? ছয়টি প্রহর অপেক্ষা করতে হয়। ২৪ ঘণ্টায় প্রহর থাকে আটটি। ৬টি প্রহর পর্যন্ত প্রায় ১৬ ঘণ্টা অপেক্ষা করে।

মোটকথা, গুনাহ-লেখক ফেরেশতা ১৬ ঘণ্টা পরেও লিখতে পারে না। হতে তো পারে লোকটি তাওবা করে নেবে। এতে তো গুনাহ লিখে উল্টো আমার কাজ বেশি করতে হবে। লেখা বন্ধ রাখলেই তো বরং ভালো। দীর্ঘ সময় পরও যদি বান্দা লজ্জিত না হয়, তাওবা না করে, তারপরই গুনাহটা লিখে নেয়।

গুনাহ প্রকাশকারীর ক্ষমা নেই

এক বান্দা আছে এমন, যার গুনাহ মাফ করা হবে না। সে হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে-গুনাহ করে ফেরে আবার সেই গুনাহের কথা অন্যের কাছে বলে বেড়ায়। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرُوْنَ

'আমার উম্মতের মধ্য থেকে গুনাহ প্রকাশকারীরা ছাড়া সকলেই মাফ পেয়ে যাবে।'[২]

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০১৯২

২. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০৩৩৮

এমন কিছু মানুষ আছে, যারা গুনাহের কথা অন্যের কাছে বলে বেড়ায়। বলে, আমি বড় স্মার্ট। আমি অমুককে এভাবে সাইজ করেছি, অমুককে এভাবে বোকা বানিয়ে দিয়েছি। আজ এই করেছি, ওই কাজটি সেরে ফেলেছি। আমি লোকটাকে শিক্ষা দিয়েছি। এমন কথা বলেছি যে, সারাটা দিন জ্বলতে থাকবে।

তো এভাবে গুনাহ করতে থাকে, আবার লোকদের মাঝে তা বলে বেড়ায়। কিছু লোক আছে, যারা গুনাহ করে বুক ফুলিয়ে অহংকার দেখায়। কতক লোক আছে, অবৈধভাবে নারীকে ফুসলিয়ে তার ইজ্জত হরণ করেছে, ধর্ষণ করেছে, কারও ওপর জুলুম করেছে, নেশা করেছে। আরও হাজারো গুনাহ করে তা আবার গর্বের সাথে বন্ধুবান্ধব ও লোকসমাজে বলে বেড়ায়। এদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে, এমন লোকদের মাফ করা হবে না।

এখানে একটি কথা মনে রাখুন। তোমার গুনাহের ব্যাপারে কোনো ডাক্তারের সাথে কথা বলা চাই। ডাক্তার রূহানি হোক বা দৈহিক হোক তার জন্য শরীয়ত অনুমতি দিয়েছে। যেমন– তুমি কোনো একটা গুনাহ করে যাচ্ছ। এখন কোনো আলেমকে জিজ্ঞেস করছ, এর থেকে বাঁচার পথ খুঁজছ কিংবা গুনাহের কারণে কোনো রোগ তোমার মাঝে সংক্রমিত হয়েছে। তাহলে তো ডাক্তারকে চিকিৎসার খাতিরে তা বলতেই হবে। এছাড়া অন্য কোনোভাবে অহংকার করে, বুক ফুলিয়ে হাসি-মজাকের ছলে, গল্পের ছলে কোনোভাবেই গুনাহের কথা প্রকাশ করা যাবে না; বরং গোপন রাখবে এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করতে থাকবে। সতর ঢাকা যেমন ফরজ, গুনাহকে গোপন রাখাও তেমন ফরজ।

আরেকটি কথা হলো, সতর তো ফরজ; কিন্তু কারও সতরের সীমানায় ফোঁড়া উঠল বা আঘাত লাগল। অপারেশনের জন্য তো এখন সতর খুলতে হবে। তেমনি চিকিৎসার প্রয়োজনে, সংশোধন ও গুনাহ থেকে মুক্তির প্রয়োজনে অন্যের কাছে, আলেমের কাছে, শায়খের কাছে, ডাক্তারের কাছে গুনাহের কথা বলা যাবে। দু'আ করতে থাকবে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ও ফিরে আসার চেষ্টা করতে থাকবে। মজা করে-করে গুনাহের কথা বলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

দিন ও রাতের ফেরেশতা

হাদীছ শরীফে এসেছে, দিনের ফেরেশতারা কোমল স্বভাবের আর রাতের ফেরেশতারা কঠোর স্বভাবের হয়ে থাকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) নবীজি থেকে বর্ণনা করেন–

إِنَّ مَلَائِكَةَ النَّهَارِ أَرَأَفُ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ

'দিনের ফেরেশতা রাতের ফেরেশতা থেকেও কোমল।'[১]

দিনের ফেরেশতা নরম স্বভাবের। দিনে কাজকর্ম করতে হয়। লোকদের সাথে ওঠাবসা, দেখা সাক্ষাৎ করতে হয়। এতে ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু রাতে তো কাজকারবার কম থাকে। তখন আল্লাহর ইবাদাত করা যায়। আল্লাহ বান্দার দিকে তাকিয়ে থাকেন। দেখেন, বান্দা আল্লাহকে ডাকে কিনা। তাই সেই সময়টায় গুনাহ করা বেশি মারাত্মক। আল্লাহর নাফরমানি না করা চাই তখন। তাই আল্লাহ রাতের ফেরেশতাকে একটু কঠোর করে বানিয়েছেন।

আরেকটি কথা হচ্ছে, রাতে আল্লাহর রহমত বান্দার ওপর বেশি বর্ষিত হয়। তাঁর এত রহমত সত্ত্বেও যদি বান্দা নাফরমানিতে লিপ্ত হয়, তখন ফেরেশতারা রেগে যায়।

অনুতপ্ত হলে গুনাহ মাফ হয়

এখানে একটি আশ্চর্য কথা শুনুন। যে-বান্দা গুনাহ করে ফেলে, সে যদি মনে-মনে অনুভব করে, আমি তো ঠিক কাজ করিনি, আমি খারাপ করেছি। এসব কথা কিন্তু অনুতপ্ত হওয়ার কারণে বলে। লজ্জিত হওয়ার কারণে বান্দা এসব বলে। ভুলের এই অনুভূতি ও উপলব্ধি দিলে পয়দা হওয়ার দ্বারা, এই অনুতাপের দ্বারা, এই লজ্জিত হওয়ার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَا عَلِمَ اللهُ مِنْ عَبْدٍ نَدَامَةً عَلَى ذَنْبٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ مِنْهُ

'আল্লাহ যখন কোনো বান্দার অন্তরে গুনাহের কারণে অনুতাপ দেখেন, লজ্জাবোধ দেখেন, তখন আল্লাহ বান্দার গুনাহকে মাফ করে দেন বান্দা এস্তেগ্‌ফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করার আগেই।'[২]

আল্লাহু আকবার! কত বড় সৌভাগ্যের কথা আমাদের জন্য। কত বড় দয়ালু আমাদের আল্লাহ! মুখে কিছু বলার আগেই শুধু অন্তরের হালত দেখেই

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০৩৪০

২. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০৩৩৮

আল্লাহ মাফ করে দেন! এটি কত বড় কথা! আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা লজ্জিত হয়েছে, আফসোস করছে। আল্লাহ তাই দয়া করে, মায়া করে বলেন, আমি আমার এই বান্দাকে মাফ করে দিলাম।

আফসোস করলে গুনাহ থেকে মুক্তি

গুনাহ করার পর যদি অন্তরে আফসোস লাগে, তাহলেও গুনাহ মাফ হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ ذَنْبًا وَإِذَا ذَكَرَهُ أَحْزَنَ وَإِذَا نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ قَدْ أَحْزَنَهُ، غَفَرَلَهُ مَا صَنَعَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي كَفَّارَتِهِ بِلَا صَلٰوةٍ وَلَا صِيَامٍ

'কিছু বান্দা এমন আছে যে, গুনাহ করে যখন তার স্মরণ হয়, তখন আফসোস করে। বলে, আমার এমন করা উচিত হয়নি। আল্লাহ তখন দিলের দিকে তাকান। যখন দেখেন, বান্দা গুনাহের কারণে দুঃখিত হয়েছে, তখন তাকে মাফ করে দেন। গুনাহের কারণে তার রোযা-নামাযের কোনো ছাওয়াব কেটে দেওয়া হয় না বা কম দেওয়া হয় না।'[১]

দেখুন, গুনাহের কারণে আফসোস করলেই ক্ষমা মিলবে। আমাদের উচিত নির্জনে আমাদের গুনাহের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

حَقِيْقٌ بِالْمَرْءِ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مَجَالِسُ يَخْلُوْ فِيْهَا يَذْكُرُ ذُنُوْبَهُ وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهَا

'বান্দার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, নির্জনে-নিভৃতে এমন মজলিস করা যে, সেখানে পুরোনো গুনাহগুলোকে স্মরণ করা হবে। এতে আল্লাহ তা'আলা বান্দার গুনাহ মাফ করে দেন।'[২]

আমাদের মাশায়েখে কেরাম বলে গেছেন, প্রতিদিনের আমলের জন্য যে-সময় বেঁধেছ, তার সাথে এর জন্যও সময় নির্ধারণ করো যে, এ-সময়টিতে আমি অতীতের গুনাহকে স্মরণ করে অনুতপ্ত হব, আফসোস করব। এতে প্রতিদিনের গুনাহ প্রতিদিন মাফ হয়ে যাবে।

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০৩৩৮

২. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০২০৯

আল্লাহর ভয়ের কারণেও মাফ মিলবে

এক তো গেল লজ্জিত হলে গুনাহ মাফ হবে। আরেক গেল আফসোস করলেও মাফ হবে। এখনকার বিষয়টি হচ্ছে, আল্লাহর ভয়ে শঙ্কিত হলেও মাফ পাওয়া যাবে। আল্লাহর বড়ত্বকে হৃদয়ে এনে ভীত হলে আল্লাহ বান্দাকে মুক্তি দান করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন–

قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لِاَهْلِهٖ اِذَا مِتُّ فَحَرِّقُوْهُ ثُمَّ اِذْرُوْا نِصْفَهٗ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهٗ فِي الْبَحْرِ

'এক বান্দা এমন আছে, যার কোনো প্রকার কোনো নেকি নেই। সে ঘরওয়ালাদের বলল, আমি যখন মরে যাব, তখন তোমরা আমার দেহটা জ্বালিয়ে দিয়ো। তার অর্ধেক ছাই বাতাসে উড়িয়ে দিয়ো আর বাকি অর্ধেক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ো।'

لَاِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ

'আল্লাহ যদি আমাকে ধরেন, তাহলে এত আযাব দেবেন, যা তামাম দুনিয়ার কাউকে দেবেন না।'

فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوْا مَا اَمَرَهٗ

'তার যখন মৃত্যু হলো, তার ঘরের লোকেরা তা-ই করল, যা সে করতে বলেছিল।'

اَمَرَ اللّٰهُ بَرًّا فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَاَمَرَ اللّٰهُ الْبَحْرَ وَجَمَعَ مَا فِيْهِ

'আল্লাহ জমিনকে হুকুম দিলেন; জমিন তার মধ্যে বান্দার যে-অংশ ছিল, তা ফিরিয়ে দিল। সাগরকে নির্দেশ দিলেন; সাগরও লোকটার দেহাংশ জমা করে ফিরিয়ে দিল।'

এবার আল্লাহ বললেন–

لِمَا فَعَلْتَ هٰذَا

'কেন তুমি এমন করেছ?'

লোকটি উত্তর দিল–

مِنْ خَشْيَتِكَ وَاَنْتَ تَعْلَمُ

'তোমার ভয়ে এমন করেছি হে মালিক! তুমি তো জানই।'

فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ

'ফলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন।'

কারণ, আল্লাহ জানেন বাস্তবেই লোকটি আল্লাহর ভয়ে এমন করেছে। তাই আল্লাহ বলবেন, যাও; আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম।

ক্ষমা চাও বারবার

আপনার মনে আরেকটি প্রশ্ন জাগতে পারে। মাফ চাইলে গুনাহ তো মাফ হবে; কিন্তু কতবার মাফ চাইতে হবে? রোজ-রোজ গুনাহ করে ফেলবে আর রোজই মাফ চাইবে। এ-ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে–

اَنَا اَكْرَمُ وَاَعْظَمُ عَفْوًا مِنْ اَنْ اَسْتُرَ عَلٰى عَبْدٍ مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اَفْضَحُهُ بَعْدَ اِذْ سَتَرْتُهُ

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি এরও ঊর্ধ্বে যে, দুনিয়ায় কোনো বান্দা গুনাহ করবে আর আমি তাতে পর্দা ঝুলিয়ে দেব আর পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়ার পর তাকে লজ্জিত করব।

কত শত কোটি গুনাহ আছে আমাদের! আল্লাহ ছাড়া কেউই জানেন না, আমাদের গুনাহের পরিমাণ কত! আল্লাহ তো পর্দা ঝুলিয়ে আমাদের গুনাহকে লুকিয়ে রেখেছেনই; আবার বলছেন, আমি এর ঊর্ধ্বে যে, লুকিয়ে রাখার পরও তা প্রকাশ করে আমি আমার বান্দাকে অপমানিত করব।

وَلَا اَزَالُ اَغْفِرُ لِعَبْدِىْ مَا اسْتَغْفَرَنِىْ

'আমি আমার বান্দাকে মাফ করতেই থাকি যতক্ষণ সে আমার কাছে মাফ চাইতে থাকে।'[১]

তো আল্লাহ যেহেতু এত দয়ালু, তাই আমাদের উচিত আমরা বারবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাব। গুনাহ থেকে ক্ষমা চাওয়া আল্লাহর কাছে এত পছন্দ যে, হাদীছ শরীফে এসেছে–

لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَاَتَى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ وَيَغْفِرُ لَهُمْ

'যদি তোমরা সবাই ফেরেশতার মতো হয়ে যাও; কেউ গুনাহ না কর, তাহলে আল্লাহ অন্য একটি জাতি তৈরি করবেন, যারা গুনাহ করবে আর আল্লাহ তাদের মাফ করতে থাকবেন।'

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০২১৫

গুনাহকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করা হবে

অনেক সময় এমনও হবে যে, গুনাহগুলোকেই নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। মানুষ গুনাহ করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে আর আল্লাহ তাদের সকলের গুনাহ মাফ করে দেবেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, নবীজি বলেছেন–

لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ لَوْ أَكْثَرُوْا مِنَ السَّيِّئَاتِ

'কিছু মানুষ আকাঙ্ক্ষা করবে, ইস্ আমাদের গুনাহ যদি আরও বেশি হতো!'

তারা কারা?

الَّذِيْنَ بَدَّلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

'তারা ওইসব লোক, যাদের গুনাহগুলোকে আল্লাহ নেক দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন।'[১]

তারা আশা করবে, গুনাহ যদি আরও হতো, তাহলে তো নেক আরও বেড়ে যেত।

مغفرت بولی ادھر آو میں گناہ گاروں کی ہوں

'মাগফেরাত বলতে থাকবে, এদিকে এসো; আমি তো গুনাহগারদেরই জন্য।'

আল্লাহর শান দেখুন। গুনাহগার উম্মতের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ তো গুনাহকে নেকও বানিয়ে দিতে পারেন। হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেন–

إِنَّ اللهَ تَعَالٰى لَيَنْفَعُ الْعَبْدَ بِذَنْبٍ يُذْنِبُهُ

'কখনও দেখা যায়, আল্লাহ বান্দার গুনাহকে উপকারী বানিয়ে দেন।'[২]

কেমন করে উপকারী বানিয়ে দেন? বান্দা যখন গুনাহের কারণে লজ্জিত হয়, কান্নাকাটি করে, অনুতপ্ত হয়, পূর্ণ এখলাছের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও; আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি আর কোনোদিন গুনাহ করব না, তো কাকুতিমিনতি করে ক্ষমা চাওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা বান্দার গুনাহগুলোকে নেকে পরিণত করে দেন।

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০২৬৭
২. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০২১৫

এমন একটি ঘটনা বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে বর্ণিত আছে। বনী ইসরাঈলে এক নওজোয়ান ছিল। যুবক বড় গুনাহগার ছিল। আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহগুলো মাফ করে দিলেন। মূসা (আ.)কে বললেন, আমার বান্দা এত তাওবা করেছে যে, যদি তার তাওবাকে পুরো শহরে ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে শহরের সকল গুনাহগারকে মাফ করে দেওয়া যেত।

সুবহানাল্লাহ! ইসলাম বড় সুন্দর একটি জীবনবিধান। শরীয়তের সৌন্দর্য কত সুউচ্চ যে, যত গুনাহগারই হোক বান্দার তার গুনাহ থেকে মাফ পাওয়ার পথ উন্মুক্ত রয়েছে। এখনই যদি তাওবা করেন, তো এখনই মাফ পেয়ে যাবেন। এখলাছের সাথে তাওবা করতে হবে; তা হলেই গুনাহকে আল্লাহ নেকিতে পরিণত করে দেন।

গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করুন

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ يَكُوْنُ نَصْبُ عَيْنَيْهِ تَائِبًا فَارًّا حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ

'কিছু বান্দা এমন আছে, যে গুনাহ করবে আবার এই গুনাহের বিনিময়ে জান্নাতে যাবে।'[১]

লোকটি গুনাহ থেকে আবশ্যিকভাবে তাওবা করে, গুনাহের ওপর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয় এবং তাওবা করে নেয়। ফলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে নিয়ে যান।

তো ভাইয়েরা! আমরা সকলেই এই বিষয়টি নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নিই যে, আমরা আল্লাহর অনুগত্য করে যাব, তার অবাধ্য হব না। সারা জীবনের জন্য এ নিয়ত করে নেওয়া চাই। অতীতে যত গুনাহই করি না কেন, এখন আমরা শপথ নিই, প্রত্যয় গ্রহণ করি। তাওবা করে ফিরে চলে আসি ভ্রান্ত পথ হতে। তাওবা করবে এবং নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। আমরা দুর্বল; কথাটা সঠিক। কিন্তু আমাদের পরওয়ারদেগার তো ইচ্ছে করলেই আমাদের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিতে পারেন।

তাই আল্লাহর রহমতের প্রতি দৃষ্টি রেখে চলা চাই। চিন্তা করবে, আমার তো পবিত্র জীবনযাপনের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। আমি ভ্রান্তির যে-

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০১৮৮

চোরাবালিতে হারিয়ে আছি, এর থেকে বের হয়ে আসা দরকার। চিন্তা করবে, আমার সুদ থেকে, ঘুস থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত। রাগ দমন করা উচিত। আমি তো মানুষের সামনে আমার হৃদয়কে মুক্তভাবে রেখে দিতে পারি না। মোবাইল ফোনের আরও যেসব বিষয় আছে, এগুলো থেকে আত্মরক্ষা উচিত। এভাবে গুনাহ থেকে বাঁচার নিয়ত করে নিন। তারপরই দেখুন, আল্লাহর মদদ ও সাহায্য কীভাবে আসে। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যেব্যক্তি গুনাহ থেকে বাঁচার পরিপূর্ণ ইচ্ছে করল, তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তখন ওই বান্দার মদদ করা আমার ওপর আবশ্যক হয়ে পড়ে।

তো ভাইয়েরা! নিয়ত তো অন্তরে করে নেবেন। আমাদের আরাধ্যই হওয়া চাই আল্লাহর কাছে তাওবা। তাওবাই মূল। তাওবাই সব। যদি আমরা নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিয়ে এভাবে জীবন চালাতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন সফল হবে। আমরা যদি পূর্ণভাবে তাওবা করে নিই, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের গুনাহগুলোকে নেকির দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন।

আল্লাহর রহমতের আশা রাখবে

সর্বদা আল্লাহর রহমতের আশা রাখুন। রহমত হতে নিরাশ হবেন না। যে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায়, আল্লাহও তার সাথে তেমনই করেন। নিরাশ হয়ে সে আল্লাহকে যেমন ভেবেছে, আল্লাহও তার সাথে তেমনই আচরণ করেন। এক হাদীছে আছে—হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে মুসনাদে আহমদ এবং সুনানে আবু দাউদে–

كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مُتَوَاخِيَانِ وَكَانَ اَحَدُ هُمَا يَذْنِبُ وَالْاٰخَرُ يَجْتَهِدُ فِي الْعِبَادَةِ

'বনী ইসরাঈলে দুই ভাই ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল এমন, যে গুনাহ করত। দ্বিতীয়জন ছিল অত্যন্ত নেককার। যে নেককার ছিল, সে বদকারকে দেখলেই বলত, তুই তো মাফ পাবি না। লোকটি বলত–

خَلِّنِيْ وَرَبِّيْ

'আমাকে আমার রবের সাথে ছেড়ে দাও। সেটা আমি আর আমার রব জানেন।'

'গুনাহগার আল্লাহর রহমতে বড় আশাবাদী ছিল। আল্লাহু আকবার! একদিন সেই নেককার কসম খেয়ে বলে বসল–

وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ

'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তোকে মাফ করবেন না।'[১]

আল্লাহ বললেন, আচ্ছা; আমি আমার রহমতের ওপর আস্থাশীল-আশাবাদী ওই অসহায় বান্দাটিকে মাফ করে জান্নাতে দিয়ে দেব। আর এই কসমকারী, যে আমার বান্দাকে আমার রহমত থেকে নিরাশ করেছে, আমি তার জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখে দিচ্ছি।

তো বোঝা গেল, আমাদের উচিত আল্লাহর ওপর আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা রাখা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া।

মুসলমানের গুনাহের বোঝা ইহুদি খ্রিষ্টানের কাঁধে

আগে হাদীছ পড়ে বড় বিস্মিত হতাম। আজ তো হাদীছ অনুধাবন করা খুব সহজ হয়ে গেছে। একটি হাদীছ হযরত আবু মূসা আশআরি (রাযি.) বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শরীফ ও কানযুল উম্মাল নামক কিতাবে লিখিত হয়েছে–

يُجِيءُ يَوْمَ الْقِيمَةِ نَاسٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَغْفِرُ اللهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارٰى

'কেয়ামতের দিন মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু লোক এমন হবে, যাদের গুনাহ থাকবে পাহাড়সমান বড় বড়।'[২]

আল্লাহ তা'আলা তাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। গুনাহের বোঝা চাপিয়ে দেবেন ইহুদি ও নাসারাদের ওপর। হাদীছটি যে সত্য এটি তো মান্য করতামই। এখনও মান্য করি। কিন্তু আগে বুঝতে কষ্ট হতো। এখন সহজ হয়ে গেছে। বলুন, যদি কোনো হতভাগা, কোনো অবাধ্য পাপী যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, নারীরা কেউ চেহারা ঢাকতে পারবে না। এতে যত নারী চেহারা খোলা রেখে চলাফেরা করবে, তাদের গুনাহ যাবে কার ভাগে? যে-নেতা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছে যে, লম্বা দাড়িওয়ালারা ভালো নয়। লম্বা

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০৩৪৮

২. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০৩৪১

দাড়ি রাখা যাবে না। এখন এ কারণে যারা দাড়ি কর্তন ও মুণ্ডন করে চলবে, তাদের গুনাহ কার ভাগে যাবে?

অন্যায়কে, পাপাচারকে, ব্যভিচার ও পাশবিকতাকে আজ যারা ফ্রি করে দিয়েছে, ব্যাপক করে দিয়েছে, যাদের কারণে আজ চারদিকে অন্যায়ের ঘোর অমানিশা, যাদের কারণে উলঙ্গপনা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, চ্যানেলে, মোবাইলে, কম্পিউটারে, ইন্টারনেটে অশ্লীলতার সায়লাব চলছে, তো যারা এসব কর্ম আঞ্জাম দিচ্ছে, গুনাহটা কি তাদের ঘাড়েও চাপানো হবে না? অবশ্যই হবে। আজ ওই সব অশ্লীলতা ও নগ্নতার কারণে মুসলিম নওজোয়ানরা নারী আর নেশা নিয়ে ছুটছে পাগলের মতো। এর দায় কার ঘাড়ে চাঁপানো হবে? এতেই আমার বুঝে আসে, চৌদ্দশত বছর আগে আমাদের নবীজির মোবারক জবাননিঃসৃত ওই হাদীছটি কত সত্য! কত বাস্ত বসম্মত! আর কে এমন কথাগুলো বলে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে? আল্লাহ তাদের গুনাহ ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কাঁধে চাঁপিয়ে দেবেন। এই হতভাগারাই তো গুনাহের মাধ্যম হচ্ছে। তারাই তো নিত্যনতুন গুনাহের উপকরণ আবিষ্কার করে চলছে। তারাই মুসলমানদের মুসলমান হয়ে থাকতে দিচ্ছে না। আজ আমাদের নারীরা পর্দা করে না। স্বতষ্ফূর্তভাবে ইসলামকে মানে না। তাদের মাঝে সংকীর্ণতা কাজ করে। তারা পর্দা করে চলার ক্ষেত্রে দ্বিধায় পড়ে আছে।

তাওবা গুনাহকে মুছে দেয়

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ

'গুনাহ থেকে তাওবাকারী সেই ব্যক্তির মতো; যার গুনাহ নেই।'[১]

তাওবা করলেই যেন হয় এক নতুন জীবনের সূচনা। ফলে অতীতের সমস্ত গুনাহ যায় মুছে। আপনার মোবাইলে কোনো ম্যাসেজ এল। আপনি একটু পর তা ডিলিট করে দিলেন। বলুন তো, এটি কি আর খুঁজে পাবেন? পাবেন না। তেমনিভাবে তাওবাও আপনার গুনাহকে ডিলিট করে দেয়। আপনি তাওবা করলেন তো সাথে-সাথে গুনাহ ডিলিট হয়ে গেল।

তো ভাই! আমাদের উচিত আপন গুনাহ থেকে ক্ষমা চাওয়া। কারও সাথে ঝগড়া হয়েছে; ক্ষমা চেয়ে দুজনে মিলে যান। কারও সাথে অন্যায়

---

১. ইবনে মাজা : হাদীছ নং ৪২৪০

কাজ করেছেন; ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করে অন্যায় থেকে ফিরে আসুন। কারও ঋণ পরিশোধ করতে হবে তো তার ঋণ পরিশোধ করে দিন।

মোটকথা, যখনই যত গুনাহ করেছেন, যত অন্যায় করেছেন, যত পাপ করেছেন, সব থেকে বিরত থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করে ফিরে আসুন, আল্লাহর সামনে হাজিরি জানান, আল্লাহর সামনে হাত মেলে ধরুন; আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দেবেন। আপনি সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে যাবেন।

বান্দা তাওবা করে কিনা আল্লাহ এই অপেক্ষায় থাকেন

আল্লাহ তা'আলা চাচ্ছেন, আমার বান্দা আমার কাছে তাওবা করুক। আল্লাহ বান্দার তাওবার অপেক্ষা করতে থাকেন। আবু মূসা আশআরি (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْئُ النَّهَارِ

'রাতে আল্লাহ তাঁর রহমতের কুদরতি হাত প্রসারিত করে দেন। বলেন, হে দিনে গুনাহকারী আমার বান্দা! তুমি তাওবা করো; মাফ পেয়ে যাবে।'

وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْئُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

'আল্লাহ দিনে তাঁর রহমতের কুদরতি হাত প্রসারিত করে বলেন, হে রাতের গুনাহগাররা! তোমরা তাওবা করে নাও; মাফ পেয়ে যাবে। সূর্য পশ্চিম আকাশে উদয় হওয়ার দিন এমন পর্যন্ত করবেন।'[১]

সূর্য পশ্চিম আকাশে উদয় হওয়ার দিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এমন করতে থাকবেন। রাতের গুনাহ দিনাদিন ও দিনের গুনাহ রাতারাতি মাফের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তো আল্লাহ বান্দার তাওবার জন্য অপেক্ষা করেন। ডেকে-ডেকে আহ্বান করেন। রাতে অপেক্ষা করেন দিনের গুনাহগারের জন্য আর দিনে অপেক্ষা করেন রাতের গুনাহগারের জন্য।

আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি

যে তাওবা করে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন, মহব্বত করেন। হাদীছে পাকে ইরশাদ হয়েছে, হযরত আলী (রাযি.) বর্ণনা করেছেন-

إِنَّ اللهَ تَعَالٰى يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০১৮৬

'আল্লাহ ওই মুমিন বান্দাকে মহব্বত করেন, যে ফেতনায় পতিত হওয়ার পর তাওবা করে নেয়।'[১]

যে-বান্দাহ গুনাহ করল, তারপর আবার তাওবা করল, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন, মহব্বত করেন। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা ফিরে এসেছে আমার দুয়ারে, ক্ষমা চাইছে আমার দরবারে।

তাওবাকারীর ওপর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি

তাওবাকারীর ওপর আল্লাহ তা'আলা কতটুকু সন্তুষ্ট থাকেন? হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنَ الْعَبْدِ اِذَا ضَلَّتْ رَاحِلَتُهٗ فِى اَرْضٍ فَلَاةٍ فِى يَوْمٍ قَائِظٍ وَرَاحِلَتُهٗ عَلَيْهَا زَادُهٗ وَمَزَادُهٗ اِذَا ضَلَّتْ اَيِقَنَ بِالْهَلَاكِ وَاِذَا وَجَدَهَا فَرِحَ بِذٰلِكَ فَاللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ هٰذَا الْعَبْدِ بِوُجُوْدِ رَاحِلَتِهٖ

'দুপুরবেলা বান্দা ঘুমিয়েছে কোনো এক গাছের নিচে কিংবা মরুপ্রান্তরে। ঘুম থেকে উঠে দেখল, তার উটটা সামানাপত্রসহ পালিয়ে গেছে। রাস্তাও অজানা। পায়ে হেঁটে যাওয়াও সম্ভব নয়। তার এই তপ্ত কঠিন পথ পাড়ি দেওয়া অসম্ভব দেখে সে নিশ্চিত হয়ে গেল, তার মৃত্যু হয়ে যাবে কিছু সময়ের মধ্যেই। কে তাকে এই উপত্যকা থেকে বাঁচাবে? ঠিক এমনি অবস্থায় এই হতাশ বান্দাটি সামানসহ যদি উটটা পেয়ে যায়, তাহলে সে কতখানি খুশি হবে? ইরশাদ হচ্ছে, ওই নিরাশ বান্দা উটটা পেয়ে যত খুশি হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হন আল্লাহ যখন তিনি কোনো গুনাহগারকে তার দরজায় ফিরে আসতে দেখেন।'[২]

আরেক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

اَللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا مِّنَ التَّائِبِ مِنَ الظَّمْاٰنِ الْوَارِدِ

'কোনো এক বান্দা অনেক পিপাসার্ত হলো। সে হঠাৎ শীতল পানি পেয়ে গেল। কতখানি খুশি হবে সে? ইরশাদ হচ্ছে, ওই বান্দা যতখানি খুশি হবে, তার চেয়ে বেশি খুশি হবেন আমাদের আল্লাহ যদি বান্দা তাওবা করে ফিরে আসে আল্লাহর সকাশে।'

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০১৮৬

২. বোখারি, মুসলিম

وَمِنَ الْعَقِيْمِ الْوَالِدِ

কোনো এক বন্ধ্যা নারী বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পর কতখানি খুশি হবে! ভাববে, আমার বিবাহের বিশটি বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর আজ আমি মা হতে চলেছি। কত সৌভাগ্য আমার! সেই নারী নিজেকে বড়ই ভাগ্যবতী মনে করে। বন্ধ্যা নারী সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম হয়ে যে-পরিমাণ খুশি হয়, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি খুশি হন আল্লাহ যখন বান্দা তাঁর সামনে এসে তাওবা করে, নত হয় আর হাত প্রসারিত করে দেয় তাঁর দরবারে।

وَمِنَ الضَّالِّ الْوَاجِدِ فَمَنْ تَابَ إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا

তৃতীয়বারে বলা হচ্ছে, পথহারা ব্যক্তি যখন ঘুরতে-ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে হঠাৎ পথ পেয়ে যায়, তখন তার কাছে কেমন লাগে? কতখানি খুশি হয় সে? আল্লাহর কাছে কোনো বান্দা তাওবা করলে আল্লাহ তার চেয়ে বেশি খুশি হন।

أَنْسَى اللهُ حَافِظَيْهِ وَجَوَارِحَهُ وَبُقَاعَ الْأَرْضِ كُلَّهَا خَطَايَاهُ وَذُنُوْبَهُ

'আল্লাহ গুনাহের লেখক ফেরেশতাকে, বান্দার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে, জমিনকে তার সমস্ত ভুল ও গুনাহের কথা ভুলিয়ে দেন।'[১]

তো দেখুন তাওবার একটি ফায়দা হচ্ছে তাওবা করলে পেছনের হিসাব কিতাব সব শেষ। আবার আল্লাহ তা'আলা কিরামান কাতেবীনকে গুনাহের কথাটি ভুলিয়ে দেন। তাদের আর স্মরনই থাকে না এই বান্দার গুনাহের কথা।

নওজোয়ান যুবসমাজের তাওবা

নওজোয়ান যুবসমাজের তাওবাকে আল্লাহ তা'আলা অত্যধিক পছন্দ করেন। হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে–

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ شَابَّ التَّائِبِيْنَ

'নিঃস্বন্দেহে আল্লাহ যুবক-যুবতিদের তাওবাকে ভালোবাসেন।'[২]

নওজোয়ান তাওবাকারী ; আল্লাহ তার তাওবার দ্বারা বেশি খুশি হন। গরম টগবগে রক্তের এই মানুষগুলো যখন তাওবা করে, তখন আল্লাহর

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০১৬৬

২. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০১৮৫

প্রেমসাগরে ঢেউ খেলে যায়। বান্দাকে আল্লাহ ভালোবেসে ফেলেন। কিন্তু শয়তান তো ধোঁকা দেয়। বলে, একবার তাওবা করলেই তো চলবে; এখন গুনাহ করো। অথচ বুযুর্গানে দীন বলেছেন, হে বন্ধু! তুমি যে তাওবা করে নেবে বলে-বলে গুনাহ করে যাচ্ছ, তুমি আরও বাঁচবে বলে চিন্তা করে তাওবা করতে দেরি করছ, এটি তো তোমার জ্ঞানের প্রদীপ যে নিভে গেছে, তার প্রমাণ বহন করে। তুমি আজ ভাবছ আরও তো বাঁচব; পরে তাওবা করে নেব, এই দিয়ে কি তুমি পার পাবে? তুমি এমন করো না। কবে কখন কীভাবে তোমার মৃত্যু চলে আসবে, তা কি তুমি জান? তাই বলছি শোনো; তাওবা করতে থাকো, করতেই থাকো, যেন পেছনের সকল গুনাহের বোঝা তোমার মাথা থেকে সরে যায়।

প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য গুনাহ থেকে তাওবা

কিছু গুনাহ আছে, যেগুলো অপ্রকাশ্যে হয়ে থাকে, গোপনে হয়ে থাকে। আর কিছু গুনাহ আছে, যেগুলো প্রকাশ্যে হয়ে থাকে। তো শরীয়ত বলছে, অপ্রকাশ্য গুনাহের জন্য গোপনেই তাওবা করো আর প্রকাশ্য গুনাহের জন্য প্রকাশ্যে তাওবা করো। হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) কিতাবুয যুহ্দে হাদীছটি মুরসালভাবে রেওয়ায়াত করেছেন–

إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاحْدِثْ عِنْدَهَا تَوْبَةَ السِرِّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةَ بِالْعَلَانِيَةِ

'যদি তুমি গুনাহ করে থাক, তবে তাওবা করে নাও। গোপন গুনাহের জন্য গোপনে তাওবা করো আর প্রকাশ্য গুনাহের জন্য প্রকাশ্যে তাওবা করো।'[১]

কেয়ামতের দিন যে-মানুষটি ভয়হীন থাকবে

তাওবাকারী মানুষটি কেয়ামতের দিন নির্ভয় থাকবে, শঙ্কাহীন থাকবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

لَا أَجْمَعُ لِعَبْدِيْ أَبَدًا أَمِنَيْنِ، وَلَا أَجْمَعُ لَهُ خَوْفَيْنِ

'আমি কোনো বান্দার মাঝে দুটি নিরাপত্তা একত্রিত করব না এবং দুটি ভয়ও একত্রিত করব না।'

إِنْ هُوَ أَمِنَنِيْ فِي الدُّنْيَا خَافَنِيْ يَوْمَ أَجْمَعُ فِيْهِ عِبَادِيْ

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০১৮০

'যে দুনিয়ায় আমাকে ভয় করেনি, কেয়ামতের দিন যখন আমি সকলকে জমা করব, সেদিন সে ভয়হীন থাকবে না; বরং সেদিন তাকে ভয়ার্ত থাকতে হবে।'

আর—

وَاِنْ هُوَ خَافَنِىْ الدُّنْيَا اَمِنْتُهُ يَوْمَ اَجْمَعُ فِيْهِ عِبَادِىْ

'আর যে দুনিয়ায় আমার ভয়ে শঙ্কিত ছিল, কেয়ামতের দিন সে থাকবে ভয়হীন; আমি তাকে ভয় থেকে নিরাপত্তা দেব।'

তাওবার পরিসীমা

গুনাহ যদি অনেক হয়ে যায়, তাহলে কি মাফ পাওয়া যাবে? অনেকে হয়তো মনে করবেন, একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকলেই গুনাহ মাফ হবে; অন্যথায় গুনাহ মাফ হবে না। আসলে ব্যাপারটি এমন নয়। তাওবা কবুল হওয়ার জন্য কোনো সীমা-পরিসীমা লাগে না। নির্দিষ্ট কিছু গুনাহের জন্য তাওবা করা যাবে আর অনেক বেশি গুনাহ হয়ে গেলে তাওবা করা যাবে না ব্যাপারটি এমন নয়। বরং যে যা-ই করুক, যত গুনাহ-ই করুক। তার জন্য তাওবার দরজা খোলা। হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَوْ اَخْطَأْتُمْ حَتّٰى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمُ السَّمَاءَ ثُمَّ تُبْتُمْ لَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ

'যদি তোমরা এত গুনাহও কর যে, তা আসমান-পরিমাণও হয়ে যায়, তারপরও যদি তাওবা কর, তাহলে আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করবেন।'[১]

তবে যেসব গুনাহ হুকূকুল ইবাদ তথা বান্দার হকের সাথে যুক্ত, তার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। কেয়ামতের দিন তো জুলুম ও বাড়াবাড়ির বিনিময়ে নেকি দিয়ে দিতে হবে।

তাওবা নিয়ে টালবাহানা করা

তাওবার ব্যাপারে টালবাহানা শয়তানের হাতিয়ার। শয়তান লোকটিকে বাহানা দিয়ে-দিয়ে তাওবা থেকে দূরে রাখে। একদিন হঠাৎ মৃত্যু চলে আসে। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) থেকে বর্ণিত–

اَلتَّسْوِيْفُ شِعَارُ الشَّيْطَانِ يُلْقِيْهِ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০২০৮

'তাওবার ব্যাপারে করছি করব করা শয়তানের নিদর্শন। এটা শয়তান মুমিনের হৃদয়ে ঢেলে দেয়।'[১]

তাওবার ক্ষেত্রে টালমাটাল করা শয়তানের হাতিয়ার। মুমিন বান্দার ওপর সে এই হাতিয়ার ব্যবহার করছে। সে ধোঁকা দিয়ে-দিয়ে বলছে আজ নয় কাল। পরে তাওবা করে নিয়ো। আজ সন্তানদের তাওবার কথা বললে, কোনো আমলের কথা বললে, বলে, আরে! আমি আবার কোন দাদিমা হয়ে গেলাম! আমি আবার কোন বাপ হয়ে গেলাম যে, এখনই, এই বয়সেই আমল করব? তারা মনে করছে, আমল করা তো মা-দাদুদের কাজ। বাবা বা বুড়োদের কাজ। বুড়ো হলেই মানুষ নেক হয়ে যায়। এত তাড়াতড়ি নেককার হওয়ার প্রয়োজন নেই।

তাওবা কবুলের সময়

তাওবা করে নিতে হবে মৃত্যু আসার আগে আগেই। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ

'মৃত্যুর গোঙানি শুরু হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তাওবা কবুল করে নেন।'[২]

মৃত্যুর পূর্বে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস যে বেগবান ও তীব্র হয়ে যায়, এতে শ্বাস দ্রুত উঠানামার ফলে গলায় গোঙানির আওয়াজ হয়। তো এই গোঙানি শুরু হওয়ার আগে-আগেই যে তাওবা করে নিতে পারবে, তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। গোঙানি শুরু হয়ে গেলে তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর তাওবা কবুল হবে না। মৃত্যুর গোঙানির মুহূর্তে তো ফেরাউনও বলেছিল–

اٰمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ

'আমি মূসা ও হারুনের রবের ওপর ইমান আনলাম।'

তখন বলা হয়েছিল, এখন সময় হলো? এখন তো সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন আর কিছু হবে না। তাই আমাদের উচিত প্রত্যেক দিন তাওবা করে প্রত্যেক দিনের গুনাহ সেদিনই মাফ করিয়ে নেওয়া। কারণ, মৃত্যুর ডাক কখন এসে যাবে, তা তো বলা যায় না। এতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন।

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০২২২

২. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০১২৭

'তাওবাতুন্নাছূহ' কাকে বলে

তাওবাতুন্নাছূহ'র সংজ্ঞায় হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلتَّوْبَةُ النُّصُوْحُ اَلنَّدَمُ عَلَى الذَّنْبِ حِيْنَ يَفْرُطُ مِنْكَ فَتَسْتَغْفِرُ اللهَ ثُمَّ لَا تَعُوْدُ اِلَيْهِ اَبَدًا

'কোনো গুনাহগারের গুনাহ যখন বেশি হয়ে যাবে, তখন বান্দা যদি গুনাহ থেকে তাওবা করে মাফ চায় এবং গুনাহের ওপর লজ্জিত হয় এবং যদি সে গুনাহটার ধারেকাছেও না যায়, তাহলে একে 'তাওবাতুন্নাছূহ' বলা হয়।'[১]

অনুতপ্ত হওয়া, এস্তেগ্ফার করা; তার পর মনে-মনে পাক্কা এরাদা করা যে, সামনে আর কখনও কোনো গুনাহ করব না। এতেই বান্দার সত্য ও পাক্কা তাওবা হয়ে যায়। এতেই আল্লাহ বান্দাকে মাফ করে দেন, কবুল করে নেন।

প্রত্যেক বান্দা-ই তাওবার তাওফীক পায় না

এই তাওবার তাওফীক ও সুযোগ প্রত্যেক বান্দারই হয় না। তাওবা আল্লাহর একটি রহমত। এই রহমত পেতে হলেও চাই সাধনা। চাই ত্যাগ। বান্দাকে মসজিদে আসতে হয়, আল্লাহর তাওফীকে ওলামা ও মাশায়েখের দীনি কথাবার্তা শুনতে হয়। অন্তরটা এতে নরম হয়। দিলটা এতে শান্ত হয়। হৃদয়টা মোমের মতো বিগলিত হয়। চোখ থেকে অশ্রু বর্ষে। হৃদয়ে জেগে ওঠে বাঁধভাঙা ঢেউ। উদিত হয় ভালো কিছু করবার স্বপ্ন ও অনুপ্রেরণা। আর দুঃখিত হয় পাপের প্রতি। তবেই তো তাওফীক মিলে তাওবার, তাওফীক মিলে ক্ষমা চাওয়ার। এই তাওফীক কি সব বান্দাই প্রাপ্ত হয়? না। হযরত জাবের (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)কে বলেছেন–

يَا عَائِشَةُ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ مُوْخًى عَلَيْهِ

'হে আয়েশা! প্রত্যেক বান্দাকেই সুযোগ দেওয়া হয় না।'

তো ভাই! আল্লাহ তা'আলা আজও আমাদের সুযোগ দিচ্ছেন। গুনাহ করা সত্ত্বেও তো আল্লাহ দুনিয়ায় আমাদের নিরাশ করেননি। আমরা আযাবের আঘাত আসার আগেই তাওবা করে নিই। আপন গুনাহ থেকে তাওবা করে নিই।

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০৩০২

তাওবার নামায

তাওবার একটি সুন্দর পদ্ধতি এই যে, আপনি দু-রাকাত নামায পড়ে নিন। নবীজি ইরশাদ করেছেন–

مَا مِنْ عَبْدٍ يَذْنُبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ لِذَالِكَ الذَّنْبِ اِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ

'যেব্যক্তি কোনো গুনাহ করার পর সুন্দর করে অজু করবে। তারপর আল্লাহর সামনে দু-রাকাত নামায পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এতে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন।'[১]

তো হাদীছ দ্বারা বোঝা গেল, তাওবার জন্য দু-রাকাত নামায পড়ে গুনাহ থেকে মাফ চায়, তাহলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন।

রওজা শরীফে তাওবা করা

যদি কখনও হজে যাওয়ার সুযোগ হয়, তাহলে বাইতুল্লাহর সম্মুখে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায়ে আতহারের সামনে নবীজির সামনে নবীজিকে উসীলা বানিয়ে গুনাহ থেকে মাফ চাইবে। হযরত আলী (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের তিন দিন পর এক গ্রাম্য ব্যক্তি এল। সে কবরের মাটির কাছে মাথা নিয়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে-কুরআন নিয়ে আগমন করেছেন, তাতে আছে–

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

'এসব লোক যদি আপনার কাছে হাজির হয় এবং নিজের গুনাহের জন্য এস্তেগ্ফার করে, তাহলে হে নবী আপনিও তাদের জন্য এস্তেগ্ফার করুন; তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কুবলকারী ও দয়ালু পাবে।'[২]

সেই লোকটি গড়াগড়ি খেয়ে এই আয়াতটি পড়ছে আর কাঁদছে, আমিও তো হে আল্লাহর রাসূল! আপনার দরবারে হাজির হয়েছি যেন আপনি আমার

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০২৭৮

২. সূরা নিসা : আয়াত ৬৪

জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এবার কবর থেকে আওয়াজ এল. তোমাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে।[১]

তাওবার গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

তাওবার ব্যাপারে একটি মাসআলা শুনে নিন। গুনাহ যদি এমন হয় যে, তা আল্লাহর সাথে যুক্ত; যেমন– কেউ নামায পড়ল না। ওয়াজিব আমলগুলো আদায় করল না, তাহলে সে ফরজ ও ওয়াজিব বিষয়গুলো কাজা করবে। তাওবা মানে তো এই নয় যে, আমি তাওবা করে নিলে ৬০ বছর যাবত যে আমি নামায পড়িনি, তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। বরং প্রত্যেক ফরজ ও ওয়াজিব নামাযগুলো আদায় করতে হবে। যদি মানুষটির বয়স এমন হয় যে, তার জীবনের অন্তিম প্রহর চলে এসেছে আর এখন সে উপলব্ধি করছে। তার তো শরীর খুব অসুস্থ। তো এর ব্যাপারে শরীয়ত বলেছে, নামাযের বিনিময় হিসেবে ফিদিয়া দাও। যদি এমন অবস্থায় থাক যে, আর পড়তে পারবে না, তাহলে ফিদিয়া আদায় করো। ফিদিয়া দিয়ে মনে-মনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হও, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।

আর যদি গুনাহটা বান্দার হকের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে সেই বান্দার থেকে গিয়ে মাফ চেয়ে নাও। শুধু আল্লাহ থেকে মাফ চাইলে হবে না। আপনি কারও থেকে পাঁচ লাখ টাকা ধার নিয়েছেন; তাহলে সব কিছু মাফ হতে পারে; কিন্তু এই ঋণের টাকা মাফ হবে না। কেয়ামতের দিন পাওনাদারকে এর বিনিময়ে ছাওয়াব দিতে হবে। আপনি হজ করে এলেও বান্দার হক থেকে মাফ পাওয়া যাবে না। যার থেকে সম্পদ ইত্যাদি নিয়েছেন, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে হবে।

বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিষয় থেকেই এত সহজে মাফ পাওয়া যাবে না। গীবতের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিন। জুলুমের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিন। মোটকথা, বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক বিষয়ের তাওবা কবুল হতে হলে আগে ওই বান্দার থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে। আর যদি এমন হয় যে, ওই বান্দা দুনিয়া থেকে চলে গেছে, তাহলে তার পক্ষ থেকে কাফফারা আদায় করে দাও। বলো, হে আল্লাহ! বান্দা তো চলে গেল; আমি তো তার থেকে মাফ চেয়ে নিতে পারিনি। এই যে কিছু টাকা আমি দান করছি, তার পক্ষ থেকে তা সদকা হিসেবে কবুল করুন এবং এর ছাওয়াব

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০৪২২

এত বাড়িয়ে দিন যে, কেয়ামতের দিন যেন সে যা আমার কাছে দাবি করে, তার দাবি এই টাকার সদকার ছাওয়াব দ্বারা আদায় করে দিতে পারি।

আল্লাহর রহমতের বিশালতা

আল্লাহর রহমত আমাদের গুনাহরাশি থেকে বহু গুণ বিশাল ও বিস্তৃত। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন–

إِنَّ اللهَ تَعَالَى حِيْنَ خَلَقَ كَتَبَ بِيَدِهٖ عَلَى نَفْسِهٖ اَنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْ

'যখন আল্লাহ জগত সৃষ্টি করলেন, তখন লিখে দিলেন, আমার রহমত আমার রাগের ওপর জয়ী হয়ে যায়।'

বোঝা গেল, আল্লাহর রহমত অনেক বেশি। হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ رَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا اُبَالِيْ

'হে আদম সন্তান! তুমি তাওবা করবে, মাফ চাইবে, চোখের পানিতে নিজেকে ধুয়ে নেবে। আমি তোমার সকল প্রকার গুনাহ মাফ করে দেব। এসব করতে আমার কোনোই পরোয়া নেই।'

يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ اَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا اُبَالِيْ

'তোমার গুনাহ যদি আসমান-সমানও উঁচু হয়, তবুও মাফ চাও। আমি এতকিছু সত্ত্বেও তোমার গুনাহ মাফ করে দেব। এতে আমার সামান্যও পরোয়া নেই।

يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ اَنَّكَ اَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَاتُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

'হে আদমসন্তান! যদি তুমি বিস্তৃত জমিনের সমান গুনাহ নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হও, আমি এত বড় ধরনের মাগফেরাত তোমাকে দান করব যে, তোমার গুনাহগুলোকে মাফ করে দেব।'[১]

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০২১৬

শিরকের ভয়াবহতা

শিরক দুই প্রকার।

১. শিরকে জলী।

২. শিরকে খফী।

শিরকে জলী মানে আল্লাহকে ছাড়া অন্যের সেজদা ও ইবাদাত করা– গাছ ইত্যাদির পূজা করা। অন্যের নাম নিয়ে, মৃতের নামে জবাই করা। মৃত জীবিত যে কারও পূজা করা। এটি প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট শিরক।

আর শিরকে খফী হচ্ছে এমন শিরক, যা আমরা বুঝতেই পারি না; অথচ আমাদের দ্বারা এমন শত-শত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, যা শিরক। এর ভয় ও ভয়াবহতা অনেক বেশি। এতে অনেক মানুষই নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এই যে আমরা আমাদের মনমতো যা ইচ্ছে করে বেড়াই, এ-ও কিন্তু এক প্রকার শিরক। কারণ, এ হচ্ছে নফসের পূজা, শয়তানের অনুসরণ। আজ আমরা নফসের পূজা করছি, শয়তানের পূজা করছি, মানুষের পূজা করছি। নেক আমল করলে মানুষ কী বলবে এই ভাবনায় আমল করি না। বলুন, এটাও তো মানবপূজা। এগুলোও তো মূর্তিপূজারই মতো। আল্লাহপ্রেম, আল্লাহপূজা আল্লাহর ইবাদাত এসব তো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে জামাতের অপেক্ষায় বসে থাকা আর এদিকে ম্যাসেজ আদান-প্রদান। এটাও তো গোপনে-গোপনে শিরক হয়ে যাচ্ছে।

তাই যাচাই করে দেখো, আল্লাহ থেকেও কোনো মাখলুককে বেশি ভালো বেসে ফেলছ কিনা। যদি মানুষের কাউকে আল্লাহর চেয়ে বেশি ভালোবাস, তাহলে বুঝে নাও, এটাও একপ্রকার শিরক। একেই বলে শিরকে খফী। আজ মাখলুকের ভালোবাসায় পড়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করছ। আল্লাহর ওপর মাখলুকের ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিচ্ছ। বলো কেন এমন করছ? এটা তো নফসের পূজা। এটা তো শিরকে খফী। এই শিরক বর্তমান যুগে অনেক বেশি হচ্ছে। যদি সমষ্টিগতভাবে দেখা হয়, মানুষ কোন গুনাহের কারণে বেশি জাহান্নামে যাবে? তখন দেখা যাবে, এই শিরকের কারণেই মানুষ বেশি জাহান্নামে চলে যাচ্ছে। এই মোবাইল ফোনের কারণেও আজকের যুগের মানুষ বেশি জাহান্নামি হয়ে যাচ্ছে। এই মোবাইলের কারণে কোনো-না-কোনোভাবেই গুনাহ হয়ে যাচ্ছে। গুনাহের সাথে সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। নামায পড়ছে, তাহাজ্জুদ পড়ছে, যিকির করছে, দু'আ করছে, আবার কোনো-না-কোনোভাবে এই মোবাইলের কারণে গুনাহ কামাই করছে। তো শিরক থেকেও তাওবা করা চাই। তাহলেই আল্লাহর মহব্বতের স্বাদ নসিব হবে।

দীর্ঘবয়সিদের জন্য বিশেষ সুযোগ

যদি কোনো তাওবাকারী দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত হয়, তাহলে আল্লাহও কিছুটা শিথিলতা করেন। দুনিয়ায় দেখে থাকবেন যে, যদি বয়সে কেউ সামান্য বড় হয়, বুড়ো হয়ে যায়, তাহলে অন্যরা তার প্রতি সহানুভূতি দেখায়, তাকে ভারী কাজ থেকে বিরত রাখে, মেহনত কম করতে বলে। হাদীছে আছে–

إِذَا بَلَغَتْ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِيْ سِتِّيْنَ سَنَةً لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ

'আমার উম্মতের কোনো বান্দার বয়স যখন ৬০ বছর হয়ে যায়, আল্লাহ তখন তার এই বয়সটাকে ওজরের সাথে কবুল করে নেন।'

কারণ, কালেমা পড়তে-পড়তেই তো এই বান্দার বয়স ষাটে পৌঁছে গেছে। একে আমি কী আর আযাব দেব? তার সব গুনাহ মাফ করে দিলাম।

চল্লিশ বছর বয়সিকে নবীজির উপদেশ

এক হাদীছে হযরত আলী (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে নসিহত করে বলেছেন–

إِذَا أَطَالَ الْعَبْدُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَّخَافَ اللهَ وَيَحْزَنَ

'যখন বান্দার বয়স চল্লিশে উপনীত হয়, তখন আল্লাহকে ভয় করা এবং গুনাহ পরিত্যাগ করা তার জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়।'

গুনাহ করতে-করতেই তো চল্লিশটা বছর পার হয়ে গেল। অন্তত এখন তো গুনাহ ছেড়ে দেওয়া উচিত। এখন তো যৌবনের সেই উন্মাদনা নেই। তাই মাস্তানি ছেড়ে দেওয়াই তো যুক্তিযুক্ত। বুযুর্গানে দীন কিতাবে লিখেছেন, চল্লিশ বছর বয়স তো গুনাহ করতে-করতেই চলে গেল। আর বান্দাও তাওবাটা করত পারলো না। শয়তান তার মুখে হাত বোলায় আর বলে, তোমাকে মোবারকবাদ! তুমিই তো আমার শিষ্য। তোমার আর আমার এই বন্ধন এখন আর কোনোভাবেই ছিঁড়বে না। আরে ভাই! শয়তানের শিষ্যের খাতায় নাম উঠার আগেই ফিরে এসো। তাওবা করে নিজেকে পবিত্র করে নাও। রহমানের বান্দা ও বন্ধুর খাতায় নামটা লিখিয়ে নাও।

তিনটা ভুল মাফ

তিনটা ভুল আল্লাহ এই উম্মতের জন্য মাফ করে দিয়েছেন। এটি প্রিয়নবীজির অপার দান আমাদের প্রতি।

হযরত ছাওবান (রাযি.) বলেছেন, নবীজি ইরশাদ করেছেন–

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيَ الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا أُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

'আমার উম্মত থেকে ভুল, বিস্মৃতি ও বাধ্য হয়ে কোনো কাজ করার অপরাধ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।'[১]

তো তিনটি গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। এক হচ্ছে ভুলে কোনো অন্যায় কাজ করে ফেলা। একটা হলো বিস্মৃতি বা ভুলে যাওয়া। আরেকটা হচ্ছে বাধ্য হয়ে কোনো কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়া। অন্তরে সেই কাজ করার ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু তাকে তা করতে বাধ্য করা হয়েছে।

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ

'... তবে সেই ব্যক্তিকে শাস্তির সম্মুখিন করা হবে না, যাকে বাধ্য করা হয়েছে এমন অবস্থায় যে, তার হৃদয় ঈমানের প্রতি পুরোপুরি আশ্বস্ত।'[২]

এটি বান্দার জন্য আল্লাহর কত বড় রহমত চিন্তা করে দেখুন।

যাদের আমল লেখা হয় না

তিন বান্দা এমন আছে, তাদের আমল লেখা হয় না–

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلٰثَةٍ

তিনজন থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফেরেশতাদের বলে দেওয়া হয়েছে, তোমরা এদের ব্যাপারে কিছু লিখো না। তারা হলো–

عَنِ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ عَلٰى عَقْلِهِ حَتّٰى يَبْرَحَ

উন্মাদ, যার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে।

وَعَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ

ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত।

وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَحْلِمَ

শিশু বালেগ হওয়া পর্যন্ত।[৩]

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০৪২২

২. সূরা নাহ্‌ল : আয়াত ১০৬

৩. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০৩৯৫

দেখুন, এরা তিনজন এমন, যাদের নেকি-বদি কোনোটা-ই লেখা হয় না। এই তিন শ্রেণির গুনাহ এমনিতেই মাফ হয়ে যায়।

গুনাহগারদের ক্ষমাকারী আল্লাহ

নবীজি বলেছেন, আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করেছিলাম, তখন সোনার হরফে লেখা তিনটি বাক্য দেখতে পেলাম।

প্রথম বাক্য

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

দ্বিতীয় বাক্য

مَا قَدَّمْنَا وَجَدْنَا، وَمَا اَكَلْنَا رَبِحْنَا، مَا خَلَّفْنَا خَسِرْنَا

আমরা যা আগে পাঠিয়ে দিয়েছি, তা পেয়ে গেছি। (অর্থাৎ– নেক আমল) আমরা যা খেয়েছি, তার দ্বারা লাভবান হয়েছি। আর যা কিছু রেখে এসেছি, তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। জমা করলেন আপনি, মালিক হয়ে গেল আপনার সন্তান। আর হিসাবটা নেওয়া হবে আপনার থেকেই।

তৃতীয় বাক্য

اُمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَرَبٌّ غَفُوْرٌ

'উম্মত হলো গুনাহগার আর রব হলেন ক্ষমাকারী।'[১]

সৌভাগ্যবান মানুষ

তাই যে-বান্দার জীবনটা নেক হালতে, নেক করতে-করতে কাটল, তার জীবন সৌভাগ্যবান হলো।

হযরত জাবের (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ اَنْ يَّطُوْلَ عُمْرُهٗ وَيَرْزُقُهُ اللّٰهُ مِنْ اِنَابَةٍ

'ওই বান্দা সৌভাগ্যবান, যে দীর্ঘ হায়াত পেল আর আল্লাহ তাকে নেক কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন।'

অর্থাৎ– বয়সটাও দীর্ঘ আবার কাজগুলোও তার সব নেক ও ভালো। তাইলেই এই বান্দা সৌভাগ্যবান।

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০৩৯৫

গুনাহও করব না, লজ্জিতও হব না

কিন্তু আমাদের গুনাহ করার দরকারটাইবা কী আর তার জন্য লজ্জিত হওয়ারই প্রয়োজন কী। বরং গুনাহ যদি পরিহার করে চলি, তাহলে তো আর লজ্জিতও হতে হবে না, লাঞ্ছিতও হতে হবে না। দেখুন, কাপড় যখন ছিঁড়ে যায়, তাকে কিন্তু সুঁই দিয়ে সেলাই করা হয়। কিন্তু এই সিলাই কি আগের মতো মসৃণ হয়? তাই বলছি, উত্তম তো হচ্ছে গুনাহ পরিহার করে পাপ মুক্ত জীবন যাপন করা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَقِلِّ مِنَ الْمَعَاذِيْر

'ওজরখাহি কম করো।'[১]

এমন করো না যে, ক্ষমা কম চাইতে হয়। গুনাহ করে আল্লাহর সামনে নত হওয়া, ক্ষমা চাওয়া নাও লাগতে পারে যদি গুনাহ না-ই কর। এমনই তো করা উচিত। এতে গুনাহও হলো না, দাগও পড়ল না।

এস্‌তেগ্‌ফারের আমল

তারপরও আমরা গুনাহ করে যাচ্ছি। এর থেকে মুক্তি নিতে হবে, ক্ষমা নিতে হবে। এর জন্য মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, প্রতিদিন ১০০বার এস্‌তেগ্‌ফার করা উচিত। নবীজি ইরশাদ করেছেন–

يَا اَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ فَوَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَتُوْبُ مِنَ اللّٰهِ مَائَةَ مَرَّةٍ

'হে লোকসকল! তোমরা আপন রবের নিকট তাওবা করো। আমি তো দিনে ১০০বার এস্‌তেগ্‌ফার করি।'[২]

অথচ নবীজির আগের-পিছের সবই মাফ। তারপরও তিনি এত এস্‌তেগ্‌ফার পড়তেন! তাঁর ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে–

لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ

'আল্লাহ তাঁর আগের পিছের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।'[৩]

কিন্তু উম্মতকে শেখানোর জন্য আল্লাহর প্রিয় হাবীব দৈনিক শতবার এস্‌তেগ্‌ফার করতেন।

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০২০১
২. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০৩০৭
৩. সূরা ফাতাহ : আয়াত ২

হযরত আবুবকর (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

'যদি বান্দা দিনে সত্তরবার গুনাহ করে এবং সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তাকে অনবরত গুনাহকারী ধরা হবে না।'[১]

কারণ, সে তো মাফ চেয়ে নিচ্ছেই। তাই আমাদের উচিত আমরা ইস্তিগ্ফারকে দৈনন্দিনকার আমলে পরিণত করব এবং আল্লাহর নিকট গুনাহ থেকে ক্ষমা চাইব। হাদীছে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

طُوْبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِيْ صَحِيْفَتِهِ اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا

'খোশনসিব সেই ব্যক্তির, যার আমলনামায় অধিক পরিমাণে এসতেগফার পাওয়া যাবে।'

এখানে وُجِدَ এবং وَجَدَ উভয়টিই পড়া সহীহ। ওই ব্যক্তির জন্য মোবারকবাদ, কেয়ামতের দিন যার আমলনামায় অধিক এস্তেগ্ফার পাওয়া যাবে। তো ভাই! যদি পূর্ণভাবে পুরো বাক্যটি নাও পড়া যায়, অন্তত اَسْتَغْفِرُ اللهَ اَسْتَغْفِرُ اللهَ এটুকু জপতে থাকুন। হযরত লোকমান (আ.) আপন পুত্রকে নসিহত করে বলেছিলেন, বৎস! اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ এই দু'আ বেশি-বেশি বলো, বলতে থাকো। আল্লাহর রহমতের এমন কিছু সময় আছে, বান্দা যদি اللهم اغفرلی বলে, তাহলে আল্লাহ বান্দার সকল গুনাহ মাফ করে দেন।

তো আমাদেরও উচিত যার-যার গুনাহগুলো আল্লাহ থেকে মাফ করিয়ে নেওয়া। আল্লাহ আমাদের অবশ্যই মাফ করে দেবেন।

তাওবার মধ্যে ৬টি বিষয় আছে

তাওবার অল্পবিস্তর আলোচনা এতক্ষণ শুনলেন। দেখুন, হযরত আলী (রাযি.)-এর সামনে একবার এক গ্রাম্য ব্যক্তি বলল–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

হযরত আলী (রাযি.) বললেন–

يَا هٰذَا اِنَّ سُرْعَةَ الْاِسْتِغْفَارِ بِالتَّوْبَةِ تَوْبَةُ الْكَذَّابِيْنَ

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ১০৩০৭

তাওবার এগ্‌তেগ্‌ফারে এমন তাড়াহুড়া মিথ্যাবাদীদের স্বভাব।

قَالَ الْاَعْرَابِيُّ مَا التَّوْبَةُ

গ্রাম্য ব্যক্তি বলল, তাওবা কী?

হযরত আলী (রাযি.) বললেন–

يَجْمَعُهَا سِتَّةُ اَشْيَاءَ

তাওবা ছয়টি বিষয়ের সমষ্টির নাম।

(১) عَلَى الْمَاضِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ النَّدَامَةُ

গুনাহের হালতে যে-সময়টা অতীত হয়ে গেছে, তার জন্য লজ্জিত হওয়া।

(২) وَلِلْفَرَائِضِ اِعَادَةٌ

ফরজ-ওয়াজিব ইবাদাতগুলোর কাজা আদায় করে নেওয়া।

(৩) وَرَدُّ الْمَظَالِمِ

মজলুম ও হকদারের হক ফিরিয়ে দেওয়া।

(৪) وَاسْتِحْلَالُ الْخُصُوْمِ

ঝগড়া মিটিয়ে পরস্পরে মিলে যাওয়া।

(৫) وَاَنْ تَعْزِمَ اَنْ لَّا تَعُوْدَ

আর পূর্ণ প্রত্যয়ী হওয়া যে, এই গুনাহ আর করব না।

(৬) وَاَنْ تُذِيْبَ نَفْسَكَ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ كَمَا اَذَبْتَهَا فِي الْمَعَاصِيَةِ

এবার নিজেকে মেহনত-মোজাহাদা ও আল্লাহর আনুগত্যে এমনভাবে নিয়োজিত রাখো যেমনভাবে অন্যকে গুনাহে লিপ্ত করেছ ও প্রচেষ্টা চালিয়েছ।

وَاَنْ تُذِيْقَهَا مُرَارَةَ الطَّاعَةِ كَمَا اَذَقْتَهَا حَلَاوَةَ الْمَعَاصِيْ

নিজের নফ্‌সকে নেকের স্বাদ গ্রহণ করাও যেমনিভাবে তাকে গুনাহের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছিলে।

এই যে রাতে ওঠা, দিনে নেক কাজে আত্মনিয়োগ করা, দৃষ্টিকে হেফাজত করা, এগুলোতে কষ্ট লাগে তাই না? তবে এগুলোর অন্য রকম এক অপার্থিব স্বাদও আছে। সেই স্বাদ গ্রহণ করার চেষ্টা করুন। নফ্‌সকে

বোঝান, এভাবে খাঁটি তাওবা করতে হয়। একেই নিখাঁদ তাওবা বলে। দুনিয়ায় এমন মানুষও অতীত হয়েছেন, যাঁদের সামনে গুনাহের সুযোগ বিদ্যমান ছিল; কিন্তু তারা গুনাহ করেননি। বরং তাওবায় মগ্ন ছিলেন, এগ্‌তেগ্‌ফারে মগ্ন ছিলেন। অনেক যুবক-যুবতি আছে, আমি বহুজনকে জানি, যারা গুনাহের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে।

এক বাদশাহর দাসির তাওবা

অতীতে এক বাদশাহর নাম ছিল হাশেম ইবনে আবদুল্লাহ। তার একজন অত্যন্ত সুদর্শনা দাসি ছিল। তার নাম ছিল গাজিজ। দাসির রূপ-গুণও আছে, ভোগ্যসামগ্রীও আছে। আর বাদশাহর ভালোবাসা তো আছেই। চোখের ইশারায় তার সব কিছু হয়ে যায়। মুখে যা বলে সাথে-সাথে পূর্ণ হয়ে যায়। তার ইচ্ছা-অভিলাষ কিছুই অপূর্ণ থাকে না। বিলাসিতার সব রকম পথ তার উন্মুক্ত। দারুণ জীবন তার। আরে ভাই! যে-মহিলা সময়ের বাদশাহর স্ত্রী হবে, তার জীবন কেমন হবে তা কি বলে বোঝাতে হয়? একবার এই নারী একটি জানাযা যেতে দেখল। জানাযাটি দেখে তার দিলে চোট লাগল। ভাবল, আচ্ছা, সারাটা জীবন তো আমি এমন যৌবনা থাকব না। আমার দেহের এই আকর্ষণ চিরদিন থাকবে না। আমারও তো মৃত্যু আসবে। দুনিয়ায় তো এমন সুখময় জীবন পেলাম; কিন্তু আখেরাতে কী দশা হবে আমার? সে হিশামকে বলল, মহারাজ! আমাকে ইবাদাতের জন্য অবসর করে দিন। হিশাম বলল, আরে! তোমাকে ছাড়া আমি থাকব কী করে!

দাসি বলল, আমি আপনার পায়ে ধরি, আপনি আমাকে ইবাদাতের জন্য ছেড়ে দিন। মহিলার দিন বদলে গিয়েছিল, অন্তরে রেখাপাত করেছিল। হৃদয়টা বুঝে নিয়েছিল যে, সময় তো চলেই গেছে। এখন তো একটু হলেও সামনের জীবনের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত।

যাহোক, একপর্যায়ে হিশাম তাকে অবসর দিল। মহিলা সেখান থেকে চলে এল মক্কা মুকাররামায়। সারাটা জীবন সে হেরেম শরীফে ইবাদাত করতে-করতে কাটিয়ে দিল। সেখানেই তার মৃত্যু হলো।

দেখুন আমাদের পূর্বেকার মানুষদের অবস্থা। তারা তো এজন্য তাওবা করে নেয়নি যে, গুনাহ করা তো যাচ্ছে না। গুনাহের সুযোগ তো পাচ্ছি না। বরং তারা জীবনের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেই বরং সকল রূপ-রস-গন্ধ আর সাধ-বাসনা ও স্বপ্ন পরিত্যাগ করে মুক্তির পথে ফিরে এসেছিলেন।

এক রাজপুত্রের তাওবা

আরেকটি ঘটনা শুনুন। আলী ইবনে মামুনের ঘটনা। মামুন ছিলেন বাদশাহ। তার ছেলের নাম হচ্ছে আলী। বড় সুন্দর এক তাগড়া জোয়ান। লোকেরা তো সৌন্দর্যের কারণে তাকে ইউসুফ বলে ডাকত। যুগের ইউসুফ বলত তাকে। সে তো চোখজুড়ানো সুন্দর। পাশাপাশি আদব-আখলাক ও বিনয়নম্রতায় বড় চমৎকার ছিল। তার মুখের ভাষাও ছিল বড় সুমিষ্ট। বাকপটু ছিল। স্বভাব ছিল কোমল ও প্রাণবন্ত। সর্বপ্রকার সুন্দর ও সুউচ্চ গুণ তার মাঝে বিদ্যমান। তার পিতা মামুনও তাকে বড় বেশি ভালোবাসতেন। কিতাবে লেখা হয়েছে, বাবা তার ছেলের চেহারা থেকে দৃষ্টি সরাতেনই না। আল্লাহ ছেলেটিকে সৌন্দর্যও দিয়েছেন এবং গুণাবলিতেও পূর্ণাঙ্গ করেছেন।

গরমের মৌসুম। দুপুরবেলা। বাদশাহর দস্তরখান বিছানো। বাদশাহ গোলামকে বললেন, যাও; আলীকে নিয়ে এসো। রাজপুত্র আলীর ক্ষুধা ততটা ছিল না। সে সংবাদ পাঠাল, বাদশাহর কল্যাণ হোক, আমার তো এখন ক্ষুধা নেই। অনুমতি হলে আমি পরে খাই। বাদশাহ বলে পাঠালেন, খানা না খাও তাতে কী; চেহারাটা তো দেখিয়ে যাবে। আলী বাবার সামনে গেল। নানা রঙের সুস্বাদু খাবার ছড়িয়ে আছে। পানীয়, শরবত সবই আছে। ক্ষুধা না থাকা সত্ত্বেও ওটাওটা কিছু খেল।

দজলা নদীর তীরে একটি বালাখানা তৈরি করা ছিল। আলী বলল, আমি ওইখানটাতে সামান্য সময়ের জন্য বসব। নদীদে কলকল করে পানি বয়ে চলছে। তো সে বালাখানায় গিয়ে বসে গেল। বালাখানার নিচে লোকদের গমনাগমনের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। সেখানে সে দজলার স্বচ্ছ পানিতে গোসল করতে যায়, তার শীতলতায় বিমুগ্ধ হয়। প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান নিয়ে সেখানে সে উপস্থিত। এমন সময় একজন মজুর এল। তার মাথায় একটা টুকরি। গরমের মৌসুমেও সে পশমি চাদর পরে আছে। এই চাদর তো শীতের সময় পরিধান করে। কারণ, লোকটির নিকট আর কোনো কাপড় নেই। তার পায়ে গরম থেকে বাঁচারও কোনো জুতা নেই। সে পদযুগলে ছেঁড়া কাপড়ের পট্টি বেঁধে রেখেছে যেন গরমে তার পা পুড়ে না যায়। আর মাথায় টুকরি নিয়ে চলছে। বোঝা-ই যাচ্ছে লোকটি মজুর। তার হাতে-পায়ে মাটি লেগে আছে। হয়তো নির্মাণকাজ করে।

সে দজলার স্বচ্ছ পানিতে এসে নামল। কলকলিয়ে পানি নেড়ে হাত-পা মুখ ধুলো। টুকরি থেকে একটি থলে বের করল। সেটিতে শুকনো রুটি

রয়েছে। তরকারি নেই। লোকটি শুকনো রুটি ভেজাতে তা পানিতে রাখল। তারপর সামান্য লবণ মেখে খেয়ে নিল। পরম তৃপ্তি ও স্বাদে সে ভরে উঠছে। পরিতৃপ্ত হয়ে যেন সে খেল। তারপর দু'আ করল। দু'আয় সে বলল, হে আল্লাহ! আমার ওপর তোমার অনিঃশেষ রহমত ও নেয়ামত আছে। এসবের শুকরিয়া তো আমি আদায় করতে পারব না।

যখন লোকটি এই শব্দ বলল, হে আল্লাহ! আমার ওপর তোমার অনিঃশেষ রহমত ও নেয়ামত রয়েছে, আলী সেই বালাখানা থেকে এই দৃশ্য দেখছিল। এই দু'আ শুনে তো আলী হতবাক। তার হৃদয়ে একটা ধাক্কা লাগল। তার অন্তর কেঁপে উঠল। কথাটা তিরের মতো গিয়ে বিদ্ধ হলো তার অন্তরে। চিন্তা করল, আমার জীবনটা দেখো। অথচ আমি প্রতিনিয়ত কত রাগ দেখাই। ভাবি, গরম-ঘাম ভালো লাগে না। আরাম পাচ্ছি না। আর এই বান্দার অবস্থা দেখো। এই অবস্থায়ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছে। লোকটি সামান্য বিশ্রামের জন্য শুয়ে গেল। তারপর উঠল। অজু করল, নামায পড়ল, দু'আ করল। আলী এরই মধ্যে গোলামকে পাঠাল– যাও তো; ওই মজুর লোকটাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। যখন গোলাম তাকে ডাকতে গেল, সে বলল, আরে ভাই! শাহজাদার সাথে আমার কাজ কী? আমি যাব না। গোলাম বলল, আরে ভাই! উনি আপনাকে ডাকছেন। আপনার আসা উচিত। সোজাভাবে যদি না আসেন, তাহলে তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব। মজুর বলল–

عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

'হতে পারে তোমরা যে বিষয়টা অপছন্দ করছ, তাতে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে।'[১]

লোকটি যেতে বাধ্য হলো। টুকরি-থলে ইত্যাদি সব নিয়েই এল রাজপুত্র আলীর সামনে। আলী লোকটিকে কাছে বসাল। জিজ্ঞেস করল, কী অবস্থা তোমার? লোকটি বলল, আল্লাহর শোকর অনেক-অনেক ভালো আছি। আলী বলল, মজুরি করেন? লোকটি বলল, হ্যাঁ। আমার মা অসুস্থ। আমার বোন অন্ধ। তাদের দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত। তাই মজুরি করে তাদের ও আমার জীবনের চাকা চালিয়ে যাচ্ছি।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২১৬

আলী বলল, তুমি এখানে বসে-বসে খাচ্ছ; অথচ অসুস্থ ও অন্ধ সেই মা বোনের সাথে খাওনি কেন যদি তাদের ভার তোমার হাতেই ন্যস্ত থাকে? মজুর বলল, দেখো, আমার মা ও বোন দিনের বেলা রোযা রাখে, রাতের বেলা খাবার গ্রহণ করবে। আর আমার তো কাজ করতে হয়। দিনে ক্ষুধা পায়; তাই খেতে হয়।

আলী বলল, কত সময় কাজ কর? লোকটি বলল, ফজরের পর থেকে আছর পর্যন্ত মানুষের কাজ করি। আর আছর থেকে ফজর পর্যন্ত আমার মালিক রব্বুল আলামীনের কাজ করি। শাহজাদা জিজ্ঞেস করল, আরাম কর না? নিদ্রা যাও না? লোকটি জবাব দিল, আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এই ভয় আমার রাতের নিদ্রাকে উড়িয়ে দিয়েছে।

তার অবস্থা শোনার পর আলী গোলামকে বলল, একে পাঁচ হাজার দেরহাম দাও। ওই যুগের পাঁচ হাজার দেরহাম এ-যুগের পাঁচ লক্ষ টাকা থেকেও অনেক বেশি মূল্যবান। মজুর নিতে অস্বীকার করল। বলল, আমি তোমার থেকে অর্থকড়ি নেব না। আলী বলল, নাও। লোকটি বলল, আমার জরুরত নেই। আলী বলল, তোমার তো এই অর্থের জরুরত নেই; কিন্তু আমার তো জরুরত আছে তুমি এটি নেওয়ার মধ্যে। তুমি এই হাদিয়া গ্রহণ করা আমার জন্য জরুরি। মজুর বলল, আমার মতো মানুষের কী গুরুত্ব যে আমাকে হাদিয়া দিতে হবে?

এতেই বোঝা যায় লোকটি আল্লাহর ওপর কতটুকু তাওয়াক্কুল করেছে। গরিবি হালতেও আল্লাহর ওপর সে সন্তুষ্ট। আলী বলল, ভাই! তুমি আমার জন্য দু'আ করে দাও। মজুর বলল, আল্লাহর দরবারে তো আমার কোনো মর্যাদা-ই নেই যে, আমি তোমার জন্য দু'আ করব।

এটি আল্লাহওয়ালাদের পরিচয়। দেখুন, তাকে মানুষ কী বলছে আর সে নিজেকে কত ছোট মনে করছে! নফ্সকে সে ফুলতেই দিচ্ছে না। লোকটি বলল, আমার তো আল্লাহর দরবারে কোনো মর্যাদা-ই নেই। আমি তোমার জন্য কী দু'আ করব? আলী তো আরও হতভম্ব হয়ে গেল। বলল, আচ্ছা আমাকে কিছু নসিহত করো। যেহেতু নসিহত সকলেই করা উচিত; গুনাহগার হোক নেককার হোক প্রত্যেকেরই উচিত সৎকাজের আদেশ দান করা, অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা।

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

'আলোচনা করো, নসিহত করো। তা মুমিনদের জন্য উপকারী।'[১]

এই ভিত্তিতে মজুর বলল, আচ্ছা আলী! যখন তোমরা লম্বা ও দীর্ঘ সফরে বের হও, তখন কোন সময় রওনা দাও? আলী বলল, সকালে। এবার মজুর বলল, আখেরাতের সফরটাও তো সুদীর্ঘ; আখেরাতের সেই অনন্ত সফরের জন্য কি কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?

আল্লাহু আকবার! দেখুন, এবার একজন মজুর কীভাবে একজন শাহজাদার হৃদয়ে বড় শান্তভাবে তির চালিয়ে দিল। আখেরাতের সফরই তো দীর্ঘ সফর। তুমি তো যুবক হয়ে গেছ। তুমি এখনও নিজের প্রস্তুতিটাই শুরু করনি। তারপর মজুর বলল, আলী, নাফরমানি থেকে বাঁচো। মৃত্যুকে স্মরণ করো। মাত্র দুটি কথা– নাফরমানি থেকে বাঁচো আর মৃত্যুকে স্মরণ করো। আলী বলল, দু'আ করুন। এবার মজুর দু'আ করল, হে আল্লাহ! আলীর হৃদয় থেকে দুনিয়ার প্রেম দূর করে দাও। তার কলব থেকে দুনিয়ার মহব্বত দূর করে দাও। তাকে তোমার সন্তুষ্টি অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করো। তাকে মাফ করে দাও।

কত সুন্দর দু'আ! আলী বলল, তোমার আর কোনো হাজত আছে কি? মজুর বলল, আমার হাজত তো এই যে, তুমি আমাকে দ্রুত মুক্তি দাও।

আলী লোকটিকে বিদায় দিল। দীর্ঘক্ষণ তার অন্তরে কথাগুলো আঘাত হানতে থাকল। সে খুব কাঁদল। তারপর সঙ্গীদের বলল, মজুরের অবস্থাটা দেখো আর আমাদের দস্তরখানের অবস্থা দেখো। তারপর সে নিজেদের দস্ত রখানের খাদ্যসামগ্রী ও পানীয়সামগ্রীর কথা বলল। বলল, সে কত মজার-মজার খাবার খায়।

আলীর এক বন্ধু ছিল, যার একটি লাইব্রেরি ছিল। বন্ধুর নাম ছিল মুনিব। আলী তাকে বলল, যাও তো মুনিব! হযরত ওমর (রাযি.)-এর জীবনাচার সম্বলিত একটি বই আনো। মুনিব বই নিয়ে এল। মুনিব পড়ে শোনাল ওমরের (রাযি.) খাবারের অবস্থা কেমন ছিল। একবার স্ত্রী তাকে ভালো খাবার তৈরি করে দিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, এমন যেন না হয় যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

---

১. সূরা যারিয়াত : আয়াত ৫৫

'তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করে ফেলেছ।'[১]

হযরত ওমর (রাযি.)-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তাকে যখন কোনো পানীয় দেওয়া হতো, তখন তিনি তা চোখের পানি ফেলতে-ফেলতে পান করতেন। পানীয়তে অশ্রু ঝরে পড়ত আর তিনি সেই পানীয় পান করে নিতেন। ভাবতেন, কেয়ামতের দিন এসবের জবাব দেব কীভাবে।

মুনিব তারপর আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের ঘটনা শোনাল। মৃত্যুর সময় আঙ্গুর খাওয়ার ইচ্ছে জাগল তার। আঙ্গুর আনাও হয়েছিল। কিন্তু একজন ফকির দেখে তাকে দিয়ে দিলেন। ভাবলেন, আমি এটি আখেরাতের জন্য রেখে দিলাম। আলী ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর কিতাব চাইল। তাঁর জীবনী আলীকে পড়ে শোনানো হলো। তাঁর দুনিয়ায় চলার নিয়ম কী ছিল তা শোনানো হলো। তিনি দুনিয়াকে আখেরাতের তরে রেখে দিয়েছিলেন। তারপর সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (রহ.)-এর জীবনী তাকে শোনানো হলো। হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব অত্যন্ত উঁচু মানের তাবেঈ ছিলেন। তারপর মুনিব মালিক ইবনে দীনারের জীবনী আলীকে শোনাল। তিনি এমন মানুষ ছিলেন, যিনি এত-এত নেকি করেছেন যে, আল্লাহ তার শরীরকে কবরের মধ্যে সংরক্ষিত রেখেছেন। তার আমলের কারণে কবরে তার দেহ নষ্ট হয়নি।

এবার আলী বলল, আমি এক কাজে বাইরে যাচ্ছি; তুমি আমার পেছনে আসবে না। আমি সরদারের কাছে যাচ্ছি। গোলাম মনে করেছিল, আলী বাদশাহর কাছে যাচ্ছে। আলী বালাখানা থেকে নেমে দজলার স্রোতে কিশতি ভাসিয়ে ওয়াকেফ নামক শহরে চলে গেল। সেখানে গিয়ে সেই মজুরের মতো কাজ করতে শুরু করল এবং সাধারণ পোশাক পরল। শুকনা রুটির জিন্দেগী শুরু করে দিল। দিনটা মজুরি করে আর রাতটা আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়ে দিত। বড় নাজুক বান্দা ছিল সে। বাদশাহ অনেক খুঁজলেন তাকে। কিন্তু সে তো সাধারণ পোশাকে মজদুরিতে থাকত। কেউ তাকে চিনত না।

অবশ্য বাদশাহর ছেলে। কাজে অভ্যস্ত ছিল না। তাই এত কষ্ট সহ্য হতো না তার। মসজিদে পড়ে থাকত। দীর্ঘ রাত জেগে-জেগে ইবাদাত করত। আবার দিনে মজুরি করত। এমন কষ্টকর পরিশ্রম করতে-করতে

---

১. সূরা আহকাফ : আয়াত ২০

একদিন আলী অসুস্থ হয়ে গেল। চিকিৎসা করাল। কিন্তু একদিন মসজিদেই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল।

মৃত্যুর আগে একব্যক্তি ব্যাপারটা লক্ষ করল। লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করল, হে প্রবাসী! তুমি কে? আলী বলল, আমার এই চিঠিখানা নাও। বাদশাহর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ো। আমার এই আংটিটা তাকে দিয়ো। ব্যাপারটা গভর্নরকে জানানো হলো। সে বলল, এটি তো আলীর আংটি। সে তার পিতা মামুনের কাছেই তো চিঠি লিখেছে। গভর্নর তার মৃত্যুসংবাদ শুনে দ্রুত ছুটে এলেন এবং মৃতদেহটা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রাজধানীতে নিয়ে গেল।

বাদশাহ মামুন তাকে দেখলেন। চিঠিটা খুলে পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল, সূরা ফাজর-এর ১৪টি আয়াত পড়ে শিক্ষা গ্রহণ করুন। সেই ১৪টি আয়াতের মধ্যে একটি আয়াত হচ্ছে–

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

'তোমার আল্লাহ তোমার প্রতীক্ষায় আছেন।'[১]

তিনি তোমাকে দেখছেন, তুমি কী করছ।

এই আয়াতটি তার হৃদয়ে বসে গেল। এর ভয়েই সে তার সমস্ত সৌন্দর্য ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। যখন দাফন করা হলো, তখন মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ তিরমিযি সূরা ফজর এর ১৪ আয়াত পাঠ করলেন। তখন মামুনও তাওবা করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইলেন এবং বাকি জীবনটা গুনাহমুক্তভাবে কাটাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন।

জান্নাতি কাফেলায় শামিল হওয়া কঠিন নয়

প্রিয় ভাইও বন্ধুগণ! আমি তো বলিনি ঘরবাড়ি সব ছেড়ে দিন। বরং বলছি, ঘরবাড়ি আহল-পরিবার সব ঠিক রাখুন। সাথে-সাথে দীনের কাজও করুন। দীন অনুযায়ী জীবন যাপন করুন। গুনাহ করা ছেড়ে দিন। আর তো কিছু আমি আপনাদের কাছে চাইনি। আমি আপনাদের সেই কাজই করতে বলব, যা আপনাদের দ্বারা সম্ভব। অসম্ভব কিছু তো আপনাদের করতে বলিনি। শরীয়তে যতটুকু জায়েয, ততটুকু স্বাদ তো দুনিয়া থেকে নেবেনই। আর যা নাজায়েয, তা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। জায়েয পথ অনেক। হারাম পথ কয়েকটামাত্র।

---

১. সূরা ফাজর : আয়াত ১৪

দেখুন, পৃথিবীর জায়েয পানীয় অনেক আর হারাম পানীয় অল্প কয়েকটা। জায়েয গোশত নানারকমের, বহু জাতের আছে। হাজার রকম পশু-পাখি খাওয়া জায়েয। হারাম গোশত হাতেগোনা কয়েকটামাত্র। তো জায়েযের সীমায় থেকে দুনিয়ার স্বাদ হাসিল করুন। নাজায়েয থেকে বেঁচে থাকুন। আল্লাহর হাজারো নেয়ামতে ডুবে থাকার পরও কেন শুধু-শুধু হারামে মগ্ন হবেন? আল্লাহ তো চান, বান্দা জান্নাতি হোক। এটি কঠিন নয়। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন গুনাহ মাফ করে দেবেন। হে আল্লাহ! আমরা যে সুস্বপ্ন দেখছি, তা পূর্ণ করুন।

اِلٰهِیْ اَنْتَ ذُوْ فَضْلٍ وَمَنٍّ ■ وَاِنِّیْ ذُوْ خَطَایَ فَاعْفُ عَنِّیْ

وَظَنِّیْ فِیْكَ یَا رَبِّیْ جَمِیْلٌ ■ فَحَقِّقْ یَا اِلٰهِیْ حُسْنَ ظَنِّیْ

হে আমার মালিক! আপনি তো দয়াবান, মেহেরবান, অনুগ্রহ কারী। আর আমি গুনাহগার। সুতরাং আমার গুনাহ মাফ করে দিন। আমি তো আপনার ওপর ভালো ধারণা করে (সুস্বপ্ন বুকে লালন করে) আছি। সুতরাং আমার সুন্দর ধারণা ও সুস্বপ্নকে বাস্তবায়ন করুন হে মাওলা!

২০ বছর পর ফিরে আসা

একটি বর্ণনায় আছে–

اِنَّ فِیْ بَنِیْ اِسْرَائِیْلَ شَابٌّ عَبَدَ اللّٰهَ بِعِشْرِیْنَ سَنَةً ثُمَّ عَصَاهُ عِشْرِیْنَ سَنَةً

বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক যুবক ছিল। সে ২০ বছর আল্লাহর ইবাদাত করেছে। পরে ২০ বছর আল্লাহর নাফরমানি করেছে। কোনো মসিবতে পড়ে গেছে। কোনো মহিলার ফাঁদে পা দিয়েছে। ২০টি বছর গাফলতে-গুনাহে কাটিয়ে দিয়েছে।

ثُمَّ نَظَرَ فِی الْمِرْاٰةِ فَوَجَدَ الشِّیْبَ فِیْ لِحْیَتِهٖ فَسَاءَتْهُ ذَالِكَ

তারপর সে আয়না দেখল। দাড়িতে শুভ্রতা দেখতে পেল । তার কাছে ব্যাপারটা খারাপ লাগল।

فَقَالَ اِلٰهِیْ اَطَعْتُكَ عِشْرِیْنَ سَنَةً ثُمَّ عَصَیْتُكَ عِشْرِیْنَ سَنَةً فَاِنْ رَجَعْتُ اِلَیْكَ اَتَقْبَلُنِیْ

এবার যুবক বলতে লাগল, হে আমার রব! আমি ২০টি বছর তোমার আনুগত্য করেছি। তারপর ২০টি বছর তোমার অবাধ্যতা করেছি। এখন আমি যদি তোমার দরবারে ফিরে আসি, তুমি কি আমায় কবুল করবে?

فَسَمِعَ قَائِلًا يَقُوْلُ وَلَا يَرَى شَخْصًا

তারপর সে যুবক কাউকে বলতে শুনল; কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে দেখল না। গায়েব থেকেই বলতে শুনল–

اَحْبَبْتَنَا فَاَحْبَبْنَاكَ فَتَرَكْتَنَا فَتَرَكْنَاكَ وَعَصَيْتَنَا فَاَمْهَلْنَاكَ وَاِنْ رَجَعْتَ اِلَيْنَا قَبِلْنَاكَ

হে আমার বান্দা! তুমি আমাকে মহব্বত করেছিলে। আমি তোমাকে মহব্বত করেছিলাম। তারপর তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে; আমিও তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। আজও যদি তুমি ফিরে আস, তাহলে আমি তোমাকে বরণ করে নেব।

আল্লাহু আকবার!

আশার প্রদীপ জ্বলতেই থাকবে

একটি হাদীছে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে–

يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيْحَ ابْنُ ادَمَ يُذْنِبُ الذَّنْبَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرُلَهٗ ثُمَّ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرُلَهٗ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে আদম সন্তানেরা! কী আশ্চর্য কথা! একবার গুনাহ করে যদি কেউ এস্‌তেগ্‌ফার করে, আমি মাফ করে দেই। তারপর যদি সে আবার গুনাহ করে এবং আবার এস্‌তেগ্‌ফার করে, মাফ চায়, তাহলেও আমি তাকে মাফ করে দেই।

لَا هُوَ يَتْرُكُ الذَّنْبَ مِنْ مَخَافَتِىْ وَلَا يَيْئَسُ مِنْ مَّغْفِرَتِىْ اُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِىْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهٗ

সে তো না আমার ভয়ে গুনাহ ছাড়ে, না আমার মাগফেরাত থেকে নিরাশ থাকে। হে আমার ফেরেশতারা! তোমরা সাক্ষী থাকো। আমি তার সকল গুনাহ মাফ করে দিলাম।

আল্লাহর রহমত এত প্রশস্ত!

হাদীছ শরীফে এসেছে, এক যুবক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এল। এসে বলল–

وَاذْنُوْبَاهُ وَاذْنُوْبَاهُ وَاذْنُوْبَاهُ فَقَالَ هٰذَا الْقَوْلُ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثَةً

হায় আমার গুনাহ! হায় আমার গুনাহ! হায় আমার গুনাহ! একথা সে তিনবার বলল।

فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلِ اللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, বলো, হে আল্লাহ! তোমার মাগফেরাত আমার গুনাহ থেকেও বেশি প্রশস্ত।

وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ

আর তোমার রহমতের আশাবাদী আমি আমার আমল থেকেও।

ওই যুবক দু'আটি হুবহু বলল।

ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعَادَ ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعَادَ

তারপর নবীজি বললেন, পুনরাবৃত্তি করো। ফলে সে কথাটির পুনরাবৃত্তি করল। নবীজি আবার বললেন, পুনরাবৃত্তি করো। যুবক পুনরাবৃত্তি করল। এবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

قُمْ فَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ

যাও; আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন।

নবীজির পবিত্র জবান থেকে এই ঘোষণা এল, এই সাক্ষী মিলল যে, যদি তিনবার এই দু'আটি পাঠ করা যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা মাগফেরাত দান করেন। তো ভাই! চলুন, আমরাও এই মজলিসেই দু'আটি তিনবার বলে ফেলি

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ

দু'আটি মুখস্থ করে নেবেন। যখনই মুনাজাত করবেন এটিও তখন পাঠ করবেন। বাস্তবেই এই দু'আটি আমাদের জন্য বড়ই সৌভাগ্যের জিনিস। আমাদের কাছে তো নেক আমল নেই। তাই তো আমরা আরও কাকুতিমিনতি করে বলা দরকার।

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ

আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা

এবার একটি কথা শুনুন। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথাবার্তার এক পর্যায়ে বললেন–

يَا رَبِّ إِذَا سَئَلَكَ سَائِلٌ مَاذَا تَقُوْلُ لَهُ

হে আমার রব! কোনো প্রার্থনাকারী যদি আপনার কাছে প্রার্থনা করে, তাহলে আপনি কী বলেন?

আল্লাহ তা'আলা বললেন–

أَقُوْلُ لَبَّيْكَ

আমি বলি, আমি আছি হে বান্দা।

فَقَالَ فَزَاهِدٌ

জিজ্ঞেস করলেন, যদি দুনিয়াবিমুখ বান্দা আপনার কাছে কিছু চায়?

আল্লাহ বললেন,

أَقُوْلُ لَبَّيْكَ

আমি বলি, লাব্বাইক।

মূসা (আ.) বললেন–

أَلصَّائِمُ

যদি রোযাদার প্রার্থনা করে?

আল্লাহ বললেন–

أَقُوْلُ لَبَّيْكَ

আমি বলি লাব্বাইক।

এবার মূসা (আ.) বললেন–

فَالْعَاصِيْ

যদি গুনাহগার প্রার্থনা করে?

فَقَالَ أَقُوْلُ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ

আমি বলি, লাব্বাইক, লাব্বাইক, লাব্বাইক।

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা বলছেন, যদি গুনাহগার প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তিনবার বলেন লাব্বাইক লাব্বাইক লাব্বাইক– আমি আছি বান্দা। আমি আছি। আমি আছি। হযরত মূসা (আ.) বললেন, আল্লাহ! এর কারণ কী? আল্লাহ তা'আলা বলেন–

كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا هٰؤُلَاءِ يَتَوَكَّلُ عَلٰى عَمَلِهٖ وَالْعَاصِيْ يَتَوَكَّلُ عَلٰى رَحْمَتِيْ

অন্য সকলে তো ভরসা করে তাদের আমলের ওপর। আর এই গুনাহগার বান্দা ভরসা করে আমার রহমতের ওপর।

وَاَنَا لَا اُخَيِّبُ عَبْدًا اِتَّكَلَ عَلَيَّ لَاَنِّيْ قُلْتُ ■ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

আমার রহমতের ওপর যে-বান্দা ভরসা করবে, আমি তাকে ব্যর্থ ও নাকাম করি না। কারণ, আমি বলেই দিয়েছি, যেব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। তো আমল নেক বটে; কিন্তু তার সাথে আল্লাহর সেই রহমতের কী তুলনা হয় বলুন। তাই আসুন, আজ থেকে আমরা আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করি। আল্লাহর রহমতের দিকে তাকিয়ে আমাদের গুনাহ মাফ করিয়ে নিই। এটি কি অসম্ভব যে, আল্লাহ আমাদের ডাকের জবাবেও বলবেন, লাব্বাইক, লাব্বাইক, লাব্বাইক। বান্দা! আমি আছি, বান্দা! আমি আছি, বান্দা! আমি আছি।

মুনাজাত

আল্লাহ আমাদের বুঝ দান করুন, যেন আমরা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করি, নেকের পথ ধরি, সত্যের পথে আসি, একটি নতুন সুন্দর পবিত্র জীবনের সূচনা করি। আমরা মজবুতভাবে প্রতিজ্ঞা করি, আর গুনাহ করব না, আর অন্যায় করব না।

يَا رَبِّ اِنْ عَزُمَتْ ذُنُوْبِيْ كَثِيْرَةً

হে আল্লাহ! যদিও আমার গুনাহ অনেক

فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِاَنَّ عَفْوَكَ اَعْظَمُ

আমি তো জানি, তোমার ক্ষমা করার গুণ অনেক বড় ও বিশাল।

اِنْ كَانَ لَا يَرْجُوْكَ اِلَّا مُحْسِنٌ

হে আল্লাহ! যদি তোমার ওপর নেক বান্দারা ছাড়া আর কেউ আশা রাখতে না পারে,

فَمَنِ الَّذِیْ یَرْجُوْ وَیَدْعُوالْمُجْرِمُ

তাহলে গুনাহগার হতভাগারা কাকে ডাকবে হে মাওলা!

مَالِیْ اِلَیْكَ وَسِیْلَةٌ اِلَّا الرَّجَاءُ

হে আল্লাহ! আমার তো এই আশাটুকু ছাড়া আর কোনো উসিলা নেই।

وَجَمِیْلُ عَفْوِكَ وَاَنِّیْ مُظْلِمٌ

তোমার ক্ষমা করার পদ্ধতি বড় সুন্দর আর আমি আঁধারে ডুবে আছি।

আরেকটি কথা হচ্ছে, আমি কালেমা পড়েছি। হে আল্লাহ! এই কালেমার দাবিটুকু আপনি রক্ষা করুন। তো আজকের এই মাহফিলে পেছনের সমস্ত গুনাহ থেকে মাফ চেয়ে, সামনের জন্য সত্য তাওবা করে মনে-মনে এই ইরাদাহ করুন, এই অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা করুন যে, হে আল্লাহ! গুনাহ থেকে আমাদের রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! তোমার থেকে আর কত কাল দূরে থাকব। কত দিন আর তোমার নাফরমানি করতে থাকব। আমার মাওলা! নেকের সূরতে আর কতকাল খারাপ কাজে লিপ্ত থাকব? গুনাহ আর যেন না হয়, গুনাহের আগেই যেন মৃত্যুর ডংকা বেজে ওঠে। হে আল্লাহ! আমাদের তাওবা করার তাওফীক দান করুন। আজকের এই মাহফিলে আমরা আপনার সাথে অঙ্গীকার করছি, আপনি তো গুনাহগারের ডাকে তিনবার সাড়া দেন। আজ আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিন। আমরা আর গুনাহ করব না। নফ্স ও শয়তানের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! আমাদের আপনার আনুগত্য করার তাওফীক দান করুন। নেককার বান্দাদের মধ্যে শামিল করে নিন। নতুন এক ঈমানি, ইসলামি ও কুরআনি জিন্দেগি গড়ার তাওফীক আমাদের দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ.

ওলামায়ে কেরামের প্রতি হৃদয়গ্রাহী দিকনির্দেশনা

'তবে একথাটা মাথায় রাখবে যে, আলেমের শান ও মান অনেক বটে; তবে যদি কারও ইল্‌ম অর্জিত হলো; কিন্তু সে আমল করল না, তাহলে সে কুরআনের এই ঘোষণার লক্ষবস্তু হয়ে যাবে–

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا

'সে গাধার মতো, যে বোঝা বহন করে বেড়ায়!'

তাই আমল অত্যন্ত জরুরি বিষয়। এই আমলের জযবা তৈরির লক্ষ্যেই আজকের এই মজলিস। আমল বিনে ইল্‌ম তো আপনাদের কাছে অনেক আছে। তো জযবাটা পয়দা হবে কীভাবে? এই অগ্নি কীভাবে প্রজ্বলিত হবে? এই মজলিস দ্বারা ইন্ধন তৈরি হয়। আমলের জযবা জ্বলে ওঠে। ভেতরে অস্থিরতা আসে। ইল্‌ম তো ওই নূর, যা অর্জিত হওয়ার পর তার ওপর আমল না করা পর্যন্ত প্রশান্তি আসে না। ইল্‌ম মানুষকে অস্থির রাখে। তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইহুদি আলেমদের ব্যাপারে বলেছেন–

لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

"যদি তারা জানত।"'

ওলামায়ে কেরামের প্রতি হৃদয়গ্রাহী দিকনির্দেশনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

কুরআনের দৃষ্টিতে ইলমের গুরুত্ব

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত ইরশাদ করেছেন–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ

'আপনি বলে দিন, ইল্মসম্পন্ন ব্যক্তি আর ইল্মবিহীন ব্যক্তি কি সমান?'[১]

আয়াতে তিনটি শব্দ আছে। এই শব্দগুলো নিয়ে গবেষণাধর্মী আলোচনা এবং এর মর্ম উদ্ঘাটনে কিছু কথা আরজ করব।

প্রথম আলোচনা قل শব্দ নিয়ে। قل অর্থ হে নবী! আপনি বলে দিন। দেখুন, রাজ্যের শাসকের পক্ষ থেকে যদি কোনো ফরমান জারি হয়, তাহলে তার নির্দেশনা প্রচারের একটি সুনির্দিষ্ট ধরন থাকে। বিচারকের ঘোষণা প্রচারেরও একটি নির্দিষ্ট ধরন থাকে। আগে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা

---

১. সূরা যুমার : আয়াত ৯

করত, এটি নগরপতির ফরমান। এটি বাদশাহর ফরমান। এভাবে ঘোষণাকারী নগরপ্রশাসক বা বাদশাহর ঘোষণা প্রচার করে।

তো দেখুন, নগরপতির এলান এক রকম, বিচারকের এলান এক রকম আবার বাদশাহর শাহি এলান ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আর কোরআনে যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো একটি খাস বিষয়ের এলান করতে চান, তখন আপন হাবীব প্রিয়তম হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেন قُلْ শব্দ বলে এবং বলে দেন, হে রাসূল! আপনি বলুন। তো কোনো হুকুমের পূর্বে قُلْ শব্দ ব্যবহার হলে বোঝা যায়, হুকুমটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বোঝা যায়, শাহেনশাহে আলমের শাহি ফরমান এটি। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা قُلْ শব্দ প্রয়োগ করে হুকুম দিচ্ছেন, বলুন হে রাসূল! এখানে গুরুত্ব বোঝাতে قُلْ ব্যবহার করা হয়েছে।

আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় শব্দটি হলো هَلْ। هَلْ শব্দটি প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহার হয়। আল্লামা তাফতাযানি (রহ.) লিখেছেন, অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন মাঝেমাঝে উল্টো ধমক দেওয়ার জন্য এবং সতর্ক করার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। এখানে যেন যে আলেম ও জাহেলকে এক মনে করে, তাকে ধমক দেওয়া হচ্ছে। তাদের শক্ত করে বলা হচ্ছে, তোমরা তো বোঝ না। আলেম আর জাহেল কোনোদিনই এক নয়। মূর্খ আর শিক্ষিত এক নয়। যেমন এক নয় আলো আর আঁধার।

আলোচনার তৃতীয় শব্দটি হচ্ছে يَعْلَمُوْنَ। এখানে বলা হয়নি কোন ধরনের ইলম! এজন্য উল্লেখ করা হয়নি যে আলেম কাকে বলে সে কথা সকলেরই জানা আছে। এটি স্বতঃসিদ্ধ কথা। যেমন ধরুন, কেউ টুপির কথা বলল। সকলেই শোনামাত্র বুঝে ফেলে টুপি মাথায় পরিধানের জিনিস। কেউ জুতা বলল। সাথে-সাথেই মানুষ বুঝে ফেলে, জুতা এমন একটি জিনিস, যা পায়ে পরিধান করা হয়।

দেখুন, টুপি জুতা এসব শব্দ নিজেই নিজের অর্থ ও মর্ম বুঝিয়ে দেয়। তেমনিভাবে عِلْمٌ শব্দটিই বলে দেয়, عالم আলেম দ্বারা উদ্দেশ্য দীনের বিষয়ে আলেম। ইল্‌মে দীনের আলেম। দীন সম্পর্কে প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী। একথা স্পষ্ট যে, দুনিয়াবি ইল্‌মে পারদর্শী হওয়া সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যাতের নিকট ইল্‌ম নয়। এমন শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর নিকট জ্ঞানী-ই নয়। তার জ্ঞান জ্ঞানই নয়। ইরশাদ হচ্ছে–

وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٦ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

'কিন্তু অনেক মানুষই জানে না। তারা শুধু দুনিয়ার বাহ্যিক বিষয়ই জানে।'[১]

এখানে 'অনেক মানুষই জানে না' বলে আবার বলা হলো তারা শুধু দুনিয়া জানে। দুনিয়াবি বিষয় জানার নাম ইল্‌ম নয়। তো বোঝা গেল, ইল্‌ম দ্বারা ইল্‌মে দীন উদ্দেশ্য। অর্থাৎ– যাকে আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যাত ইল্‌মে দীন দান করেছেন, সে আলেম তথা জ্ঞানী। আর যে ইল্‌মে দীন পেল না, আল্লাহর মতে সে জ্ঞানী নয়। আর আলেম ও জাহেল এক নয়, সমান নয়। যেমন আলো আর আঁধার সমান নয়। তেমনি আলেম আর জাহেল সমান নয়। ইল্‌ম হলো আলো ও জ্যুতি। আর জাহালাত হচ্ছে অন্ধকার। তো জাহালাত কেমন করে ইল্‌মের সমান হবে? ইল্‌মে দীনের গুরুত্বের ব্যাপারে এই আয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ অকাট্য দলিল। আয়াতটি দ্বারাই কেয়ামত পর্যন্ত ইল্‌মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এমনকি পরিচয়ও জানা যায়।

ইল্‌ম অর্জনের গুরুত্ব হাদীছের ভাষায়

হাদীছ শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে কুরআনুল কারীম শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।'

তো হাদীছটিতে শিক্ষা করাকে শিক্ষা দান করার আগে উল্লেখ করা হয়েছে। শেখার কথা আগে বলা হয়েছে। তারপর বলা হচ্ছে শেখানোর কথা। এর নানারূপ আলোচনা আছে।

এক. বাস্তবতার ক্ষেত্রে বিষয়টির কয়েকটি দিক ও ধারাবাহিকতা এমনই। অর্থাৎ– আগে নিজে শিখতে হয়, তারপর অপরকে শেখাতে হয়। এই ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ রেখেই হাদীছে পাকে আগে শেখার কথা এবং পরে শেখানোর কথা আনা হয়েছে।

দুই. হাদীছের মর্মের প্রতি লক্ষ করলে আমরা সুস্পষ্টভাবে একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার দেখতে পাই। হাদীছে বলা হয়েছে, خَيْرُكُمْ কল্যাণের দিক থেকে উত্তমের দিক থেকে মুতাআল্লিম তথা শিক্ষা গ্রহণকারী মুআল্লিম তথা শিক্ষক

---

১. সূরা রূম : আয়াত ৬, ৭

থেকে উত্তম হয়ে থাকে। কীভাবে শিক্ষক থেকে ছাত্র উত্তম হতে পারে? দেখুন, মুআল্লিম শিক্ষা প্রদান করে বেতন-বিনিময় সামান্য হলেও পায়। তার জন্য স্বাধীনতা থাকে, শিথিলতা থাকে। কিন্তু তালেবুল ইল্‌মের জন্য নানারূপ কঠোরতা থাকে, বাধ্যবাধকতা থাকে, নিয়মনীতি থাকে এবং শিক্ষা গ্রহণ করে ছাত্র বেতন ইত্যাদি পায় না। অথচ দীন বাকি রাখা ও রক্ষা করার ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক উভয়েরই কষ্ট করতে হচ্ছে। ওস্তাদ বেতন ইত্যাদি পাচ্ছেন। ছাত্র কিছুই পাচ্ছে না। তার কোনোই প্রাপ্তি নেই।

তিন. শিক্ষককে সফর করতে হয় না। ছাত্রই সফর করে শিক্ষকের নিকট গমন করতে হয়। (এটি আগের যুগের হিসাব)। কখনও এই ওস্তাদের নিকট যেতে হয়, কখনও অন্য ওস্তাদের কাছে গমন করতে হয়। কখনও এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে হয়, কখনও অন্য প্রতিষ্ঠানে যেতে হয়। ওস্তাদগণ প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান থাকেন। সফরের কষ্ট শিক্ষাগ্রহণকারীদেই বেশি হয়ে থাকে। তাই আল্লাহর দৃষ্টিতে তালেবুল ইল্‌ম বা ছাত্রের ফজিলত বেশি। তাই তো তার আলোচনাটা আল্লাহ তা'আলা আগে এনে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, কোনো কিছু না পেয়েও দীনের মেহেনতকারী ছাত্র বিনিময়ের মাধ্যমে মেহনতকারী শিক্ষক হতে উত্তম।

চার. ইল্‌মের মর্যাদা উঁচু আল্লাহর দরবারে। আর এই ইল্‌ম অর্জন করতে থাকতে হয় সারাটা জীবন। নবীজি বলেছেন–

এসব হাদীস নয় ১/৮০ اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

'তোমরা দোলনা থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত ইল্‌ম অর্জন করো।'[১]

চার. এমনটি কোনো দিন হবে না যে, কোনো বান্দা দাবি করতে পারবে, আমার সকল ইল্‌ম অর্জিত হয়ে গেছে। বরং আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যাত তো আপন প্রিয় হাবীবকে বলেছেন–

قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

'বলুন, হে আমার রব! আপনি আমার ইল্‌ম বাড়িয়ে দিন।'[২]

---

১. ওলামায়ে উম্মতের তাহকীকমতে উল্লিখিত বাক্যটি হাদীছ নয়। এটি বড় কোনো মনীষীর বাণী। একে উলূমুল হাদীছের পরিভাষায় হাদীছে মাওযূ' বলা হয়। বাক্যটি দ্বারা সারা জীবন ইল্‌ম অর্জন করতে থাকার কথা বলা হয়েছে। (অনুবাদক)

২. সূরা ত্বহা : আয়াত ১১৪

এতেই তো বোঝা যায়, ইল্‌মের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। ইল্‌ম অর্জন করো; যতই থাকুক আরও করো। আরও বৃদ্ধির দু'আ করতে হবে। সারাটা জীবনই মানুষ ইল্‌ম অন্বেষণে মগ্ন থাকতে হয়। ইল্‌ম বাড়ানোর এই আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক তালেবুল ইল্‌মেরই থাকা দরকার। প্রত্যেকের চেতনা এমন হওয়া দরকার যে, আমার ইল্‌ম বৃদ্ধি পেয়ে যাক। বিস্তারিতভাবে কথাটি হাদীছে এভাবে এসেছে–

مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ

'দুই ক্ষুধার্ত কোনোদিন পরিতৃপ্ত হয় না।'

এক. তালেবুল ইল্‌ম! যে ইল্‌মের অন্বেষায় মগ্ন।

দুই. তালেবে দুনিয়া, যে দুনিয়া কামাইয়ে মত্ত।

উভয়ে কিন্তু ক্ষুধার্ত। অর্জনের নেশায় দুজনই সমান। কিন্তু একজন দুনিয়ার অর্জনে, আরেকজন ইল্‌ম অর্জনে পরিতৃপ্ত হবে না। যার ইল্‌ম যত বেশি, সে আরও অর্জনের তরে নিবেদিত থাকবে। আর যার সম্পদ যত বেশি, সে আরও কামানোয় মত্ত থাকবে। এটিই তাদের ধর্ম। ইল্‌মের পিপাসু হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.)-এর বহু আশ্চর্য ঘটনা আছে। তিনি অন্তিম প্রহরে যখন ডাক্তার তাকে উঠে বসতেও নিষেধ করে দিয়েছে, সে-সময়ও কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও হাদীছের কিতাব অধ্যয়ন করার মধ্যে মগ্ন ছিলেন। তাঁর এক ছাত্র বলতে লাগল, এত কষ্টের সময় যখন ডাক্তার আপনাকে উঠতে নিষেধ করে দিয়েছেন, এমন সময়ও আপনার কি দরস আছে যে, এখন অধ্যয়ন করতে হবে? কোন বিষয় আছে, যেটি আপনার অজানা? আমরা ছাত্ররা কেন আছি। আমাদের বলুন, আমরা আপনাকে সে বিষয়টি পড়ে শোনালেই তো হয়।

জবাবে হযরত কাশ্মিরি (রহ.) আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানিকে বললেন, তেমন কোনো জটিল বিষয় তো নেই, যা খুঁজে ফিরতে হবে। কিন্তু ইল্‌মের যে পিপাসা আমাকে অস্থির রাখছে, তা কাকে বোঝাব বলুন?

তো বন্ধুগণ! ইল্‌মের পিপাসা এমন, যা সারা জীবনেও মেটে না। যে মজা পেয়ে যায়, যে স্বাদ পেয়ে যায়, সে আর ছাড়তে পারে না। দেখুন, লোভ কিন্তু নিষিদ্ধ। কুরআন-হাদীছে লোভকে একটি ঘৃণিত অভ্যাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তবে তা দুনিয়া অর্জনের ক্ষেত্রে। ইল্‌মের ক্ষেত্রে, আখেরাত অর্জনের ক্ষেত্রে লোভ সম্পূর্ণভাবে জায়েয। বরং তা তখন প্রশংসনীয় একটি গুণে পরিণত হয়।

তো দুজন লোভী এমন আছে যে, তাদের মন কখনও ভরে না। তাদের মধ্যে একজন ইল্‌মের লোভী। এ-ক্ষেত্রে বান্দাকে বরং প্রতিযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে–

وَفِيْ ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ

'এ-ক্ষেত্রে যেন প্রতিযোগিতাকারীরা প্রতিযোগিতা করে।'[১]

তো সম্মানিত হাজিরীন! এটি চিন্তা ও লক্ষ করার মতো বিষয়। আরেকজন দুনিয়ার লোভী। এ-ক্ষেত্রে তাকে তিরস্কৃত করা হয়েছে।

ইল্‌ম বৃদ্ধি করার দুটি পথ

এখন মাথায় একটি প্রশ্ন জাগে যে, ইল্‌ম বৃদ্ধি করাকে যেহেতু আল্লাহ তা'আলা পছন্দই করেন, তো ইল্‌ম বৃদ্ধি হবে কীভাবে? কোন পথে কোন পদ্ধতিতে আমাদের ইল্‌ম বৃদ্ধি পাবে? সুধী! ইল্‌ম দুইভাবে বৃদ্ধি পায়।

১. অধিক অধ্যয়ন ও পড়াশোনার মধ্যমে। অধ্যয়ন ও পড়াশোনা যত বেশি হবে, ইল্‌মও তত বৃদ্ধি পাবে।

২. অধিক আমলে সালেহের কারণেও ইল্‌ম বৃদ্ধি পায়।

তো অধিক অধ্যয়ন এবং অধিক আমল করার মধ্যেই ইল্‌ম বৃদ্ধি পায়। তবে দুয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। অধিক আমলে সালেহের কারণে যে-ইল্‌ম হয়, তাতে গভীরতা থাকে অনেক বেশি। গভীরতা হয় সমুদ্রের। আপনি হয়তো দেখে থাকবেন, সমুদ্রের বিশালতা হাজার মাইল। এমনকি তারও অনেক বেশি। মাপা যায় না এত বেশি। আর গভীরতা? হ্যাঁ; সমুদ্রের গভীরতাও অনেক। তো যে অধিক আমলে সালেহ করবে, তার ইল্‌মে গভীরতা বৃদ্ধি পাবে। তার জ্ঞানসমুদ্র সমান হয়ে যাবে। আর অধিকহারে অধ্যয়ন করার দ্বারাও ইল্‌ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তবে এই ইল্‌ম বিস্তৃত হয় বেশি, এর প্রাপ্তি বেশি। একে তাফাক্কুহ বলা হয়। তাফাক্কুহ মানেই বিস্তৃত ইল্‌মের অধিকারী হওয়া।

فَتَّخِذُوْا الْعِلْمَ

সাহাবাগণ ইল্‌মে পারদর্শী ছিলেন। তাঁদের এই পারদর্শিতা ছিল আমলের বরকতে। তাঁরা আমলের মাধ্যমে অর্জন করেছেন গভীর ইল্‌ম।

---

১. সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত ২৬

তুমি যদি দীর্ঘ অধ্যয়নের পাশাপাশি নেক আমলও করে যাও অধিকহারে, তাহলে কি তুমি উভয় প্রকার তথা গভীরতা ও প্রসারতাসম্পন্ন হতে পারবে না? পারবে। অবশ্যই পারবে। তাই বলছি ভাই! আজই শুরু করো! ইল্‌মও অর্জন করো, সাথে-সাথে সেই অনুসারে আমলও করতে থাকো।

তাফাক্কুহ্ ফিদ্দীন কীভাবে আসবে

একব্যক্তি হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)কে প্রশ্ন করল, এক আলেম যখন মারেফাতের কোনো কথা বলে, তাহলে কখনো ঠিক হয় আর কখনো ভুল হয়। আর হাজী সাহেব (রহ.) যখন কোনো কথা বলেন, একেবারে পাকাপোক্ত কথা বলেন। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বললেন, দেখুন, আমাদের মাথায় সর্বপ্রথম ভূমিকা অবতীর্ণ হয়। তো আমরা সেই ভূমিকার আলোকে ফল বের করে তারপর কথা বলি। কখনও সেই ফল সঠিক হয়, কখনও হয় সঠিকের কাছাকাছি। হাজী সাহেবের অন্তরে আগেই ফল অবতীর্ণ হয়। তাই সেই ফল কথাটির দলিল খোঁজা তাঁর পক্ষে কঠিন হয় না। তাই তাঁর কথা পাকাপোক্তই হয়ে থাকে। একেই বলা হয় تفقه فى الدين তাই তো ফোকাহায়ে কেরাম এমন ছিলেন যে, তারা শরীয়তের মেজাজ বুঝতেন। তাঁদের তবীয়ত ও স্বভাব আল্লাহ তা'আলা এমন বানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা শরীয়তের মেজাজ বুঝতে পারতেন। তাই তাদের জন্য হাদীছ থেকে মাসআলা বের করা অনেক সহজ ছিল। এই কাজটা সকলেই করতে পারে না। একজনের মধ্যে ইল্‌মের বিস্তৃতি বেশি থাকে। আরেকজনের মধ্যে বেশি থাকে গভীরতা। আর যদি উভয়টাই থাকে– অধ্যয়নের বিস্তৃতিও থাকে, সাথে-সাথে নেক আমলও থাকে, তাহলে তো আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রভূত কল্যাণে ধন্য করবেনই। অপার নেয়ামতে আকীর্ণ করবেন তার জীবন।

ইল্‌ম অর্জনের সুন্দর পথ

এই উভয় নেয়ামত অর্জিত হবে যদি সযত্নে সুন্দরভাবে ইল্‌ম অর্জন করা হয়। ইল্‌মের অন্বেষণ যত বেশি হবে, ইল্‌ম বৃদ্ধি পাবে তত বেশি। আপনি নিশ্চয় ফোম দেখেছেন। যদি ফোম পানিতে ফেলা হয়, তাহলে সে পানিকে শুষে নেয়। তার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পানি পৌঁছে যায়। তালেবুল ইল্‌মকে স্পঞ্জ তথা ফোমের মতো হওয়া চাই। তালেবুল ইল্‌ম তার ওস্তাদ ও বুযুর্গানে দীন থেকে সকল ইল্‌ম শুষে নেবে। যে-বান্দার পিপাসা যত বেশি হবে, তার ইল্‌মের তলবও তত বেশি হয়। তো তালেবুল ইল্‌ম যে-ই হবে, সে সময় নষ্ট হতে

দেবে না। এদিক-ওদিক অপ্রয়োজনীয় কাজে সে সময় নষ্ট করবে না। ইল্‌মের প্রতিই সে নিবিষ্ট থাকবে। ইল্‌ম ছাড়া অন্য কোনো কাজে সে লিপ্ত হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেছেন–

اَلْعِلْمُ لَا يُعْطِيْكَ بَعْضَهٗ حَتّٰى تُعْطِيَهٗ كُلَّكَ

'তুমি যদি পূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে না দাও, তা হলে ইল্‌মের সামান্যও তোমাকে দেওয়া হবে না।'

তাই ইল্‌মের তরে, ইল্‌মের পথে সর্বদাই তোমাকে লেগে থাকতে হবে। মানুষ যখন কোনো একটি বিষয়ে মগ্ন থাকে, তাহলেই সে তাতে সফল হবে। তো যখনই আত্মমগ্নতা থাকবে, তখনই সাফল্য আসবে।

দেখো, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর ছেলে মারা গেছে। ছেলেকে গোসল দেওয়া হলো। জানাযা হতে কিছু সময় বাকি ছিল। তিনি তার ভাই ও বন্ধুদের বললেন, আপনারা জানাযা পড়ে নিন। কারণ, আমি এই সময়টিতে ইমাম আবু হানীফার কাছে ইল্‌মের দরসে যাই। আমি দরস কাজা দিতে চাচ্ছি না। তাঁর আত্মীয়রা জানাযা পড়ে নিলেন। তাঁর চোখে অশ্রু ছিল। কিন্তু তারপরও ইল্‌মের দরসে উপস্থিত হয়েছেন। ইমাম আযমের দরস তিনি কাজা করেননি।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর দিকে তাকাও। আন্দালুসের এক ছাত্র ছিল তাঁর। নাম তার ইয়াহয়া ইবনে ইয়াহয়া আন্দলুসি। আল্লাহর কী যে শান! কেউ একজন মদিনায় হাতি নিয়ে এল। কারণ, মদিনা এলাকায় হাতি নেই। লোকদের জন্য তো এটি এক নতুন ব্যাপার। এটা দেখার জন্য সকলে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল। ইমাম মালেক (রহ.)-এর সকল শাগরেদ বের হয়ে গেল। তিনি ইয়াহয়াকে বললেন, তুমি গেলে না হাতি দেখতে? তিনি বললেন, হযরত! আমি এখানে হাতি দেখতে আসিনি। আমি তো আপনার নিকট ইল্‌ম অর্জন করতে এসেছি। ইমাম মালেক (রহ.) এত খুশি হলেন যে, তার নাম রেখে দিলেন আকেল আন্দালুসি। তো তোমার তলব ও অন্বেষণের নেশা যখন এমন হবে, তখন তোমার অধিক ইল্‌ম নসিব হবে। আল্লাহ তোমাকে ইল্‌ম দান করবেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) ইমাম আযমের মজলিসসমূহ থেকে কত ইল্‌ম অর্জন করেছেন! একটি কিতাব তিনি লিখেছেন, যার নাম সিয়ারে কাবীর। এক ফিরিঙ্গি এই কিতাবটি পড়েছিল।

পড়ার পর বলল–

هٰذَا مُحَمَّدُكُمُ الصَّغِيْرُ فَكَيْفَ يَكُوْنُ مُحَمَّدُكُمُ الْكَبِيْرُ

'এই যদি হয় তোমাদের ছোট মুহাম্মাদ, তাহলে তোমাদের বড় মুহাম্মাদ কেমন!'

মেহনত করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে

তো আল্লাহ বান্দাকে এত ইল্‌ম দান করেন। কিন্তু এর জন্য মেহনত করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে।

بِقَدْرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِيْ ■ وَمَنْ طَلَبَ الْعُلٰى سَهِرَ اللَّيَالِيْ

تَرُوْمُ الْعِزَّ ثُمَّ تَنَامُ لَيْلًا ■ يَغُوْصُ الْبَحْرَ مَنْ طَلَبَ اللَّآلِيْ

'পরিশ্রম অনুপাতে মর্যাদার আসবে। তুমি যদি বড় হতে চাও, তাহলে রাতের ঘুমকে তোমার হারাম করতে হবে।

কামনা করবে উচ্চ মর্যাদা আর সারা রাত ঘুমিয়ে থাকবে এ তো হতে পারে না। যদি মুক্তা আহরণ করতে চাও, তা হলে তোমাকে সমুদ্রে ডুব দিতেই হবে।'

মেহনত দ্বারাই আল্লাহ তা'আলা এই নেয়ামত দান করেন। এখানে একটি সূক্ষ্ম কথা শুনুন। ইল্‌মের জন্য নত হতে হবে। ইল্‌মের সামনে নত হয়ে বসতে হবে। ইল্‌মের সামনে নিজের আগ্রহ নিজের চাহিদা ও অন্বেষণের আকুতি প্রকাশ করতে হবে। এ তো হতে পারে না যে-

اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ

' তোমাদের ইচ্ছার বাইরে আমি তোমাদের বাধ্য করব নাকি?'[১]

হেদায়াতের ফয়সালা আমি তোমাদেরই সাথে সম্পৃক্ত করে দিলাম। তোমাদের হৃদয়কে আমি ইল্‌মের দ্বারা পূর্ণ করে দেব; অথচ তুমি তা অপছন্দ করবে এটা হতে পারে না। তাই তো ইল্‌ম পেতে হলে ওস্তাদের জুতা সোজা করতে হয়।

---

১. সূরা হূদ : আয়াত ২৮

ইল্‌ম অর্জনের তাওফীক পেতে হলে দুটি জিনিস প্রয়োজন

এখানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দুটি বিষয় আছে। বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হতে হবে। এতে দ্রুত ইল্‌ম পাওয়া যাবে।

১. আদব : একটি বিষয় হচ্ছে আদব। এই আদব দ্বারাই ইল্‌মের ভাগিদার হওয়া যায়। তো যে-বান্দা চায়, আমার অধিক অধ্যয়ন ও নেক আমলের তাওফীক অর্জিত হোক, সে যেন আদবের প্রতি যত্নবান হয়, আদবের প্রতি লক্ষ রাখে। এতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে আমলের তাওফীক দান করেন।

হযরত মুফতী কেফায়েতুল্লাহ (রহ.) দরস দিচ্ছিলেন। তিনি ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন বলো তো হযরত কাশ্মিরি আল্লামা কাশ্মিরি কী করে হয়েছেন? তো কেউ বলল, তিনি কুরআনের তাফসীর ভালো জানতেন। কেউ বলল, তিনি হাদীছে পারদর্শী ছিলেন। এভাবে একেকজন একেকটা কারণ উপস্থাপন করল এবং বলল, এই কারণে তিনি বড় জ্ঞানী-গুণী হয়েছেন। কিন্তু হযরত মুফতী কেফায়েতুল্লাহ (রহ.) বললেন, কেউ একজন এই প্রশ্নটিই হযরত কাশ্মিরিকেই জিজ্ঞেস করেছিল। বলেছিল, আপনি এমন বড় আলেম কী করে হলেন? তখন কাশ্মিরি (রহ.) জবাবে বলেছিলেন, আমি আদবের কারণে বড় হয়েছি। আমি ওস্তাদগণের আদব করতাম, কিতাবের আদব করতাম। এমনকি যেকোনো ইল্‌মি জিনিসের আদব করতাম। আমি কখনো অজু ছাড়া ইল্‌মি কিতাবে হাত দেয়নি। আমি এত আদব করতাম যে, যখন বোখারি শরীফ অধ্যয়ন করতাম, তখন হাশিয়া এলে, বাঁকা টীকা এলে আমি নিজে ঘুরে সেটি পড়তাম। আমি কখনও কুরআন মাজীদের ওপর হাদীছের কিতাব রাখিনি। হাদীছের কিতাবের ওপর ফিকহের কিতাব রাখিনি। ফিকহের ওপর ইতিহাসের কিতাব রাখিনি। আমি কিতাব রাখার ক্ষেত্রেও মানের দিকটা বিবেচনা করতাম। তো যখন এমন আদব আমাদের মধ্যে থাকবে, তখন আমাদের দিলও নূরান্বিত হয়ে যাবে।

আদব দ্বারা তাওফীক অর্জিত হয়। আর বেয়াদবির দ্বারা বঞ্চিত হতে হয়। কত-কত ছাত্র এমন আছে, যারা ওস্তাদের খেদমত করার কারণেই কবুল হয়ে গেছে। অথচ তাদের ইল্‌মি যোগ্যতা খুব ভালো ছিল না।

খেদমত সৌভাগ্য এনে দিয়েছে

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর খেদমতে একজন তালেবুল ইল্‌ম ছিল। ছেলেটি মুলতানের সুজাবাদের আশপাশের এলাকার ছিল। হযরত

শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর নিকট সে বোখারি শরীফ পড়ত। হযরতের সাথে তার মহব্বত এমন প্রগাঢ় ও সুগভীর ছিল যে, রাতে যখন সকলে ঘুমিয়ে যেত, ছেলেটি হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর দরজা থেকে দারুল হাদীছের দরজা পর্যন্ত পুরো রাস্তাটি পরিষ্কার করে দিত যে, আমার শায়খ এপথে চলেন; তা পরিষ্কার থাকা চাই।

কখনও মহব্বতের তীব্রতা বেড়ে যেত, যার কারণে নিজের পাগড়ি দ্বারা-ই পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করে দিত। আল্লাহর কী শান যে, একদিন ছেলেটি রাস্তা পরিষ্কার করছিল, ঝাড়ু দিচ্ছিল। তখন ছিল তাহাজ্জুদের সময়। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) বাইরে বের হলেন। ছেলেটাকে দেখে ফেললেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী করছিলে তুমি? ছেলেটি ব্যাপারটা বলল। এতে হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) এত দিনের রহস্য বুঝে ফেললেন। দিল থেকে ছেলেটিকে দু'আ দিলেন। ওস্তাদের এই দু'আ তার সৌভাগ্য হয়ে গেল। দুনিয়াকাঁপানো আলেমে পরিণত হলো সেই ছেলে।

কে ছিল সেই ছেলেটা জান? আজকের গোলাম রাসূল। হ্যাঁ, এই গোলাম রাসূল ছিলেন সেই ছেলে। এত এলেম আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন যে, তিনি পড়াশোনা শেষ করে এসে তাঁর নিজের এলাকায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু গ্রামে তো মাদরাসা চালানো ততটা সহজ ছিল না। গ্রামও ছিল শহর থেকে ৩০ মাইল ভেতরে। এতে ছাত্ররা তাদের সামানা মাথায় নিয়েই ৩০ মাইল পথ পাড়ি দিতে হতো। পায়ে হেঁটে যেতে হতো। গাড়ি ইত্যাদিতে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল না। ৩০ মাইল শহরের দিকে এগুলে তারপর গাড়ির দেখা মিলত। সেই পাড়া গ্রামে তার কাছে তিনশো ছাত্র পড়াশোনা করছে। আজ তো অনেকে বলে, যাতায়াতব্যবস্থা নেই; ছাত্র আসবে না। কী করে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করি। আরে ভাই! ছাত্ররা তো যাতায়াত আর উন্নত ব্যবস্থাপনা অন্বেষণ করে না। তারা অন্বেষণ করে ইল্‌ম। যেখানেই ইল্‌ম আছে, সেখানেই ছুটে যায় তালেবুল ইল্‌ম।

তো গোলাম রাসূলকে আল্লাহ কত ইল্‌ম দিয়েছেন! দেখুন, খাইরুল মাদারিসের বার্ষিক জলসা হচ্ছিল। হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ জলন্ধরি দেশের অন্যতম শীর্ষ আলেম ও শায়খুল হাদীছগণকে দাওয়াত দিয়েছেন সেই জলসায়। দেশের এত বড়-বড় আলেম উপস্থিত ছিলেন। সে-সময় হযরত জলন্ধরি এলান করলেন, শামসুন্নুহাত হযরত মাওলানা গোলাম রাসূল স্টেজে তাশরীফ আনুন। এত আলেমের উপস্থিতিতে তাকে 'শামসুন্নুহাত'

বলা হলো। আল্লাহ তাঁকে এত ইল্‌ম দিয়েছেন যে, তিনি নিজেই বলতেন, যদি শরহেজামী কিতাবটি সমগ্র দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়; একটি কপিও যদি তার বাকি না থাকে আর কোনো ছাত্র আমার নিকট আগমন করে, তাহলে আমি আমার হেফয অনুযায়ী দ্বিতীয়বার এই শরহেজামী কিতাবটি লিখে দিতে পারব।

বন্ধুরা! এটি অর্জিত হয়েছে ওস্তাদের দু'আর বরকতে। অন্য কিছুতে নয়– শুধুই দু'আ। তিনজন নওজোয়ান সাহাবা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে থাকতেন। একজন অন্যজন থেকে একেকটি বিষয় আগ্রসরমান। হাদীছে এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তাদের নাম নিয়ে দু'আ করতাম। আশ্চর্য বিষয় হলো, এই তিনজনেরই নাম আবদুল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইমামুল মুফসসিরীন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইমামুল মুহাদ্দিছীন আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইমামুল ফুকাহা।

একটি সূক্ষ্ম কথা শুনুন। কাবেল, তথা যোগ্য হওয়ার চেষ্টা কমই করো। মাকবুল তথা গ্রহণযোগ্য হওয়ার চেষ্টা বেশি করো। ওস্তাদের দৃষ্টিতে যদি মাকবুল হয়ে যেতে পার, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ইল্‌ম দ্বারা তোমার বক্ষ, তোমার আত্মা ভরে দেবেন, পূর্ণ করে দেবেন।

خرد کے پاس عقل کے سوا کچھ اور نہیں
تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

'জ্ঞানীর কাছে তো জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নেই। তোমার প্রতিকার তো শুধুই বড়দের নেক দৃষ্টির মাঝে।'

آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں
دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں

'কেয়ামতের দৃশ্যাবলি চোখে জমে গেছে; অথচ কোনো একজনের চোখের সামনে দু-চারদিনই তো ছিলাম!'

কারও তত্ত্বধানে দু-চারটা দিন থাকো; তারপরই দেখবে, তোমার ভেতর-বাহির কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। শরীরের যেমন নানারূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, ইল্‌মেরও তেমন নানারকম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। ইল্‌ম অর্জনেরও কয়েকটি অঙ্গ আছে।

দেখুন, আপনার বুদ্ধি-বিবেক থাকে সবার ওপরে। চক্ষু থাকে চেহারার ওপর। কান চেহারার ওপর। জবান চেহারার ওপর। এগুলো ইল্‌ম অর্জনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তো ইল্‌ম অর্জনের অঙ্গগুলোকে আল্লাহ উঁচু জায়গায় স্থাপন করেছেন। আর মজুরির অঙ্গ হাত-পা ইত্যাদিকে নিচের দিকে স্থাপন করেছেন। ইল্‌মের মাঝে আছে উন্নতি, অগ্রগতি ও উচ্চতা। তবে এই উচ্চাসন পেতে হলে প্রয়োজন নত হওয়া, ঝোঁকা। তুমি যত নত হবে, যত বিনয় অবলম্বন করবে, নম্রতা প্রদর্শন করবে, তত বেশি ইল্‌ম প্রাপ্ত হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) একটি আজব কথা বলেছেন–

اَلْعِلْمُ عِزٌّ لَا ذِلَّ فِيْهِ يَحْصِلُ بِذِلٍّ لَا عِزَّ فِيْهِ

ইল্‌ম হলো সম্মান, যার মধ্যে কোনো লাঞ্ছনা নেই। কিন্তু তাকে অর্জন করতে হয় নীচুতা ও হীনতার মধ্যমে, যাতে কোনো সম্মান নেই।

ইল্‌মটা হাসিল হয় নীচু হওয়ার দ্বারা। তার মধ্যে ইজ্জত থাকে না। নত হতে হয়, ঝুঁকতে হয়।

২. **তাকওয়া :** তো ইল্‌ম বৃদ্ধি পাওয়ার একটি পথ তো হচ্ছে আদব, এতক্ষণ যার ব্যাপারে আমরা কথা বলেছি। আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে তাকওয়া। কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ

'তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, তাকওয়াবান হও। আল্লাহ তোমাদের ইল্‌ম বাড়িয়ে দেবেন।'[১]

মারেফাতের এই ইল্‌ম আল্লাহ তা'আলা সিনার মধ্যে ঢেলে দেন। আমাদের জীবনের মাঝে এবং আমাদের আকাবিরে কেরামের জীবনের মাঝে পার্থক্যটা এই জায়গায়। তাদের জীবনে তাকওয়া ভরপুর ছিল। আর আমাদের জিন্দেগী তাকওয়া শূন্য হয়ে গেছে। তাই তো আল্লাহ তা'আলা তাদের বিশেষ সম্মান দান করেছেন। আর আমরা সেই ইজ্জত পাচ্ছি না।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেছেন, মারেফাত তো আমলেরই মিরাছ। তোমার মাঝে হাল সৃষ্টি হবে, মারেফত অর্জিত হবে তখন যখন তোমার মাঝে আমল বৃদ্ধি পাবে।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২৮২

ইল্‌ম দুটি প্রচেষ্টার ফসল

দেখুন, আমল করতে হলে ইল্‌ম জরুরি। ইল্‌মের ওপর আমল নির্ভরশীল। আর ইল্‌ম অর্জিত হয় না দুই প্রকারের মুজাহাদা ও প্রচেষ্টা ছাড়া।

(১) تحصيل علم ইলমের অর্জন।

(২) استعمال علم ইলমের ব্যবহার।

আজকালের ছাত্ররা তাহসীলে ইল্‌ম অর্থাৎ– ইল্‌ম অর্জনের মেহনত তো করে ঠিকই; কিন্তু ইস্তে'মালে ইল্‌ম তথা ইল্‌ম প্রয়োগের মেহনত করে না। আর আজকের এই মজলিস তো এজন্য যে, যেন আমাদের মাঝে ইস্তে'মালে ইল্‌ম তথা ইল্‌ম ব্যবহারের ও প্রয়োগের উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ আমাদের যে ইল্‌ম দান করেছেন, তা বাস্তবায়নের মেহনতে যেন আমরা মগ্ন হয়ে যাই। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে–

كَانُوْا يَتَعَلَّمُوْنَ الْهُدٰى كَمَا يَتَعَلَّمُوْنَ الْعِلْمَ

'তারা যেভাবে ইল্‌ম শিক্ষা করতেন, সেভাবে হেদায়েতেরও শিক্ষা লাভ করতেন।'

তো বোঝা গেল, تحصيل علم তথা ইল্‌ম অর্জন এক রকম মেহনত আর استعمال علم তথা ইল্‌মের ব্যবহার অন্য রকম মেহনত। এই استعمال علم কীভাবে হাসিল হবে? তরবিয়তের মাধ্যমে। আর সেই তরবিয়তের জন্যই আজকের এই মজলিস অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের হৃদয়ে যেন আপন ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। আপন ইল্‌মকে সঠিকভাবে প্রয়োগ ও ব্যবহার করার চেতনা সৃষ্টি হয়। ইল্‌মের ওপর আমল করার উদ্দীপনা যেন সৃষ্টি হয়।

বাতেনি ইল্‌মের বাহক ছিলেন যাঁরা

হযরত কারী তায়্যেব (রহ.) বলতেন, আমরা তো এমন আকাবিরকে দেখেছি যে, তাঁদের নিকট বাহ্যিক ইল্‌ম ছিল না। অথচ তাদের থেকে ইল্‌ম শিক্ষা করেছেন বড়-বড় আকাবিরে কেরাম। ইল্‌মের বড়-বড় পাহাড় যাঁরা তাঁরাও ইল্‌ম শিখেছেন সেই জাহেরি ইল্‌মহীন আকাবিরের নিকট। ব্যাপারটি কীভাবে সম্ভব হলো? হযরত কারী তায়্যেব (রহ.) বলেন, মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.)-এর একজন খাদেম ছিল। তার নাম ছিল আমীর শাহ খান।

ছেলেটির তবিয়ত, মেজাজ ও স্বভাব বেশ নেক ও ভালো ছিল। তার মাঝে তাকওয়া ছিল। তাই তার মুখ থেকে মারেফতি কথা বের হতো। হযরত কাশ্মিরি (রহ.) আকায়েদের মাসআলায় অনেক সময় থমকে দাঁড়াতেন। কারণ, আকায়েদের মাসআলার জন্য অনেক গভীরে প্রবেশ করতে হয়। হযরত কাশ্মিরি (রহ.) বলতেন, আমীর শাহ খানের কাছে চলো। তার কাছে এসে হযরত কাশ্মিরি ব্যাপারটি বলতেন। তার জবান থেকে এমন একটা শব্দ বের হতো, যার দ্বারা হযরত কাশ্মিরি (রহ.) আলো পেয়ে যেতেন।

হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.) একবার বলেছেন, লোকেরা তো হাজী সাহেবের নিকট বাইআত গ্রহণ করে তাঁর তাকওয়ার কারণে। আমি তাঁর কাছে বাইআত গ্রহণ করেছি তার ইল্‌মের কারণে। শ্রোতারা তো হতবাক হয়ে যেত! ভাবত, হযরত কী বলছেন? তারা জিজ্ঞেস করত, হযরত! এটি কীভাবে? তিনি বলতেন, আরে ভাই! হযরত হাজী সাহেব যদিও কাফিয়া পর্যন্ত পড়েছেন; কিন্তু তার যোগ্যতা এমন ছিল যে, মৌলভী মুহাম্মাদ জলন্ধরি সাহেব মেশকাত শরীফের দরস দিচ্ছিলেন। হযরত হাজী সাহেব তাঁর দরসে বসে থাকতেন। একবার জলন্ধরির মছনবি শরীফের একটা শেরের তরজমার মাঝে দ্বিমত হলো। জলন্ধরি বললেন, আমি যা বলছি তা-ই ঠিক। হযরত হাজী সাহেবের তো তর্ক করার স্বভাব ছিল না। তিনি চুপ থাকলেন। তারপর কিছুদিন পর হযরত জলন্ধরি মছনবী শরীফ পড়ানোর সময় সেই তরজমাটা-ই করলেন, যে তরজমা হযরত হাজী সাহেব বলেছিলেন।

হাজী সাহেব তখন কামরায় ছিলেন। তিনি বের হলেন। মুচকি হেসে মাওলানা সাহেবকে বললেন, এখন তো ওই তরজমাটা-ই করলেন যেটা আমি বলেছিলাম। এবার তিনি মেনে নিলেন, আপনি ওই শেরে মর্ম সহীহভাবে বুঝেছেন আমি এখন বুঝেছি।

আকাবিরে দেওবন্দের ইল্‌মি শায়খ মাওলানা মামলূক আলী (রহ.)। ইনি মাওলানা ইয়াকুব নানুতবি (রহ.)-এর পিতা। তাঁকে ওস্তাদুল কুল্ তথা সবার ওস্তাদ বলা হয়। একজন সাধারণ তালেবুল ইল্‌ম ছিলেন। ওস্তাদগণ মনে করতেন, ছেলেটা মনে হয় মেধাবী নয়। সেজন্যেই সবক নাহুতে তার জ্ঞান কাজ করে না। ওস্তাদগণ তাকে ভাগিয়ে দিতেন। আজ এই ওস্তাদের কাছে পড়ে তো কাল পড়ে অন্যখানে। কেউই তাকে পড়াতে চাইতেন না। পরে এমন একটি সময় এল যে, তার মাঝে হতাশা কাজ করল। আমাকে কেউ পড়াতে প্রস্তুত নন! তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন।

এমন হতাশা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে তিনি হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলবি (রহ.)-এর নিকট চলে গেলেন। বললেন, হযরত! আমার অবস্থা তো এমন। শাহ সাহেব বললেন, কাল এসো। তিনি তো ছেলের মধ্যে তলব দেখলেন। অন্বেষণের নেশা দেখলেন। রাতে তাহাজ্জুদে তার জন্য দু'আ করলেন। পরদিন তাকে নাহু-সরফের সবক পড়িয়ে দিলেন। সাথে-সাথে তাকওয়ার তালকীনও দিলেন। এই এক দরসের পর তিনি বলেন, আমি যেখানে যে ওস্তাদের নিকট গমন করেছি, আমি ওস্তাদের চোখের তারায় পরিণত হয়েছি। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এত ইল্‌ম দিয়েছেন যে, হযরত নানুতবি, হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) তাঁর কাছ থেকে ইল্‌ম অর্জন করেছেন।

জানা ও মানার মধ্যে পার্থক্য

যে তালেবুল ইল্‌মের মাঝে তাকওয়া যত বেশি হবে, তার মাঝে ইল্‌মের গভীরতাও তত বেশি সৃষ্টি হবে। আজ তো আমরা শিখি; কিন্তু আমল করি না। তো আমরা ইল্‌ম থেকে ফায়দা নিচ্ছি না। তাই তাকওয়া অবলম্বন করা অত্যন্তজরুরি। কেউ একজন বলেছেন–

فَاِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِىْ فَتِلْكَ مُصِيْبَةٌ

وَاِنْ كُنْتَ تَدْرِىْ فَالْمُصِيْبَةُ اَعْظَمُ

'যদি তুমি না জান, তাহলে এ একটা বিপদ। আর যদি জান, তাহলে তা আরও বড় বিপদ।'

আজ আমরা ওই বড় মসিবতটাতেই পড়ে আছি। আজ তুমি যার সাথেই কথা বলবে, সে-ই বলবে, আমি জানি। আমার জানা আছে। আরে ভাই! জান তো ঠিকই; কিন্তু সেই জানার ওপর আমল কর কতটুকু তা-ই তো দেখার বিষয়। আর আশ্চর্য কথা হলো, কেয়ামতের দিনও জানা কতটুকু ছিল এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন হবে না। প্রশ্ন হবে মানা কতটুকু ছিল তা নিয়ে।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى

'যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে নিল, সে সফলকাম হয়ে গেল।'[১]

قد খানে নিশ্চয়তা বোঝানোর জন্য এসেছে। আর اَفْلَحَ অতীতবাচক শব্দ। আর বাক্যটি হচ্ছে জুমলায়ে ফে'লিয়া তথা কর্মবাচক বাক্য। তো

১. সূরা আ'লা : আয়াত ১৪

দেখুন, বাক্যটিতে আল্লাহর উদ্দেশ্য কী, আমাদের কী করা উচিত ওই দিকে আমাদের ভাবনা যায় না। এখানে আল্লাহ বলেছেন, যে তাযকিয়া অর্জন করল, সে সফলকাম হয়ে গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাযকিয়া অর্জন করতে না পারব, ততক্ষণ আমরা সফল হতে পারব না।

ইল্‌মে ফুরকান লাভ করা

ইল্‌ম একটি জ্যোতি, আলো। ইল্‌ম আলো আর অন্ধকারকে পার্থক্য করে দেয়। সত্য ও মিথ্যাকে পরিচিত করে দেয়। যদি মানুষের মাঝে দ্বিধা তৈরি হয়, সেই দ্বিধায় আশার আলো দেখায় ইল্‌ম। ইল্‌ম Line of demarkation -এর ভূমিকা পালন করে। যেমন– মনে করুন দানশীলতা আর অপচয় দুটি দু-রকম জিনিস। আমরা জানি না, আমরা কি দানশীলতায় আছি, না অপচয়ে আছি। তো এমন অবস্থায় আমাদের সামনে দানশীলতা ও অপব্যয়ের মাঝে কে পার্থক্য স্পষ্ট করবে? হ্যাঁ; ইল্‌ম এই পার্থক্য তুলে ধরবে। তো বোঝা গেল, ভুল ও শুদ্ধতার মাঝে, সত্য ও মিথ্যার মাঝে, ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয় শুধুই ইল্‌ম। তাই ইল্‌মের প্রয়োজন অপরিসীম।

দীনের ইল্‌ম সুরক্ষিত

মাকসাদে এলাহী সুরক্ষিত : আল্লাহর শান দেখুন। ইসলামে ইল্‌ম সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যখন ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন তার মাঝে কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হতো। এমন হতো, যেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো অকেজো হয়ে গেছে। তো এমন হওয়ার কারণ কী? যেন মাকসাদে এলাহী ও ফয়জে মাকসাদে এলাহীর মাঝে মিশ্রণ ঘটে না যায়। হযরত নানুতবি (রহ.)-এর সামনে কেউ একজন বলল, কিছু মানুষ তো ঘুমেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেয়ারাত করে। আবার কেউ জাগ্রত অবস্থায়ই মুশাহাদার মাধ্যমে যেয়ারত করে। তখন হযরত বললেন, উত্তম যেয়ারত হলো যদি ঘুমন্ত অবস্থায় করা যায়। লোকেরা বলল, ঘুমন্ত অবস্থায় উত্তম কেন? তিনি বললেন, জাগ্রত অবস্থায় যে মুশাহাদা হয়, তাতে ক্রিয়াশীল অনুভূতি তো অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর ঘুমন্ত অবস্থায় স্বাভাবিক অনুভূতিটা অকেজো থাকে। তাই ঘুমের মধ্যেই যেয়ারত উত্তম। এভাবে ওহী নাযিলের সময় স্বভাবিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অকেজো করে দেওয়া হয় যেন মুরাদে হক-এর মধ্যে কারও নিজস্ব মুরাদের অনুপ্রবেশ না ঘটে।

কুরআন সংরক্ষিত : এই যে কুরআন! দেখো, এর হেফাযতের জন্য আল্লাহ সংরক্ষণকারী এক বিশাল বাহিনী তৈরি করে দিয়েছেন। একদল অতন্দ্র প্রহরী নিযুক্ত করে দিয়েছেন এর হেফাজতে। এই কারী সাহেবগণ হুরূফে কুরআনের সংরক্ষক। এই ওলামায়ে কেরাম মাআনিয়ে কুরআনের সংরক্ষক। এই মাশায়েখে কেরাম মাআরেফে কুরআনের সংরক্ষক। একে সুরক্ষিত আঁধারে রেখে দেওয়া হয়েছে। এখন কেউ এর শব্দ পরিবর্তন করতে পারবে না। কোনো অর্থ পরিবর্তন করতে পারবে না। তার মর্ম পরিবর্তন করতে পারবে না। কোনো উদ্দেশ্যও পরিবর্তন করতে পারবে না। কেউ কোরআনের কোনো অংশ পরিবর্তন করতে পারবে না। এই ইল্‌ম সুরক্ষিত। অপরিবর্তনীয়। যেভাবে নবীজির সিনা থেকে নিঃসৃত হয়েছে, সেভাবেই আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।

হাদীছ সংরক্ষিত : কুরআনের পর রয়ে গেল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালাম, আমরা যাকে হাদীছ বলি। হাদীছের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা একদম অতন্দ্র প্রহরী নিযুক্ত করে দিলেন। তিনি কিছু রিজালুল হাদীছ (হাদীছের সাধনায় ত্যাগী প্রাণ) সৃষ্টি করে দিলেন, যারা হাদীছের শব্দগুলো হেফাজত করেছেন। এমন একদল ফকীহ সৃষ্টি করেছেন, যারা হাদীছের অর্থ ও মর্মকে সংরক্ষণ করেছেন। তো কালামোল্লাহ শরীফও সংরক্ষিত, আবার কালামে রাসূলও সুরক্ষিত।

ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা সূফীদের থেকেও বহু ওপরের

ওলামায়ে কেরাম তো দীনের মোহাফেজ, দীনের প্রহরী। তাই তাদের মর্যাদাটাও বহু উচ্চে। আল্লাহর দরবারে ওলামায়ে কেরামের বিশেষ স্থান রয়েছে। ওলামায়ে কেরামের খেদমত সূফীদের সাধণা থেকেও উত্তম। কারণ, তাঁরা দীনের সংরক্ষক। যদি উলামা না থাকেন, তাহলে দীনই থাকবে না। আর দীন যদি না-ই থাকে, সূফীরা সাধনা করবে কীসের? সাধনাটা করতে হবে তখন শয়তানের! সূফীদের সাধনাও গুরুত্বপূর্ণ। তবে ওলামায়ে কেরামের খেদমতের গুরুত্ব তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। তাই ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা অন্তরে ধারণ করে রাখা চাই আর মাশায়েখে কেরামের সাথে দিলের মহব্বত রাখা চাই। আজকাল লোকেরা ইল্‌ম থেকে, ওলামায়ে কেরাম থেকে দূরে অবস্থান করে। এটি চূড়ান্ত পর্যায়ের আফসোস ও দুঃখজনক বিষয়। ইমাম গায্‌যালি (রহ.) এমনও বলেছেন যে, ইল্‌মে যাহের অস্বীকারকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব।

وَمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهُ شَيْئًا بِذَوْقٍ فَلَيْسَ يَضْرِبُ حَقِيْقَةَ النُّبُوَّةِ وَخَاصِيَتَهَا

'যার মাঝে ইল্‌মের অভিরুচি অনুপস্থিত থাকবে, নবুওতের হাকীকত বোঝা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

বে-আমল আলেম গাধার মতো

তবে একথাটা মাথায় রাখবে যে, আলেমের শান ও মান অনেক বটে; তবে যদি কারও ইল্‌ম অর্জিত হলো; কিন্তু সে আমল করল না, তাহলে সে কুরআনের এই ঘোষণার লক্ষবস্তু হয়ে যাবে–

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا

'সে গাধার মতো, যে বোঝা বহন করে বেড়ায়!'

তাই আমল অত্যন্ত জরুরি বিষয়। এই আমলের জযবা তৈরির লক্ষ্যেই আজকের এই মজলিস। আমল বিনে ইল্‌ম তো আপনাদের কাছে অনেক আছে। তো জযবাটা পয়দা হবে কীভাবে? এই অগ্নি কীভাবে প্রজ্বলিত হবে? এই মজলিস দ্বারা ইন্ধন তৈরি হয়। আমলের জযবা জ্বলে ওঠে। ভেতরে অস্থিরতা আসে। ইল্‌ম তো ওই নূর, যা অর্জিত হওয়ার পর তার ওপর আমল না করা পর্যন্ত প্রশান্তি আসে না। ইল্‌ম মানুষকে অস্থির রাখে। তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইহুদি আলেমদের ব্যাপারে বলেছেন–

لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

'যদি তারা জানত।'[১]

এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের কাছে ইল্‌ম আছে; কিন্তু যেহেতু তারা ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করছে না, তাই তাদের ইল্‌ম আল্লাহ তা'আলার নিকট ইল্‌মই নয়।

وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ

'অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করছ।'[২]

তাই বোঝা গেল, শুধু ইল্‌মই কামিয়াবির মাধ্যম নয়। শুধু ইল্‌মকে যথেষ্ট মনে করা অনেক বড় ভুল।

---

১. সূরা জুমু'আ : আয়াত ৫

২. সূরা বাকারা : আয়াত ৪৪

মাওলানা রুমি (রহ.) বড় আশ্চর্য কথা বলেছেন–

علم رسمی سر بسر قیل است و قال

نے ازو کیفتے حاصل نہ حال

সাধারণ ইল্‌ম তো হলো قال ও قیل (কী ও কেন?) শিক্ষা করার নাম। এতে না কোনো অবস্থান তৈরি হয়, না কোনো অবস্থা সৃষ্টি হয়।

علم چہ بود آں کہ رہ نمایدت

زنگ گمراہی ز دل .برواید

প্রকৃত ইল্‌ম তাকেই বলা হবে, যা বান্দাকে পথপ্রদর্শন করবে। মানুষটিকে ভ্রান্তি থেকে মুক্তির পথে আনয়ন করবে। হৃদয় থেকে গোমরাহিকে দূর করবে। ইল্‌ম তো তাই-ই যা, অন্তর থেকে গুনাহের কালিমা মুছে দেবে।

ایں ہوسہا از سرت بیروں کند

خوف وخشیت در دلت افزوں کند

ইল্‌ম মূলত এমন একটি নূর যা তোমার মাথা থেকে দুনিয়ার ভাবনাকে দূরে ঠেলে দেবে। আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা তোমার হৃদয়ে ভরে দেবে।

تو ندانی جز بجوز و لا بجوز

خود ندانی کہ حوری یا عجوز

তুমি তো জায়েয-নাজায়েয ছাড়া আর কিছুই জান না। তুমি এ-ও তো জান না যে, তুমি হুর, নাকি বৃদ্ধ।

علم نبود غیر علم عاشقی

ما بقي تلبیس ابلیس شقی

ইল্‌ম তার মাঝে থাকবে না, যার ইল্‌মের প্রতি প্রেম নেই, কামনা নেই, ব্যকুলতা নেই। ইল্‌মের তরে যার ইশ্‌ক নেই, ইল্‌ম নেই, তার ইশ্‌কেরই মর্ম নেই যার, ইশ্‌ক ছাড়া ইল্‌ম ইবলিসের প্ররোচনামাত্র।

علم چوں بر دل زنی یارے بود
علم چوں بر تن زنی مارے بود

হৃদয়ে যখন ইল্‌মের ধারা উৎসারিত হয়, ইল্‌ম তখন তোমর বন্ধু হয়ে যাবে। আর ইল্‌ম যদি তোমার শরীরেই থেকে যায়, অন্তরকে স্পর্শ না করে, তবে তো তা তোমার জন্য ভয়ংকর নাগিন হয়ে যাবে।

তাই তো যে-ইল্‌মের ওপর আমল করা হবে না, তা মূর্খতা বই নয়।

ইল্‌ম অর্জনের পাশাপাশি সেই ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করার প্রেরণা ও উদ্দীপনা অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে। আর আমলেরও মেহনত চালিয়ে যেতে হবে।

ওলামায়ে কেরামকে পথপ্রদর্শন

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)-এর কিছু মালফূযাত আছে, যেগুলো আমি আপনাদের জন্য বাছাই করে রেখেছি। এই মজলিস তো ওলামায়ে কেরাম ও তালাবায়ে ইযামের শিক্ষকদের মজলিস। তাই এখন আমি প্রাণ খুলে কথা বলতে পারি, পারি হৃদয় নিংড়িয়ে, আত্মাকে উজাড় করে নসিহত করতে। চলুন, হজরত থানবি (রহ.)-এর মালফূযাতের আলোকেই এবার আলোচনা করি।

নিজের ভুল মেনে না নেওয়ার রোগ

হযরত (রহ.) বলেছেন, ওলামায়ে কেরামের মাঝে নিজের দোষ মেনে না নেওয়ার রোগ মারাত্মকভাবে বিদ্যমান রয়েছে। দেখুন, একথাটি কে বলছেন? সেই মহান চিকিৎসক, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা ইল্‌মে, আমলে, তাকওয়ায়, তাহারাতে সুউচ্চ মাকাম দান করেছেন। দান করেছেন সর্বদিকের বিশেষ যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা, যাঁকে মুজাদ্দিদে মিল্লাত বা উম্মাহর সংস্কারক বলা হতো। তাঁরই কথা, ওলামায়ে কেরামের মাঝে নিজের দোষ মেনে না নেওয়ার রোগ রয়েছে। কারণ, তারা মান্তেক পড়ছেন আর দলিলের পর দলিল স্থাপন করে যাচ্ছেন নিজের মতের সমর্থনে। যা চাচ্ছেন, যেভাবে চাচ্ছে দলিল প্রদান করছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বলেন, আমার ছাত্রজীবনের ঘটনা। একদিন মেলা হচ্ছিল। আমিও দেখতে গেলাম। এক বুযুর্গ আমাকে পথ আগলে ধরলেন। বললেন, তুমি কেন মেলায় গিয়েছ?

আমি বললাম, হযরত! যে-বান্দা এই নিয়তে যাবে যে, আমি তো আলেম হব, আমার তো জানা থাকা উচিত মেলায় কী হয়? যেন জায়েয-নাজায়েযের ব্যাপারে কথা বলতে পারি। তো এই নিয়তে আমার মেলায় গমন তো জায়েয হয়েছে। তো দেখুন, সাধারণ মানুষ গুনাহ করে নিজেকে গুনাহগার মনে করে। আর আলেম গুনাহ করে গুনাহকে জায়েয মনে করে। কথায়-কথায় দলিল আর Logic প্রয়োগ করে। নিজের কথাকে, নিজের কর্মকে জায়েয সাব্যস্ত করে।

একবার একব্যক্তির সাথে কথা হচ্ছিল। আমি তাকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, দৃষ্টিকে সংযত রাখবার চেষ্টা করা উচিত, দৃষ্টিকে হেফাজতে রাখা চাই। লোকটি বলতে লাগল, হযরত! শরীয়তের হুকুম তো আছেই যে, কাউকে বিবাহ করার নিয়তে দেখা জায়েয আছে। তাই আমি পথ অতিক্রম করার সময় রাস্তার নারীদের দেখতে থাকি বিবাহের নিয়তে। এবার আমি বললাম, আচ্ছা নারীটি যদি অন্য কারও স্ত্রী হয়ে থাকে, তাহলে? তাকে তো বিবাহ করা জায়েয নয়। রাস্তার নারীর ব্যাপারে কী নিশ্চয়তা আছে যে, সে কারও স্ত্রী নয়।

দেখুন, শয়তান আমাদের এমন ফন্দিতে পরিচালিত করছে যে, গুনাহকেই আমরা জায়েয বানিয়ে নিচ্ছি। তো এসলাহের প্রথম কথাটিই হলো, নিজের ভুল স্বীকার করে নেবে এবং এর অভ্যাস গড়ে তুলবে। নিজের ভুল স্বীকার করা মানুষের অভ্যাস, আদম (আ.)-এর গুণ। আর ভুল মেনে না নেওয়া শয়তানের গুণ। যদি আমরা নিজের ভুল মেনে না নিই, তাহলে বুঝতে হবে, আমাদের মাঝে শয়তানি গুণ বিদ্যমান রয়েছে। উঁচু মর্যাদা যদি পেতে হয়, তাহলে নিজেকে শুধরে নিতে হবে। নিজের ভুল মেনে নিয়েই কবরে যেতে হবে। কিছু-কিছু ছাত্র-ওস্তাদের মাঝে এই ব্যাপারটা পরিলক্ষিত হয় বলে আলোচনায় আনলাম।

নিজের এখলাছের পরীক্ষা নিতে থাকবে

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বলেছেন, ওলামায়ে কেরামের উচিত, নিজেই নিজের এখলাছের পরীক্ষা নেবে। যাচাই করবে, আমি এখলাছ নিয়ে কাজ করছি কি-না। আমার রিয়া হয়ে যাচ্ছে কি-না। আমার ইবাদাত মাখলুকের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হয়ে যাচ্ছে কি-না। তো আপনি নিজেই জানেন আপনি কার জন্য ইবাদাত করছেন।

যেমন– কেউ এক মাদরাসা থেকে অন্য মাদরাসায় চলে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই মাদরাসার খাবারদাবার ভালো। এবার তিনি মানুষের মাঝে আগের মাদরাসার দোষ বলে বেড়াচ্ছেন। তাহলে বলো, এখলাছ কোথায়? ভাই! আপনি অন্য মাদরাসায় গেলে একথা বলুন যে, আপনার জরুরত এখানে পূর্ণ হচ্ছে না। যেখানে পূর্ণ হচ্ছে আপনি সেখানে চলে গেছেন। দোষ কেন বলবেন? সেখানকার ওস্তাদদের ব্যাপারে আপনি কটূক্তি করছেন, ছাত্রদের ব্যাপারে কটূক্তি করছেন। তো এত দিন এই মাদরাসাকে পছন্দ করতেন; এখন পছন্দ করছেন না। এখন আপনার এখলাছের পরীক্ষা, আপনার সততা ও নিষ্ঠার পরীক্ষা আপনিই নিন। কেন এখন আপনি এর বিরোধী হয়ে গেলেন? মুখলিস মানুষের আলামত তো হচ্ছে, পূর্বের মাদরাসা থেকে ফায়দা না পেলে তার জন্য দু'আ করতে থাকে এবং নতুন জায়গায় গিয়ে ফায়দা হাসিল করবে। ওলামায়ে কেরামের উচিত, এভাবে চিন্তা করে এখলাছের পরীক্ষা নেওয়া, নিজেই নিজের পরীক্ষা নেওয়া।

সবার সাথে সমান সম্পর্ক বজায় রাখুন

হযরত থানবি (রহ.) আরেকটি কথা বলতেন। ওলামায়ে কেরামের উচিত সবার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা। কারও সাথে একেবারে ফ্রি না হওয়া আবার একেবারে রুক্ষ ও রুঢ় না হওয়া। আল্লামা শামি (রহ.) লিখেছেন, ওলামায়ে কেরাম ও ফোকাহায়ে ইযামের আদালতে সাক্ষ্য না দেওয়া চাই। কারণ, এতে একজন নারাজ হবে আর তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আবার আরেকজন খুশি হবে। এতে সে তোমার সাথে ফ্রি হয়ে যাবে। সবার সাথে তো একই রকম সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। কারণ, ওলামায়ে কেরাম তো সবারই পথপ্রদর্শক। সকলকে পথ দেখাবেন ওলামায়ে কেরাম। তুমি মসজিদের অর্ধেক মুছল্লির ইমাম নও, তুমি সকলের ইমাম। তাই সবার সাথে সমান সম্পর্ক রাখো।

জনসাধারণের অনুগত হয়ে থেকো না

ওলামায়ে কেরামের জনসাধারণের তাঁবেদারি না করা উচিত। এই রোগটা আজকের যুগে অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। দেখুন, ইল্‌মের শান এই নয় যে, আপনি জনসাধারণের তাঁবেদারি করবেন। বরং তারা আপনার আনুগত্য করুক। অনেককে তো দেখা যায়, মসজিদের সভাপতির, কমিটির সদস্যদের জুতা ঠিক করে দেয়। এটা বড় লজ্জাজনক বিষয়। তোমার

ইল্‌মের দাবি এই নয়। তুমি তো এটা করছ এজন্য যে, এর হাতে তোমার বেতন। একরাম তো ভিন্ন বিষয়।

দুনিয়াদারদের থেকে বিমুখ থাকবে

জরুরি একটি বিষয় শুনুন। মনে রাখবেন, যে-আলেম দুনিয়াদারদের থেকে বিমুখ হবে, দুনিয়াদারদের থেকে অমুখাপেক্ষী হবে, আল্লাহ তাকে গায়েব থেকে সাহায্য করবেন। দীনের ব্যাপারে যারা-ই কথা বলবে, আল্লাহ তাদের গায়েব থেকে সাহায্য করবেন। হাঁ; যদি কখনো কোনো দুনিয়াদার তোমার কাছে এসে যায়, তাহলে তাদের একরাম করো।

نِعْمَ الْاَمِيْرُ عَلٰى بَابِ الْفَقِيْرِ

'সবচেয়ে ভালো বিত্তবান সে, যে গরিবের দ্বারে করাঘাত করে।'

বিত্তবান ছিলে, নেতা ছিলে, ক্ষমতা ছিলে নিজের ঘরে। এই লোকটা হেঁটে যখন কোনো আলেমের কাছে এসে ধরনা দেবে, তখন হয়ে যাবে 'উত্তম আমীর'। তাই তারা এলে তাদের একরাম করবে। কথাটি হাদীছেও আছে।

وَاِذَا اَتَاكُمْ كَرِيْمُ الْقَوْمِ فَاَكْرِمُوْهُ

'যখন কোনো সম্মানিত ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে, তখন তাকে সম্মানের সাথে বরণ করে নেবে।'

অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের পিছু পড়বে না

অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের পিছু নেবে না কখনও। ওলামায়ে কেরামের মাকসাদে হায়াত এবং জীবনের আরাধ্য হচ্চে ইল্‌মের সাধনা, ইল্‌মের হেফাজতে নিবেদিত থাকা। ইল্‌ম বিনে এদিক-ওদিক যত কাজ আছে সবই আলেমদের জন্য অপ্রয়োজনীয় কাজ। এসবের পেছনে ছুটবে না। দেখুন, আপনার ঘরে যে-লোকটি পরিচারিকার কাজ করছে, সে যদি তার কাজ না করে নিত্যনতুন পোশাক পরে ফ্যাশন করতে থাকে, তাহলে কি তাকে কেউ কাজে রাখবে? তেমনি ওলামায়ে কেরামের কাজ ইল্‌মের খেদমত। এই খেদমতই আল্লাহ তাঁর জন্য পছন্দ করেন। তাই ইল্‌মের তরেই আপনি নিবেদিত থাকুন।

পবিত্রতার প্রতি যত্নবান থাকতে হবে

ওলামায়ে কেরাম পবিত্রতার প্রতি যথাসম্ভব যত্নবান হবেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

النَّظَافَةُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ

الطَّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ

'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক, পবিত্রতা ঈমানের অংশ।'

তো দীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা বড়ই পছন্দনীয় বিষয়। চাই তা বাইরের হোক বা অভ্যন্তরীণ হোক। উভয় দিক দিয়েই তা তাৎপর্যবহ। তাই ওলামায়ে কেরামের উচিত পবিত্রতার প্রতি যত্নবান হওয়া। পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, ইস্ত্রিকরা জামাকাপড় পরিধান করতে হবে। বরং উদ্দেশ্য হলো, শরীর থেকে ঘামের দুর্গন্ধ যেন না ছড়ায়, কাপড় ময়লা ও অপরিচ্ছন্ন যেন না থাকে। কোনোরূপ নাপাকি যেন জামাকাপড়ে না থাকে। তাই স্বভাবগতভাবেই পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্ন নেবে।

অনেক সময় আমরা এমন খাবার খাই, যা দাঁতে আটকে যায়। ফলে মেসওয়াক দ্বারা দাত পুরোপুরি পরিষ্কার হয় না। তো সুন্নত হিসেবে মেসওয়াক তো অবশ্যই করবে। যদি প্রয়োজন বোধ হয়, তাহলে ব্রাশও করবে, যেন মুখ থেকে গন্ধ না আসে। এটা অবশ্যই নিন্দনীয় যে, তুমি বেশ সুন্দর পোশাকে আবৃত, তুমি সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত; অথচ তোমার মুখ থেকে গন্ধ আসে। তোমার সাথে সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে মানুষ বিব্রত বোধ করে। তাই এই দিকটার প্রতিও খুব লক্ষ রাখবে, যেন তোমার মুখ থেকে গন্ধ না আসে।

তোমার সুমহান মর্যাদা তোমাকেই রক্ষা করতে হবে

ইল্‌ম অর্জনের পর তুমি এক সুমহান আসনে অধিষ্ঠিত হবে। তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তুমি বড় সম্মানিত হয়ে যাবে। তুমি তোমার এই মর্যাদার আসন ও মহা নেয়ামতকে নিজেই হেফাজত করবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন, হে আমার হাবীব!

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

'তুমি যা জানতে না, আল্লাহ তোমাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। তোমার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।'[১]

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১১৩

তো যখন তোমার ইল্‌ম জুটবে, তখন সেই মহা সম্মান তুমিও পাবে। আল্লাহর ফজল ও অনুগ্রহ তুমিও পাবে। পাবে মহা এক নেয়ামত। সেই সম্মান ও নেয়ামত তুমিই হেফাজত করো। ইল্‌মকে তরতাজা রেখো। ইল্‌ম তাজা রাখার সুন্দর সূরত ও মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষকতা করা। হয় পুরোটা সময়ই তাদরীসের কাজ করবে; অন্যথায় অন্তত কিছু সময় তাদরীসের কাজে আর কিছু সময় অন্যান্য কাজে ব্যয় করবে। শিক্ষা-দীক্ষার কাজ করতে থাকবে। যদি মাদরাসায় না পড়াও, তাহলে এলাকার তরুণ-যুবকদের পড়াও, তাদের দীন শেখাও। ইংরেজি শিক্ষিতদের দীন শেখাও, যেন তোমার অন্তত ইল্‌মের সাথে একটি সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়।

তাদরীস তো সবচেয়ে উঁচু কর্ম। যদি এটি সম্ভব না হয়, তাহলে সকালে বা সন্ধ্যায় মাদরাসায় দরস দেবে। আবার সকালে মসজিদে তাফসীর করো আর বিকেলে মসজিদে হাদীছের দরস দাও। এতে তোমার মুতাআলাটা ঠিক থাকবে। আর যদি তা-ও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত সর্বদা অধ্যয়ন চালিয়ে যাও। এতেও তোমার ইল্‌ম তাজা থাকবে। তো ওই পন্থাগুলোর কোনো একটি অবশ্যই অবলম্বন করো।

সব সংশয়ের জবাব দেওয়া জরুরি নয়

ভালো করে শুনে রাখো। সব সংশয়ের জবাব দেবে না। সমস্ত কথার তো জবাব দিতে হয় না। আজকের যুগে অনেক নওজোয়ান সাইন্স নিয়ে আসে। তাই কুরআনে সাইন্স খুঁজতে যেয়ো না। কুরআন সাইন্সের জন্য নাযিল হয়নি। যদিও কুরআনের সকল কথাই বিজ্ঞানময়। তুমি চিকিৎসা করতে যেয়ো না। কারণ, তুমি সামান্য ভুল করলে গোটা আলেম সমাজ অপমানিত হবে। কোনো সংশয়পূর্ণ বিষয়ের কাছেও তুমি যেও না। মানুষের মাঝে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে। মহব্বত যদি মজবুত হয়, তাহলে অন্যসব যুক্তি, নানারূপ ভ্রান্তি দূর হয়ে যায়। আর মহব্বত না থাকলেই একে অন্যের দোষ খোঁজে। আল্লাহর মহব্বত মজবুত হয়ে গেলে সকল সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। মহব্বত যদি না থাকে, তাহলেই নানা রকম সন্দেহ এসে মানুষকে আক্রমণ করে। যদি কোনো সময় তোমার কাছে এমন মানুষ আসে, যার মাঝে আল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহ আছে, তা হলে বুঝবে, তার মাঝে মহব্বতে এলাহীতে কমতি আছে। তাই তার সাথে বিতর্কের পরিবর্তে আহলে মহব্বতের দরবারে তাকে পাঠিয়ে দেবে। তাকে কোনো শায়খের দরবারে পাঠিয়ে দেবে; তাহলে তার সকল সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।

اے لقائے تو جواب بر سوال ■ بات مشکل حل شود بے قیل و قال

'শোনো হে! তোমার সাক্ষাতেই সকল প্রশ্নের উত্তর। কঠিন বিষয়টিও কোনো প্রকার কথাবার্তা ছাড়াই সমাধা হয়ে যায়।'

আমাকে কতিপয় আলেম বলেছেন, আমরা আপনার সাথে তাছাওউফ নিয়ে কিছু কথা বলার জন্য সাক্ষাৎ করব। আমি বলি, অবশ্যই বলো। কিন্তু যখন জায়গামতো আসে, তখন তাদের জবানে তালা লেগে যায়। তখন আর তারা কোনো কথা বলে না। তাই সঠিক রোগের চিকিৎসা করবে। প্রত্যেক কথারই জবাব দেবে না। আওয়ামের কথা অনুযায়ী প্রত্যেক কথা, কুরআনের প্রত্যেক বিষয় সাইন্সের আলোকে বলা তোমার জন্য জরুরি নয়। কুরআনকে কোনোভাবেই সাইন্সের আলোকে সাব্যস্ত করতে যেয়ো না। কারণ, যে-রমণী সুন্দরী, তাকে পার্লারে নিয়ে মেকআপ করালেও কী আর না করালেওবা কী। আর যে-বিষয়টি সত্য, সুন্দর ও অকাট্য তা তুমি অন্য কিছু দিয়ে মাপলেও কী আর না মাপলেওবা কী? শরীয়ত তো সুন্দর। তাকে সাইন্স দ্বারা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত করার কোনোই প্রয়োজন নেই।

ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে সৎকাজের আদেশ ছেড়ে দিয়ো না

হয়তো তুমি ভাববে, আমি নিজেই তো ওই আমলটি করি না; কেন আমি তা মানুষকে করতে বলব? না; এমন ভেবো না। ব্যাপারটা বিদেশে বেশি দেখা যায়। আমাদের কিছু ছাত্র এখানে পড়াশোনা করে ওই দেশে গেছে। তাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা শিক্ষকতা করো, তাদরীসের কাজ করো। তারা বলে, আমাদের মধ্যে তো আমল নেই; কী করে আমরা পড়াব। শোনো এটা শয়তানের অনেক বড় ধোঁকা। শয়তানই তোমার অন্তরে এই আয়াতটি উদিত করে দেয়–

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

'তোমারা নিজেদের কথা ভুলে লোকদের সৎকাজের আদেশ দিচ্ছ কেন?'[১]

তো দেখো ইল্‌ম শিখার পরও দিনের সকল কাজ তোমার থেকে ছুটে যাচ্ছে। আয়াতে সৎকাজের আদেশ করার বিষয়টিকে তো অন্য কোনো নেক কাজের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়নি। এমন তো বলা হয়নি যে, তুমি নেক কাজ

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ৪৩

করলেই শুধু সৎকাজের আদেশ করতে পারবে। তুমি এমনিতেই তো গুনাহ করছ। আবার সৎকাজের আদেশ না করেও গুনাহ করছ। তো অন্তত একটি তো করবে। একটি পারছ না; অন্যটি তো করবে। এমনও তো হতে পারে যে, সৎকাজের আদেশের বরকতে তোমার অন্য আমলটিও করার সুযোগ এসে যাবে।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বলেছেন, আমি যখন আমার মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট রোগ অনুভব করি, তখন আমি সেই বিষয়টি নিয়েই বয়ান করি। ওই ওয়াজ ও বয়ানের বরকতে আল্লাহ আমাকে শেফা দিয়ে দেন। ফলে আমি আমলটি করতে পারি। আরে ভাই! শ্রোতাদের কান তো তোমার কানের চেয়ে দূরে। তোমার কান তো তোমার সবচেয়ে কাছে। তাই বলে যাও; তোমার কথাটি তোমার কানেই আগে পৌঁছবে। তোমার শ্রোতার কানে পৌঁছুক আর না পৌঁছুক। এতে আল্লাহ তোমাকে আমল করার তাওফীক দিয়ে দেবেন।

লেখালিখি ও বক্তৃতায় পারদর্শী হতে হবে

ওলামায়ে কেরামের জন্য লেখালিখি ও বক্তৃতা উভয় শাখার সর্বোচ্চ যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকতে হবে। অনেক সময় শয়তান ধোঁকা দেয় যে, এসব তো রিয়া হয়ে যাবে। কক্ষনো নয়। তুমি তো দীনের কথা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে কলম ও বক্তৃতার মাধ্যমে। দক্ষতার সাথে তুমি মানুষের দুয়ারে দীনের বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়ার সংগ্রাম চালাবে, সাধনা করবে। তুমি যদি তোমার যোগ্যতা অনুসারে তোমার যে সামর্থ্যটুকু আছে, তার আলোকে মানুষের মন ও মেজাজ বুঝে দীনের কথা উপস্থাপন করতে পার, তাহলে অবশ্যই তা মানুষের হৃদয়ে রেখাপাত করবে।

كَلِّمُوا النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ

'মানুষের সাথে তাদের বিবেক অনুযায়ী কথা বলো।'

তো লেখালিখির যোগ্যতাকে কাজে লাগাও শিক্ষিতদের মাঝে। আর বক্তৃতার যোগ্যতাকে কাজে লাগাও জনসাধারণের মাঝে। তবে বক্তৃতা ব্যাপকভাবে সবারই উপকারে আসে। তো দেখো, উভয় পন্থায়ই তুমি দীনের কাজ করতে পারবে। লেখালিখির মাধ্যমেও পারবে, বক্তৃতার মাধ্যমেও পারবে। দেখো, আজ তো বহু আলেম বয়ান-বক্তৃতা করে জনসাধারণের মনরোঞ্জনের জন্য আর মাশায়েখগণ মালফূযাত বয়ান করেন নিজের বুযুর্গি

যাহির করবার জন্য। এটি তো একেবারেই নফসের পূজা। এটি নিতান্তই দুঃখজনক। যা-ই করবে, দীনের যে-কাজই করবে, এখলাছের সাথে আল্লাহর জন্য করবে।

ওলামায়ে কেরাম সম্পদের পেছনে দৌঁড়াবে না

সম্পদ তো আজ আমাদের কাবু করে ফেলছে। সম্পদ কামানোর ফিকিরে আজ আমাদের আলেমসমাজের অনেকেই দীন-ঈমান ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। এমনটা হওয়া অনুচিত, দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক। আজ তো দুনিয়াদারদের অবস্থা হলো–

يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝

'আহ! আমার যদি কারুনের মতো সম্পদ হতো! সে তো বিপুল সম্পদের মালিক ছিল!'[১]

তো ওলামায়ে কেরামের ঘোষণা তো হওয়া দরকার এমন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ

'আর যারা ইল্‌মপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা বলে, তোরা ধ্বংস হয়ে যা; আল্লাহর ছাওয়াবই তো উত্তম!'[২]

আজকের যুগেও তো ইল্‌মপ্রাপ্তরা সেই একই কথা বলবে যে, আমাদের কিসমতে যা আছে, তা আল্লাহ আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবেনই। তাই সম্পদের পেছনে নিজের দীনকে বিক্রি না করে দেওয়া চাই। আমি দেখেছি, ওলামায়ে কেরাম শুধু টাকার লালসায় এমন মসজিদে ইমামতি করে, যেখানে রয়েছে বদ আকিদা, ভ্রান্ত মতবাদ ও বিশ্বাস। অবিরাম চলছে সেখানে বেদআত। অথচ সেই আলেম কোনো প্রতিবাদ না করে চুপ থাকে। হয় তাদের ঠিক করার চেষ্টা করো, না হয় অন্তত নিজের দীন-ঈমান বাঁচাও। আমি একব্যক্তিকে দেখেছি, ছোট বয়সে হয়তোবা তার পেছনে নামাযও পড়েছি। বিশ বছর পর তার সাথে সাক্ষাৎ হলো। সে তাজিয়া মুহাররম করে। আমাকে বলল, কী করব ভাই! তারা আমাকে এক রাতে এক লক্ষ টাকা দেয়। আমি সারা বছরেও তো এত টাকা কামাই করতে পারি না। বলুন তো কী করব? এত টাকা তো আমাকে অন্যরা দেবে না।

---

১. সূরা কাছাছ : আয়াত ৭৯

২. সূরা কাছাছ : আয়াত ৮০

সম্পদ উপার্জনে নিজেকে সঁপে দেওয়া আর দীন ও ঈমান নষ্ট করে ফেলা; এ তো ওলামায়ে কেরামের শান নয়। তাকদীরে যা লেখা আছে, তা তো আল্লাহ তোমাকে দিয়েই দেবেন। তাই তো আমাদের মাশায়েখে কেরাম প্রয়োজনপরিমাণ উপার্জনের উৎসাহও দেন আবার সতর্কও করেন, যেন দীন বিক্রি না করে দিই। দুনিয়াদারদের পেছনে ছুটতে থাকা হারাম। এর তো অনুমতি নেই। ইল্‌মের মর্যাদার দিকে লক্ষ রাখা চাই। আল্লাহ তা'আলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ করে বলছেন–

اَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

'নাকি আপনি তাদের কাছে কোনো প্রতিদান চান। তা-ই যদি হয়, তাহলে মনে রাখুন, আপনার রবের প্রতিদানই উত্তম এবং তিনিই রিযিকদাতা। আরে ভাই! এই আয়াতটি পাঠ করলে আশা ও আস্থায় মনটা ভরে যায়।

আলেমরা কাফের বানান না, কাফের বাতান

দেখুন, আজকাল মানুষ মনে করে, ওলামায়ে কেরাম জনসাধারণকে কাফের বানিয়ে দেন। এটা তাদের ভুল ধারণা। এই ভুল শোধরানো প্রয়োজন। ওলামায়ে কেরাম সাধারণ মানুষকে কাফের বানানা, তবে কাফের বাতান। মানে, কেউ যদি কুফরি করে, কুফরি কথা বলে, তাহলে ওলামায়ে কেরাম বলে দেন, এটা কুফরি হয়েছে। তো বোঝা গেল, তাঁরা কাফের বানান না; বরং কেউ কাফের হয়ে গেলে তা বলে দেন। তো বলে দেওয়াটা তো অন্যায় নয়। যদি তারা না বলে দেন, তাহলে ক্ষতিটা কার হবে? না বলে দেওয়া তো মুখে তালা লাগিয়ে রাখার নামান্তর। দেখুন, যদি কারও কুফরিমূলক কথা বা কাজ হয়ে যায় আর কোনো আলেম সতর্ক করে বলে দেন, তা হলে তিনি তো ওই ব্যক্তির বন্ধু– শত্রু নন। কারণ, ততর্ক না করলে, বলে না দিলে তো আপনারই বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে।

সুলূকের পথে মুজাহাদা আলেমদের কম করতে হয়

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) আরেকটি কথা বলেছেন যে, ওলামায়ে কেরাম সুলূকের পথে এলে মুজাহাদা কম করতে হয়। কারণ? ভেজা লাকড়ি জ্বালানো কঠিন। শুকনা লাকড়ি জ্বালানো সহজ। শুকনা লাকড়িতে আগুন ধরে যায় দ্রুত। তো ছাত্ররা ইল্‌ম হাসিলের তরে যে-মেহনত করে, তার মাধ্যমে তারা শুকনা লাকড়ির মতো হয়ে যায়। তাই

কোনো সাহেবে নেসবতের মজলিসে এলেই ইশ্‌কের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। আমাদের মুরশিদ বলতেন, আমাকে কোনো আলেম যদি চল্লিশটা দিন দান করে, তাহলে চল্লিশ দিনেই তার দিলে নেসবতের নূর এসে যাবে। এই হাদীছ দ্বারা তিনি দলিল দিতেন যে, যেব্যক্তি চল্লিশ দিন পূর্ণ এখলাছের সাথে ইবাদাত করবে, তার আত্মায় হেকমতের চোখ খুলে যাবে। নিয়ত যদি সঠিক হয় আর এখলাছের সাথে যদি চল্লিশটা দিন দান করা হয়, তাহলে তা আমাদের আকাবিরে কেরামের নিকট অনেক মূল্যবান।

বিষয়বস্তুকে সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করবে

শিক্ষকতা করার সময়, দরসদানের সময়, বয়ান করার সময় আপনার আলোচনা সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করুন। কঠিন কোনো বিষয়ও সহজ বানিয়ে পেশ করুন। নফ্‌স অনেক সময় ধোঁকা দেয়। একটি বিষয়কে কঠিন করে বলতে পারলেই ছাত্ররা মনে করবে, আহ! আমাদের ওস্তাদের নিকট অনেক ইল্‌ম আছে। ওস্তাদ মনে করেন, আমার ছাত্ররা তো কিছুই বুঝবে না। তাই তিনি এমনসব পরিভাষা ব্যবহার করেন, যে ছাত্রদের মাথা থেকে তা একটু পরেই বেরিয়ে যায়। ফলে তারা মনে করে, ওস্তাদজি আজ কঠিন ইল্‌ম ঝেড়েছেন। তাই বললাম, আলোচ্যবিষয়কে, প্রতিটি কথাকে সহজ, সাবলীল ও বোধগম্যরূপে উপস্থাপন করুন।

মাদরাসায় এসলাহি বয়ানের ধারা চালু রাখবে

একটি সুনির্দিষ্ট আমল হিসেবে মাদরাসায় এসলাহি বয়ানের ধারা চালু রাখবে। কোনো-কোনো মাদরাসায় আছর নামাযের পর মাশায়েখে কেরামের মালফূযাতের তালীম হয়। এটি সুন্দর পন্থা। এসলাহি বয়ানও চালু করা যেতে পারে।

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

'আপনি নসিহত করুন, আলোচনা করুন। কারণ, নসিহত-আলোচনায় মুমিনদের উপকার হয়।'[১]

এতে নেক কাজের প্রতি প্রেরণা তৈরি হয়। একবার আমি এক মহিলা মাদরাসার বয়ানে বলেছি, যে-ছাত্রী নিয়মিত নটি নামায আদায় করবে, আমি তাকে পুরস্কৃত করব। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, ছয় নম্বরে তাহাজ্জুদ, সাত নম্বরে

---

১. সূরা যারিয়াত : আয়াত ৫৫

এশরাক, আট নম্বরে আওয়াবীন, নয় নম্বরে চাশত। এই নয় নামায যে-ছাত্রী যথাযথ গুরুত্বের সাথে প্রতিদিন আদায় করবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে। পরের বছরের শেষে আমাকে জানানো হলো, বত্রিশজন ছাত্রী পুরস্কার পেয়েছে। শিক্ষিকাগণ এর তত্ত্বাবধান করেছেন।

তো দেখুন, আলহাম্দুলিল্লাহ! এক মাদরাসায় বত্রিশজন ছাত্রী এমন পাওয়া গেল, যারা পুরো বছর প্রতিদিন নয় ওয়াক্ত নামায পড়েছে। একটি নামাযও কাজা করেনি। যেব্যক্তি আল্লাহর মহব্বত অন্বেষণ করে, সে-ই এমনভাবে তাহাজ্জুদের প্রতি, ফরজ আদায়ের প্রতি যত্নবান হয়। তো দেখুন, এসলাহি বয়ানের দ্বারা সত্যিই ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক ফায়দা হয়।

নিজের ওপর কঠোর আর অন্যের ওপর কোমল হোন

একটি মৌলিক কথা শুনুন। একজন আলেমের নিজের ওপরের কঠোর হওয়া চাই। আর অন্যদের ব্যাপারে হওয়া চাই কোমল। নফ্স অবশ্য এর বিপরীতটা শিক্ষা দেয়। নফ্স বলে, অন্যদের ব্যাপারে কঠোর হও, নিজের ব্যাপারে কোমল হও।

ইল্মের নেয়ামতকে আল্লাহর ইহসান মনে করবে

ইল্ম প্রাপ্ত হয়েছেন। আপনি একে আল্লাহর নেয়ামত মনে করুন। একে মনে করুন আপনার প্রতি আল্লাহর অপার করুণা।

رَضِيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا ■ لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجُهَّالِ مَالٌ

فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِىْ عَنْ قَرِيْبٍ ■ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَىٰ لَا يَزَالُ

'মহা প্রতাপশালী আল্লাহর বণ্টনে আমরা সন্তুষ্ট। আমাদের ভাগে দিয়েছেন এলেম আর মূর্খদের ভাগে দিয়েছেন সম্পদ। কারণ, সম্পদ অচিরেই ধ্বংস হয়ে যায় আর এলেম অক্ষুণ্ন থাকে চিরকাল।'

আজকের দুনিয়াদাররা যদি আমাদের ইল্মের মূল্যায়ন না করে, তাতে কী। অতি শীঘ্রই আমরা এমন এক মালিকের কাছে যাব, যার কাছে এই ইল্মের অপরিসীম মর্যাদা ও মূল্য রয়েছে।

একজন তালেবে ইল্ম। নিয়মিত সে মাদরাসা যাচ্ছে, ইল্ম তলব করছে। এক জেন্টলম্যান একদিন তার গতি রোধ করে দাঁড়াল। বলল, তুমি কি মোল্লা হচ্ছ? তোমাকে তো কেউ চাকরি দেবে না। ছেলেটা ঘরে বসে গেল। মাদরাসায় যাওয়া বন্ধ করে দিল। ওস্তাদজি বড়ই বুঝমান ও যোগ্য

ছিলেন। তিনি তাকে ডেকে আনালেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর বাবা! মাদরাসায় আসছ না কেন? ছেলে সহজভাবেই ঘটনাটা বলে দিল। ওস্তাদজি ছিলেন বড় সচেতন মানুষ। তিনি ছাত্রটিকে ইল্‌মের গুরুত্ব বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু তিনি কোনো বয়ান না করে একটি অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি বললেন, তুমি কাল এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করো; আজ যাও। পরদিন ছেলেটি এল। ওস্তাদজি তার হাতে ছোট একটি পাথরখণ্ড দিলেন। বললেন, যাও এই পাথরের বিনিময়ে সবজি দোকান থেকে দুই কেজি সবজি কিনে নিয়ে এসো।

ছেলেটি সবজি কিনতে গেল। বিক্রেতা ছিল এক মহিলা। তাকে বলল, ২ কেজি সবজি দিন আমাকে। মহিলা তাকে ২ কেজি সবজি মেপে দিল। টাকা দেওয়ার পরিবর্তে এই পাথরটা দিতেই মহিলা তাকে ধমক দিয়ে ওঠল। বলল, পাথর দিয়ে সবজি! টাকা দাও; না হয় সবজি রেখে দ্রুত ভাগো। ছেলেটি এসে ওস্তাদকে বলল। ওস্তাদ বললেন, আচ্ছা তাহলে এই পাথরটা অমুক কামারের নিকট নিয়ে যাও। কামারের নিকট নিয়ে গেলে সে তাকে বলল, আমি তোমাকে এর বিনিময়ে হাজার টাকা দেব। ছেলে এসে ওস্তাদকে জানাল। ওস্তাদ বললেন, এবার এর মূল্য গিয়ে জিজ্ঞেস করো স্বর্ণকারের কাছে। ছেলে গেল স্বর্ণকারের কাছে। স্বর্ণকার তাকে বলল, এর মূল্য আমি তোমাকে লাখ টাকা দেব। ছেলে ফিরে এল ওস্তাদের কাছে। বলতে লাগল, হযরত! আমি তো কিছুই তো বুঝলাম না। একজন ২ কেজি সবজি দিল না এ পাথর দ্বারা! আরেকজন তার মূল্য দিতে চাইল হাজার টাকা! আরেকজন দিতে চাইল লক্ষ টাকা! ব্যাপারটা আসলে কী?

এবার ওস্তাদজি বললেন, আরে বেটা! এটা পাথর নয়– এটা হলো হীরা। সবজি বেপারী ওই মহিলার কী জ্ঞানই আছে যে সে জানবে এই হীরার মূল্য? সে তো হীরা চেনেই না। আর দ্বিতীয় লোকটি অর্থাৎ– কামার; সে চেনে এটি হীরা; কিন্তু কিছুটা জানে। তাই তার মূল্য বলেছে এক হাজার টাকা। আর ওই যে স্বর্ণকার, সে তো হীরা বিশেষজ্ঞ। সে জানে, এর মূল্য লাখ টাকা। তাই সে তোমাকে বলেছে, এক লক্ষ টাকা দেবে। তো শোনো, ইল্‌মের মূল্য তো সে-ই দেবে, যে ইল্‌ম চেনে, যে ইল্‌মের শান জানে।

তো ইংরেজি শিক্ষিত জেন্টলম্যানের কী খবর আছে? ইল্‌মের মূল্য সে আর কী বোঝে? তো ছেলে এবার নিজেকে চিনতে পারল এবং আবার মাদরাসায় পড়াশোনা শুরু করল। কিছুদিনের মধ্যেই সে-যুগের বাদশাহর একটি মাসআলা সামনে এল। তার সমাধান প্রয়োজন হলো। সে স্ত্রীকে বলে

দিল, যদি তুমি চাঁদের চেয়ে সুন্দরী না হও, তাহলে তুমি তালাক। এখন ফতোয়া দেবে কে? কেউ তো জানে না, এর সমাধান কী হবে? বাদশাহ সেই ওস্তাদের নিকট লোক পাঠাল। ওস্তাদ ওই ছাত্রকেই পাঠালেন। বলে দিলেন, এই হলো ফতোয়া, এ হলো তার জবাব। এই ফতোয়াটি বাদশাহকে দিয়ে এসো। ছেলেটি বাদশাহর নিকট গেল। ছেলে গিয়ে উত্তর দিয়ে দিল যে, স্ত্রী তালাক হয়নি। কারণ, কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

'অবশ্যই আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছি।'[১]

তো দেখুন, মানুষ কিন্তু চাঁদের চেয়েও সুন্দর। ছেলেটি যখন মাসআলা বলো দিল, বাদশাহ তাকে পুরস্কার দিলেন। তার বাহিনীকে বললেন, একে ঘরে পৌঁছিয়ে দাও। শাগরেদ তো হয়রান হয়ে গেল যে, বাদশাহ এত কিছু পুরস্কার দিলেন!

দেখুন ভাই, দুনিয়াদার লোকেরা যা বলে, তার প্রতি কর্ণপাতই করবেন না। হয়তো বলবে, মোল্লা হচ্ছে, মৌলভী হচ্ছে। তারা মনে-মনে বলবে, লোকটি নিজেকে মূল্যহীন করে ফেলছে। আরও কত কিছুই-না বলবে। তো তার কী জ্ঞান আছে? সে আর কতটুকু জানে? সে কী করে ইল্‌মের মূল্যের খবর জানবে। বরং তার মূর্খতার ওপর তো আমার বড়ই করুণা হয়। আল্লাহ আমাদের কুরআনের ইল্‌ম দান করেছেন। এ তো আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামত। এ তো আল্লাহর অনেক বড় পুরস্কার।

তিনটি অতুলনীয় কিতাব

হযরত নানুতবি (রহ.) বলতেন, তিনটি কিতাবের তুলনা হয় না।

(১) কুরআনুল কারীম।

(২) বোখারি শরীফ।

(৩) মছনবি শরীফ।

কত ইল্‌ম ও মারেফত যে, এই কিতাবগুলোতে গচ্ছিত আছে!

ইল্‌মে পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করা কঠিন

সবচেয়ে আজব কথা হলো ইল্‌মে পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করতে হলে ইল্‌ম ও আমল উভয়টিই একত্রিত করতে হবে। প্রত্যেকেই কিন্তু কামেল হতে পারে

---

১. সূরা তীন : আয়াত ৪

না। প্রত্যেকেই উপযুক্ত হতে পারে না। ইমাম সিবওয়াইহ তাঁর ওস্তাদের কাছে এই হাদীছটি পড়ছিলেন–

مَنْ قَاءَ فِيْ صَلٰوتِهٖ اَوْ رَعُفَ

হাদীছটিতে رَعُفَ এর স্থলে সীবওয়াইহ رُعِفَ পড়েছেন। ওস্তাদ বললেন, তোমার নাহু-সরফে দুর্বলতা আছে। তুমি আলীম আহমদের নিকট কিছু দিন পড়ে এসো। সীবওয়াইহ সেখানে গেলেন। সেখানেই তার সারাটা জীবন নাহু আর সরফের পথে ব্যয় করে দিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হলো। তাকে এখন ইমামুন নাহু ওয়াস-সার্‌ফ বলা হয়। কিন্তু তিনি অন্য আর সকল ইল্‌ম কিন্তু অর্জন করতে পারেননি। একটিমাত্র বিদ্যায় তিনি পূর্ণাঙ্গ হয়েছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার দিকে তাকান। তাকে আল্লাহ কত ইল্‌মই-না দান করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বলেছেন, ইবনে তাইমিয়া (রহ.) মানকুলাতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ; তবে মা'কুলাতে নিম্ন। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, হাদীছের রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে ইবনে তাইমিয়া যদি বলেন, আমি এই হাদীছটি শুনিনি, তাহলে বুঝতে হবে, এটি জাল হাদীছ। এত রেওয়ায়াত তাঁর নিকট ছিল। কিন্তু ফেকাহ, উসূলে ফেকাহ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা নেই। ফিকহের ব্যাপারে তাঁর অবস্থা এমন যে, তারাবির নামায আট রাকাত বলে ফতোয়া দিয়ে ফেলেছেন। সাহাবা কেরামই তো দীন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। হযরত ওমর (রাযি.) মসজিদে নববীতে সকল সাহাবাকে ২০ রাকাত তারাবি পড়িয়েছেন। কোনো সাহাবি এর ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি। তো ইবনে তাইমিয়া হাদীছের ক্ষেত্রে তো সুযোগ্য ছিলেন। কিন্তু ফিকহের ক্ষেত্রে তার যোগ্যতা ছিল না। কামেল হওয়া, পূর্ণাঙ্গ হওয়, কোনো সহজ কাজ নয়। কামেল হওয়ার জন্য কামেলীনের সোহবত গ্রহণ করতে হয়।

ওলামায়ে দেওবন্দের ইল্‌ম ও আমল উভয় ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গতা

আমাদের আকাবিরে কেরামের শান তো এই ছিল যে, প্রথমে তারা ইল্‌ম অর্জন করেছেন। তারপর কামেলীনের সোহবত এখতিয়ার করেছেন। তাই আল্লাহ তাঁদের কামালিয়াত দান করেছেন। বয়ানের মসনদে তাঁরা জুনায়েদ ও বায়েদিজ (রহ.)-এর মতো। আর হাদীছের মসনদে তারা আসকালানি ও কাসতল্লানির মতো। আল্লাহ তাঁদের এমন যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বানিয়েছেন।

হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.)-এর ইল্‌মি শান

ওলামায়ে দেওবন্দের কিছু কথা শুনুন। আমরা তাদের সন্তান। সন্তান পিতার আলোচনা করে খুশি হয়। তালেবুল ইল্‌ম তার শিক্ষকের আলোচনা করে খুশি হয়। তো আমরা আমাদের ওস্তাদের আলোচনা করব না এটা কি হয়? আল্লামা শাব্বির আহমদ ওছমানি, যিনি হাদীছের বিখ্যাত কিতাব মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল মুলহিম লিখেছেন। তার ইল্‌মি উচ্চতা সকলেই মান্য করে। তিনি আপন ওস্তাদ আল্লামা কাশ্মিরি (রহ.) সম্পর্কে বলেছেন–

سَأَلْتُ عَلَّامَةَ النَّقِيَّ التَّقِيَّ الَّذِيْ لَمْ تَرَى الْعُيُوْنُ مِثْلَه وَلَمْ يَرَهُ مِثْلُهُ

আমি আমার ওস্তাদ আল্লামা কাশ্মিরি (রহ.)কে প্রশ্ন করলাম, যিনি নাকী তথা ন্যায়পরায়ণ আর তাক্বী তথা পরহেযগার ছিলেন; তিনি এমন ব্যক্তি, যার মতো ইল্‌মওয়ালা এই চোখ দেখেনি আর তাঁদের চোখও এমন ইল্‌মওয়ালা দেখেনি।

وَلَوْ كَانَ فِيْ طَالِبِ زَمَانٍ لَكَانَ لَهُ شَانٌ فِيْ سَبْقَةِ اَهْلِ الْعِلْمِ عَظِيْمٌ

যদি তিনি পুরোনো যুগের হতেন, তাহলে ইল্‌মের স্তরে তার অনেক বড় শান হতো।

وَهُوَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا اَلْاَنْوَرْشَاه الْكَشْمِيْرِى

তিনি আমাদের হযরত, আমাদের নেতা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি।

এবার বলুন, আল্লামা কাশ্মিরি (রহ.)-এর ব্যাপারে যদি শাব্বীর আহমদ ওছমানি এমন কথা বলেন, তাহলে তার ইল্‌মি শান কত উচ্চে ছিল! হযরত আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বলেছেন, যখন হযরত আল্লামা কাশ্মিরি (রহ.) মজলিসে আগমন করতেন, তখন তার ইল্‌মি জালালাতের কারণে আমার মাঝে এক অন্য রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে যেত।

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর ইল্‌মি শান

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি আমাদের আকাবিরের ব্যাপারে বলেন–

اِبْنُ نُجَيْرِ الْمِصْرِيُّ صَاحِبُ الْبَحْرِ الرَّائِقِ اَفْقَهُ عِنْدِيْ مِنَ الشَّامِيْ

'আমার দৃষ্টিতে বাহরুর রায়েকের মুসান্নিফ আল্লামা ইবনে নুজাইম ইমাম শামি থেকেও বড় ফকীহ।'

বাহরুর রায়েক কিতাবটি কানযুদ্দাকায়েকের ব্যাখাগ্রন্থ। লিখেছেন মিশরের আলেম ইবনে নুজাইম (রহ.)। তাখাসসুস ফিল ফিকহের ছাত্রদের কিতাব পড়ানো হয়। ছাত্ররা বেশ উপকৃত হয়। তারই ব্যাপারে আল্লামা কাশ্মিরি বললেন, তিনি শামী থেকেও বড় ফকীহ।

لِاَنَّ اَمَارَاتِ الْفِقْهِ طُلُوْعٌ فِيْهِ

'কারণ, তার মাঝে ফিকহের শান জ্বলজ্বল করছিল।'

তো দেখুন, ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর ব্যাপারে কত বড় কথা বলেছেন! তারপর বলেছেন–

وَكَذَالِكَ شَاهَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ الْمُحَدِّثُ الدِّهْلَوِى وَكَذَالِكَ شَيْخُ مَشَائِخِنَا رَشِيْد اَحْمد كَنْكُوْهِىْ اَفْقَهُ عِنْدِىْ مِنَ الشَّامِى

'অনুরূপভাবে শায়খ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবি এবং আমাদের শাইখুল মাশায়িখ রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.)ও আমার মতে শামী থেকেও বড় ফকীহ।'

গাঙ্গুহি (রহ.)-এর শায়খ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.) বলেছেন, যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখে, তারা মৌলভী রশীদ আহমদকে যেন আমার স্থলে বা আমার চেয়ে উঁচু স্তরের মনে করে। ওস্তাদ তাঁর ছাত্রের ব্যাপারে, পীর তার মুরীদের ব্যাপারে বলছেন, যেন মুরিদরা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহিকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। তার অস্তিত্বকে গনিমত মনে করে।

এমন লোক দুনিয়ায় সহজে সৃষ্টি হয় না। হযরত হাজী সাহেব বলেন, যেমনিভাবে শামস তাবরিজের মুখপাত্র হয়েছেন মাওলানা রুমি, তেমনিভাবে আমার মুখপাত্র হলো মাওলানা নানুতবি। যে মারেফাত আমার দিলে উদয় হয়, আল্লাহ তা মৌলভী কাসেমের ভাষায় ও কলমে প্রকাশ করিয়ে দেন। হযরত মাওলানা নানুতবি (রহ.) যখন শাহজাহানপুরের মুনাযারায় অংশ নিলেন, তখন তখন তিনি একা-ই সমস্ত ধর্মের অসারতা প্রমাণ করে দিলেন এবং ইসলামের সত্যতা সাব্যস্ত করলেন।

হযরত নানুতবির এই কামিয়াবির সংবাদ যখন মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.) পেলেন, তখন তার চোখে অশ্রু নেমে এল। তার ছাত্ররা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, এই বিজয়ে আপনার চোখে অশ্রু কেন? তিনি বললেন, মনে হচ্ছে, আমার দোস্ত আমার থেকে এখন পৃথক হয়ে যাবে। তাঁর মানে হয় ডাক এসে যাবে। কারণ, তাকে আল্লাহ যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন

অর্থাৎ– ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত করা সেটা তিনি করে দিয়েছেন। সেই বছরই হযরত নানুতবির ইন্তেকাল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত কাসেম নানুতবিকে এমন ইল্‌মি শান দান করেছিলেন। হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর ব্যাপারে শাহ আম্বালবি মাজযূব (রহ.) বলেছেন, আমি রশীদ আহমদ গাঙ্গুহিকে মসজিদে নববীর মসনদে ইফতায় অধিষ্ঠিত দেখেছি। এমন ফাকাহাত ও জ্ঞান-গভীরতা আল্লাহ তাকে দান করেছেন। হযরত মিয়া আবদুর রহীম বেলায়েতি সাহেবুল কাশ্‌ফ ছিলেন। তিনি বলতেন, আমি দেখেছি মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহির কলম আরশে ইলাহীকে দেখে দেখে চলছে।

মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদির ইল্‌মি শান

হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী (রহ.)-এর কাশফের কথা বেশ প্রসিদ্ধ। বড় বুযুর্গ ছিলেন তিনি। হযরত আবদুল হাই মুলগি (রহ.) যিনি মুআত্তা মালেকের ওপর হাশিয়া লিখেছেন, শরহে বেকায়ার ওপর হাশিয়া লিখেছেন। তিনি মাওলানা ফজলুর রহমানের সাথে এলেন। পথিমধ্যে সফরের কসর নামায পড়ার ক্ষেত্রে ভুল করে বসলেন। হযরত ফজলুর রহমান যখন তার সাথে মুসাফাহা করলেন, তখন বললেন, এত বড় আলেম হয়ে ফিরছেন আর রাস্তায় কসর নামাযেই ভুল করে বসলেন! তিনিও নিজের ভুল মেনে নিলেন। এমন কাশফ আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন।

মাওলানা আহমাদ আলী সাহরানপুরি (রহ.) হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ.)-এর শাগরেদ। তিনি আকাবিরে দেওবন্দের অনুসারী। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অনেক উঁচু মাকাম দান করেছেন। তিনি বোখারি শরীফের ওপর হাশিয়া লিখেছেন। তখনও তিনি লিখছিলেন। এমন সময় মাওলানা ফজলুর রহমান তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। ফজলুর রহমান (রহ.) বললেন, মাওলানা! অমুক স্থানে কী লিখেছেন? দেখা যায় সেখানে ভুল আছে। এমন কাশ্‌ফ আল্লাহ তা'আলা হযরতকে দান করেছেন।

একবার তার খাদেম হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। বিদায়ের সময় হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বললেন, আপনার পীরকে বলবেন, খলকে মুহাম্মাদিকে যেন তিনি ইখতেয়ার করেন এবং জবতের সাথে কাজ করেন। অর্থাৎ– নবীজির আদর্শমতো যেন চলেন এবং নিয়মমতো যেন কাজ করেন। কারণ, তিনি তাঁর কাছে আগতদের খুব শাসাতেন এবং জালালি তবিয়ত দেখাতেন। এজন্যই হযরত গাঙ্গুহি তাকে একথা বলে দিয়েছেন।

তো খাদেম যখন এল, হযরত মাওলানা গাঙ্গেমুরাদাবাদি বলে দিলেন, তোমাকে তো মাওলানা গাঙ্গুহি এই-এই বলেছেন। আসলে আমার কাছে যারা আসে, তারা এসলাহের জন্য আসে না। তারা আসে তাবিজের জন্য। তাই তাদের এভাবে শাসাই। আমি মাওলানা গাঙ্গুহির মতো কীভাবে করব? তিনি তো সমুদ্রের-পর-সমুদ্র ইল্‌ম পান করে বসে আছেন। আর আমি? এতে অনুমান করা যায়, হযরত গাঙ্গুহির ইল্‌মি শান কেমন ছিল! আমাদের দৃষ্টিতে তিনি কুতুবুল ইরশাদ ছিলেন। আর কতুবুল ইরশাদ যিনি হন, আল্লাহ তাঁর দ্বারা পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে দীনের সকল শাখায় খেদমত নিয়ে থাকেন।

হযরত গাঙ্গুহির খলীফাদের ইল্‌মি শান

হযরত গাঙ্গুহির (রহ.)-এর খলীফাদের একজন হচ্ছেন মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ নিয়েছেন সারা দুনিয়ায়। এই দাওয়াত তো দীনের একটি শাখা।

দ্বিতীয় শাখাটি হচ্ছে তাযকিয়ায়ে নফ্‌স। হযরতের আরেক খলীফা হলেন শাহ আবদুর রহীম রায়পুরি (রহ.)। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাযকিয়ার কাজ নিয়েছেন। প্রথম-প্রথম হযরত ইলিয়াস (রহ.) তাঁর জামাতকে তাযকিয়ার জন্য হযরত রায়পুরির কাছে পাঠাতেন। তো وَيُزَكِّيهِمْ এর কাজও আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে নিয়েছেন–

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

আর তৃতীয় শাখা হচ্ছে কিতাবের শিক্ষাদান। হযরত গাঙ্গুহির আরেক খলীফা হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহরানপুরি (রহ.)। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই কাজ নিয়েছেন। তাঁরই খলীফা হচ্ছেন হযরত শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া (রহ.)। শাখয় যাকারিয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইল্‌মের খেদমত নিয়েছেন। আজ তো সারা দুনিয়ায় কুরআনে কারীমের পর যে কিতাবটি সবচেয়ে বেশি পাঠ হয়, তা হচ্ছে ফাযায়েলে আমল। আল্লাহ ফয়েজ ও বরকত জারি করে দিয়েছেন।

وَالْحِكْمَةَ

এটি দীনের চতুর্থ শাখা। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর একজন খলীফা। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইকামাতে দীনের

কাজ নিয়েছেন। তাঁর মাধ্যমেই তো হিন্দুস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। তো বোঝা গেল, হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.) কুতুবুল ইরশাদ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে দীনের সমস্ত শাখায় কাজ নিয়েছেন। তো এঁরা কারা ছিলেন? এঁরা ছিলেন ওলামায়ে দেওবন্দ। হযরত নানুতবি, হযরত গাঙ্গুহি, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি। হযরত থানবি তো ছিলেন মুজাদ্দিদে মিল্লাত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে ইল্‌ম ও তাযকিয়া উভয় শাখার কাজ নিয়েছেন। ইল্‌মের বিষয়ে দুনিয়ায় প্রায় দুই হাজার কিতাব রচনা করে গেছেন। একজন তো তাঁর কিতাগুলোর নামের একটি তালিকা তৈরি করেছেন। তখন ছাব্বিশ শত কিতাবের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলো হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি লিখেছেন। পাকিস্তানের যত বড়-বড় মাদরাসা দেখেন, তার প্রায় সবগুলোই তাঁর শাগরেদরা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাযকিয়ার ময়দানে তো তার কর্মের ব্যাপ্তি সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে।

হযরত মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহ.) তাঁরই খলীফা ছিলেন। তিনি 'দারুল উলূম করাচি' প্রতিষ্ঠা করেছেন। হযরত বিন্নুরি (রহ.)ও তাঁর খলীফা ছিলেন। তিনি বিন্নুরি টাউন মাদরাসা বানিয়েছেন। এখানের পাঞ্জাবে জামেয়া আশরাফিয়া তাঁরই খলীফা হযরত মুহাম্মাদ হাসান প্রতিষ্ঠা করেছেন। মূলতানের বড় মাদরাসার নাম খাইরুল মাদারিস। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবিরই শাগরেদ হযরত খায়ের মুহাম্মাদ জলন্ধরি সেটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই যে ইল্‌মের এত বড়-বড় ধারা তাঁরা প্রবাহিত করেছেন, ইল্‌মের সুধা এই দেশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন, এসব ওলামায়ে দেওবন্দেরই অবদান।

তারপর অবশিষ্ট আর যত কাজ ছিল, আল্লাহ তা'আলা তা হযরত মাদানি (রহ.)-এর মাধ্যমে পূর্ণ করেছেন। একদিকে বৃটিশদের বিতাড়নের সংগ্রাম তিনি করেছেন। দেশে-দেশে বয়ান-বক্তৃতা করেছেন, আরেক দিকে রাতের বেলায় মাদরাসায় দরসে বোখারির মসনদকে আলোকিত করেছেন। বড়-বড় মাদরাসা তাঁরই শাগরেদরা বানিয়েছেন। হযরত মাওলানা সালীমোল্লাহ খান সাহেব আজ আমাদের মাথার মুকুট। বেফাকুল মাদারিসের সদর তিনি। তিনি এত বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, জামেয়া ফারুকিয়া আমাদের আকাবিরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছে।

এরপর দেখুন, পাঞ্জাবে জামেয়া মাদানিয়া প্রতিষ্ঠা করেছেন হযরত মাদানি (রহ.)-এর খলীফা হযরত মাওলান মুহাম্মাদ মিয়া সাহেব। আবার

দারুল উলূম হাক্কানিয়াও প্রতিষ্ঠা করেছেন হযরত মাদানি (রহ.)-এর খলীফা হযরত মাওলানা আবদুল হক (রহ.)। অবশ্য আমাদের হযরত মাওলানা আবদুল মালেক সিদ্দীকি থেকেও তিনি খেলাফত পেয়েছেন।

তরবিয়তি মজলিসগুলোর উদ্দেশ্য

স্পষ্টভাবেই বোঝা গেল, ইল্‌মের যে স্রোতোধারা আজ বহমান, তার সবটুকু কীর্তি সেসব সুমহান ত্যাগী পুরুষদের, যারা ইল্‌ম শিখেছেন নিরলসভাবে। তারপর নিবেদিত ছিলেন শায়খের সোহবতে। ফলে ইল্‌মের পাশাপাশি তারা অর্জন করেছেন আমলের সুমহান দীক্ষা। আর তরবিয়তি মজলিসগুলোর উদ্দেশও তা-ই। এমন আবেগ ও উদ্দীপনা প্রদান করা হবে, যেন ইল্‌মের সৌরভ একজন তালিবে ইল্‌মের পুরো দেহাবয়ব জুড়ে ব্যাপ্ত থাকে। ইল্‌মের নূরে উজ্জ্বল হয় যেন তার জীবন। তাহসীলে ইল্‌মের মনযিলগুলো তুমি পার হয়েছ। এখন তোমার গন্তব্য ইস্তে'মালে ইল্‌ম। তাই সেই সংগ্রামে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়ো। এই চেতনা-ই তোমাদের বুকে ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এসব তরবিয়তি মজলিসগুলোতে। তাই ইল্‌মকে ব্যবহার করতে শুরু করো। তাকওয়ার জিন্দেগি এখতিয়ার করো। আল্লাহওয়ালাদের জীবন গ্রহণ করো। আল্লাহ তাঁর ফসল ও করম, নেয়ামত ও রহমতের ধারা চালু করার কাজে আমাদের নিয়োজিত করেন। তবে এর জন্য মেহনত করতে হবে। এত সহজেই তা অর্জিত হয়ে যাবে না। এটি সহজ কাজ নয়। যারা-ই কোরবানি করে দীনের কাজ করেছে, আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা'আলা তাদের যামানার মুজাহিদ বানিয়ে দিয়েছেন।

ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে মুজাদ্দিদীনে উম্মাহ

আমাদের আকাবিরে দেওবন্দের মাঝে মুজাদ্দিদ সৃষ্টি হয়েছিলেন। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, মুজাদ্দিদ তো একজন ব্যক্তিও হতে পারেন। আবার একটি জামাতও হতে পারে। ওই জামাতের মাধ্যমে আল্লাহ মুজাদ্দিদী কাজ নিয়ে থাকেন।

(১) প্রথম হিজরিতে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয ছিলেন প্রথম শতাব্দির মুজাদ্দিদ।

(২) দ্বিতীয় শতাব্দিতে হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা ছিলেন, ইমাম শাফেয়ি ছিলেন। তাঁরা ফেকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি প্রণয়ন করে গেছেন। তারা ফিকহের সংকলন ও বিস্তার করে গেছেন। তারা মুজাদ্দিদ ছিলেন।

(৩) তৃতীয় শতাব্দির মুজাদ্দিদ ছিলেন ইমাম তাহাবি (রহ.) ও ইমাম আশআরী (রহ.)। তাঁরাই ইল্‌মুল কালামের উসূল এবং আকীদার সকল শাখাগত দিক পরিবেশন করে গেছেন।

(৪) চতুর্থ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ছিলেন আবুবকর বাকিল্লানি (রহ.)। তাফসীরের কিতাবে আপনারা তাঁর নাম পড়ে থাকবেন।

(৫) পঞ্চম শতাব্দির মুজাদ্দিদ ছিলেন ইমাম গায্‌যালি (রহ.)। তাছাওউফের ইমাম ছিলেন তিনি।

(৬) ষষ্ঠ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ফালসাফার ইমাম আল্লামা রাযি (রহ.)।

(৭) সপ্তম শতাব্দির মুজাদ্দিদ হাফেয ইবনে দাকীক (রহ.)– হাদীছ শাস্ত্রবিদ।

(৮) অষ্টম শতাব্দির মুজাদ্দিদ হাদীছশাস্ত্রের ব্যক্তিত্ব হাফেয ইবনে হাজ্‌র, সিরাজুদ্দীন বালকানি ও যাইনুদ্দীন ইরাকি।

(৯) নবম শতাব্দির মুজাদ্দিদ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.)। হাদীছ ও তাফসীর উভয় বিষয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন।

(১০) দশম শতাব্দির মুজাদ্দিদ মোল্লা আলী কারী (রহ.)।

(১১) একাদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)।

(১২) দ্বাদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবি (রহ.)। তিনি সেই বুযুর্গ, যাকে جامع الاسانيد বলা হয়। ওলামায়ে দেওবন্দের যত সনদ আছে, সবার সনদ তার সাথে গিয়ে যুক্ত হয়। এমনকি বেরেলবি, গায়রে মুকাল্লিদীনের সনদও তাঁরই সাথে গিয়ে যুক্ত হয়। তাঁর পরের স্তরে হচ্ছেন আল্লামা আবু সাহেব মাদানি (রহ.)। তাঁর থেকে সনদ গিয়ে মিলিত হয় ইমাম বোখারি (রহ.)-এর সাথে।

(১৩) ত্রয়োদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ হচ্ছেন আমাদের সেলসেলার বুযুর্গ হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলবি (রহ.) ও সায়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.)। তিনি হযরত মাওলানা খালেদ কুরদি (রহ.)-এর মুরিদ ছিলেন। আর আল্লামা খালেদ কুরদির মুরিদ ছিলেন আল্লামা শামী (রহ.)ও। তাঁরা তাজদীদি কাজ কীভাবে করলেন? ওই যামানায় বিভিন্ন এলাকায় নবাব ছিলেন। আপনি শাহ গোলাম আলী দেহলবি (রহ.)-এর খালীফাদের নাম পড়ে দেখুন। প্রত্যেক নবাবের সাথেই তার খলীফাদের মধ্য থেকে কোনো-না-কোনো এক খলীফার উপস্থিতি ছিল। তারা নবাবদের রাজনীতিতে দীনে

আহকামের প্রচার চালাতেন। তো নবাবদের যারা দীনের ওপর রেখেছেন, তারা এই হযরতেরই খলীফা। তাই তো হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) তাঁকে ত্রয়োদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(১৪) চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদগণের মধ্যে রয়েছেন হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.), হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.), হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)। তাঁদের মাধ্যমেই এই শতাব্দিতে আল্লাহ তা'আলা দীনের কাজ নিয়েছেন।

আমাদের আকাবিরগণ ছিলেন ইল্‌মের সুবিশাল পাহাড়। আবার বাতিনী ক্ষমতারও অধিকারী। তাই তো আজ ওলামায়ে দেওবন্দের ফয়েজ ও বরকত সারাটা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা ছড়িয়ে রেখেছেন একামতে দীনের কাজে। দীনের মহাসংগ্রমে আল্লাহ এই ওলামায়ে কেরামকেই নিয়োজিত রেখেছেন।

হযরত শাইখুল হিন্‌দ (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব

হযরত শাইখুল হিন্‌দ (রহ.)—যাঁকে আসীরে মাল্টা বা মাল্টা দ্বীপের বন্দি বলা হয়—তাঁর ইবাদাত, তাঁর বিনয়, তাঁর শিক্ষকতা, তাঁর সংগ্রাম-সাধনা সবই বড় আশ্চর্যজনক। একব্যক্তি হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করতে এল। বলল, আমি শায়খুল হিন্‌দ-এর সাথে দেখা করতে চাই। হযরত শাইখুল হিন্‌দ নিজেই তাকে বসতে দিলেন। মেহমানখানায় খাবারদাবার প্রস্তুত করে তাকে মেহমানদারি করলেন। তারপর তাকে আরাম করতে দিলেন। নিজে তার খেদমত করতে লাগলে, পা দাবিয়ে দিতে লাগলেন। লোকটি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, আরে ভাই! তুমি আমার এত খেদমত করছ; শায়খুল হিন্‌দ-এর সাথে দেখা করিয়ে দিচ্ছ না কেন? আমি তো তার সাক্ষাতের জন্য এসেছি।

লোকটি ভেবেছিল, ইনি ঘরের খাদেম। কিন্তু হযরত শায়খুল হিন্‌দ তাঁকে অবাক করে দিয়ে বললেন, আপনি যদি মাহমূদুল হাসানের সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে থাকেন, তাহলে আমিই মাহমুদুল হাসান। আমি জানি না শাইখুল হিন্‌দ কে?

দেখুন ভাইয়েরা! কেমন সুন্দর দৃশ্য! তিনি রমযান মাসে সারাটা রাত তারাবির নামাযে কাটিয়ে দিতেন। স্ত্রী কারী সাহেবকে খবর দিতেন, হযরত তো অসুস্থ, খাচ্ছেনও কম। একটা দিন হযরতকে আরাম করার সুযোগ করে দাও। এতে কারী সাহেব নিজে একটি বাহানা তৈরি করে বললেন, হযরত!

আমি তো আজ অসুস্থ; তারাবি তো পড়ব কিন্তু সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। হযরত অন্যের কষ্টের দিকটা খুব খেয়াল রাখতেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে; আপনি আরাম করুন।

তারাবি শেষ হওয়ার পর হযরত বললেন, আপনি আমার কামরায় আমার বিছানায় শুয়ে পড়ুন। খুব জোর করে কারী সাহেবকে নিজের বিছানায় নিয়ে গেলেন। তো কারী সাহেব বললেন, ঠিক আছে; আমি গুলাম। বাতি বন্ধ করা হলো। কিছুক্ষণ পর কারী সাহেব অনুভব করলেন, কেউ তার পা টিপে দিচ্ছে। ঝটপট উঠে দেখলেন, শায়েখ নিজে কারী সাহেবের পা দাবিয়ে দিচ্ছেন। ওস্তাদ ও শায়খ শাইখুল হিন্দ (রহ.) খোদ কারী সাহেবের পা টিপে দিচ্ছেন। কারী সাহেব বললেন, হযরত! আপনি এ কী করছেন? হযরত বললেন, আপনি তো ক্লান্ত, অসুস্থ; তাই চিন্তা করলাম, আপনার একটু খেদমত করি। আপনার পা দাবিয়ে দিলে হয়তো সুস্থতা বোধ করবেন। কারী সাহেব তো হতভম্ব হয়ে গেলেন। বললেন, হযরত! পা-ই যদি দাবিয়ে দেন, তো চলুন; তার চেয়ে ভালো আমি আপনাকে নিয়ে কিয়ামোল্লাইল করি, নামায পড়ি।

এমন ইবাদাত, এমন ইল্‌ম, এমন তাকওয়া আর এই বিনয় ছিল তাঁর। সংগ্রামী জীবনের চিত্র আর দীন প্রতিষ্ঠার ত্যাগ ও কোরবানির কথা শুনুন। তাঁর যখন ওফাত হলো, তাকে গোসলের জন্য নেওয়া হলো। লোকেরা দেখল, কোমরের ওপর তাঁর বড়-বড় যখমের চিহ্ন। তারা বুঝতে পারল না, এসব কীসের দাগ। হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানি যখন তাশরীফ আনলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। ঘরে লোকেরাও জানে না, এই যখম কীসের। আমাদের কেউই জানে না, এমন দগদগে ক্ষত কীসের?

হযরত মাদানি এই প্রশ্নের সামনে নিজেকে বড় অসহায় বোধ করলেন। তিনি বহু কোরবানির সময় ধৈর্য ধরেছেন। কিন্তু এই প্রশ্নের সামনে ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। চোখে পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, আমার শায়খ আমার থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, এই গোপন কথাটি যেন কাউকে না বলি। তাঁর জীবদ্দশায় জানি আমি এই সংবাদ কাউকে না দিই। আজ তো তিনি চলে গেছেন। আজ বলতে পারি। শুনুন যখন আমরা মাল্টার দীপে ছিলাম। কালা পানির দ্বীপে নির্বাসিত ছিলাম। তখন বৃটিশরা হযরতকে বলেছিল, যদি তুমি আমাদের মুখের দুটি কথা বল; তাহলে তোমাকে মুক্তি দিয়ে দেব। আর যদি না বল, তাহলে কঠিন শাস্তি দেব। হযরত বলে দিলেন আমি কোনো ভাবেই তোমাদের ওসব কথা বলব

না। ফলে তাকে শাস্তি দেওয়া হলো। তপ্ত অঙ্গারের ওপর হযরতকে তারা শুইয়ে দিত আর বলত ওই বাক্যগুলো বলো। হযরত তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিতেন। ইংরেজরা বলত, দুটি কথা বললেই তোমাকে মুক্তি দিয়ে দেব। হযরত বলে দিতেন, তোমরা আমার দেহ থেকে জান বের করে নিতে পারবে; কিন্তু ঈমান বের করে নিতে পারবে না।

রাতে হযরতকে শাস্তি থেকে ছাড়া হতো। হযরত চিত হয়ে শয়ন করতে পারতেন না। তখন আমি এবং আরও যারা সঙ্গী ছিলেন, বলতাম, হযরত! দীনের খাতিরে হিলার তো এজাযত আছে। ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) কিতাবুল হিয়াল' লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। আপনিও কোনো রূপক অর্থ ধারণ করে কথাগুলো তাদের বলে দিন। অন্তত কষ্টের দিন তো শেষ হয়ে যাবে। হযরত কথাটা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হুসাইন আহমদ! তুমি কি মনে করছ, আমি কষ্টের হাত হতে বাঁচার জন্য তারা পছন্দ করে এমন কথা মুখে উচ্চারণ করব? এমনটা কোনো দিনও হবে না। আমি হযরত বেলাল (রাযি.)-এর রূহানি সন্তান। আমি হযরত খাব্বাব (রাযি.)-এর রূহানি সন্ত ান। আমি ইমাম আযম আবু হানীফার রূহানি সন্তান। আমি ইমাম মালেকর রূহানি সন্তান। আমি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের রূহানি সন্তান। আমি শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবি (রহ)-এর রূহানি সন্তান, শেষ বয়সে যার দুটি হাত কেটে দেওয়া হয়েছিল। আমি তাঁদেরই রূহানি সন্তান। স্মরণ রেখো, তাঁরা আমাদের দেহ থেকে জান বের করে ফেলতে পারবে; কিন্তু ঈমান বের করে নিতে পারবে না।

এবার হযরত মাদানি (রহ.) আরেকটি কথা শোনালেন। ইংরেজরা যখন দেখল, হযরত তাদের কথা মেনে নিচ্ছেন না, তখন তারা তার ব্যাপারে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিল। তখন হযরত সম্পূর্ণ শান্ত ছিলেন। তাঁর চেহারা আগেরই মতো জ্বলমল করছিল। কোনোরূপ শঙ্কার চিহ্ন তাঁর চেহারায় দেখা যায়নি। কিন্তু তাঁর চোখ থেকে অবিরত অশ্রু ঝরছিল। আমরা হযরতকে বললাম, হযরত! ফাঁসি দিয়ে দিলে তো এই কষ্টের জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। কিন্তু আমরা আপনার অশ্রুর কারণ বুঝতে পারছি না। হযরত তখন বললেন, দেখো, আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু আমি তো আল্লাহর ভয়ে আছি। আল্লাহ তো বেনিয়ায। তিনি তো অমুখাপেক্ষী। তাঁর এই সিফাতের ভয়েই আছি কাঁদছি। তিনি তো কখনো-কখনো বান্দার জান নিয়ে নেন; অথচ বান্দাকে কবুল করেন না। তাই আমার ভয় হচ্ছে, আল্লাহ বান্দার জান নিয়ে

নেন, আর কবুল করবেন না এমন হলে তো আমার... । তাই আমি আল্লাহর এই অমুখাপেক্ষিতাকে ভয় করছি ।

তো এরাই ছিলেন আমাদের আকাবের ওলামায়ে কেরাম ।

أُولٰئِكَ اٰبَائِيْ فَجِئْنِيْ بِمِثْلِهِمْ.

'তাঁরা আমাদের পূর্বপুরুষ । যদি পার নিয়ে আসো তাদের মতো কোনো মানুষ ।'

এঁরা আমাদের আকাবির । এঁদেরই রূহানি সন্তান আমরা । এঁদের জীবন আজ সামনে রাখতে হবে । এঁদের পদচিহ্ন দেখে-দেখে পথ চলতে হবে । পা থেকে মাথা পর্যন্ত সুন্নত ও শরীয়তের আদর্শ অনুযায়ী চলতে হবে । আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফীক দান করুন । আমীন ।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

তাকওয়ার প্রতি যত্নবান হোন

'অনেক সময় মানুষ পেরেশান হয়ে ভাবে, কেউ মনে হয় আমার অনিষ্ট করছে, আমার সন্তানের ওপর আছর করছে, আমার স্ত্রীর ওপর আছর করছে, আমার মেয়ের ওপর আছর করছে। জাদু করেছে, দিকভ্রান্ত করেছে। কেউ বন্ধ করে রেখেছে। আমার কাজকারবারের বিরুদ্ধে তাবিজ করেছে। কেউ ভাবে, হিংসুকেরা আমাকে চলতেই দিচ্ছে না। এমন যদি কোনো সময় হয়ে যায়, তাহলে তদবিরকারীদের কাছে যাবেন না; বরং কোরআনের আমল করুন। আল্লাহ বিরোধীদের থেকে, হিংসুকদের থেকে আপনাকে হেফাজত করবেন। দুটি কাজ করবেন। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ ﴿١٢٠﴾

'যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তা হলে তাদের অনিষ্ট তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'[১]

তো এর চেয়ে বড় গ্যারান্টি আর কী হতে পারে? কারও পিছে চলার প্রয়োজন হবে না। সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করার দ্বারা আল্লাহ বান্দাকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেন। কেউ তার পশমও নাড়াতে পারে না।'

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১২০

তাকওয়ার প্রতি যত্নবান হোন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ : اِنْ اَوْلِيَاؤُهٗ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ

তাকওয়ার অর্থ

'তাকওয়া' শব্দটি আরবি। শব্দটি হাদীছেও ব্যবহার হয়েছে, কুরআনেও ব্যবহার হয়েছে। অর্থ হলো বাঁচা, নিরাপদ থাকা, আত্মরক্ষা করা, পরহেয করা।

তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ

শব্দটি আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রমতে باب افتعال এর اسم مصدر। শব্দটি مجرد হিসেবে এভাবে صرف صغير হয় وَقٰى يَقِيْ وِقَايَةً অর্থ বাঁচানো। হেফাজত করা। وَاقٍ অর্থ রক্ষাকারী, হেফাজতকারী। কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আছে–

فَمَا لَهُمْ مِّنْ وَّاقٍ

'তাদের কোনো রক্ষাকারী থাকবে না।'

আরবি প্রবাদ আছে–

اَلْوِقَايَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْعِلَاجِ

'প্রতিরক্ষা ও সতর্কতা চিকিৎসা থেকে উত্তম।'

সূরা ফাতেহার একটি নাম হচ্ছে وَاقِيَة (রক্ষাকারী)। কারণ, এই সূরা রোগব্যাধি, বিপদাপদ ও বালামসিবত ইত্যাদি থেকে মানুষকে রক্ষা করে। সাহাবা কেরাম বলতেন, কোনো সময় রণাঙ্গনে যদি যুদ্ধ তুমুল আকার ধারণ করত, শত্রুবাহিনী শক্তি দেখাত, তখন

اِتَّقَيْنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ

'আমরা আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করতাম।'

তাকওয়ার পারিভার্ষিক অর্থ

ইমাম রাগেব ইস্‌ফাহানি লিখেছেন, শরীয়তের পরিভাষায় তাকওয়া হচ্ছে–

حِفْظُ النَّفْسِ عَمَّا يُؤْثِمُ وَذَالِكَ بِتَرْكِ الْمَحْظُوْرِ وَتَتِمُّ ذَالِكَ بِتَرْكِ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ

নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানো। আর তা নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে হয়ে থাকে। হারাম থেকে বাঁচার লক্ষ্যে অনেক সময় মুবাহ বিষয়ও পরিত্যাগ করতে হয়।

আল্লামা জুরজানি (রহ.) বলেছেন–

طاعت میں تقوی سے مراد اخلاص ہے اور معصیت میں تقوی سے مراد بچنا ہے

আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাকওয়া হচ্ছে এখলাছের নাম আর গুনাহের ক্ষেত্রে তাকওয়া হচ্ছে বেঁচে থাকার নাম।

আরও বলা হয়েছে–

اَلْمُحَافَظَةُ عَلٰى اٰدَابِ الشَّرْعِيَّةِ وَمُجَانَبَةُ كُلِّ مَا يُبْعِدُ الْمَرْءَ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى

তাকওয়া হচ্ছে আদাবে শরীয়তের হেফাযাত করা এবং মানুষকে যা আল্লাহ থেকে দূরে রাখে তার থেকে বিরত থাকা।

আরও বলা হয়–

هِيَ تَرْكُ حَظُوْظِ النَّفْسِ وَمَبَانِيَةِ الْهَوٰى

'নাফসের মজা ও খাহেশাতের স্থানগুলো থেকে বেঁচে থাকা।'

এও বলা হয় যে,

هِيَ تَجَنُّبٌ عَنْ كُلِّ مَا يُؤَثِّمُ مِنْ فِعْلٍ اَوْ تَرْكٍ

'যেকোনো কাজ করা বা ছাড়ার ক্ষেত্রে গুনাহ থেকে বাঁচার নামই তাকওয়া।'

মালেক ইবনে আনাস (রাযি.) বলেছেন, তাকওয়া হচ্ছে–

رَضِيَ بِالْقَضَاءِ وَصَبَرَ عَلَى الْبَلَاءِ وَشَكَرَ عَلَى النَّعْمَاءِ

'নিজের তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা, মসিবতে ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতরাজির ওপর শুকরিয়া আদায় করা।'

তো আমরা সহজে বুঝতে পারি, তাকওয়া হচ্ছে–

প্রত্যেক ওই কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা, যা বান্দাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

তাকওয়ার ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের বক্তব্য

উম্মতের আকাবিরে কেরাম তাকওয়ার তাফসীর বড় সুন্দরভাবে প্রদান করে গেছেন যেন সকলে বুঝে নিতে পারে, তাকওয়া আসলে কী জিনিস?

হযরত আলী (রাযি.) বলেছেন–

اَلتَّقْوٰى هِيَ الْخَوْفُ مِنَ الْجَلِيْلِ وَالْعَمَلُ بِالتَّنْزِيْلِ وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيْلِ وَالْاِسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيْلِ

তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল ইযযাতকে ভয় করা, কুরআন মাজীদ মোতাবেক আমল করা, অল্পে তুষ্ট থাকা আর কেয়ামতের দিনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলি (রহ.) বলেছেন–

اَصْلُ التَّقْوٰى اَنْ يَّجْعَلَ الْعَبْدُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ مَا يَخَافُهٗ وَيَحْذَرُهٗ وِقَايَةً تَقِيْهِ مِنْهُ

তাকওয়ার মূল হচ্ছে, বান্দা ওই সকল কাজ ও নিজের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, যা মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, যেন ওই কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

হযরত ওমর (রাযি.) উবাই ইবনে কা'ব (রাযি.)কে জিজ্ঞেস করেছিলেন–

مَا التَّقْوٰى

'তাকওয়া কী?'

তিনি বললেন–

اَمَا تَلْقٰى طَرِيْقًا فِيْهِ شَوْكًا

'কখনো কি এমন পথে অতিক্রম করেছ, যাতে কাঁটা রয়েছে?'

হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, হ্যাঁ করেছি।

فَقَالَ مَاذَا فَعَلْتَ

'কেমন করে অতিক্রম করেছ সেই পথ?'

হযরত ওমর (রাযি.) বললেন–

أُشَمِّرُ عَنْ سَاقِيْ وَأَنْظُرُ إِلَى مَوَاضِعِ قَدَمِيْ وَأُقَدِّمُ قَدَمًا وَأُعَخِّرُ أُخْرٰى مَخَافَةُ أَنْ تُصِيْبَنِيْ شَوْكَةٌ

যখন ওই পথ চলি, আমি আমার পোশাক গুটিয়ে পায়ের গোড়ালির ওপরে উঠিয়ে নিই এবং যেখানে কদম রাখি, সেই স্থানে দৃষ্টি দেই। এক কদম আগাই. (যেখানে কাঁটা নেই) আরেক কদম সরিয়ে নেই (যেখানে কাঁটা আছে সেখান থেকে)। এমন করি আমার গায়ে কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার ভয়ে।

وَقَالَ أُبَيُّ ابْنُ كَعْبٍ: تِلْكَ التَّقْوٰى

'হযরত উবাই ইবনে কা'ব বললেন, এরই নাম তাকওয়া।'

হযরত সুফিয়ান ছাওরি (রহ.) বলেছেন–

إِنَّمَا سُمُّوْا مُتَّقِيْنَ لِأَنَّهُمْ اتَّقُوْا مَا لَا يُتَّقٰى

'মুত্তাকীদের এজন্যই তো মুত্তাকী বলা হয়। কারণ, তারা ওই সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকে, যেসব বিষয় থেকে সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকে না।'

হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন–

اَلتَّقْوٰى أَنْ لَّا يَرٰى (نفسه) خَيْرًا مِنْ أَحَدٍ

'তাকওয়া হচ্ছে নিজেকে অন্যের চেয়ে ভালো মনে না করার নাম।'

কোনো এক বুযুর্গ বলেছেন–

اَلْمُتَّقِيْ هُوَ. إِذَا قَالَ قَالَ لِلّٰهِ، إِذَا سَكَتَ سَكَتَ لِلّٰهِ، وَإِذَا ذَكَرَ ذَكَرَ لِلّٰهِ تَعَالٰى

'মুত্তাকী সে, যে যখন কথা বলে আল্লাহর জন্য বলে, যখন চুপ থাকে আল্লাহর জন্য চুপ থাকে। আর যখন যিকির করে, আল্লাহর জন্য করে।'

অন্য এক বুযুর্গ বড় সুন্দর কথা বলেছেন–

أَنْ تُزَيِّنَ سِرَّكَ لِلْحَقِّ كَمَا تُزَيِّنُ عَلَانِيَتَكَ لِلْخَلْقِ

'তোমরা অভ্যন্তরকে আল্লাহর জন্য এমনভাবে সুন্দর করো, যেমনভাবে তোমার চেহারাকে মাখলুকের জন্য সুন্দর করে থাক।'

তুমি কখনও কোনো মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করতে হলে বিশেষ প্রস্তুতি নিয়ে গমন করো। কোনো মিটিংয়ে যেতে হলে ধোওয়া জামাকাপড়, ভালো

পোশাক পরিধান করে যাও। বিবাহ অনুষ্ঠানে বরং কনের সাক্ষাতে যায় বড় সুন্দর পোশাক পরে। ইন্টারভিউ দিতে গেলে মানুষ এক ধরনের প্রস্তুতি নিয়েই যায়। তো যেমনিভাবে মাখলুকের সাথে, মানুষের সাথে সাক্ষাতের জন্য তোমার আত্মাকে, তোমার হৃদয়কে তোমার অভ্যন্তরকে ওইভাবে প্রস্তুত করো, সুন্দর করো। এরই নাম হচ্ছে তাকওয়া। মাখলুক তো বাহ্যিক চেহারা দেখে। মুখটা ধুল কি-না, ভালো পোশাকটা পরল কি-না দেখে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ দিলটা দেখবেন। দিলে ময়লা আছে কি-না, দিলটা পরিশুদ্ধ কি-না দেখবেন।

আমাদের হযরত খাজা আবদুল মালেক সিদ্দীকি (রহ.) বলতেন, তাকওয়া বলা হয় প্রত্যেক এমন কর্ম ছেড়ে দেওয়াকে, যার কারণে তা'আল্লুক মা'আল্লায় ফটল সৃষ্টি হয়।

হযরত যুননূন মিছরি (রহ.) বলতেন, হৃদয়ের ইচ্ছেগুলোকে যদি দেহের আকৃতি দেওয়া হয় আর তাকে একটা তশতরিতে রেখে বাজারময় ঘুরে আসা হয়, তাহলে যদি এমন হয় যে, প্রতিটি ইচ্ছা-ই এমন হয় যে, তার কোনোটির কারণেই লজ্জিত না হতে হয়, তাহলেই তা তাকওয়া।

আরেকটি বিষয় হলো, আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেহমানের জন্য খাবার পাকালে ১০০ জনের স্থানে ১১০ জনের খাবার প্রস্তুত করি। কেন করি? সতর্কতার খাতিরে করি। বিমান ছাড়ার সময় যদি হয় ১০ টা, তাহলে আমরা ৮.০০ টায় সেখানে পৌঁছে যাই। কেন? সতর্কতার খাতিরে। তো দুনিয়ার ব্যাপারে এত সতর্কতা আমাদের। দীনের ব্যাপারে কি আমরা To be on the safe side-এর ভিত্তিতে চলতে পারি না। সতর্কতা হিসেবে সাবধান হয়ে চলতে পারি না? একেই তো তাকওয়া বলা হয়। বান্দা গুনাহের কাছেও যাবে না।

তাকওয়ার ফলাফল

তাকওয়ার ফায়দা অনেক। চলুন, কুরআন খুলে দেখি কী লেখা আছে তাকওয়ার ব্যাপারে?

তাকওয়া প্রত্যেক কঠিন বিষয় থেকে নাজাত দেয়

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, মুত্তাকী বান্দার সকল কাজ আমি সহজ করে দিই। প্রত্যেক মুশকিল বিষয় থেকে আমি তাকে বের করে নিয়ে আসি। ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

'যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নাজাতের উপায় বের করে দেন।'[১]

আপনি কোনো মসিবতে যদি পতিত হন, কোনো পেরেশানিতে যদি পড়েন, যদি দুশমনের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হন, তাহলে তার থেকে পবিত্রাণ পাওয়ার সহজ মাধ্যম হচ্ছে তাকওয়া অবলম্বন করা। এটি আল্লাহর ওয়াদা। এই ওয়াদা পূর্ণ হবেই।

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا

'তার চেয়ে সত্য কথা আর কার হতে পারে?'[২]

রিযিকের পেরেশানি দূর হয়ে যাবে

তাকওয়া আরেকটি ফায়দা হচ্ছে, এমন স্থান থেকে আল্লাহ রিযিকের ব্যবস্থা করবেন, যার কথা বান্দা কল্পনাও করতে পারে না।

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

'তিনি এমন উৎস থেকে রিযিক দেবেন, যার কথা কল্পনাও করা যায় না।'[৩]

আমার এক নিকটতম বন্ধু বড় নেককার মানুষ। তিনি তার বোনকে বিবাহ দিলেন। আয়োজন ইত্যাদি করতে-করতে তার প্রায় লক্ষ টাকা ঋণ হয়ে গেছে। শনে আমিও পেরেশান হলাম। লোকটার বোঝা কত ভারী হয়ে গেল। আল্লাহর কী শান! ভালো মানুষ ছিলেন। তো মাত্র ছ-মাসেই সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়ে গেল। কীভাবে? লোকটি বলল, আমিও জানি না, কীভাবে কী হলো। তাকে আল্লাহ এমন কাজ দান করলেন, যার খবর তার ছিল না। অগোচরেই তার সমস্ত হাজত পূর্ণ হয়ে গেল। দেখুন, আল্লাহ কীভাবে পেরেশানি দূর করে দেন। আমরা যে পেরেশানিতে পড়ে যাই, তার কারণ হচ্ছে আমাদের আমলের কমতি, আমাদের তাকওয়ার দুর্বলতা। যদি তাকওয়া অবলম্বন করতে পারি, তাহলে আল্লাহ আমাদের হেফাযত করবেন।

---

১. সূরা তালাক : আয়াত ২
২. সূরা নিসা : আয়াত ২২
৩. সূরা তালাক : আয়াত ৩

কর্মে আসানি আসবে

আরেকটি আয়াত–

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

'যে তাকওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ তার কাজ আসান করে দেবেন।'[১]

কত মানুষ বলে থাকে, আহ! কাজ শেষই হচ্ছে না– করতে-করতে আরও রয়ে যায়। কত কাজ চারপাশ থেকে জড়িয়ে ধরে। মেয়েকে দেখতে সম্বন্ধ আসছে। দেখে খুশিও হচ্ছে। কিন্তু পরে আর যোগাযোগ করছে না। এই যে আমাদের কাজ, কোনোটাই ঠিকমতো হচ্ছে না– কঠিন-থেকে-কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে। সমাধান না হয়ে কাজ অসমাপ্ত থেকে যাচ্ছে। এসব তাকওয়া না থাকার কারণেই হচ্ছে। অথচ ঘোষণা হয়ে আছে–

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

'যে-ই তাকওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ তার কাজকর্ম সহজ করে দেবেন।'

এমনকি মুত্তাকীদের কেয়ামতের দিন আল্লাহ সর্বপ্রকার পেরেশানি থেকে নাজাত দান করবেন।

ইরশাদ হচ্ছে–

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا

'অতঃপর আমি মুত্তাকীদের নাজাত দান করব আর জালেমদের এভাবেই ছেড়ে দেব।'[২]

তো তাকওয়ার মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে আসানি আসে আর আখেরাতে পাওয়া যায় নাজাত। আজ কোনো এক বান্দাকে যদি বলা হয়, ভাই! আমি তোমাকে অমুক রাষ্ট্রের কোনো বড় ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেব; তোমার কর্ম সম্পাদন করা সহজ হয়ে যাবে, তাহলে সে খুশিতে আটখানা হয়ে যাবে। অথচ এখানে পরওয়ারদেগারে আলম বলে দিচ্ছেন, তোমরা এই কাজটি করে নাও; তোমাদের কর্ম সহজ করে দেব।

আশ্চর্য কথা যে, এই কথাটিই আজ আমাদের বুঝে আসছে না। তাকওয়া অর্জন সমৃদ্ধ জীবন যাপনের সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতি। বাহ্যিকভাবে মনে হবে, তাকওয়া অর্জন করতে হলে অনেক কিছু ছাড়তে হবে। কিন্তু

---

১. সূরা তালাক : আয়াত ৪

২. সূরা মারয়াম : আয়াত ৭২

বাস্তবে ব্যাপারটা এমন নয়। বাস্তবতা তো এই যে, যতটুকু ছাড়া হবে, তার চেয়ে বেশি আল্লাহ দিয়ে দেবেন। আমরা ত্যাগ করব অল্প আর আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের ফিরিয়ে দেবেন অনেক। তিনি তো বরং একের বদলে দশ দান করেন। এটি হলো ন্যূনতম সংখ্যা। আর বেশি তো সত্তরগুণও দান করেন।

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ

'আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বাড়িয়ে দেন।'[১]

বোধশক্তি প্রদান করেন

তাকওয়ার আরেকটি ফায়দা হচ্ছে, এর ফলে আল্লাহ মানুষকে ভালো-খারাপের মাঝে প্রভেদ নির্ণয়ের শক্তি প্রদান করেন। এতে মানুষ নিজেকে আত্মরক্ষা করতে পারে সহজেই।

اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا

'যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ফোরকান দান করবেন।'[২]

আর ফোরকান হচ্ছে এমন একটি নূর, যার মাধ্যমে মানুষ হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয়।

এলাহি প্রেমের ভাগিদার হবে

তাকওয়া অর্জনের আরেকটি ফায়দা হচ্ছে, আল্লাহ ওই বান্দাকে ভালোবাসেন, মহব্বত করেন। আজ স্বামী চায়, আমি আমার স্ত্রীর কাছে ভালো লাগে এমন করে পরিবেশিত হব। তো বান্দা কি এটি চাইতে পারে না যে, আমি আজ আমার আল্লাহর কাছে ভালো লাগে এমন করে চলব। ইরশাদ হচ্ছে–

فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন, ভালো বাসেন।'[৩]

তাই ভালোবাসা পেতে হলে তাকওয়া অবলম্বন করা চাই।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২৬১

২. সূরা আনফাল : আয়াত ২৯

৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৭২

এলাহি সম্পর্ক স্থাপিত হবে

মুত্তাকীদের সাথে আল্লাহর এক অপার্থিব সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

'জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।'[১]

রিযিকে বরকত হয়

মুত্তাকী বান্দার রিযিকের মধ্যে আল্লাহ বরকত দান করেন। তো রিযিকের মধ্যে যখন বরকত হবে, তখন অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষিতা থাকবে না।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۝

'যদি জনপদবাসী ঈমান আনয়ন করত এবং তাকওয়া অর্জন করত, তাহলে আমি আসমান ও জমিন থেকে তাদের জন্য বরকতের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিতাম।'[২]

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

'যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য দুনিয়ায়ও সুসংবাদ রয়েছে, আখেরাতেও সুসংবাদ রয়েছে।'[৩]

ইল্‌মের প্রবৃদ্ধি

তাকওয়া অর্জনের আরেকটি ফায়দা হচ্ছে, এতে আল্লাহ তা'আলা ইল্‌মে প্রবৃদ্ধি দান করেন। ইল্‌মে গভীরতা দান করেন। ইল্‌ম বাড়িয়ে দেন।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ

'তোমরা তাকওয়া অর্জন করো; আল্লাহ তোমাদের ইল্‌ম শিক্ষা দেবেন।'[৪]

আমল কবুল করে নেবেন

আল্লাহ মুত্তাকী বান্দার আমল কবুল করে নেন এবং দ্রুত কবুল করেন।

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ৩৬
২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৯৬
৩. সূরা ইউনুস : আয়াত ৬৩, ৬৪
৪. সূরা বাকারা : আয়াত ২৮২

'নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের আমল কবুল করেন।'[১]

অনিষ্ট হতে রক্ষা করবেন

অনেক সময় মানুষ পেরেশান হয়ে ভাবে, কেউ মনে হয় আমার অনিষ্ট করছে, আমার সন্তানের ওপর আছর করছে, আমার স্ত্রীর ওপর আছর করছে, আমার মেয়ের ওপর আছর করছে। জাদু করেছে, দিকভ্রান্ত করেছে। কেউ বন্ধ করে রেখেছে। আমার কাজকারবারের বিরুদ্ধে তাবিজ করেছে। কেউ ভাবে, হিংসুকেরা আমাকে চলতেই দিচ্ছে না। এমন যদি কোনো সময় হয়ে যায়, তাহলে তদবিরকারীদের কাছে যাবেন না; বরং কোরআনের আমল করুন। আল্লাহ বিরোধীদের থেকে, হিংসুকদের থেকে আপনাকে হেফাজত করবেন। দুটি কাজ করবেন। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ ﴿١٢٠﴾

'যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তা হলে তাদের অনিষ্ট তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'[২]

তো এর চেয়ে বড় গ্যারান্টি আর কী হতে পারে? কারও পিছে চলার প্রয়োজন হবে না। সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করার দ্বারা আল্লাহ বান্দাকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেন। কেউ তার পশমও নাড়াতে পারে না।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একটি ঘটনা লিখিত আছে। দুজন বন্ধু ছিলেন। একজনের নাম কল্যাণ, অন্যজনের নাম দুষ্কৃতি। তো কল্যাণের মাঝে ছিল সব ভালো-ভালো গুণ। আর দুষ্কৃতির মাঝে ছিল সর্বপ্রকার অনিষ্টতার গুণ। দ্বিতীয়জন থেকে ভালো কিছু আশা করা যেত না আর প্রথমজন থেকে খারাপ কিছু আশা করা হতো না। দুজন ছোটকালের বন্ধু। কল্যাণ তার বন্ধুর সাথে সর্বদা ভালো আচরণ করত আর দুষ্কৃতি সর্বদা তার বন্ধুর সাথে দুর্ব্যবহার করত। একবার কল্যাণ মিয়া কোথাও গেল। ক্লান্ত হয়ে একটা টিলার ওপর শুয়ে পড়েছে। এদিকে দুটা পাখি কথোপকথন করছে। আল্লাহ যদি চান তো পাখির কথনকেই ইল্‌ম অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে দেন। ইরশাদ হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ২৭

২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১২০

'হে লোকসকল! আমাকে পাখির কর্থন, শিক্ষা দান করা হয়েছে।'[১]

তো আল্লাহ কল্যাণকে পাখির কথা বোঝার তাওফীক দিয়ে দিলেন। পাখিরা একজন বলল, আমাকে কোনো সংবাদ শোনাও। দ্বিতীয় পাখি বলল, বাদশাহর মেয়েটা আজকাল অসুস্থ। তার রোগের ওষুধ হলো এই গাছের শিকড়। এবার দ্বিতীয় পাখি প্রথম পাখিকে বলল, তুমি একটা খবর শোনাও। প্রথম পাখি বলল, আমরা যে-টিলাটায় বসে আছি, তা একটা টিলামাত্র নয়। এটা একটা খাজানা, এখানে সম্পদের একটা খনি আছে।

তো এই কথাগুলো ওই ছেলে শুনে নিল। সে খবর নিয়ে দেখল, বাস্তবেই বাদশাহর মেয়ে অসুস্থ। ছেলে বলল, আমি চিকিৎসা করব। সে এই গাছের শেকড় নিয়ে দিলে এতে আল্লাহ বাদশাহর মেয়েকে শেফা দান করলেন। বাদশাহ কল্যাণ মিয়াকে বড় ধরনের পুরস্কার দিলেন।

কল্যাণ মিয়া পুরস্কার নিয়ে যাচ্ছে। পথিমধ্যে দেখা হলো তার সেই বন্ধু দুস্কৃতির সাথে। দুস্কৃতি বলল, কী রে বন্ধু! এসব কোথায় পেলি? কল্যাণ বলল, তোমার বরকতেই তো পেলাম। তুমি আমাকে জ্বালাতন করতে। তোমার জ্বালায় অতিষ্ট হয়ে আমি বের হয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলাম। এই ওসিলায় আল্লাহ আমাকে এসব দান করেছেন। দুস্কৃতি বলল, আচ্ছা আমার কারণে পেয়েছ তো বাদশাহকে বলো আমাকেও কিছু দিতে।

কল্যাণ মিয়া সুপারিশ করলে বাদশাহ দুস্কৃতিকেও কিছু দিল। ও তো ছিলই দুস্কৃতি। করত সব অন্যায় ও অশোভন কাজ। একদিন কোথাও কথা হচ্ছিল। দুস্কৃতি বলল, বাদশাহর চিকিৎসক তো আমার গাঁয়ের অমুক। এই বলে সে একটা নীচু জাতের নাম নিল। কথাটা বাদশাহর কানে গেলে বাদশাহ খুব রাগান্বিত হয়ে গেলেন। বাদশাহ বললেন, তুমি এমন নীচু জাতের মানুষ হয়ে আমার কন্যার চিকিৎসা করছ! বাদশাহ হুকুম দিলেন ছেলেটাকে শায়েস্তা করতে। কল্যাণ মিয়াকে শায়েস্তা করতে আনা হলো।

বাদশাহ বললেন, তুমি নীচু জাতের মানুষ আমার ঘরের সদস্যদের চিকিৎসা করতে এসে অন্যায় করেছ। এখানে তো আসবে উঁচু জাতের বড়-বড় ডাক্তাররা।

কল্যাণ মিয়া বলল, বাদশাহ! আপনি কল্যাণে থাকুন। আমি তো বড় ডাক্তারই। কিন্তু আমি লোকদের মাঝে সেকথা বলে বেড়াই না। বাদশাহ বললেন, প্রমাণ দাও। সে বলল, আমার সাথে চলুন। সে গিয়ে ওই টিলাটা

---

১. সূরা নাম্‌ল : আয়াত ১৬

দেখাল এবং বলল, এটা খনন করুন। এর নিচে আমার ধনভান্ডার রয়েছে। খাজানা বের হলো। এবার বাদশাহ বিমোহিত হয়ে নিজের কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দিয়ে দিলেন। বাদশাহ চিন্তা করলেন, এত বড় লোক সে! এত অর্থসম্পদ তার!

এবার আবার সেই দুস্কৃতির সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। তাকে বলা হলো, বাদশাহর কন্যার সাথে আমার বিবাহ হয়েছে। দুস্কৃতি বলল, কীভাবে? কল্যাণ মিয়া বলল, তোমারই বরকতে।

তো দেখুন, এ ঘটনাটা আমি এজন্য শুনিয়েছি যে, কারও দিকে তাকানোর প্রয়োজন বান্দার নেই। সবর করলে, তাকওয়া অবলম্বন করলে হিংসুকদের হাত হতে আল্লাহ রক্ষা করবেন। হিংসাত্মক বিষয়কে আল্লাহ উপকারী বানিয়ে দেবেন।

لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

'তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না।'[১]

তাকওয়ার গুরুত্ব

তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাকওয়া ওলী ও বেলায়েত প্রাপ্ত হওয়ার জন্য শর্ত। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ

'আল্লাহর ওলী তারা-ই, যারা মুত্তাকী।'[২]

তাকওয়া ব্যতীত বেলায়েতের স্তরে উন্নীত হওয়া যায় না।

তাকওয়ার পয়গাম কুরআনে

কুরআন ও সুন্নায় তাকওয়া অর্জনের জন্যে অনেক উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এর জন্য গুরুত্ব প্রদান করেছেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কুরআনের দিকে তাকান :

হযরত নূহ (আ.) এর পয়গাম ছিল এই তাকওয়া–

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

'যখন তাদের ভাই নূহ বলল, তোমরা কি তাকওয়াবান হবে না?'[৩]

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১২০
২. সূরা আনফাল : আয়াত ২৪
৩. সূরা শু'আরা : আয়াত ১০৬

হযরত হূদ (আ.)-এর পয়গাম ছিল তাকওয়া–

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ

'যখন তাদের ভাই হূদ বলল, তোমরা কি তাকওয়াবান হবে না?'[১]

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

'যখন তাদের ভাই ছালেহ বলল, তোমরা কি তাকওয়াবান হবে না?'[২]

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ

'যখন তাদের ভাই শু'ইাইব বলল, তোমরা কি তাকওয়াবান হবে না?'[৩]

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

'ইলিয়াসও অবশ্যই রাসূলদের একজন। যখন সে তার জাতিকে বলল, তোমরা কি তাকওয়াবান হবে না?'[৪]

'তারপর যুগপরম্পরায় আমাদেরও একই হুকুম প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন–

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ

'তোমাদের আগে আমি যাদের কিতাব দিয়েছিলাম, তাদের উপদেশ দিয়েছি এবং তোমাদেরও দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।'[৫]

কেমন শাহি আন্দাজে আমাদের সম্বোধণ করে বলা হচ্ছে!

তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও এই নসিহত করা হয়েছে, তোমাদেরও একই নসিহত করা হচ্ছে! বলা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো। মানুষ কোনো কথা গুরুত্বপূর্ণ হলে তা একাধিকবার বলে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলাও তেমনই করেছেন। একই কথা কয়েকবার বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿١٨﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর সব মানুষেরই দেখা উচিত, সে আগামীর জন্য কী পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।'[৬]

---

১. সূরা শু'আরা : আয়াত ১২৪
২. সূরা শু'আরা : আয়াত ১৪৩
৩. সূরা শু'আরা : আয়াত ১৭৭
৪. সূরা ছফফাত : আয়াত ১২৩, ১২৪
৫. সূরা নিসা : আয়াত ১৩১
৬. সূরা হাশর : আয়াত ১৮

দেখুন একই কথা বারবার বলা হচ্ছে।

اِتَّقُوا اللّٰهَ. اِتَّقُوا اللّٰهَ

'আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো।'

তো এর মাধ্যমে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে যে, তোমরা তাকওয়াবান হও, তোমরা তাকওয়া বান হও।

সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান হচ্ছে মুত্তাকী

হযরত আলী (রাযি.) ইরশাদ করেছেন–

سَادَةُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا الْاَسْخِيَاءُ وَسَادَةُ النَّاسِ فِي الْاٰخِرَةِ الْاَتْقِيَاءُ

'দুনিয়ায় সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হচ্ছে দানশীলরা। আর আখেরাতে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হবে তাকওয়াবানরা।'

মুত্তাকী সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত

এই তাকওয়ার মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। অন্যথায় সকল মানুষ তো একই স্তরের।

سُئِلَ سَيِّدُنَا عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اَيُّ النَّاسِ اَشْرَفُ

হযরত ঈসা (আ.)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত?

وَقَبَضَ قَبْضَتَيْنِ مِنْ تُرَابٍ

'তিনি দু-মুঠো মাটি নিলেন।'

তারপর বললেন–

اَيُّ هٰذَيْنِ اَشْرَفُ

'এর দুটির কোনটি উত্তম?'

লোকেরা বলল, উভয়ই তো এক।

ثُمَّ جَمَعَهُمَا وَطَرَحَهَا وَقَالَ

'এবার তিনি উভয়গুলো একত্র করলেন এবং ছুড়ে ফেলে দিলেন।'

তারপর বললেন–

اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْ تُرَابٍ وَاَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ

সকল বান্দা সমান। তবে তাদের মদ্দে তাকওয়াবানরা আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও মর্যাদাবান।

কুরআনুল কারীমে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ

'হে মানবসকল! আমি তোমাদের একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে গোত্রে-গোত্রে ও সমাজে-সমাজে বানিয়েছি, যেন তোমরা একে অন্যের পরিচিত হতে পার। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের থেকে সম্মানিত সে, যে আল্লাহর প্রতি বেশি তাকওয়াবান, যে বেশি পরহেযগার।'[১]

আউলিয়া কেরামের আলোচনা

একবার কোনো এক মজমায় বিপুলসংখ্যক অলি একত্র হলেন। তাঁরা পরস্পর কথা বলছিলেন। আলোচ্যবিষয় ছিল, নাজাত কে পাবে?

জুনাইদ বাগদাদি (রহ.) বললেন–

مَا نَجَا مَنْ نَجَا اِلَّا بِصِدْقِ اللَّجَا

'যে যখনই নাজাত পেয়েছে, সত্যের কারণে নাজাত পেয়েছে।'

তাঁদের মাথায় এই আয়াতে মুবারাকা ছিল–

وَّ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ

'এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকেও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত-না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুবিষহ হয়ে গিয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল, আল্লাহ ছাড়া কোনো আশ্রয় নেই।'[২]

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাযি.) সত্য বলেছেন। ফলে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত তাঁকে নাজাত দিয়ে দিয়েছেন।

সেই আওলিয়া কেরামের মজমায় হযরত জারীরিও ছিলেন। তিনি বললেন–

مَا نَجَا مَنْ نَجَا اِلَّا بِمُرَاعَاةِ الْوَفَا

---

১. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১৩

২. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৮

যখনই যে নাজাত পেয়েছে, সে বিশ্বস্ততার প্রতি যত্নবান থাকার কারণেই নাজাত পেয়েছে। কারণ, ইরশাদ হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ

'যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার মান্য করেছে এবং অঙ্গীকার ভেঙে দেয়নি।'[১]

সেই মজলিসে আতা ইবনে আবী রাবাহও ছিলেন। তিনি বললেন–

مَا نَجَا مَنْ نَجَا اِلَّا بِتَحْقِيْقِ الْحَيَا

যে যখনই নাজাত পেয়েছে, সে লজ্জার প্রতি যত্নবান হওয়ার কারণে নাজাত পেয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى

'তার কি জানা নেই, আল্লাহ তাকে দেখছেন?'[২]

হযরত হাসান বছরি (রহ.) ও সেখানে ছিলেন

مَا نَجَا مَنْ نَجَا اِلَّا بِالْحُكْمِ وَالْقَضَا

সে যখনই নাজাত পেয়েছে আল্লাহর হুকুম ও ফয়সালার কারণেই পেয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى

'যাদের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে সৌভাগ্য ও কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে...।'[৩]

এই আয়াত দ্বারা তো বোঝা যায়, যার তাকদীরে আছে, সে-ই নাজাত পাবে। আর যার নেই, সে পাবে না।

আরেক বুযুর্গ বললেন–

مَا نَجَا مَنْ نَجَا اِلَّا سَبَقَ لَهٗ مِنَ الْاِجْتِبَاءِ

যে যখনই নাজাত পেয়েছে, সে আল্লাহর মনোনয়নের কারণেই নাজাত পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

---

১. সূরা রা'দ : আয়াত ২০
২. সূরা আলাক : আয়াত ২০
৩. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ১০১

'আমি তাদের মনোনীত করেছি এবং হেদায়েতের পথে পরিচালিত করেছি।'[১]

সেখানে হযরত রুওয়াইম (রহ.)ও ছিলেন। শেষ পর্যায়ে চূড়ান্ত কথা তিনিই বলে দিলেন–

مَا نَجَا مَنْ نَجَا إِلَّا بِصِدْقِ التُّقَى

যে যখনই নাজাত পেয়েছে, সে তাকওয়ার দ্বারাই নাজাত পেয়েছে।

সমর্থনে তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন–

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا

'অতঃপর আমি তাদেরই নাজাত দেই, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে।'[২]

তো দেখুন, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে নাজাত দেবেন বলে জানিয়েছেন। আর তা হবে তাকওয়ার মাধ্যমে। তাই বোঝা গেল, তাকওয়া অবলম্বন করা খুবই জরুরি বিষয়।

তাকওয়ার সবচেয়ে বড় উপকারিতা

শত ফায়দা তো আছেই। এসব ছাড়াও আল্লাহ তাকওয়ার মাধ্যমে মহব্বতের সম্পর্ক গড়েন। এতে বান্দা আল্লাহর মাহবুব হয়ে যায়, আল্লাহর অলি হয়ে যায়। তাই আমাদের পূর্বসূরি সালফে সালেহীন সকলেই মুত্তাকী ছিলেন। তাকওয়া এমন একটি গুণ, যা সকল আওলিয়া কেরামের মাঝে সম্মিলিতভাবে বিদ্যমান। কিছু গুণ এমন থাকে, যা সবার মাঝে বিদ্যমান থাকে। যেমন লজ্জাশীলতা সকল আওলিয়া কেরামের মাঝেই ছিল। আজ পর্যন্ত কোনো নির্লজ্জ মানুষ আল্লাহর ওলী হতে পারেনি, পারবেও না। তেমনি সম্মিলভাবে সবার মাঝে বিদ্যমান গুণটির নাম তাকওয়া। যিনি-ই অলি হয়েছেন, এই তাকওয়ার মাধ্যমেই হয়েছেন।

সালফে সালেহীনের তাকওয়া ঘটনা

এখানে আমাদের আকাবিরে কেরামের তাকওয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শোনানো হবে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হবে যে, আমাদের জন্য উচিত হলো শরীয়তের সীমারেখা মান্য করে চলা। খুব সতর্ক থাকা।

---

১. সূরা আন'আম : আয়াত ৮৭

২. সূরা মারয়াম : আয়াত ৭২

খাদ্যখাবারে নবীজির সতর্কতা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি অনেক সময় ঘরে আসি। আমার খুব ক্ষুধা পায়। আমার কামরায় আমি খেজুর দেখতে পাই। কিন্তু আমি সেই খেজুর খাই না এই চিন্তা করে যে, হতে পারে তা সদকার খেজুর। আর আমার জন্য সদকা খাওয়া নাজায়েয। তো ক্ষুধাও আছে, ঘরে খেজুরও আছে; কিন্তু সতর্কতাবশত তা খাননি।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর তাকওয়া

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর একবার ক্ষুধা পেল। গোলাম খেজুর এনে দিল। তিনি তা নিয়ে খেলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোথা থেকে এনেছ? বলল, আমি জাহেলি যুগে ঝাড়ফুকের কাজ করতাম। তাদের ওপর আমার অনুগ্রহ ছিল। আমি তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তাদের বিবাহের অনুষ্ঠান চলছিল। তারা আমাকে খাবার দিয়েছে। এগুলো সেই খাবার। হযরত আবু বকর (রাযি.) বললেন, তুমি তো আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছ। তিনি গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করলেন। এটি কেন করলেন তিনি? তাকওয়ার কারণে।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর তাকওয়া

হযরত ওমর (রাযি.)-এর খেলাফতকালে বাইতুল মালে খুশবু এল। এখন তা বণ্টন করে দিতে হবে হকদারদের মাঝে। হযরত ওমর (রাযি.)-এর স্ত্রী বললেন, আমি তা বণ্টন করে দিই। হযরত ওমর (রাযি.) সম্মত হলেন না। স্ত্রী বললেন, আমি সতর্ক থাকব যেন আমার আঙুলে না লাগে। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, এর গন্ধ তো তোমার নাকে লাগবে। এটিও তো ব্যবহারের শামিল। তো আমার পরিবারের কেউ বাইতুল মালের জিনিস ব্যবহার করুক এটা আমি চাই না।

এমন তাকওয়া ও পরহেযগারি ছিল তাঁদের।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর তাকওয়া

একবার বাইতুল মালের খুশবু বণ্টন করা প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি বন্টনের স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন অধিকারী ছাড়া অন্য কেউ লাইনে দাঁড়িয়ে নিয়ে যায় কি-না তা পর্যবেক্ষণের জন্যে। কিন্তু লোকেরা দেখল, তিনি নাক ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ একজন বললেন, নাক ধরেছেন কেন? তিনি বললেন, শুকলেই তো খুশবু ব্যবহার করা হবে।

কিছু লোক মনে করে, তাকওয়া শুধু খাওয়া আর পান করার মাঝেই সীমাবদ্ধ। এটা ভুল কথা। খানাপিনা তো আমাদের জীবনের একটি কর্ম। আর তাকওয়ার সম্পর্ক সারা জীবনের সমস্ত কর্মের সাথে যুক্ত। আচার-ব্যবহার, লেনদেন, ওঠাবসা, কথাবার্তা সর্বক্ষেত্রেই সতর্ক থাকতে হয়। সতর্কতামূলকভাবে উত্তম পন্থা অবলম্বন করতে হয়।

হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.)-এর তাকওয়া

আমাদের সেলসেলার একজন বুযুর্গের নাম ছিল কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক। তিনি মদিনার সাত ফুকাহার একজন ছিলেন। সায়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) তাঁকে নিজের ঘরে বড় করেছেন। তিনি তাঁর মুরুব্বী ছিলেন। আর তিনি হযরত সালমান ফারসি (রাযি.) থেকে ফয়েজ লাভ করেছেন। তাঁর যুগে তাঁর মতো ফকীহ ও মুত্তাকী আর কেউ ছিল না। তো তাঁর বাড়ির পাশেই একজনের বাড়ি ছিল। তিনি বড় আলেম ছিলেন। তাঁর নাম সালেম ইবনে আবদুল্লাহ। তো এক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করলেন, সালেম বড় আলেম, না কি আপনি বড় আলেম? বাস্তবেই কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ বড় আলেম ছিলেন। তো তিনি লোকটির প্রশ্নের মোড় পাল্টে বললেন, সালেমের ঘর ওইটি। তো তিনি সতর্কতামূলকভাবে এমন করে বললেন, যেন হারামে লিপ্ত না হতে হয়। তো বোঝা গেল, কথাবার্তার মাঝেও তাকওয়া আছে।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর তাকওয়া

দেখুন, পর্দা তো করতে হয় জীবিতদের সাথে– মৃতদের সাথে তো পর্দা করতে হয় না। অথচ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর আমল দেখুন। নবীজির রওজা শরীফে তিনি পর্দা ছাড়া যেত। যখন হযরত আবু বকর (রাযি.)কে দাফন করানো হলো, তখনও তিনি পর্দা ছাড়াই হুজরা শরীফে যেতেন। কারণ, ইনি তাঁর বাবা; এখানে তো পর্দা করতে হবে না। কিন্তু যখন সেখানে হযরত ওমর (রাযি.)কে দাফন করানো হলো, এবার তিনি পূর্ণ শরয়ী পর্দার সাথে যেতে লাগলেন। এটিই হচ্ছে তাকওয়া। উম্মুল মুমিনীনের পবিত্রতা বুঝতে হলে নবীজির পবিত্রতার কথা কল্পনায় আনতে হবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ

'পবিত্র নারীরা পবিত্র পুরুষদের জন্য।'

সায়্যেদা ফাতেমাতুয-যাহরা (রাযি.)-এর তাকওয়া

হযরত ফাতেমাতুয-যাহরা হচ্ছেন খাতুনে জান্নাত। স্বভাগতভাবেই তিনি অত্যন্ত লাজুক ছিলেন। একবার কথা হচ্ছিল, উত্তম নারী কে? একেকজন একেকজনের কথা বললেন। হযরত আলী (রাযি.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলে খাতুনে জান্নাত উত্তর দিলেন, সবচেয়ে উত্তম নারী তো সে, যে না নিজে গায়রে মাহরামকে দেখে, না কোনো গায়রে মাহরাম তাকে দেখে। ওফাতের পূর্বে তিনি ওসিয়ত করলেন, আমার জান বের হয়ে যাওয়ার পর রাতারাতি আমার জানাযা দিয়ে দেবে। আমার খাটিয়ার চার পাশে খেজুরের ডাল দিয়ে আবরণ তৈরি করে দেবে, যেন গায়রে মাহরাম কেউ আমার দৈহিক কাঠামো অনুমান করতে না পারে।

তাকওয়া একেই বলে। উম্মাহাতুল মু'মিনীনের ব্যাপারে লিখিত আছে যে, তারা অভ্যাসগতভাবেই ঘরে আঙিনায় বসলে দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসতেন, যেন কেউ গেট দিয়ে হঠাৎ প্রবেশ করলেও সে তাদের দেখতে না পায় এবং তাঁরাও আগন্তুককে দেখতে না পান।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর তাকওয়া

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর তাকওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি ঘটনা শুনুন। একবার তিনি একজন দাসি ক্রয় করার চিন্তা করলেন। দশ বছর পর্যন্ত তিনি তার শাগরেদদের সাথে পরামর্শ করছিলেন, কোন এলাকার দাসিরা শরীয়তের মাপকাঠিতে পুরোপুরি জায়েয? তিনি চাচ্ছিলেন, যেন এমন না হয় যে, কোনো একটি শর্ত ওই দাসির মধ্যে পাওয়া গেল না। তো দশ বছর পর্যন্ত এমন দাসির খোঁজ নিচ্ছিলেন তিনি।

হাসান ইবনে সালেহ (রহ.) বলেন, আমি ইমাম আবু হানীফা অপেক্ষা আর কোনো ফকীহকে নিজের জান ও ইল্‌মের এত হেফাজত করতে দেখিনি।

হযরত ইয়াযীদ ইবনে হারুন (রহ.) বলেছেন, আমি এক হাজার মুহাদ্দিছ ও ফোকাহায়ে কেরাম থেকে ইল্‌ম শিখেছি। কিন্তু আবু হানীফা (রহ.)-এর মতো পরহেযগার আমি কাউকে দেখিনি।

আলী ইবনে হাফস তাঁর একজন ছাত্র। তিনি বলেন, ইমাম আবু হানীফা আমার পিতার সাথে শেয়ারে ব্যবসা করতেন। ইমাম সাহেব অর্থ দিতেন আর আমার পিতা বিক্রি করতেন। কারণ, ইমাম সাহেব সর্বদা ইল্‌ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। একটি কাপড় এমন ছিল, যাতে সামান্য দাগ ছিল। ইমাম

সাহেব বলে দিলেন, এই কাপড়টি বিক্রি করার সময় গ্রাহককে বলে দেবেন, এতে ত্রুটি আছে। তারপর এর মূল্য নির্ধারণ করবেন। পিতা বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে একদিন কাপড় বিক্রির সময় আমার বাবার ওই কথাটা স্মরণ ছিল না। ইমাম সাহেব এসে দোকানে ঘুরে দেখলেন, সেই কাপড়টা নেই। জিজ্ঞেস করলেন, কাপড়টা কোথায়? বলা হলো, বিক্রি হয়ে গেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ত্রুটি বলে বিক্রি করেছেন? বাবা বললেন, আমি তো কথাটা ভুলে গেছি। ইমাম সাহেব পুরো দোকানের মালগুলো সদকা করে দিলেন, যার মূল্য প্রায় ত্রিশ হাজার দেরহাম হবে এবং বাবাকে ব্যবসা থেকে পৃথক করে দিলেন।

এই ছিল তাঁর তাকওয়া।

হযরতের কাপড়ের দোকান ছিল। আছরের পরই দোকান বন্ধ করে দেওয়া হতো। কিন্তু একদিন যোহরের পরই বন্ধ করে চলে এলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, আজকে যোহরের পর দোকান বন্ধ করে দিলেন যে? তিনি উত্তর দিলেন, আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; পুরোপুরি আলো নেই। গ্রাহকরা কাপড়ের কোয়ালিটি চিনতে পারবে না। দোকান এজন্য বন্ধ করে দিলাম, যেন ক্রেতারা কম মূল্যের কাপড় বেশি মূল্যে কিনে নিয়ে না যায়।

এই উম্মতের মধ্যে ব্যবসা করে দেখিয়েছেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) আর ইমাম আবু হানীফা (রহ.)। একেই বলে ব্যবসা।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর একজন ছাত্র ছিলেন খারেজা (রহ.)। ইনি হজের জন্য যাচ্ছিলেন। তাঁর একজন সুশ্রী দাসি ছিল। তাকে তিনি বললেন, হজ করে আসতে আমার চার-পাঁচ মাস সময় লাগবে। আমি তোমাকে ইমাম সাহেবের ঘরে রেখে যাবে। ইমাম সাহেবকে বলে দিলেন, যদি কোনো কাজ করানোর প্রয়োজন হয়, একে হুকুম করবেন। চার মাস পর খারেজা (রহ.) হজ থেকে ফিরে এলেন। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)কে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! আমার দাসি কেমন খেদমত করল? ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম! আমি তো তার চেহারাও দেখিনি।

দেখুন, চারটা মাস কাজ করে দেওয়ার মতো লোক ঘরেই ছিল। অথচ ইমাম সাহেব তাঁর চেহারাই দেখেননি। এবার খারেজা (রহ.) দাসিকে ঘরে নিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ইমাম সাহেবকে কেমন পেয়েছ? দাসি বলল, আল্লাহর কসম! আমি আমার জীবনে এমন পরহেযগার মানুষ আর দেখিনি।

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) ছিলেন নবাবের সন্তান। সেই নবাব সাহেবই তাকে নিয়ে এলেন ইমাম আ'যমের দরবারে। বলরেন, হযরত! আমি

ছেলেটাকে আপনার শাগরেদ বানাতে চাই। ইমাম সাহেব অনুভব করলেন, বাচ্চাটা বড় মেধাবী ও চতুর। বললেন, ঠিক আছে; বাচ্চাটাকে প্রতিদিন আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তবে তাকে একেবারে সাধারণ পোশাক পরিধান করাবেন। ছেলে তো খুবই সুশ্রী। পোশাকও যদি উন্নতমানের হয়, তাহলে ফেতনা আশঙ্কা আছে।

তো শর্ত জুড়ে দিলেন, তাকে সাধারণ কাপড় পরিধান করাতে হবে। ইমাম মুহাম্মাদ প্রতিদিন আসতেন। হযরত তাকে নিজের পেছনে বসাতেন। দাড়িবিহীন বালককে সামনে বসিয়ে পড়াতেন না। একদিন সবক পড়ানোর সময় মুহাম্মদের ছায়া এসে দেওয়ালে পড়ছিল। ইমাম সাহেব লক্ষ করলেন, ছেলেটার মুখে বড়-বড় দাড়ি। তিনি বিস্মিত হয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখলেন। নবাব সাহেবের নিয়ে আসার পর এ-ই প্রথমবার ছেলেটাকে দেখলেন।

তো দেখুন, সেই কত আগে নবাব সাহেব যেদিন নিয়ে এসেছিলেন সেদিন প্রথম দৃষ্টি দিয়েছিলেন আর আজ দাড়ি হওয়ার পর দৃষ্টি দিলেন! মধ্যখানে এত দীর্ঘ দিন তাকাননি দাড়িহীন মুহাম্মাদের প্রতি।

ওয়াকী' ইবনে জার্‌রাহ বলেছেন, ইমাম সাহেবের কাপড়ের দোকান ছিল। তো একবার এক নারী তার নিকট কিছু কাপড় নিয়ে এসে বলল, আমি এই কাপড়গুলো বিক্রি করব; আপনি কিনবেন কি? ইমাম সাহেব বললেন, কিনব; দাম কত? মহিলা বলল, একশো দেরহাম। ইমাম সাহেব বললেন, আরে! এত কম কেন? তোমার কাপড়ের দাম তো আরও বেশি আছে।

দেখুন ক্রেতা নিজে একথা বলে দিচ্ছেন! মহিলা অনভিজ্ঞ মানুষ। হয়তো জানেই না কাপড়ের দাম কত। তাই তার হয়ে ইমাম সাহেব নিজেই বলে দিচ্ছেন কাপড় তো এত। আর আমরা কী করি? আমরা তো উল্টো ঠকানোর চেষ্টা করি। মহিলা বলল, তাহলে দুশো দেরহাম দিন। ইমাম সাহেব বললেন, না; কাপড় তো আরও দামি। মহিলা বলল, তিনশো দেরহাম দিবেন ইমাম সাহেব বললেন কাপড় আরও দামী। মহিলা বলল চারশত দেরহাম দেন। ইমাম সাহেব বললেন, তোমার ঘরের একজন পুরুষমানুষ নিয়ে আসো। মহিলা পুরুষকে নিয়ে এল। ইমাম সাহেব ওই কাপড় পাঁচশো দেরহাম দিয়ে খরিদ করলেন।

মুমিন বান্দা ব্যবসায়ী হলে এমনই হয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেছেন, আমার ইল্‌ম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয় যদি না হতো, তাহলে আমি কখনো ফতোয়া দিতাম না। জিজ্ঞেস করা হলো, কেন? ইমাম আবু হানীফা (রহ.)

বললেন, বোঝা হলো আমার মাথায় আর মজা নেয় অন্যরা। যুগের বাদশাহ তাঁকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন, না। বাদশাহ বললেন, তা হলে তুমি ফতোয়া দিতে পারবে না। ইমাম সাহেব বললেন, ফতোয়া ঠিক আছে; আমি ফতোয়া দেব না।

তিনি ফিরে এলেন। কিছুদিন পর ঘরের এক নারী মাসআলা জিজ্ঞেস করল। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বললেন, আমার ছেলে আম্মারকে জিজ্ঞেস করো। আমি তো বাদশাহকে কথা দিয়েছি, আমি ফতোয়া দেব না।

এত সতর্ক ছিলেন তিনি! এর বরকতে আল্লাহ হাকীমের দিল নরম করে দিলেন। তিনি ফতোয়া না দেওয়ার আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বলেছেন, একবার একব্যক্তি কিছু বকরি চুরি করে এনে কুফার বকরির সাথে মিলিয়ে দিয়েছিল। ইমাম সাহেব লোকদের থেকে জিজ্ঞেস করলেন, একটা বকরি সর্বোচ্চ কত বছর বাঁচে? জানতে পারলেন, সাত বছর। সেই হিসাব অনুসারে হযরত ইমাম সাহেব সাত বছর বকরির গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকলেন এজন্যে যে, এমনও তো হতে পারে, এটা সেই চোরাই বকরির গোশত।

ইয়াযীদ ইবনে হারুন বর্ণনা করেন, ইমাম আযমের শাগরেদ ইয়াইয়া ইবনে যায়েদাহ গলিপথ হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। দেখলেন, ইমাম সাহেব গরমের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। বলা হলো, হযরত! দুপুরের সময়। তীব্র গরম। আপনি ঘামে ভিজে যাচ্ছেন। ওই দেওয়ালটার ছায়ায় দাঁড়ান। তিনি বললেন, এই ঘরের মালিককে আমি কিছু করজে হাসানা দিয়েছি। আজ সে আমার ঋণ শোধ করবার কথা। আমি নিতে এলাম। আমি তার ঘরের ছায়ায় দাঁড়ানোকে সুদ মনে করি। আমি তার দেওয়াল থেকে এই স্বার্থটুকুও নিতে চাচ্ছি না।

উলামা ও মাশায়েখে কেরামের তাকওয়া

এই চরিত্র তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। তাঁর একজন শাগরেদ হলেন ইমাম আবু ইউসুফ। তাঁকেও বিচারক হওয়ার জন্যে প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে, তিনি সম্পূর্ণরূপে ভারসাম্য বজায় রেখে ইনসাফপূর্ণ বিচার করতেন। কারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। যখন মৃত্যুর সময় এল, তাঁর চোখে অশ্রু দেখা গেল। শাগরেদরা জিজ্ঞেস করল, হযরত! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, পুরোটা জীনবই কারও মুখের দিকে তাকিয়ে বিচার করিনি। কিন্তু একবার

একটি মামলা এল এমন যে, এক দিকে একজন খ্রিষ্টান, অন্য দিকে বাদশাহ হারুনুর রশীদ। আমি হারুনুর রশীদকে ওই খ্রিষ্টানের সাথে দাঁড় করালাম। মকদ্দমা শুনানির পর আমি খ্রিষ্টানের দাবির পক্ষে ফয়সালা দিলাম। কিন্তু আমার দিল বলছিল, রায়টা যদি হারুনুর রশীদের পক্ষে হতো, তা হলে কতই-না ভালো হতো। আজ ওই চিন্তাটার কারণে কাঁদছি। ভাবছি, আল্লাহ যদি আমার ওই চিন্তার কারণে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আমি কী জবাব দেব!

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) ইরানের শহর মারুতে থাকতেন। একবার সফর করে শাম চলে এলেন। সেখানে কারও থেকে একটি কলম নিয়েছিলেন। সেটি দিতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। সফর থেকে ফিরে চলে এলেন। তখন মনে হলো, আরে! আমার কাছে তো অমুকের কলমটি রয়ে গেছে! তিনি আবার শাম গেলেন এবং কলমটি ফিরিয়ে দিয়েই তবে এলেন।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরিন ও আওন ইবনে আবদুল্লাহ কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় একস্থানে বৃষ্টির পানি জমে ছিল। পাশেই খেজুরবৃক্ষের একটা টুকরা পড়ে ছিল। ইবনে সীরিন সামনে ছিলেন। তিনি সেই টুকরাটার ওপর পা দিয়ে টপকে পার হয়ে গেলেন। কিন্তু আওন ইবনে আবদুল্লাহ এসে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং পাদুকা খুলে পানি দিয়েই হেঁটে গেলেন। ইবনে সীরিন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি পা'টা ক্লেদাক্ত করলেন কেন? ইবনে আবদুল্লাহ বললেন, আমার মনে হয়েছে, এই গাছের গুঁড়িটা কেউ রাস্তা পারাপারের জন্য দেননি। তো মালিকের অনুমতি ছাড়া কীভাবে এতে পা রাখি। অনুমতি ছাড়া তো কারও জিনিস ব্যবহার করা জায়েয নয়।

এমন তাকওয়া ছিল তাঁদের। আজ তো রাস্তায় পড়ে থাকা যেকোনো জিনিসকে আমরা গনিমতের মাল মনে করি। এটা কেয়ামতের আলামত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের একটা আলামত হলো, মানুষ আমানতের মালকে গনিমতের মালের মতো ব্যবহার করবে।

বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.) এক সফরে ছিলেন। কাপড় ধুয়ে রোদে দিতে যাবেন। সাথি বললেন, এই বাগানের দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিন। বোস্তামি (রহ.) বললেন, কিন্তু এর যে ইজাযত নেই। মালিকের অনুমতি বিনে কারও দেওয়ালে কাপড় ঝুলাব কী করে? সাথি বলল, এই ঘাসের ওপর ছড়িয়ে দিন। তিনি বললেন, আরে ভাই! ঘাসের এই প্রান্তর পশুচারণের জন্য। আমি কাপড় ছড়িয়ে তা ঢেকে দেব? তাদের হক নষ্ট হবে না? সাথি বললেন, গাছের ওপর ঝুলিয়ে দিন। বোস্তামি (রহ.) বললেন, হাঁ এটা হতে পারে।

তবে ছোট গাছে বা ডালে নয়, যেন ভেঙে না যায়। তাই বড় ডালে দিতে হবে।

বোঝা যায়, আমাদের বুযুর্গানে দীন যখনই কোনো কাজই করতেন, খুব চিন্তা করে করতেন। এমন কোনো কাজ করতেন না যে, এতে তিনি পাকড়াও হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ইমাম ওয়াকী' (রহ.) উপবিষ্ট। একব্যক্তি এসে বলল, আপনি আ'মাশের দরসে বসার সময় আমার কালি ব্যবহার করেছিলেন। এর বিনিময় পরিশোধ করুন। তিনি দিনারের একটা থলে তাকে দিয়ে দিলেন আর বললেন, এই থলেটা নিয়ে যাও আর আমাকে মাফ করে দাও। কেয়ামতের দিন আমার কাছে কিছু চেয়ো না। তো দোয়াত ব্যবহারের বিনিময়ে দিনারের থলে দিয়ে দিলেন, যেন এ জগতেই তার দায়দেনা মিট হয়ে যায়।

একবার ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তিন দিন অনাহারে ছিলেন। তো তিন দিন এমন থাকতে হলে তো হারাম খাবার গ্রহণ করাও জায়েয হয়ে যায়। ঘরের লোকেরা বলল, কারও থেকে ঋণ নিন। ঘরের লোকেরা ঋণ নিয়ে আটা আনল এবং দ্রুত রুটি তৈরি করে দিল, যেন ইমাম সাহেব খাবার গ্রহণ করেন। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় রান্না করেছ? ঘরের লোক বলল, আপনার ছেলে সালেহের পৃথক চুলাটা জ্বলছিল। দ্রুত তার জন্য সেখানেই রুটি ভেজে নিলাম। হযরত বললেন, সালেহ তো সরকারি চাকরি করে। আমি ওর চুলার আগুনে পাকানো রুটি খাব না। তিন দিনের ক্ষুধায় কাতর থাকার পরও সামান্য সন্দেহের কারণে রুটি খেলেন না ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল।

ইবনে সীরিনের নিকট ৪০ মটকা ঘি ছিল। এক মটকা থেকে একটা ইঁদুর বেরিয়ে এল। কিন্তু কোনটা থেকে ইঁদুরটা বেরিয়েছে তিনি মনে রাখতে পারলেন না। তাকাওয়ার খাতিরে তিনি ঘিয়ের ৪০টা মটকা-ই সদকা করে দিলেন।

সকল তাবেঈর মধ্যে আপনি যাঁরই জীবন দেখবেন, সেখানেই তাকওয়া-তাহারাতের একটি সমুজ্জ্বল নমুনা দেখতে পাবেন।

নারীদের মাঝে তাকওয়া

এতক্ষণ তো পুরুষদের তাকওয়ার আলোচনা গেল। আগেকার নারীদের মাঝেও তাকওয়া-তাহারাতের চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে। রয়েছে সুন্দর-সুন্দর অনেক ঘটনা।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) উপবিষ্ট। একনারী এসে বলল, আমি রাতের বেলা ঘরের ছাদে বসে সেলাইয়ের কাজ করি। একদিন চাঁদের আলোয় বসে সেলাই করছিলাম। এমন সময় নগরপিতার লোকলস্কর আমাদের গলিপথ হয়ে যাচ্ছিল। তাদের মশাল আলোকিত করে ফেলেছিল চারদিক। আমি সেলাই করছিলাম। সেই উজ্জ্বল আলোয় আমি কিছুক্ষণ সেলাই করলাম। যখন কাফেলা অতিক্রম করে চলে গেল এবং আলো কমে গেল, তখন বুঝতে পারলাম, আমি তো ওদের আলো ব্যবহার করে ফেলেছি। আমি চাচ্ছি, এই কাজের মুনাফা ভোগ না করতে। এখন আমার জিজ্ঞাসা হলো, আমি কি পুরো রাতে যতখানি সেলাই করেছি, তা সদকা করে দেব, নাকি শুধু ওই আলোকময় সময়ে যতটুকু করেছি, ততটুকু দেব? আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বললেন, সেদিন সারা রাতের সবটুকু সদকা করে দাও।

মহিলা চলে গেলেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর ছেলে বলল, আব্বু! আপনি এটি কী ফতোয়া দিলেন? ইমাম সাহেব বললেন, তুমি মহিলার পেছনে-পেছনে যাও; দেখো সে কোন ঘর থেকে এসেছে। ছেলে তা-ই করল। দেখা গেল, মহিলা বিশ্‌র হাফির ঘরে প্রবেশ করলেন। মহিলা তাঁর বোন! ছেলে এসে পিতাকে তথ্যটা জানাল। আহমদ ইবনে হাম্বল বললেন, এরা এমন মহিলা, যারা জীবনে কোনোদিন হারামের কাছেও যায়নি। পুরোপুরিই পবিত্র ও হালাল সম্পদ ব্যবহার করে।

তো তাঁরা এমনই মুত্তাকী নারী ছিলেন।

আজকাল সতিন সতিনকে দেখতে পারে না। কেউ দুটি বিয়ে করলে দুই বউয়ের মাঝে বিদ্বেষের যে বীজ রোপিত হয়, ধীরে-ধীরে তা বড় হতে থাকে। কোনো সতিন অন্য সতিনকে কোনোদিনই কাছে টানতে পারে না। অথচ তাকওয়াবান এক রমণীর কথা শুনুন। এক পুরুষ ব্যবসায়িক কাজে সব সময় শহরে থাকে। একেকবার গমন করলে ৪-৫ মাস বাড়ি আসে না, আসতে পারে না। তার স্ত্রী অনেক পরহেযগার নারী। ছেলেসন্তান নিয়ে গ্রামের বাড়িতে থাকে। স্বামী বেচারা তো থাকে শহরে।

একবার স্বামী চিন্তা করল, একটু আরামে থাকবার জন্য আমার শহরে বাড়ি করে থাকাটা ভালো হবে। সে ঘর বানাল। এবার মাথায় চিন্তা এল, একটা বউও তো লাগে। চিন্তাভাবনা করে শহরের এক নারীকে বিয়ে করে নিল। মনে-মনে চিন্তা করল, তার প্রথম স্ত্রীকে একথাটা জানাবে না। এভাবে দিন কাটাতে লাগল। তিন-চার মাস পরপর সে গ্রামের স্ত্রীর কাছে আসে আর বাকি সময় শহরের স্ত্রীর কাছেই থাকে।

একবার সে গ্রামের স্ত্রীর কাছে এল। স্ত্রী অনেক চালাক ও জ্ঞানী। কেইসটা সে ধরে ফেলল। স্বামীকে বলল, কী খবর? আরেকটা বিবাহ করেছ বলে মনে হয়। স্বামী অস্বীকার করল। স্ত্রী কিছুই বলল না। প্রথম স্ত্রী তার বাড়ির এক লোককে খরচ দিয়ে শহরে পাঠাল। দেখা গেল, বাস্তবেই সে বিয়ে করেছে। প্রথম স্ত্রী অনেক পরহেযগার ছিল। সে ধৈর্য ধারণ করল। কিছুই বলল না স্বামীকে। আল্লাহর কী কুদরত! কিছু দিন পর স্বামী হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেল। স্ত্রী তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করল এবং তার-রেখে-যাওয়া সম্পদ বণ্টন করল। স্ত্রী হিসেবে সে যা পেল, তা দুভাগ করে এক লোকের মাধ্যমে দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে তার এক ভাগ পাঠিয়ে দিল। আত্মীয়রা তো কেউই এই খবর জানত না। প্রথম স্ত্রী সবাইকে এখন ব্যাপারটা জানাল। লোকেরা শহরের দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে গিয়ে লোকটির মৃত্যুর সংবাদ দিল এবং বলল, এই যে টাকা-পয়সা ও দিনার-দেরহামের থলে এসব ওই লোকের রেখে-যাওয়া সম্পদ। তার প্রথম স্ত্রী ভাগ করে তোমার জন্য তোমার অংশ পাঠিয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় স্ত্রী এই অবস্থা দেখে অভিভূত হলো। কিন্তু সে বলল, তিনি বাড়িতে যাওয়ার সময় আমাকে তালাক দিয়ে গেছেন। আমি তো আর এখন তার স্ত্রী নই। তুমি গিয়ে বড় স্ত্রীকে এসব ফিরিয়ে দাও।

তো তাকওয়া কাকে বলে দেখুন। সতিন সতিনের সম্পদ কেমন যত্ন করে পাঠিয়ে দিল। ঘৃণা-হিংসাও দেখাল না। দীন যখন আমাদের জীবনে চলে আসবে, দুনিয়ার এই জীবন আমাদের জন্য জান্নাত হয়ে যাবে। ইসলামের সৌন্দর্য দেখুন। আজ তো আমরা স্বার্থের সুবাদে কিংবা প্রবৃত্তির তাড়নায় দীনকে নিজেদের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। আমরা আমাদের দায়িত্ব ভুলে গেছি।

ওলামায়ে দেওবন্দের তাকওয়ার ঘটনা

দূর অতীতের কথা তো অনেক বললাম। এবার নিকট অতীতের কিছু কথা বলি। বর্তমানের কথা বলি এবং আমাদের একান্ত আপনজন আকাবিরে দেওবন্দের কথা বলি। এখানেও আছে তাকওয়া ও এখলাছের সুবিশাল ভান্ডার।

হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.)-এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, কিছু ছাত্র ও আলেম তাকে বাধ্য করে দাওয়াতে নিয়ে যেত এবং খানা খাইয়ে দিত। যদি হযরতের সন্দেহ হতো যে, লোকটির উপার্জনের পন্থা সঠিক নয়, তাহলে

ফিরে চলে আসতেন। খেয়ে ফেললে এসে বমি করে সব খাবার বের করে ফেলতেন, যেন এই খাবার তার শরীরের অংশ না হতে পারে।

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর দাদা ছিলেন সে যুগের অনেক বড় নবাব। তার বিশাল জায়গির ছিল। হযরত গাঙ্গুহি ইল্‌ম অর্জন থেকে ফারেগ হয়েছেন তেইশ বছর বয়সে। তো তিনি সমস্ত জমিনের পরিমাপ করলেন দেখার জন্য যে, সব সম্পদ নিজেদের কিনা। তো প্রায় সবই তাঁদের ছিল। একটি জমিতে অন্যের অংশ প্রকাশ পেল। হযরত সমস্ত জায়গির বিক্রি করে দিলেন এবং নিজের স্ত্রীর অলংকার বিক্রি করে হকদারদের হক আদায় করে দিলেন, যেন কেয়ামতের দিন পাকড়াও না হতে হয়।

হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরি (রহ.) ছিলেন সদরে মুদাররিস। তো সেই কারণে হযরতকে মোটা আরামদায়ক গদি বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেন হযরত তাতে বসে দরস দিতে পারেন। কিন্তু হযরত দরস দেওয়ার সময় সেখানে গিয়ে বসতেন। দরসদান শেষ হলে উঠে গিয়ে অন্যত্র বসতেন আর বলতেন, এখন আর আমার জন্য এটি ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

হযরত মাওলানা মানযূর হুসাইন কান্ধলবি (রহ.) সফরে যাচ্ছিলেন। গাড়িতে বসেও গেছেন। এমন সময় যদি কেউ এসে বলত, হযরত আমার চিঠিখানা অমুকের কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন, তখন হযরত বলতেন, দেখুন, আমি তো টাকার বিনিময়ে আমার ভার হিসেবে গাড়ি ভাড়া করে নিয়েছি। এখন আরও বোঝা নিতে হলে গাড়িওয়ালার অনুমতি লাগবে। আপনি তার অনুমতি নিয়ে নিন। আমি আপনার চিঠি অবশ্যই বহন করব।

মিয়াজি নূর মোহাম্মাদ জানজানবি (রহ.)-এর নিকট একবার এক কারী সাহেব এলেন। কেউ বলল, হযরত! এই লোক চমৎকারভাবে কবিতা আবৃত্তি করতে জানে, শে'র পাঠ করতে জানে। হযরত বললেন, আমি তো শুনব না। জিজ্ঞেস করা হলো, শুনতে বাধা কিসের? বললেন, লোকেরা কোনো-কোনো সময় আমাকে ইমাম বানায়। আর সুন্দর সুললিত কণ্ঠে শে'র ও কবিতা শোনাকে কোনো-কোনো ওলামায়ে কেরাম গান শোনার সমপর্যায়ের বলেছেন। তাহলে তো এটি জায়েয নেই। তাই আমি তা শুনি না, যেন ইমামতের দায়িত্বপালনে কোনো সমস্যা না হয়।

আমাদের হযরত খাজা ফজল আলী কুরায়শি (রহ.)-এর একজন অন্ধ মুরীদ ছিলেন। তিনি কারও থেকে করজ নেওয়ার ছিলেন। তো সেই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েক মাইল পথ সফর করে গমন করলেন। গলিপথে ঢোল-তবলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলেন, কী হচ্ছে? বলা হলো, যার ঘরে

যাচ্ছেন, তার ঘর থেকে দু-তিন ঘর সামনে অন্য ঘরে এসব হচ্ছে। তিনি বললেন, আচ্ছা; তাহলে আরেক দিন আসব। সাথি বলল, আপনি চোখে দেখেন না। আবার কখন কষ্ট করে আসবেন এখানে? আসুন আজই নিয়ে যান। তিনি বললেন, না, আমি যখন গলিপথে প্রবেশ করব, তখন লোকেরা বলবে, কুরাইশি সাহেবের মুরীদ ঢোলের আওয়াজ শোনে। মানুষ তো জানে না, আমি পাশের ঘরে ঋণ নিতে এসেছি। একেই বলা হয়, অপবাদের ক্ষেত্র থেকে বেঁচে থাকা।

পাকিস্তানের মুফতিয়ে আযম মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহ.) বলেছেন, আমি মুফতী আযীযুর রহমান মুহাদ্দিছ সাহেবের খেদমতে কয়েকবার গিয়েছি। তাঁর মজলিসে কোনোদিন গীবত হতে দেখিনি। তাঁর মজলিসে অনুপস্থিত কোনো লোকের সমালোচনার অনুমতি ছিল না।

হযরত শায়খুল হাদীছ (রহ.) বলেছেন, আমার পিতা মাওলানা ইয়াহয়া (রহ.) ঘরে খাবার পাকাতেন। কিন্তু তিনি ঘরে আসতে আসতে শীতকালে খাবার জমে যেত। ফলে ছাত্ররা মাদরাসার চুলার পাশে খাবার রেখে দিত যেন জমে না যায়। চুলার ওপর না রেখে পাশে রাখত, যেখানে তাপ এমনিতেই ছড়িয়ে যেত। তো এই ফায়দাটুকুর জন্য তিনি মূল্য পরিশোধ করতেন। বার্ষিক জলসায় তিনি বাড়ি থেকেই খাবার এনে খেতেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)-এর বেশ প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা আছে। তিনি রেলে সফর করছিলেন। হারেসপুর থেকে কানপুর যাবেন। একব্যক্তি তাঁকে আঁখের একটা গাঁঠুরি দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, এগুলো তো আমি নিতে পারব না। কারণ, এর ওজন নির্ধারিত ওজনের চেয়ে বেশি। লোকটি বলল, সমস্যা হবে না; আমি টিটিকে বলে দেব। ইতিমধ্যে টিটিও এসে পড়ল। সেও বলল, হযরত! টিকিট তো আমিই চেক করব; আপনি নিয়ে নিন। হযরত বললেন, আমি তো আরও সামনে যাব। গার্ড বলল, আমি পরের টিটিকে বলে দেব। হযরত বললেন, আমি তো আরও সামনে যাব। টিটি বলল, হযরত ওই ষ্টেশনের পর তো আর ট্রেনই যাবে না। আপনি এরপর কোথায় যাবেন?

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বললেন, আমি তো রোজ কেয়ামতে আল্লাহর সামনে যাব। সেখানে যদি বাঁচতে পারি, তাহলেই টিকিট ছাড়া যাব।

একেই তাকওয়া বলা হয়। আপনি রেলের ভালো বগিতে সফর করলে ভালো বগির টিকিট নিন। আর নরমাল বগিতে চড়লে নরমাল টিকিট নিন। আজ তো এমন লোক দেখবার জন্য চোখ অপেক্ষায় থাকে।

হযরত মাদানি (রহ.) দিল্লির জমিয়তের অফিসে তাশরীফ আনলেন। সেখানে ব্যবস্থাপক ভালো খাবার খাওয়ালেন। নামাযের সময় হলো। তারা নামাযের জন্য নতুন নতুন মুছল্লা বিছালেন। মাওলানা মাদানি হযরত মাওলানা হিফজুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলেন, মাশাআল্লাহ! আল্লাহ মাদরাসার জন্য নতুন মুছল্লার ব্যবস্থা করলেন। তিনি বললেন, এ তো আমাদের নয়। অমুক ব্যবসায়ী আপনার মুরীদ। আপনি আসবেন শুনে তিনি তার দোকান থেকে নতুন মুছল্লা পাঠিয়ে দিয়েছেন; ব্যবহার করে ফিরিয়ে দেব। একথা শুনে হযরতের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি মুছল্লার বাইরে চলে গেলেন। বললেন, দেখো, সে তার মুছল্লা ব্যবহার করিয়ে তারপর বিক্রি করবে। এটা তো জায়েয হবে না। এর জন্য আমাকে পাকড়াও করা হবে। আমি এর ওপর নামায পড়ব না।

হযরত মাওলানা আহমাদ আলী মুহাদ্দিছে সাহারানপুরী বোখারি শরীফের হাশিয়া লিখেছেন। ওলামায়ে দেওবন্দের মাঝে তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। হাদীছের ময়দানে এমন পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ দুনিয়ায় কমই আছে। একবার তিনি এক বন্ধুর সাক্ষাতে কলকাতা গেলেন। বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হলো। বন্ধু বলল, আমার অনেক আত্মীয় আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। তাদের ডেকে আনা হলো। তারা বলল, হযরত! নসিহত করুন। হযরত নসিহত করলেন। এরপর তারা বলল, হযরতের তো মাদরাসা আছে; কিছু নুসরত করা হোক। অনেক অর্থ জমা হলো। হযরত তা মাদরাসায় নিয়ে এলেন এবং নাজেম সাহেবের নিকট দিলেন। নাজেম সাহেব বললেন, হযরত! কোনো ওস্তাদই তো এত বেশি অর্থ আনতে পারে না। আপনি তো কোনো ভাউচার দিলেন না, যে এগুলো আনতে আপনার কত খরচ হয়েছে। তিনি বললেন, আমি তো আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। তারপর সেখানকার লোকেরা মাদরাসার জন্য এগুলো দিয়েছে। তো আমার জন্য তো সফর ও অন্যান্য হাজতের খরচের ভাউচার দেওয়া জায়েয হবে না।

আল্লাহর দরবারে মানুষের কবুলিয়াতের কোনো-না-কোনো মাধ্যম থাকে। এমন সুপবিত্রতা, আত্মরক্ষা এবং এমন তাকওয়া-তাহারাতের বদলেই আল্লাহ আমাদের আকাবিরকে এত উঁচু মাকামে অধিষ্ঠিত করেছেন।

নকশবন্দি তরিকার মাশায়েখে কেরামের তাকওয়া

আমাদের মাশায়েখে কেরামের কিছু ঘটনা দেখুন। জীবনের প্রতিটি পরতে-পরতে তাঁরা তাকওয়ার সাক্ষর রেখেছেন। তাঁদের বৈশিষ্ট্য তো এখানেই।

খাজা ফজলে আলী কুরায়শির বাহ্যিক অবস্থা জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না। সামান্য একটু জমি ছিল। নিজেই হাল চাষ করতেন। নিজেই ক্ষেতের কাজ করতেন। যে গম উৎপাদন হতো, তা দিয়ে সারা বছর চলে যেত। হযরত কিছু-কিছু অর্থ জমা করে ঘরেই পেষণযন্ত্র বসিয়ে নিলেন। কেউ একজন বলল, হযরত! এত বেশি গম তো হয় না যে, আপনি ঘরেই চাক্কি বসাতে হবে। তিনি বললেন, বাইরের চাক্কিতে গম পেষার জন্য পাঠাতে হয়। তো সেখানে আগের ব্যক্তির কিছু আটা থেকে যায়। আমি চাচ্ছি না, আমার আটার সাথে কারও আটা মিশ্রিত হয়ে চলে আসুক। আমাদের মাথা যা চিন্তাও করতে পারে না, হযরত বুযুর্গানে কেরাম সেই ছোট-ছোট বিষয়গুলোর প্রতিও খেয়াল রাখতেন।

হযরত আবদুল মালেক সিদ্দীকি (রহ.)-এর যুগে হিন্দুরা ঘিয়ের কাজ ও ব্যবসা করত। হযরতজি তাই বাজারের ঘি ব্যবহারই করতেন না। তাঁর একজন খলীফা ছিল। হযরতের একজন মুরীদ নিজস্ব গাভির দুধ দিয়ে ঘি বানাত। হযরত শুধু তার থেকেই ঘি আনতেন। বাজারের ঘি ব্যবহার না করার কারণ হলো, এমন তো হতে পারে যে, এই ঘি হিন্দুরা বানিয়েছে। আর ওদের তো পাক-নাপাকের কোনো তোয়াক্কা নেই। সফরে সাথে ঘি ও খাবার রাখতেন। কেউ দাওয়াত দিলে নিজের খাবারই তার দস্তরখানে বসে খেয়ে নিতেন। বলে দিতেন তোমার দাওয়াত নিলাম; তবে আমি আমারই খাবার খাব।

খানেওয়াল এলাকায় ভালো জাতের আম হতো। কিন্তু হযরত কখনও বাজার থেকে আম কিনে খেতেন না। ঘরের লোকেরা যতই বলত, এটি এই আম সেই আম ভালো আম, হযরত খেতেনই না। প্রশ্ন করা হলো, কেন খান না? বললেন, আজকাল ব্যবসারীরা ফল আসার আগেই বাগান কিনে নেয়। আর এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েয। তাই তিনি এমন ফল বাজার থেকে কিনে খেতেন না, আচার-চাটনিও কিনতেন না। কারণ, হতে পারে এতেও তেমন নাজায়েয ক্রয়-বিক্রয়ের ফল দেওয়া হয়েছে–

হযরতের অভ্যাস ছিল শীত-গরম সর্বদা ছাতা ব্যবহার করা। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, মানুষ গরমে ছাতা ব্যবহার করে; আপনি তো শীতেও

ব্যবহার করেন; ঘটনাটা কী? হযরত বললেন, আরে! আমি তো গরমের কারণে ছাতা ব্যবহার করি না। আমি ছাতা ব্যবহার করি যদি রাস্তায় ডান দিক থেকে বেগানা নারী আসছে মনে হয়, তো ডান দিকে ছাতা ধরে আত্মরক্ষা করি। আর যদি বাম দিক থেকে আসে তো বাম দিকে ছাতা ধরি। আমি পর্দা করার জন্য ছাতা ব্যবহার করি। আমি চাই না, কোনো নারীর পোশাকের ওপরও আমার দৃষ্টি পড়ুক।

দেখুন, তাঁরা কতটা সতর্ক ছিলেন। গায়রে মাহরাম নারী থেকে কীভাবে পরহেয করতেন। তাই তো তাঁদের কর্মকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নিয়েছেন। তো আজ যদি আমরা চাই, আমাদের আকাবিরদের মতো চলব, তা হলে আমাদের উচিত নতুন করে শুরু করা। জীবনকে নতুন করে সজ্জিত করা।

হযরত মুরশীদে আলম (রহ.) নিজেই এই ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বললেন, একদিন আমার স্ত্রী পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন আর আমি অজু করছিলাম। স্ত্রী পানি ঢালার ক্ষেত্রে একটু ভুল করে ফেললেন। আমি রেগে গেলাম এবং তার দিকে চোখ লাল করে তাকালাম। বললাম, দেখতে পাচ্ছেন না? পানি কোন দিকে ঢালছেন? আমার স্ত্রী চুপ করে ছিলেন। আমি মসজিদে ফজর নামাযের ইমামত করতে রওনা হলাম। কিন্তু আমি মাঝপথ থেকে ঘরে ফিরে এলাম। চিন্তা করলাম, আমি ইমামত করব; অথচ আমি অযথা আমার স্ত্রীকে কষ্ট দিয়ে এসেছি। আমি আমার স্ত্রীর কাছে মাফ চাইলাম। তিনি মুচকি হেসে বললেন, আমি তো কিছু মনে করিনি। মাফ চেয়ে এসে আমি ইমামত করলাম।

এই ছিল আমাদের পূর্বাসূরি আকাবিরে কেরামের তাকওয়া।

নিজের পরিমাপ করুন

আমাদের আকাবিরে কেরামের জীবন এমনই ছিল। আজ ওলামায়ে কেরামের স্ত্রীদের জিজ্ঞেস করুন তাদের স্বামীদের অবস্থা কেমন, তাদের ঘরোয়া জীবন কেমন। সামান্য বিষয়েই রাগান্বিত হয়ে যান আর বলেন, আমি জালালি মেজাজের। এমন বলে না কখনও যে, আমি বদমেজাজ। আমার ক্রোধের রোগ আছে। জালালি মেজাজ বলছ; কেয়ামতের দিন তোমার সাথে যদি জালালি আচরণ করা হয়, তখন কেমন হবে? তখন তো রহমত-রহমত করে আর্তনাদ করতে থাকবে। আজ ঘরে স্ত্রী-বাচ্চাকে কষ্ট দিচ্ছেন, কারী সাহেবরা ছোট-ছোট বাচ্চাদের পশুর মতো মারছেন আর

বলছেন, আমি খুব ভালো ওস্তাদ, কেয়ামতের দিন এরা যখন আপন হক দাবি করে দাঁড়াবে, তখন বুঝবেন কী কাণ্ড করে গেছেন দুনিয়ায়।

হাদীছে পাকে এসেছে, কেয়ামতের দিন অধীনদের হক আদায় করে দেওয়ার জন্য আম্বিয়া কেরাম উকিল হবেন। আমি কেয়ামতের দিন অধীনদের হক আদায় করে দেওয়ার উকিল হব। আমি সেদিন হক আদায় করে দেব। এবার বলুন, বাচ্চাদের উকিল যখন আমাদের নবী হয়ে যাবেন, তখন আমাদের কী উপায় হবে? আমরা তো বহু মানুষের হৃদয়ে কষ্ট দিয়েছি। কত মানুষের জিনিস অনুমতি বিনে ব্যবহার করেছি আর ভাবছি দুনিয়ায় কেউ আমাদের জিজ্ঞেসকারী নেই। অথচ কেয়ামতের প্রস্তুতি তো তখনই হবে, যখন আমরা দুনিয়ার সমস্ত বিবাদ দুনিয়াতেই খতম করার চেষ্টা করে যাব এবং খতম করে যাব। মাফ চেয়ে হোক, পরিশোধ করে হোক, কেয়ামতের আগে-আগেই হক আদায় করে যেতে হবে। যেন কেয়ামতের দিন কেউ সামনে দাঁড়িয়ে না বলে, কোথায় যাচ্ছ? আমার হক আদায় করে যাও।

আখেরাতের স্ক্যানিং মেশিন

বিমানে সফর করতে গেলে একটা মেশিনের ভেতর দিয়ে সকলকে অতিক্রম করতে হয়। কারও নিকট লোহার টুকরা থাকলেও মেশিন আওয়াজ দেবে। লোকেরা সতর্কতার সাথে সেখানে এমন কোনো জিনিস নিয়ে যায় না, যার কারণে মেশিন আওয়াজ করবে। মেশিনটির ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় আমার কেয়ামতের কথা স্মরণ হয়। কেয়ামতের দিনও তো এমন করা হবে যে, প্রত্যেক মানুষের দিল চেক করা হবে। দিলে গুনাহের চিহ্ন কতটুকু লেগেছে, তা চেক করা হবে। কত মানুষের অন্তরে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তা দেখা যাবে। যারা তাকওয়ার জীবন যাপন করবে, তাদের বলা হবে, যাও; আগে বাড়ো; তোমাদের সমস্যা নেই। সামনে জান্নাতের দরজা; তোমরা জান্নাতে চলে যাও। আর যাদের বেলায় মেশিন বলে দেবে, এ লোক এমন-এমন করে এসেছে, তখনই ফেরেশতারা তাকে ধরে ফেলবে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ

'ওদের থামাও; কারণ, ওদের প্রশ্নের সম্মুখীন করা হবে।'[১]

---

১. সূরা ছফফাত : আয়াত ২৪

আজ এই ঘোষণা থেকেই শিক্ষা নেওয়া দরকার আমাদের। আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রশ্ন করা দরকার, জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার, কেমন জীবন কাটাচ্ছি দুনিয়ায়। সেদিন সূফী সাহেবকেও ধরা হবে। কারণ, সে তার স্ত্রীকে সংকীর্ণ জীবনের মধ্যে রেখেছে। ঘরে নারীকে পেরেশানিতে রেখেছে। ওপরে-ওপরে তো খুব তাসবীহ জপছে; কিন্তু ভেতরে-ভেতরে স্ত্রীকে কষ্ট দিচ্ছে। বলা হবে–

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ

'ওদের থামাও; জিজ্ঞেস করো কীভাবে কাটিয়েছে দুনিয়ার জীবন।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ نُوْقِشَ فِي الْحِسَابِ فَقَدْ عُذِّبَ

'যার থেকে হিসাব চাওয়া হবে, ব্যস, বুঝে নাও তার সাজা হবেই।'

আজই আত্মপর্যালোচনা করে নিন

আমাদের অবস্থা সেদিন কেমন হবে? আজও সময় আছে নিজের জীবনটাকে তাকওয়া দ্বারা সুন্দর করে নেওয়ার। তাকওয়া মানে, আমরা আমাদের জীবনগুলোকে এমনভাবে কাটাব, যেন কেয়ামতের দিন কোনো বান্দা আমাদের ঘাড় চেপে ধরতে না পারে। নির্জনে বসে পড়ুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন, কখন কার গীবত করেছ, কার হক নষ্ট করেছ, কার জিনিস অনুমতি বিনে ব্যবহার করেছ, কার দিলে কষ্ট দিয়েছ। সবার থেকে আজই মাফ চেয়ে নিন। এছাড়া বেলায়েত অর্জন কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) বলেছেন, আমি বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়েছি। দুজন ফেরেশতা এলেন। তারা কথা বলতে লাগলেন, এ কে? একজন বলল, ইবরাহীম ইবনে আদহাম। আল্লাহ তাকে এক স্তর নিচে নামিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়জন বললেন, কেন? উত্তর এল, সে বসরার খেজুর ক্রয় করেছিল। দোকানদারের একটি খেজুর নিচে পড়ে গিয়েছিল। সে তার মনে করে সেটা তুলে খেয়ে নিয়েছে। তাই তার বেলায়েতের একটি দরজা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইবনে আদহাম বলেন, আমার সাথে-সাথেই স্মরণ হয়ে গেল। ঘটনা তো এমনই ছিল। পরদিন তিনি খেজুর ক্রয় করে সেই খেজুর ফেরত দিলেন। তারপর বাইতুল মুকাদ্দাসে পুরো রাত ইবাদাত করলেন। আবারও দুজন ফেরেশতা দেখতে পেলেন। তারা কথাবার্তা বলছিলেন। একে অন্যকে বলছেন, খেজুর ফিরিয়ে দেওয়ার কারণে আল্লাহ

তার বেলায়েতের স্তর আগের স্থানে স্থাপন করে দিয়েছেন। অর্থাৎ– যে স্তর কমিয়ে দিয়েছিলেন, তা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

মাত্র একটি খেজুরের কারণে যদি বেলায়েতের দরজার মধ্যে কমতি এসে যায়, আমরা তো কত মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করেছি, বাড়াবাড়ি করেছি। আমাদের বেলায়াত তো দূরের কথা সাধারণ অবস্থাও তো ঠিক নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার জীবনের তাকওয়া ইখতিয়ার না করবে, ততদিন পর্যন্ত বেলায়েতের পথ রুদ্ধ থাকবে। পশুকে যেভাবে বেঁধে দেওয়ার কারণে আর যেতে পারে না, আমাদেরও শয়তান তেমন বেঁধে দিয়েছে। ফলে আজ আমরা তাকওয়ার পথে যেতে পারি না। আল্লাহর দিকে যেতে পারি না। অসতর্কতার কারণে আমাদের থেকে ছোট-ছোট এমনসব বিষয় ঘটে যায়, যার কারণে আখেরাতের আদালতে পাকড়াও হতে হবে। আল্লাহ যদি আমাদের বুঝ দান করেন, তবেই তো মুক্তি পেতে পারি। আজই আমরা অঙ্গীকার করে নেব, যেন সতর্কতামূলকভাবে আমরা জীবন যাপন করি। পেছনের মুআমালা ও কর্মগুলো শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করি আর ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যয় গ্রহণ করি যে, হে আল্লাহ! সামনে আর কখনো তোমার বান্দাদের হক নষ্ট করব না। আর নেক কাজ করার জন্য হে আল্লাহ! আমাদের তাওফীক দিন। আমাদের তো নেক আমল নেই। আপনাকে দেখানোর মতো আমাদের কিছুই নেই হে আল্লাহ! নেক করা তো আপনারই রহমত। আপনার সাত্তারগুণের ওসীলায়ই তো আমাদের গুনারাশি গোপন আছে। যদি আপনি আমাদের গুনাহের দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে দিতেন, তাহলে আমাদের আশেপাশে আজ কেউই থাকত পারত না। তো আজই সময়; তাই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। অন্যথায় আল্লাহর সামনে জবাব দেওয়া বড় কঠিন হবে।

মুকরানের বাদশাহর একটি ঘটনা শুনুন। তার বাহিনী এক গাঁয়ের কোনো এক লোকের একটা গরু জবাই করে খেয়ে ফেলেছিল। তারা ওই গ্রাম্য লোকটিকে মূল্যও পরিশোধ করেনি। লোক পুলের নিকট এসে দাঁড়িয়ে গেল এবং বাদশাহর যাওয়ার সময় তাঁর বাহনের লাগাম আঁকড়ে ধরল। বাদশাহ বললেন, কী ব্যাপার? লোকটি বলল, আমি তোমার সাথে একটি কথা বলব। তোমার আর আমার মাঝে একটি লেনদেন আছে। এই পুলেই তুমি এর ফয়সালা করে যেতে হবে। অন্যথায় কেয়ামতের দিনে পোলসেরাতের ওপর ফয়সালা করা হবে।

বাদশাহ প্রকম্পিত হয়ে উঠলেন। নেমে এলেন বাহন থেকে। জিজ্ঞেস করলেন, কী সেই লেনদেন? বলল, তোমার লোকেরা আমার একটা গাভি খেয়ে ফেলেছে । বাদশাহ একটা গাভির বদলায় তাকে সাত গাভির মূল্য পরিশোধ করলেন আর বললেন, আমাকে এই পুলেই মাফ করে দিন। পোলসেরাতে আমার পথ আগলে ধরবেন না।

আমাদেরও উচিত এই দুনিয়ানামক পুলেই ফয়সালা করিয়ে নেওয়া। কেয়ামতের দিনে পোলসেরাতের ওপর জবাব দেওয়ার যোগ্যতা আমাদের নেই। আল্লাহ আমাদের তাকওয়ার জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

ওলামায়ে কেরামের জন্য সোহবতে সালেহীনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

'সময়ের সাথে-সাথে কিছুসংখ্যক জাহেল সূফীর আমল ওলামায়ে কেরামকে বিচলিত করে দিয়েছে। ওলামায়ে কেরাম এতটা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন যে, তাছাওউফকে তারা নিষিদ্ধ মনে করতে লাগলেন। ওলামায়ে কেরাম বলতে লাগলেন, কাইফিয়াত ছাড়ো, ঈমান রক্ষা করো। ফলে দেখা গেল, নতুন যুগের তালেবুল ইল্‌মরা এশকে নববীওয়ালা কাইফিয়াতে দুর্বল হতে লাগল। এই অধঃপতন আজও মাদরাসার পরিবেশে বিদ্যমান রয়েছে। আজ নতুন করে এই দুই যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করা জরুরি। এই উভয় শাখার মাঝে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা একান্তই আবশ্যক। খানকায় অবস্থানকারীরা মাদরাসায় গিয়ে ইল্‌ম শিক্ষা করবে। আর মাদরাসায় ইল্‌ম অর্জনকারীরা খানকায় এসে এশকে নববী ও এশকে এলাহী শিক্ষা করবে, যেন আবার সবার মাঝে আগের যুগের মতো পূর্ণতা সৃষ্টি হয়ে যায়।'

ওলামায়ে কেরামের জন্য সোহবতে সালেহীনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

দুটি নেয়ামত

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মতের জন্য দুটি নেয়ামত রেখে গেছেন। এক. তা'লীমাতে নববী। দুই. কাইফিয়্যাতে নববী। অর্থাৎ– ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছেন এবং ইল্‌মের রূপরেখা কী হবে তা-ও শিখিয়েছেন। তো সাহাবা কেরাম দুটি নেয়ামত পেয়েছেন। তা'লীমাতে নববী ও কাইফিয়্যাতে নববী। তাই তাঁরা যখনই এই কাইফিয়াতের মাঝে কিছুটা হেরফের অনুভব করতেন, সাথে-সাথেই নিজের সম্পর্কে বলতেন–

نَافَقَ حَنْظَلَةُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ

'হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে—হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে।'

তো দেখুন, দুটি নেয়ামত উম্মত নবীজি থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। এক. তা'লীমাতে নববী। দুই. কাইফিয়্যাতে নববী। তা'লীমাতে নববীকে 'ইল্‌ম' বলা হয় আর কাইফিয়্যাতে নববীকে 'তাযকিয়া' বলা হয়।

ইল্‌মের সাথে তাযকিয়াও লাগবে

তো ইল্‌মের রূপরেখা সম্পর্কে আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন। তাযকিয়া এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি শুধু ইল্‌ম দিয়ে মাগফেরাত

পাওয়া যেত, তাহলে শয়তানও মাগফেরাত পেয়ে যেত। কারণ, শয়তানের কাছে ইল্‌ম কম ছিল না। তার অঢেল ইল্‌ম ছিল। কিন্তু তার মাঝে বাতেনি মরজ তথা আত্মার ব্যাধি ছিল। তাকাব্বুর তথা অহংকার ছিল। তাই ইল্‌ম থাকা সত্ত্বেও তাকাব্বুর নামক বাতেনি রোগ তাকে বরবাদ করে দিয়েছে। তাই বোঝা যায়, বাতেনি রোগ থাকলে ইল্‌ম কোনো উপকারে আসে না। কুরআনে বনী ইসরাঈলের বেআমল আলেমদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

'ওরা হলো গাধার মতো, যে কিনা বোঝা বহন করে।'[১]

আরও বলা হয়েছে–

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

'আপনি কি দেখেছেন ওই ব্যক্তিকে, যে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে তার প্রবৃত্তিকে। আল্লাহ ইল্‌ম থাকা সত্ত্বেও তাদের গোমরাহ করে দিয়েছেন।'[২]

তো বোঝা গেল, তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন অপরিসীম।

আগেকার মাশায়েখে কেরাম উভয় নেয়ামতের অধিকারী ছিলেন

আগের যুগের মাশায়েখে কেরাম উক্ত উভয় নেয়ামতের অধিকারী ছিলেন এবং কামেল ও পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁদের নিকট নববি তালীমও ছিল, আবার নববি কাইফিয়্যাতও ছিল। ফলে তাদের ছাত্ররা এ উভয়টিই তাঁদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। সময়ের সাথে-সাথে তাঁদের মধ্যে গড়ে উঠত এক অনুপম দক্ষতা, যোগ্যতা ও আদর্শিক গুণ। কিন্তু পরে এই বিশেষ গুণের অস্তিত্ব একত্র থাকেনি। মাদরাসা তৈরি হওয়ার পর এই উভয় গুণ পৃথক-পৃথক অবস্থানে চলে গেছে। তো তা'লীমাতে নববী যেখান থেকে শেখা হতো, তাকে বলা হতো মাদরাসা। আর যেখান থেকে কাইফিয়্যাতে নববী শেখা হতো, তাকে বলা হতো খানকা। উম্মতের মাঝে বহু বছর এভাবেই দীনের কাজ চলছিল। তালিবুল ইল্‌ম মাদরাসা থেকে ইল্‌ম অর্জন করে নিত আর মারেফতের ছাত্ররা খানকা থেকে এশকে এলাহীর নেয়ামত অর্জন করে নিত।

---

১. সূরা জুমু'আ : আয়াত ৫

২. সূরা জাছিয়া : আয়াত ২৩

অধঃপতনের কারণ

সময়ের সাথে-সাথে কিছুসংখ্যক জাহেল সূফীর আমল ওলামায়ে কেরামকে বিচলিত করে দিয়েছে। ওলামায়ে কেরাম এতটা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন যে, তাছাওউফকে তারা নিষিদ্ধ মনে করতে লাগলেন। ওলামায়ে কেরাম বলতে লাগলেন, কাইফিয়াত ছাড়ো, ঈমান রক্ষা করো। ফলে দেখা গেল, নতুন যুগের তালেবুল ইল্‌মরা এশকে নববীওয়ালা কাইফিয়াতে দুর্বল হতে লাগল। এই অধঃপতন আজও মাদরাসার পরিবেশে বিদ্যমান রয়েছে। আজ নতুন করে এই দুই যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করা জরুরি। এই উভয় শাখার মাঝে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা একান্তই আবশ্যক। খানকায় অবস্থানকারীরা মাদরাসায় গিয়ে ইল্‌ম শিক্ষা করবে। আর মাদরাসায় ইল্‌ম অর্জনকারীরা খানকায় এসে এশকে নববী ও এশকে এলাহী শিক্ষা করবে, যেন আবার সবার মাঝে আগের যুগের মতো পূর্ণতা সৃষ্টি হয়ে যায়।

শায়খদের সোহবতে বিখ্যাত আলেমগণ

আগের যুগে বড়-বড় ওলামায়ে কেরাম আপন যুগের মাশায়েখে কেরামের সামনে শাগরেদ হয়ে হাঁটু গেড়ে বসতেন। ইমাম কুশাইরি (রহ.) বলেছেন, মাশায়েখে কেরামের নতজানু হওয়ার মতো আচরণ ওলামায়ে কেরামের মাঝে ইমামগণও করেছেন।

ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)

ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) ইমাম জা'ফর সাদেক (রহ.) থেকে ফয়েজ লাভ করেছেন। তিনি আমাদের নকশবন্দিয়া তরিকার লোক। দু-বছর তাদের মাঝে বন্ধন ছিল। এত ফয়েজ তিনি পেয়েছেন যে, তিনি নিজেই বলেছেন–

لَوْلَا السَّنَتَانِ لَهَلَكَ النُّعْمَانُ

'যদি দু-বছর না হতো, তাহলে নো'মান ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।'

ইমাম মালেক (রহ.)

ইমাম মালেক (রহ.) ইমাম জা'ফর সাদেক (রহ.)-এর সোহবতে অনেক বেশি গমন করতেন। তাই তো তাদের উভয়ের জীবন একই রকম ছিল। তাঁদের উভয়েরই উসূলে ফিক্‌হ একই রকম ছিল। তবে উসূলে ফিক্‌হ প্রথম প্রণয়ন করেন ইমাম মালেক (রহ.)।

বর্ণিত আছে–

لَتَبِعَهُ مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ

'ইমাম মালেক (রহ.) তাঁকে অনুসরণ করেছেন।'

তাই তাঁদের উভয়ের মাঝে অনেক মিল ছিল।

ইমাম শাফেয়ি (রহ.)

ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর যুগের একজন বুযুর্গের নাম ছিল শা'বান রায়ি (রহ.)। অবশ্য শা'বান একটি গোত্রের নাম। ইমাম মোহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানি সেই গোত্রেরই লোক। তো ইমাম মালেক সেই গোত্রের লোকের নিকট থেকে ফয়েজ লাভ করেছেন।

আবুল আব্বাস ইবনে শুরাইহ

আবুল আব্বাস ইবনে শুরাইহ ইমামুল লুগাত ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি জুনাইদ বাগদাদির সোহবতে গিয়েছেন। প্রথম দিন তাঁর কথা শুনে বললেন, আমি তো এই বান্দার কথা বুঝছি না। কিন্তু তাঁর কথাবার্তা এমন শানদার যে, তাঁকে ভ্রান্তও বলা যায় না। তো তিনি বললেন, নিশ্চয় এসব কোনো সাহেবে জয্ব ব্যক্তির কথা।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) হযরত বিশ্‌র হাফি (রহ.)-এর সোহবতে যেতেন। কেউ একজন বলল, আরে ভাই! আপনি এত বড় ইমাম, মুহাদ্দিছ, ফকীহ; অথচ আপনি এমন এক বান্দার কাছে গমন করেন, যিনি শুধুই ইবাদাতে মগ্ন থাকেন। তখন তিনি দারুণ সুন্দর একটি জবাব দিলেন। বললেন, দেখো, আমি কিতাবুল্লাহর আলেম। আর বিশ্‌র হাফি আল্লাহর আলেম। আর কিতাবুল্লাহর আলেমের চেয়ে আল্লাহর আলেমের মর্যাদা বেশি। একবার একব্যক্তি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)কে প্রশ্ন করল–

مَاالْاِخْلَاصُ

'এখলাছ কাকে বলে?'

বললেন–

هُوَ الْخَلَاصُ مِنْ اٰفَاتِ الْاَعْمَالِ

'আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে যাওয়ার নাম এখলাছ।'

লোকটি বললেন–

مَا التَّوَكُّلُ

'তাওয়াক্কুল কাকে বলে?'

হযরত বললেন–

اَلثِّقَةُ بِاللهِ

'আল্লাহর ওপর ভরসা করা।'

লোকটি বললেন–

مَا الرِّضَاءُ

'রিজা কাকে বলে?'

হযরত বললেন–

تَسْلِيْمُ الْاُمُوْرِ اِلَى اللهِ

'আল্লাহর কাছে নিজের বিষয়গুলো সোপর্দ করা।'

লোকটি বললেন–

مَا الْمَحَبَّةُ

'মহব্বত কাকে বলে?'

হযরত বললেন, এর জবাব আমি দেব না। এর জবাব বিশ্‌র হাফি থেকে জেনে নাও। তো দেখুন, যতক্ষণ ইল্‌মের কথা চলছিল, ততক্ষণ উত্তরও প্রদান করেছিলেন। যখন হালতের ব্যাপারে, মারেফতের ব্যাপারে প্রশ্ন এল, তখন বিশ্‌র হাফির কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

আবার দেখুন, আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁর ছেলে সালেহ ইবনে আহমাদকে উৎসাহ দিতেন। বলতেন, তুমি তার সোহবত গ্রহণ করো। তাঁর সংস্পর্শে থাকো।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.)

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) যুগের বুযুর্গ ব্যক্তি আবু হাফ্‌স হাদ্দাদ (রহ.)-এর কাছে বাইয়াত হলেন। তিনি ওই বুযুর্গ, যিনি লোহা কাটতেন। তিনি হাতিয়ার মাথার দিকে তুললেন আর এদিকে আযান দিল; তাহলে এই হাতিযার আর লোহায় মারতেন না। বলতেন, এখন আমাকে আমার আল্লাহ ডাক দিয়েছেন।

আল্লাম ইবনে হাজ্‌র (রহ.)

আল্লামা ইবনে হাজ্‌র (রহ.) বোখারি শরীফের সুবিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাত্‌হুল বারী লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি একবার শায়খ মাদয়ান (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর একবারের নেক দৃষ্টি ও তাওয়াজ্জুহের বরকতে সারাটা জীবন তিনি শায়খের তত্ত্বাবধানের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন।

ইমাম রাযি (রহ.)

ইমাম রাযি (রহ.) হযরত শায়খ নাজমুদ্দীন আবকারের হাতে বাইআত গ্রহণ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম আবদুল্লাহ আনসারি

এই মহান ব্যক্তিও বোখারি শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। তিনি প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লামা যাহাবি (রহ.) বলেছেন–

اَلْقُعُوْدُ مَعَ الصُّوْفِيَّةِ فِيْ خَانْقَاهْ

'তিনি খানকায় সূফীদের সাথে বসতেন।'

শাইখ আবুল আব্বাস ইয্‌যুদ্দীন আল-ফারুকী

তাঁর ব্যাপারে আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ.) বলেছেন–

كَانَ قَدْ لَبِسَ خِرْقَةَ التَّصَوُّفِ مِنَ السُّهْرَوَرْدِى

তিনি শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি (রহ.) থেকে খেলাফত পেয়েছেন।

শায়খ আবদুল্লাহ (রহ.)

তিনি মাঅরাউন্নাহারের বড় ফকীহ ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত আছে–

ذَهَبَ بِاِشَارَةِ شَيْخِهٖ اِلٰى بُخَارَا وَاعْتَكَفَ هُنَا

'তিনি আপন শায়খের ইঙ্গিতে বোখারা গমন করেছেন এবং সেখানে ই'তেকাফ করেছেন।

সেখানে তিনি বাহাউদ্দীন নকশবন্দি (রহ.) থেকে খেলাফত পেয়েছেন।

মোল্লা জিওন (রহ.)

ইনি সমকালের এক কাদেরি বুযুর্গ শাইখ ইয়াসীন ইবনে আবদুর রায্‌যাক (রহ.) থেকে খেলাফত পেয়েছেন।

ইমাম গায্যালি (রহ.)

ইমাম গায্যালি (রহ.) সেলসেলায়ে আলিয়া নকশবন্দিয়ার বুযুর্গ হযরত খাজা আবু আলী ফারমাদি (রহ.) থেকে বাতেনি নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি তাঁর কিতাবে লিখেছেন, আমি বাতেনি নেয়ামত হযরত আবু আলী থেকে অর্জন করেছি।

আল্লামা শামি (রহ.)

আল্লামা শামি (রহ.) বাতেনি নেসবত পেয়েছেন হযরত মাওলানা খালেদ কুরদি (রহ.) থেকে। তিনি আমাদের সেলসেলা আলিয়া নকশবন্দিয়া তরিকার লোক ছিলেন। খাজা গোলাম আলী দেহলবি (রহ.) ছিলেন তাঁরই খলীফা আর আল্লামা শামি হচ্ছে দুররে মুখতার কিতাবের রচয়িতা। এই কিতাবটিকেই বর্তমানে ফতোয়ায়ে শামী বলা হয়। সকল দারুল ইফতায় তা বিদ্যমান আছে। কোনো মুফতী সাহেবকে মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি সর্বপ্রথম যে কিতাবের শরণাপন্ন হন, সেটি এই ফতোয়ায়ে শামী। সুবিশাল এক কিতাব। তো আল্লামা শামি একদিকে বিদগ্ধ আলেম ও ফকীহ ছিলেন, অন্যদিকে ছিলেন তাছাওউফের বড় এক ব্যক্তিত্ব।

মোল্লা নিযামুদ্দীন (রহ.)

আমাদের বর্তমান পাঠ্যসূচি ও নেসাব দরসে নেযামীর প্রণেতা হলেন মোল্লা নিযামুদ্দীন। তিনি ইন্ডিয়ার এক গ্রামের লোক ছিলেন। ইন্ডিয়ার একটি শহরের নাম অধ। সেখানকার একটা গ্রামের নাম বাঁসা। ওই গ্রামের একজন অখ্যাত-অপরিচিত আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। সেখানে থেকে গিয়ে তিনি তাঁর হাতে বাইআত হন। তাঁরই দু'আয় তিনি এখলাছ প্রাপ্ত হয়েছেন। আর এখলাছের বরকতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রণীত সিলেবাসটিকে এভাবে কবুল করে নিয়েছেন।

মোল্লা জামি (রহ.)

বর্তমান আপনারা যে শরহে জামী কিতাবটি পড়েন, তার লেখক হলেন মোল্লা জামী (রহ.)। তিনি বাইআত গ্রহণ করেছেন আমাদের নকশবন্দিয়ার সেলসেলার বুযুর্গ খাজা উবাইদুল্লাহ আহরার (রহ.)-এর হাতে।

আল্লামা মীর সায়্যেদ শরীফ জুরজানি

এই বুযুর্গকে আপনারা যারা দরসে নেজামীর ছাত্র সকলেই চেনেন। তিনি আমাদের নকশবন্দিয়া সেলসেলার বুযুর্গ খাজা আলাউদ্দীন আত্তার (রহ.)-এর হাতে বাইআত হয়েছেন। তিনি নিজেই তার শায়খের ব্যাপারে লিখেছেন–

وَاللّٰهِ مَا عَرَفْتُ حَقَّ سُبْحَانَهُ تَعَالٰى مَا لَمْ اَتِيْتُ فِيْ خِدْمَةِ الْعَطَّارِ

'আল্লাহর শপথ! আমি আত্তার (রহ.)-এর খেদমতে না আসা পর্যন্ত আল্লাহকে চিনিনি।'

আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলবি

হযরত শাইখ আবদুল হক দেহলবি (রহ.) একজন মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি যে মুকাদ্দামা বা ভূমিকাটি লিখেছেন, আকসামে হাদীছের ক্ষেত্রে আজও সেটি কাজে আসছে। সেখানে তিনি সহীহ হাদীছ কী, মারফু' হাদীছ কী, মাওযূ' হাদীছ কী এসবের আলোচনা করেছেন। এত বড় মুহাদ্দিছ সাহেব বাইআত হয়েছিলেন আমাদের সেলসেলা নকশবন্দিয়া তরিকার বুযুর্গ খাজা বাকি বিল্লাহ (রহ.)-এর হাতে।

কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি

বোখারায় যুগের ফকীহ হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) ছিলেন একজন মুফাসসিরে কুরআন। তাঁর লেখা আরবি তাফসিরগ্রন্থ তাফসীরে মাযহারী বেশ প্রসিদ্ধ কিতাব। বয়ানুল কুরআন ও মারেফুল কুরআন অধ্যয়ন করলে আপনি পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় তাফসীরে মাযহারীর রেফারেন্স পাবেন। তিনি বাইআত হয়েছিলেন আমাদের নকশবন্দি সেলসেলার এক বুযুর্গ হযরত মাওলানা মির্জা জানে জানাঁ (রহ.)-এর হাতে। তাঁর থেকে তিনি এজাযত ও খেলাফত পেয়েছেন। তো তিনি ফকীহ তো বটেনই, সাথে-সাথে ছিলেন বিদগ্ধ তাফসীর ও হাদীছবিশারদ এবং যুগের সূফী ও সাধক।

হযরত মাওলানা আবদুল হাই (রহ.)

হযরত মাওলানা আবদুল হাই ফিরিঙ্গি মহল্লি (রহ.) বাইআত গ্রহণ করেছিলেন সায়্যেদ আহমাদ শাহীদ (রহ.)-এর হাতে। আবার হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি এবং হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.) বাইআত ছিলেন হযরত হাজী সাহেব হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রহ.)-এর হাতে।

ওলামায়ে দেওবন্দ

তাঁদের পরের স্তরের বুযুর্গ হযরত শাহ্ আশরাফ আলী থানবি, হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানি, হযরত কারী তায়্যেব, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহ.)। এঁরা সকলেই কারও-না-কারও হাতে বাইআত ছিলেন। আবার তাঁরাও অন্যদের বাইআত করেছেন।

তো দেখুন, এ-সকল ব্যক্তি, যাঁদের হাতে আল্লাহ তা'আলা দিনের কাজ নিয়েছেন, বিশাল বিশাল কাজ তাঁরা আঞ্জাম দিয়েছেন। তারা সকলেই তা'লীমাতে নববীরও অধিকারী ছিলেন আবার কাইফিয়্যাতে নববীরও অধিকারী ছিলেন। উভয় সাগরের মোহানা ছিলেন তাঁরা। তাঁদের হাতে আল্লাহ তা'আলা দীনের কাজ নিয়েছেন।

একাধিক শায়খ থেকে ফয়েজ গ্রহণ

অনেকে আবার একাধিক শাইখ থেকে ফয়েজ লাভ করেছেন। যেমন– খাজা আবু সাঈদ (রহ.) রজার মাকাম ইমাম রাযি (রহ.) থেকে শিখেছেন। হায়ার মাকাম শিখেছেন শাহ সুজা কিরমানি (রহ.) থেকে। নেসবতে ফরদিয়্যাত হাসিল করেছেন আবু হাফ্স হাদ্দাদ (রহ.) থেকে।

হযরত আবু আলী (রহ.) বলেছেন, তাছাওউফের ক্ষেত্রে আমার ওস্তাদ জুনাইদ বাগদাদি, ফিকহের ক্ষেত্রে ইবনে শুরাইহ, নাহুর ক্ষেত্রে সালেহ (রহ.), হাদীছের ক্ষেত্রে ইবরাহীম (রহ.) আর আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে এতটুকু ইল্‌ম থাকা-ই যথেষ্ট।

সোহবতের প্রভাব

তো দেখুন, বড়-বড় সকল ওলামায়ে কেরামই নিজের যুগের মাশায়েখে কেরাম থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত হয়েছেন। কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) তাঁর কিতাব তুহফাতুছ ছালেহীন-এ লিখেছেন, অগণিত মানুষের সুবিশাল একটি জামাত, যাঁরা মিথ্যার ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন এমনটা মনে করা বিবেকে বাঁধে। তাঁদের এই জামাত এমন ছিলেন যে, প্রত্যেক সদস্যই তাকওয়া ও ইল্‌মের দ্বারা এমন স্তরে উন্নীত ছিলেন যে, তাঁদের ওপর মিথ্যার অপবাদ দেওয়া নাজায়েয। তাঁরা তাঁদের জবান দ্বারা, তাঁদের কলম দ্বারা একথা সত্যায়ন করে গেছেন যে, আমরা মাশায়েখে কেরামের সোহবতে থাকার কারণে অভ্যন্তরীণভাবে একটি অন্য রকম হালত অনুভব করতাম।

এমন কথা আরও অগণিত হযরত সত্যায়ন করেছেন। তো এসব কথা তো ইল্‌মে তাছাওউফের গুরুত্বই বহন করে। আর এই সত্য দীপ্ত প্রভাতের মতো উজ্জ্বল যে, আল্লাহ তা'আলা দীনের কাজ এমন ব্যক্তিবর্গ দ্বারা নিয়েছেন, যাঁরা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার ইল্‌মে সমান পারদর্শী ছিলেন। এখলাছ ও নিষ্ঠার প্রভাব তাদের লেখায়, কথায়, ভাষণে ও বক্তৃতায় প্রতিফলিত হয়েছিল। হযরত আকদাস থানবি (রহ.) বলেছেন, উম্মতের দুটি জামাত আল্লাহ তা'আলার রহমত। এক ফোকাহায়ে কেরামের জামাত। দুই, সূফিয়ায়ে কেরামের জামাত। তিনি বলেছেন, এঁরা হলেন উম্মতের হুকামা। যেমনটি কুরআনের বর্ণিত হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সোহবত অবলম্বন করো।'[১]

আল্লামা আলূসি (রহ.) রুহুল মা'আনী কিতাবে লিখেছেন–

خَالِطُوْهُمْ لِتَكُوْنُوْا مِثْلَهُمْ وَكُلُّ كَرِيْمٍ بِالْمُقَارَنِ يَقْتَدِىْ

'তাঁদের সাথে ওঠাবসার সময় এমনভাবে মিশে যাও যে, তোমরাও তাঁদের মতো হয়ে যাও। আর প্রত্যেক সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত সাথি তার সাথির অনুকরণ করে।'

মানে তোমরা তাঁদেরই মতো হয়ে যাও যেন, তাদের রং তোমাদের মাঝে চলে আসে, বান্দার গুণ অপর বান্দার মাঝে চলে আসে।

এখানে خَالِطُوْاهُمْ باب مفاعله এর সিগাহ مَخَالِطَةٌ يُخَالِطُ خَالَطَ অর্থাৎ– এই পদ্ধতিতে উভয়েরই জন্য ফায়দা রয়েছে। আপনারা خاصيت ابواب এর মধ্যে পড়েছেন باب مفاعله এর মধ্যে افاده استفاده অর্থাৎ– উভয়ের ক্ষেত্রে ফায়দাটি পারস্পরিকভাবে প্রয়োগ হবে। তো এক বান্দার মাঝে অপর বান্দার গুণ প্রভাব সৃষ্টি করে।

یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو
تجھ کو سب پکار اٹھیں گزر جاوں جدھر سے میں

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৯

মোটকথা, সুন্নাতে নববীর রং এমনভাবে আয়ত্ত করে নাও যে, তুমি যেদিক থেকেই অতিক্রম কর, তোমাকে দেখলে তুমি যার অনুসরণ করছ তার কথা মনে পড়ে যাবে। নবীজির সুন্নাতের রং যেন তোমার মাঝে এমনভাবে ছড়িয়ে যায় যে, তুমি যে প্রান্তেই যাও, লোকেরা বুঝতে পারে, লোকদের স্মরণ হয়ে যায় মুসলমানদের পয়গম্বরের কথা।

বন্ধু চলে বন্ধুর ধারায়

সায়্যেদুনা হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন–

اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِطُ

'বান্দা তার বন্ধুর দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং তোমরা প্রত্যেকে দেখো, বান্দাটি চলে কার সাথে; কার সাথে তার ওঠা বসা।

মোল্লা আলী কারী (রহ.) এই হাদীছ সম্পর্কে বলেছেন–

لِاَنَّ الطَّبْاعَ مَجْبُوْلَةٌ عَلَى التَّشَبُّهِ وَالْاِقْتِدَاءِ بَلِ الطَّبْعُ يَسْرِقُ مِنَ الطَّبْعِ مِنْ حَيْثُ لَايَدْرِىْ هٰذا

'এক স্বভাব অন্য স্বভাব থেকে চুপিসারে এমনভাবে গুণ আহরণ করে নেয় যে, বুঝতে পারাই সম্ভব হয় না। যেন চুরি করে নিয়ে নেয়। একেবারে গোপনে এক স্বভাব থেকে আরেকজনের স্বভাব প্রভাবিত হয়ে যায়।'

আপনি যদি সাগরতীরে বসে থাকেন, সামান্য সময়ের ভেতরেই আপনার ভেতর আর্দ্রতা ও কোমলতা প্রভাবিত হয়ে উঠবে। আর যদি আপনি আগুনের কাছে থাকেন, তাহলে আপনার মাঝে রুঢ়তা ও রুক্ষতা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে। উটের রাখালদের মাঝে থাকলে হটকারিতা এসে যায় আর ঘোড়ার পরিচর্যাকারীর মাঝে এসে যায় বীরত্ব। বকরির রাখালদের মাঝে বিনয় ও নম্রতা এসে যায়।

তো যদি এভাবে অন্য প্রাণীর অভ্যাস মানুষের মাঝে আসতে পারে, তাহলে মানুষের অভ্যাস কেন হয়ে যাবে না মানুষের মতো? কেন প্রভাব বিস্তার করবে না মানুষের স্বভাব মানুষের মাঝে?

দৃষ্টি লাগার বাস্তবতা আছে

অন্য একটি হাদীছ শুনুন। আসমা বিনতে যুবাইর (রহ.) বলেছেন, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলাম, হে আল্লাহর নবী! জা'ফরের বাচ্চাদের দৃষ্টি লেগেছে–

اَفَاَسْتَرْقِيْ لَهُمْ

'আমি কি কিছু পড়ে ঝাড়ফুঁক করব?'

قَالَ نَعَمْ فَاِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الْقَدْرِ لَتَسَبَّقُ الْعَيْنُ

'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ; যদি কোনো জিনিস তাকদীরকে অতিক্রম করে যায়, তাহলো নজর বা দৃষ্টি।

তাহলে যেব্যক্তির আত্মার ব্যাধির অভাব নেই, যেব্যক্তি হিংসা-বিদ্বেষ, দুশমনি, শত্রুতা, হটকারিতা, কাপুরুষতা ইত্যাদি নানারকম ব্যাধিতে আক্রান্ত তাদের দৃষ্টি যদি প্রভাব সৃষ্টি করে, যেব্যক্তির মাঝে মহব্বত থাকবে, দয়া-মায়া থাকবে, এখলাছ ও নিষ্ঠা থাকবে, সেই ব্যক্তির দৃষ্টি কেন মানুষের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না? এই যে আল্লাহওয়ালাগণের সোহবতে থাকার কারণে প্রভাব সৃষ্টি হয়, এর মূল হচ্ছে, তাদের দৃষ্টি লেগে যায়। যেমনটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلْعَيْنُ حَقٌّ

দৃষ্টি লাগা বিষয়টি সত্য।

আরেফীনের দৃষ্টি

আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহ.) হাদীছটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

كُنْتُ وَجَدْتُ هٰذَا الْعَيْنَ نَظَرَ الْعَارِفِيْنَ

'এই যে দৃষ্টি লাগা এ-বিষয়টি আমি আরেফীন তথা তাছাওউফের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির মাঝে পেয়েছি।'

প্রথমে তো খারাপ দৃষ্টি লাগার বিষয়টির আলোচনা করা গেল। তার বিপরীত প্রকার হচ্ছে আরেফীনের সুদৃষ্টি। এই সুদৃষ্টিও লাগে। একেও দৃষ্টি লাগা বলা হয়।

فَاِنَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّاْثِيْرِ اِلَّا كَثِيْرٌ

'আর এই দৃষ্টিটা প্রভাব সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ভুমিকা রাখে।'

يَجْعَلُ الْكَافِرَ مُؤْمِنًا

'কাফেরকে মুমিন বানিয়ে দেয়।'

وَالْفَاسِقَ صَالِحًا

'ফাসেককে বানিয়ে দেয় নেককার।'

وَالْجَاهِلَ عَالِمًا

'জাহেলকে বানিয়ে দেয় আলেম।'

وَالْكَلْبَ اِنْسَانًا

'কুকুরের মতো স্বভাবের মানুষকে বানিয়ে দেয় প্রকৃত মানুষ।'

আরেকটি বিষয় দেখুন। আসহাবে কাহ্ফের সাথে যে-কুকুরটি ছিল, তার ব্যাপারে কিতাবে লিখিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত দান করবেন। যে নেয়ামত মানুষে প্রাপ্ত হবে, সেই নেয়ামত সেই কুকুরটিকে প্রদান করা হবে।

হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لِكُلِّ شَيْءٍ مَعَادِنٌ وَمَعَادِنُ التَّقْوٰى قُلُوْبُ الْعَارِفِيْنَ

'প্রত্যেকটি জিনিসেরই খনি আছে। আর তাকওয়ার খনি হলো আরেফীনের হৃদয়।'

সোহবত ব্যতীত দীন আসে না

আমাদের বুযুর্গগণ কথাটির অপরিসীম গুরুত্ব দিতেন। তারা এর ব্যাখ্যাটা এভাবে করতেন–

لَادِيْنَ اِلَّا بِالْعِلْمِ

'ইলম ব্যতীত দীন নেই।'

وَلَا عِلْمَ اِلَّا بِالْكِتَابِ

'কিতাব ব্যতীত ইল্‌ম নেই।'

وَلَا كِتَابَ اِلَّا بِمُرَادِهٖ سُبْحَانَهٗ تَعَالٰى

'আল্লাহর উদ্দেশ্য বোঝা ব্যতীত কিতাব নেই।'

وَلَا يَتَبَيَّنُ مُرَادُهُ اِلَّا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'আল্লাহর উদ্দেশ্য বোঝা যাবে না নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ব্যতীত।'

وَلَا يَتَّضِحُ السُّنَّةُ اِلَّا بِكَلَامِ الْفُقَهَاءِ

'আর সুন্নত বোঝা যাবে না ফোকাহায়ে কেরামের বক্তব্য ব্যতীত।'

তো হাদীছ তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা। আর সেই কথার বুঝকে বলা হবে ফিক্হ। হাদীছ বোঝার জন্য ফেকাহ জরুরি। তারপর বলা হচ্ছে–

وَلَا يُفِيْدُ كَلَامُ الْفُقَهَاءِ اِلَّا بِالْاِنْصِبَاغِ

'ফোকাহায়ে কেরামের বক্তব্য উপকারী হবে তখন, যখন আল্লাহর রঙে صبغة الله এর আদলে তার জীবন হবে।'

وَلَا يَلُوْحُ الْاِنْصِبَاغُ اِلَّا بِالتَّزْكِيَةِ

'আর সেই রং আসবে না তাযকিয়া ব্যতীত।'

তাযকিয়া ছাড়া তাতে আলো আসে না।

وَلَا يَتَاَتَّى التَّزْكِيَةُ اِلَّا بِمَعِيَّةِ الشُّيُوْخِ

'আর শাইখের সোহবত ছাড়া তাযকিয়া হয় না।

আর–

وَلَا الْمَعِيَّةُ اِلَّا بِاِتِّبَاعِهِمْ

'আর সোহবত হবে না তাদের অনুসরণ ছাড়া।'

বোঝা গেল, যেব্যক্তি দীনকে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গে স্থাপন করতে চাইবে, নিজের গোটা সত্তায় দীন জিন্দা করতে চাইবে, তার উচিত হবে কামেল মাশায়েখে কেরামের সোহবতে আগমন করা, নিজেকে শাইখের হাতে ন্যস্ত করে দেওয়া। তারপরই দেখবে আল্লাহ তা'আলা হৃদয়ের জগতকে কীভাবে পরিবর্তন করে দেন। এছাড়া ইল্ম কোনো কাজে আসবে না, আমলের রাস্তা পরিপূর্ণভাবে উন্মুক্ত হবে না।

আল্লামা ইকবাল আশ্চর্য একটি কবিতা বলেছেন–

تری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب
مجھ کو نہ تھی خبر کہ ہے علم نخیل بے رطب

আমার বিগত জীবনের দিনরাত সবই তোমার সামনে। কিন্তু আমারই জানা ছিল না, আমার ইল্‌মের বৃক্ষে কোনো ফল নেই। ফল ছাড়া গাছের কী মূল্য বলো–

تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا
عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب

এশ্‌কের সবটুকুই সুনির্বাচিত। আকল যদি পূর্ণতা পায়, তাহলে তা আগুনের লেলিহান শিখার রূপ ধারণ করে। এই আকলকে সোজা রাখতে এশ্‌কের প্রয়োজন। আর এই এশ্‌ক জুটবে আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে বসার মাধ্যমে।

তাই হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বলেছেন, ওলামায়ে কেরাম নিজের এসলাহের জন্য কোনো মুহাক্কিকের নিকট গমন করা উচিত। আরে ভাই! দুনিয়ার ডাক্তাররাও তো রোগের জন্য অন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। তারাও তো অন্যের থেকে চিকিৎসা নেন। নিজের দেহের সম্পর্কে নিজের অনুভূতি, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, নিজের অবগতি বেশি থাকা সত্ত্বেও তিনি আরেকজনের চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তো আমাদের ওলামায়ে কেরামেরও উচিত নিজের আত্মার রোগের জন্য আরেক আত্মার চিকিৎসকের কাছে, আরেকজন মুহাক্কিক ব্যক্তির কাছে গমন করা, নিজের চিকিৎসা গ্রহণ করা।

মাশায়েখের সোহবত ওলামায়ে কেরামের জন্য কেমন জরুরি

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বলেছেন, ওলামায়ে কেরাম নিজের এসলাহের জন্য কিছুটা সময় কোনো শায়েখের দরবারে থাকা জরুরি। কারণ, যে-ইল্‌মের ওপর আমল করা হবে না, তা ওই আলেমকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ

'যে ইল্‌ম শিখেছে ওলামায়ে কেরামের সাথে বসার জন্য আর সাধারণদের সাথে বিবাদ করবার জন্য... ।'

থানবি (রহ.) বলতেন, ইল্‌ম হাসিল করার জন্য দশটি বছর ব্যয় করেছ; ইল্‌মকে আমলে আনতে কি দশটি মাসও ব্যয় করবে না?

যেমনিভাবে কানযুদ্দাকায়েক ও হেদয়া পড়া জরুরি, তেমনিভাবে আবু তালেব মাক্কি (রহ.)-এর 'কূতুল কুলূব' পাঠ করাও জরুরি। ইমাম গায্‌যালি (রহ.)-এর 'আরবাঈন' পাঠ করাও জরুরি। তো দশটি বছর চলে গেল কিতাবের পেছনে দীনের ইল্‌ম অর্জন করতে; এখন দশটি মাস কি সেই ইল্‌ম তোমার মাঝে চলে আসার মেহনতে ব্যয় করবে না? তুমি তাদের কাছে বসে দেখো রাগ দমন করতে হয় কীভাবে, গীবত থেকে বাঁচতে হয় কীভাবে, আল্লাহর মহব্বত হৃদয়ে ধারণ করতে হয় কীভাবে, রাসূলের সুন্নত জীবনের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হয় কীভাবে। এসব ছিফাত, এসব কামালিয়াত তোমার মাঝে আসবে অন্যকে দেখে-দেখে। তোমার ভেতরে জ্বলে উঠবে এশ্‌কের আগুন অন্যের এশ্‌কের আগুনের ছোঁয়া পেয়ে। হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) বলতেন, আমার নিকট তো দিন-রাতের মাঝে পার্থক্য দূর হয়ে গেছে। আমল করার ক্ষেত্রে রাতদিন এক হয়ে গেছে। জান ও দিল আল্লাহর হাওলা করে দেওয়া হয়েছে।

اے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی

تا راہ بیں نباشی کہ راہبر شوی

'ওরে বেখবর! চেষ্টা করো বোধজ্ঞানসম্পন্ন হতে। তুমি নিজেই যদি পথ না দেখ, তবে রাহবারের ভূমিকা পালন করবে কীভাবে?'

در مکتب حقائق پیش ادیب عشق

ہاں اے پسر بکوش کہ روزے پدر شوی

'তুমি নিজেকে আগে অন্যের সামনে পেশ করো। তারপরই তোমার সামনে অন্যরা আসবে। আগে কিছুদিন বাচ্চা হও, তবেই তো হতে পারবে সন্তানের বাবা।'

হযরত মুরশিদে আলমের উক্তি

আমাদের হযরত বলেন, বাতেনি নূর অর্জনের ক্ষেত্রে আমজনতার চেয়ে ওলামায়ে কেরামের সময় কম লাগে। সাধারণরা আসে এবং বাতেনের এই নেয়ামত অর্জনের মাধ্যমে নূর হয়ে যায়। আর ওলামায়ে কেরামরা এসে হয়ে যায় নূরের ওপর নূর। কারণ, তাদের মাঝে ইল্‌ম তো আগে থেকেই অর্জিত থাকে। তাই বাতেনি নূরটা সামান্য ধরিয়ে দিলেই আল্লাহ তা'আলার দানে তার মধ্যে নূর চলে আসে। সেই নূর আরও উঁচু মাপের নূরে পরিণত হয়। হযরত আবু নাঈম (রহ.) হতে বর্ণিত আছে–

مَنْ اَخْلَصَ لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ظَهَرَتْ يَنَابِيْعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهٖ عَلٰى لِسَانِهٖ

'চল্লিশ দিন যেব্যক্তি এখলাছের সাথে সময় পার করবে, তার হৃদয় থেকে হেকমতের ঝরনাধারা প্রবাহিত হবে।'

হাদীছ শরীফে বাণত আছে–

مَنْ صَلّٰى اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ لَمْ تَفُتْهُ تَكْبِيْرَةُ الْاُوْلٰى كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بَرَآءَتَيْنِ، بَرَآءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَآءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ

'যেব্যক্তি চল্লিশ দিন এমনভাবে জামাতের সাথে নামায আদায় করবে যে, তার তাকবীরে উলা ছোটে না। আল্লাহ তার জন্য দুটি মুক্তি লিখে দেন। আগুন থেকে মুক্তি দান করেন এবং মুনাফেকি থেকে মুক্তি দান করেন।'

মাশায়েখের সোহবত দ্বারা দিল জিন্দা হয়

আরে ভাই! আমাদের মাশায়েখের তাকবীরে উলার হিসাব তো দিন অনুযায়ী নয়– বছর অনুযায়ী। হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দের সালানা জলসায় এলেন। বয়ান শেষ হলে আযান হলো। হযরত সাথে-সাথে মুছল্লায় চলে গেলেন। মুসাফাহা করার জন্য মানুষ এত ভিড় করছিল যে, হযরত হাঁটতে পারছিলেন না। অনেক বলা হলো যে, রাস্তা দিন, রাস্তা দিন। এত সময় হয়ে গেল যে, রাস্তা পার হতে গিয়ে পথে থাকতেই নামায দাঁড়িয়ে গেল। হযরত নামায পড়লেন ঠিকই; কিন্তু তাঁর চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, হযরত কী হলো? হযরত বললেন, আজ ৩০ বছর পর আমার তাকবীরে উলা ছুটে গেল।

তো এই মহা নেয়ামত তাঁর কীভাবে অর্জিত হলো? হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি (রহ.) থেকে অর্জন করেছেন। এতে মানুষের দিল জিন্দা হয়ে যায়। হাদীছে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِيْ لَا يَذْكُرُ رَبَّهٗ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

'যেব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে আর যে যিকির করে না তারা জীবিত ও মৃতের মতো।'

মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেছেন–

وَفِي الْحَدِيْثِ اِيْمَاءٌ اِلٰى اَنَّ مُدَاوَمَةَ ذِكْرِ الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ تُوْرِثُ الْحَيَاةَ الْحَقِيْقِيَّةَ الَّتِيْ لَا فَنَاءَ لَهَا

'যিকিরের মাধ্যমে এমন আসল জীবন মিলে যায়, যার পর তার আর মৃত্যু হয় না।'

এমনটি আমাদের মাশায়েখে কেরাম বলেছেন। দিল এমন জিন্দা হয়ে যায় যে, তার আর মৃত্যু আসে না। হাদীছে পাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا

মোল্লা আলী কারী (রহ.) হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

اِذَا مَرَرْتُمْ بِجَمَاعَةٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى فَاذْكُرُوا اللّٰهَ اَنْتُمْ اَيْضًا مَوَافَقَةً لَّهُمْ فَاِنَّهُمْ فِيْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

'হাদীছটির মর্ম হচ্ছে, যখন তোমরা এমন জামাতের পাশ দিয়ে অতিক্রম কর, যারা যিকির করছে, তাদের সাথে তোমরাও আল্লাহর যিকির করো। কারণ, এই জামাতটিই জান্নাতের বাগানের মধ্যে বসে আছে।'

তাই যে-মানুষ নেকের সংস্পর্শ পায়, তার মাঝেও ওই নেকি প্রভাব সৃষ্টি করে।

صحبت صالح ترا صالح کند

صحبت طالع ترا طالع کند

'সৎ সঙ্গ স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ।'

আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন–

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

'আল্লাহ যাদের ওপর নেয়ামত বর্ষণ করেছেন তথা নবী সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীন; তারা তাদের সাথে উঠবে। বন্ধু হিসেবে তারা কতই-না উত্তম!'[১]

শুধু বন্ধুত্বই যথেষ্ট নয়। সুন্দর বন্ধুত্ব ও উত্তম বন্ধুত্ব হতে হবে। আর তা হবে তাদের সোহবতে থাকার মাধ্যমে। অন্যথায় সম্ভব নয়।

অনুসরণের বরকত

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

'যে আমার প্রতি মনোনিবেশ করেছে, তুমি তার পথ ধরে চলো।'

এরপরেই আল্লাহ বলছেন-

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

'তারা হলো নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক বান্দাদের দল।'

এতে বোঝা গেল, অনুসরণটা হবে নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহীনের। তো যারা মাশায়েখের অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাদের নামকেই কবুল করে নেবেন।

হাদীছ শরীফে আছে–

هُمْ رِجَالٌ لَا يَشْقَىٰ جَلِيسُهُمْ

'তারা এমন লোক, যাদের কাছে উপবেশনকারীরা হতভাগা হয় না।'

একথাটি মাওলানা রুমি ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

یک زمانہ صحبتے با اولیاء

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریاء

'অলিদের সোহবতে কিছু সময় কাটানো একশো বছর রিয়ামুক্ত ইবাদাতের চেয়েও উত্তম।'

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ৬৯

পাকিস্তানে মুফতিয়ে আযম মুফতী মোহাম্মাদ শফী (রহ.) বলেছেন, আমি একবার হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)কে জিজ্ঞেস করলাম, এই যে কবিরা; তারা তো বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে আক্রান্ত। যাকে ভালো মনে করে, তাকে বড় করে বলে আর যা অপছন্দ করে তা ছেড়েছুড়ে বলে। আমার মনে হচ্ছে মাওলানা রুমি এখানে কথাটি বাড়িয়ে বলেছেন। শুনে মাওলানা থানবি (রহ.) শে'রটি এভাবে পড়লেন–

یک زمانہ صحبتے با اولیاء ■ بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریاء

صد এর স্থানে لاکھ পড়েছেন। এবার মুফতিয়ে আযম সাহেব বললেন, হযরত! একশো বছরের ব্যাপারটিই বুঝে আসছিল না, এখন বললেন, লাখ বছর...। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বললেন, দেখো, একশো বছর আর লক্ষ বছর ইবাদাত করলে, কিন্তু এর কী নিশ্চয়তা যে, সে ঈমান নিয়ে মরতে পারবে? তিনি বললেন, না, এই নিশ্চয়তা তো নেই। শয়তান তো ধোঁকা দিয়েই যাচ্ছে। হযরত বললেন, দেখো, শত-শত, লাখ-লাখ বছরের ইবাদাত তোমাকে ঈমান নিয়ে মরতে পারবে বলে গ্যারান্টি দিতে পারবে না; কিন্তু সোহবতের ব্যাপারে পেয়ারা হাবীব তার সত্য জবানে বলে গেছেন–

هُمُ رِجَالٌ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ

'তারা এমন ব্যক্তি যে, তাদের নিকট উপবেশনকারীরা হতভাগা হবে না।'

অর্থাৎ– যার জীবনের সমাপ্তি ঈমানের ওপর হবে সে হতভাগা নয়। অন্যথায় তার মতো কপালপোড়া আর কেউ হতে পারে না। এতে বোঝা যায়, হাজার বছর ইবাদাত করেও মৃত্যুর সময় ঈমান নসিব না-ও হতে পারে। অথচ সালেহীনের সোহবতে থাকলে ঈমান নসিব হবে এটি নিশ্চিত।

মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)-এর উক্তি

হযরত আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বলেছেন, আমার কাছে দুজন আলেম আনো। একজন সোহবতপ্রাপ্ত, আরেকজন সোহবতপ্রাপ্ত নয়। আমার সামনে আনলে পাঁচ মিনিটে আমি বলে দিতে পারব, তাদের মাঝে কে সোহবতপ্রাপ্ত আরকে সোহবতপ্রাপ্ত নয়। চলাফেরা, কথাবার্তা, ইশারা-ইঙ্গিত

সকল বিষয়ই বলে দেবে, এর মাঝে সোহবতের রং আছে আর এর সোহবতের রং নেই।

ইমাম গায্যালি (রহ.)-এর উক্তি

ইমাম গায্যালি (রহ.) লিখেছেন–

عالم بدون تربیت کے نفس کا کپا ہوتا ہے

'আলেম তরবিয়ত ছাড়া নফসের গোলাম হয়।'

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.) একবার দাওরা হাদীছের ছাত্রদের বলেছেন, তোমরা যতবার চাও বোখারি শরীফ খতম করে নাও। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহওয়ালাদের সোহবত না পাবে এবং তাদের জুতা সোজা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের রূহ প্রাপ্ত হবে না।

তো এর দ্বারা বোঝা যায়, জীবনে রাহবারের প্রয়োজন আছে।

আবুল কাসেম কুরায়শির উক্তি

আল্লামা আবুল কাসেম কুরায়শি (রহ.) বলেছেন, মুরীদের ওপর ওয়াজিব হচ্ছে শায়খ থেকে তরবিয়ত গ্রহণ করা। যার শায়খ নেই, সে সফল হবে না। তার পথপ্রদর্শক হবে শয়তান। তিনি আরও বলেছেন, আমি আবু আলী দাক্কাককে বলতে শুনেছি যে, 'ফলহীন গাছ হয়ো না।'

কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.)-এর উক্তি

কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.)-এর উক্তিটি খুব মনোযোগের সাথে পড়ো এবং ভাবো। তিনি বলেছেন–

نور باطن صلی اللہ علیہ وسلم راز سینہ درویشاں باید جست

'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরকে তালাশ করো দরবেশদের সিনায়। তবেই তুমি পাবে নূরে নবুওয়াত।'

হযরত মুহাম্মাদ মা'সূম (রহ.)-এর উক্তি

হযরত মুহাম্মাদ মা'সূম (রহ.) বলেছেন, এই যে খাস কোরবত, এই যে সোহবত, যাকে আমরা 'নেসবত; বলি, তা সূফী-সাধকদের তরিকায় চলার মাধ্যমেই অর্জিত হবে।

আল্লামা সায়্যেদ সালমান নদবি (রহ.)-এর উক্তি

আল্লামা সায়্যেদ সালমান নদবি (রহ.) বলেছেন, আল্লাহর মহব্বত হাসিল করবার জন্য আহলুল্লাহর সোহবত ছাড়া অন্য কোনো মামুল নেই। তিনি চমৎকার একটি দলিল দিয়েছেন যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে একটি দু'আ শিখিয়েছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ یُّحِبُّكَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার মহব্বত চাই এবং ওই সকল লোকের মহব্বত চাই, যারা আপনাকে মহব্বত করে।'

এখানে আল্লাহকে মহব্বতকারীদের মহব্বত প্রার্থনা করা হচ্ছে। এটি একথা-ই প্রমাণ করে যে, তাদের সোহবত ও মহব্বতের মাঝেই মানুষের ভাগ্যে দীন জোটে।

হযরত শায়খ মুহাদ্দিছে দেহলবি (রহ.)-এর উক্তি

হযরত শায়খ মুহাদ্দিছে দেহলবি (রহ.) বলেছেন, আমি অধ্যয়ন করছিলাম। আমার পিতা আমার কাছে চিঠি পাঠালেন–

ملائے خشک وناہموار نباشی

'শুষ্ক ও রুক্ষ আলেম হয়ো না।'

বিতর্কমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করো

হযরত মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেছেন, তোমরা সোহবতে থাকবে মহব্বতের সাথে বিতর্ক করবার জন্য নয়। তাহলে তুমি ফায়দা পাবে না।

میری ہر نظر تیری منتظر تیری ہر نظر میرا امتحان

'আমার দৃষ্টি তোমার প্রতীক্ষায় থাকে আর তোমার দৃষ্টি থাকে আমার পরীক্ষায়।'

বহু তালাবা-উলামাকে দেখা যায়, তারা শুধু শায়খকে মাপতে থাকে, ওজন করতে থাকে যে, অমুক বুযুর্গ এমন, তমুক বুযুর্গ এমন। ফলে তারা বুযুর্গ থেকে ফায়দা প্রাপ্ত হওয়ার তাওফীক পায় না। এক আলেম হযরত মাদানির নিকট দাওরায়ে হাদীছ পড়েছেন। তিনি আমাদের শায়খ মুরশিদ আলমের মাদরাসা দারুল উলূম হানাফিয়ায় মুসলিম শরীফ পড়াতেন। বহুকাল চলে গেল মুসলিম শরীফ পড়াতে-পড়াতে। সিনিয়র ওস্তাদ ছিলেন।

একবার চিন্তা করলেন, আমি বাইআত হব। হব-হবই করছেন। কিন্তু যেদিন হযরতের ওফাত হয়ে গেল, সেদিন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, হায়! হায়! আমি তো ফায়দা উঠাতে পারলাম না। আগেই যদি বাইআত হয়ে যেতাম! আমার কাছে এসে বলতে লাগলেন, জীবনে এমন ভুল আর হয় না। এমন কামেল মাদরাসায় থেকে এত বছর চলে গেল, আমি তাঁর হাতে বাইআত হয়ে ফায়দা নিতে পারলাম না!

তো এখনও এমন লোক আছে, যারা হব, হচ্ছি, করব, করছি করতে-করতে আর বুযুর্গদের যাচাই-বাছাই করতে-করতেই দিন চলে যাচ্ছে।

সোহবতে থাকবে মহব্বতের সাথে। হাদীছে এসেছে–

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ

হাদীছটির ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেছেন–

فِيْهِ تَعْلِيْمٌ لِمُرِيْدٍ لِاَنْ لَّا يَنْظُرَ اِلَى الشَّيْخِ بِعَيْنِ الْاِسْتِحْقَارِ وَاِنْ رَاٰى عِبَادَتَهٗ قَلِيْلَةً فَلْيَظْهَرْ عُذْرَهٗ وَيُعَلِّمَ نَفْسَهٗ اِنْ شَرَعَ مِنْهَا اِنْكَارٌ عَنْ شَيْخِهٖ لِاَنَّ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَى الشَّيْخِ لَمْ يُفْلَحْ اَبَدًا

এতে মুরিদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যে, তারা নিজেদের শায়খকে ছোট করে দেখবে না। যদিও তার আমল মুরিদের নিজের আমল থেকেও কম হয়। তুমি বুঝে নিয়ো শায়খের কোনো উজর আছে কিনা। যদি শায়খের ব্যাপারস্যাপারকে খণ্ডন করতে থাক, তাহলে তোমার আর কী অর্জিত হলো! শায়খের ওপর যে প্রশ্ন তুলবে, সে কামিয়াব হবে না।

বোঝা গেল, সোহবতে থাকবে মহব্বতের সাথে কোনোরূপ প্রশ্ন ও আপত্তি না তুলে।

এসলাহের পথে বাধা

বড় মসিবতটা হলো, নফ্স নিজের দোষ কাউকে বলতে দেয় না। যদি রোগী ডাক্তারের কাছে যায় আর ডাক্তারকে বলে, আমি অসুস্থ; অথচ রোগের বিবরণ যদি সে না দেয়, তাহলে ডাক্তার তার চিকিৎসা কীভাবে করবে। আপনার রানে ফোড়া উঠল। আপনার জন্যে ডাক্তারকে তা দেখানো জায়েয হবে। অথচ জনসাধারণকে রান দেখানো হারাম। তেমনি যে-কারও কাছে নিজের গুনাহ বলে বেড়ানো হারাম। ডাক্তারকে রান দেখানো জায়েয

চিকিৎসার স্বার্থে। তেমনিভাবে শায়খকে চিকিৎসার স্বার্থে নিজের দোষগুলো, নিজের অন্তরের রোগগুলো বলা জায়েয আছে। তাহলেই তো তোমার চিকিৎসা হবে। না হয় কীভাবে চিকিৎসা করাবে? তো শায়খের কাছে নিজের দোষ বলতে হবে; তখনই সঠিক পথ পাওয়া যাবে।

সোজা পথ কোনেটি

হযরত কারী তায়্যেব (রহ.) বলেছেন, কুরআনের খোলাসা হচ্ছে সুরায়ে ফাতেহা আর সুরা ফাতেহার সারসংক্ষেপ হচ্ছে–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

এটি তো আল্লাহর সমীপে দু'আ। এটি সমগ্র কুরআনের খোলাসা। এ-কারণেই মুক্তাদী ইমামকে অনুসরণ করে। ইমামকে জিম্মাদার বানিয়ে নেয় আর ইমাম আল্লাহর সামনে ফরিয়াদ করেন–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

তো মাসআলা দেখুন। প্রথমে দু'আ করা হলো। তারপর ইমাম পড়তে-পড়তে যখন সামনে বাড়বেন, তখন আল্লাহ তাকে বলে দিচ্ছেন–

ذَالِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

তো বোঝা গেল, সরল ও সঠিক, সহজ ও সোজা রাস্তার প্রার্থনা করা মানেই কুরআনের পথের প্রার্থনা করা। তবে এখানে সরাসরি কুরআনে اهدنا الصراط এর পর صراط القران والحديث বলা হয়নি। বলা হয়নি কুরআন ও হাদীছের পথে চলো। দেখুন, কিছু-কিছু মানুষ বলে, আমাকে কুরআন হাদীছ থেকে দলিল দাও! অথচ اهدنا الصِّراط المُستَقِيم এর পর বলা হয়েছে–

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

ওই বান্দাদের পথ, যারা নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছে।

জানা গেল, আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের পেছনে হাঁটতে হবে। এরই নাম একতেদা, এরই নাম তাকলীদ।

তাকলীদের ব্যাপারে দুটি কথা

তাকলীদ আমার আলোচ্য বিষয় নয়। তবু এ সম্পর্কে দুটি কথা বলছি। তাকলীদ ফরজ।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ

'তুমি অনুসরণ করো সেই ব্যক্তির, যে আমার প্রতি ধাবিত হয়েছে।'

এখানে আদেশসূচক শব্দ প্রয়োগ করে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, অনুসরণ করো তাদের, যারা আমার নৈকট্য প্রাপ্তিতে আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আমার যারা স্থলাভিষিক্ত, আমার যারা প্রতিনিধি। ব্যক্তি তাকলীদ তাকলীদ ওয়াজিব। আর মোটের ওপর তাকলীদ ফরজ। আমার ভাইয়েরা! আজ বলছ, আমি তাকলীদ করি না। দেখো, ইমামদের তাকলীদ অস্বীকার করে শেষে এখন ফাসেকদের তাকলীদ, নিজের নফসের তাকলীদ শুরু করেছ। আর প্রত্যেকে তোমরা মসজিদের ইমামের তাকলীদ তো নিশ্চয়ই করছ। তো তাকলীদ করছই যখন, আরেকজনের কথা মানছই যখন, তখন নেককার-পরহেযগার মহাজ্ঞানী আবু হানীফাকেই মানো।

আরেকটি বিষয় হলো, যখন কোনো সমস্যায় পড়, তখন তার সমাধান তো ওলামায়ে কেরাম থেকেই নাও। তো এদিকে বলছ, তাকলীদ করব না আর ওদিকে আবার ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া গ্রহণ করছ। বলো, তাহলে তোমাদের মতলবটা কী?

তো এত বেশি কথা বলব না। দলিল-প্রমাণ দেব না। শুধু বলব, যেকোনো এক ইমামকে মানো। কুরআন ও হাদীছ হতে যে সহীহ বুঝ আমাদের ইমামগণ অর্জন করেছেন, তা মান্য করো।

সোহবতের বরকত

আগেই এ-বিষয়ে কিছু কথা বলেছি। মোটমাট কথা হচ্ছে, সোহবতের বরকত অপরিসীম। আপনি অল্প সময়ে আমলে-আখলাকে উন্নত হয়ে যাবেন। সেরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান পাবেন। যে-পথ আপনি হাজার বছর চেষ্টা করে পাবেন না, তা পেয়ে যাবেন মাত্র কয়েক মুহূর্তের সোহবতের মাধ্যমে। তাই বড়দের সোহবত ইখতিয়ার করুন। সোহবতের বরকতেই অন্যসব ইবাদাত সুন্দরভাবে আদায় করার তাওফীক হবে। সোহবতের দ্বারা এমন স্তর অর্জিত হবে, যে স্তরে সোহবতহীন ইবাদাতে নিজে-নিজে করা ইবাদাতের মাধ্যমে হাজার বছরেও অর্জিত হবে না।

ওস্তাদ ছাড়া কিছুই হয় না

আজ তো সমগ্র দুনিয়া একমত যে, ওস্তাদ ছাড়া কোনো শিক্ষাই পোক্ত হয় না। গাড়ি চালাতে যদি ওস্তাদ লাগে, অন্য একটি ভাষা বুঝতে, জানতে ও সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে যদি ওস্তাদ লাগে, তাহলে কি কুরআন আর সুন্নাহর এত-এত বিস্তৃত বিষয় বুঝতে হলে ওস্তাদ লাগবে না?

ہر آں کارے کے بے استاد باشد

یقین دانی کہ بے بنیاد باشد

'প্রত্যেক ওই কাজ, যা ওস্তাদ বিনে সংঘটিত হয়েছে, নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো তা বিত্তিহীন হয়েছে।'

মাওলানা রুমি (রহ.) বলেছেন–

ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا

او نشیند در حضور اولیاء

যে-বান্দা চায়, আমি আল্লাহর সাথে বসব, তার উচিত আল্লাওয়ালাদের সাথে ওঠাবসা করা। তাহলেই তার বসা আল্লাহর সাথে বসার সমান হবে।

صحبت نیکاں اگر یک ساعت است

بہتر از صد سالہ زہد و طاعت است

'নেক লোকদের সাথে সামান্য সময়ের এক ঘণ্টার সোহবাত শত বছর ইবাদাত অপেক্ষা উত্তম।'

সোহবতের রং আসবে কীভাবে

তো প্রথমে আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক করতে হবে। তারপর মহব্বতের সাথে শায়খকে অনুসরণ করবে। শায়খ যা করতে বলেন, তা করবে আর যা বর্জন করতে বলেন তা বর্জন করবে। শায়খের প্রতিটি কথাকে আমলে আনবে। শায়খের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

গাছে কলম করা হয়। সাধারণ আম গাছে লেংড়া আমের কলব দিলে কিছু দিন পর ফল আসে। সেখানে কলমের শাখাটিতে ফল ধরে। তেমনি দেশী গোলাপ গাছে ফুল কম আসে। তাতে কলম লাগিয়ে দেওয়ার পর দেখা যায়, কলমের শাখাটি বড় হয়ে যায় এবং তাতে অনেক বেশি ফুল আসে।

তো মুরীদ হলো দেশি গাছ। যখন তার ওপর পীর সাহেবের সকল কাজের নমুনা চলে আসে, কলমের শাখায় ফোটা ফুলে-ফুলে সুশোভিত গাছটির মতো মুরীদের জীবনের সুন্দর সুবাসিত হয়ে যায়। তো বর্তমানে কামেল ব্যক্তির অভাব নেই। এখনও বহু বড়-বড় বুযুর্গ আছেন। তাদের সোহবতে গিয়ে আমাদের জীবনকে সুন্দর, সুশোভিত ও সুবাসিত করা আমাদের জন্য অপরিহার্য।

দেখুন, আম মুখে দিলেই তার স্বাদ পাবেন। মিষ্টান্ন মুখে নিলেই মিষ্টান্নের স্বাদ পাবেন। আপনি যদি মুখেই না নেন, গ্রহণই না করেন, স্বাদ চেখেই না দেখেন, তাহলে আপনি কীভাবে বুঝবেন ফলটির স্বাদ কেমন, মিষ্টান্নের মজা কেমন। তো শুধু দূর থেকে সোহবতের কী মূল্য? সোহবতের কী মূল্য? বললেই হবে না। সোহবতে এসে তার মূল্য, তার স্বাদ বুঝবার চেষ্টা করুন।

এশ্‌কের দৌলত পাবেন আশেকীনের কাছে

ইল্‌মের গুণ আমলের দ্বারা আর আমলের গুণ এশ্‌কের দ্বারা। দিলে এশ্‌কে এলাহী থাকলে আমলেও মজা আসবে, নামাযে স্বাদ পাবেন, তেলাওয়াতে স্বাদ পাবেন। আর এশ্‌কের দৌলত পাবে আশেকীনের দ্বারা।

হযরত ফজলুর রহমান গঞ্জেমুরাবদি মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মঙ্গেরি (রহ.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, মাওলানা! আপনি কি কখনও এশ্‌কের দোকান দেখেছেন? তিনি চিন্তা করে বললেন, জি হযরত! দুটা দোকান দেখেছি। জিজ্ঞেস করলেন, কোন-কোন দোকান? বললেন, শাহ আফাক ও গোলাম আলী দেহলবির দোকান।

হ্যাঁ; খানকাগুলোকেই এশ্‌কের দোকান বলা হলো। তো কাপড়ের দোকানে কাপড় পাওয়া যায় আর এশ্‌কের দোকানে এশ্‌ক পাওয়া যায়। আল্লাহওয়ালাদের খানকায় আল্লাহকে পাওয়া যায়।

ان سے ملنے کی ہے یہی اک راہ

ملنے والوں سے راہ پیدا کر

'তুমি আল্লাহর সাথে দেখা করতে চাইলে যার সাথে আল্লাহর দেখা আছে, তার সাথে দেখা করো।'

تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں

میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آیئے

'এই মহব্বতের পথে তো তুমি একা চলতে পারবে না। আমি চলছি; তুমি আমার সাথি হয়ে যাও।'

আল্লামা ইকবাল যেমনটি বলেছেন–

ہے وہی تیرے زمانے کا امام بر حق
جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے
موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست
زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے
دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے
فقر کی سان چڑھ کر تجھے تلوار کرے

তিনি তোমার সময়ের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ইমাম
যে তোমাকে উপস্থিত এবং বিদ্যমান বস্তুরাশি থেকে অমুখাপেক্ষী বানান।
মৃত্যুর আয়নায় তোমাকে দেখিয়ে রেখেছে বন্ধু
তোমার জন্যে জীবনকে করে দিয়েছে বড় কষ্টকর।
অনুভূতি জাগিয়ে তোমার লহু করে দিয়েছে তপ্ত-গরম।
দরিদ্রতার কষাঘাতে তোমাকে করেছে তরবারির মতো তেজিয়ান।

তো এমন পূর্ণ মুমিন এখনো আছেন এই দুনিয়ায়। যেখানে ইচ্ছে হয় আপনি চলে যান, আপনি কিছু না কিছু উপকার পাবেনই। ফায়দা অবশ্যই পাবেন।

স্বাদ নিয়ে দেখুন মজা পাবেন

ইবাদাতের এই স্বাদ আপনি পাবেন। স্বাদের হাজারো বর্ণনা দিলেও বুঝে আসবে না। আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের মাধ্যমেই শুধু এই স্বাদ ও মজা বুঝে আসবে। দেখুন, কোনো এক বান্দা জীবনেও আম দেখল না। তার সামনে যখন কেউ আমের বর্ণনা দেয়, তখন সাধারণতই সে ভাববে আম চিনি বা মিঠাই জাতীয় কিছু। এই লোকটিকে এবার যদি একটি আম খাওয়ানো যায়, তবেই সে বুঝতে পারবে আম মিষ্টি ঠিক, কিন্তু এই মিষ্টি অন্য রকম। তেমনিভাবে শুধু বয়ানের মাধ্যমে প্রকৃত স্বাদের কথা বোঝানো যাবে না। এটা বোঝা যায় আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের মাধ্যমে।

হযরত নানুতবি (রহ.)কে কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছিল, হযরত! আপনি হাজী সাহেবের হাতে বায়আত হয়েছেন; কেন তাঁর হাতে বায়আত হলেন? জবাবে তিনি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, একটি বিষয় হলো مبصرات আরেকটি বিষয় হলো ابصار। আমাদের مبصرات বেশি আর ابصار কম। আর হাজী সাহেবের ابصار বেশি, مبصرات কম। তাই তো আমাদের অন্তরে مقدمات উদিত হয় আর আমরা নতীজা বের করি কখনো ঠিক আর কখনো ভুল।

অবশ্য মুজতাহিদের ইজতেহাদি ভুলের কারণেও সাওয়াব মিলে। আমাদের ভুল হয়ে যায়। আর হাজী সাহেবের হৃদয়ে প্রথমে নতীজা উদিত হয়, আর مقدمات তো নিজে-নিজেই হৃদয়ে এসে যায়। তাই তো তিনি যা-ই বলেন, তা হয় পরিপূর্ণ কথা।

এশ্‌কের দৌলত পাবেন আশেকীনের কাছে

একটি মূলনীতি শুনুন। ইল্‌মের মজা আমল দ্বারা আর আমলের মজা এশ্‌ক দ্বারা। হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা জন্মালে আমল করেও মজা পাওয়া যায়। নামাযে মজা পাওয়া যায়, তেলাওয়াতে মজা পাওয়া যায়। ইল্‌মের মজা আমল দ্বারা আর আমলের মজা এশ্‌ক দ্বারা। আর এশ্‌ক অর্জিত হয় প্রেম-প্রণয়ের মাধ্যমে।

হযরত ফজলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদি (রহ) একবার হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরি (রহ.)কে জিজ্ঞেস করলেন, মাওলানা! আপনি কি কখনো এশ্‌কের দোকান দেখেছেন?

তিনি চিন্তাভাবনা করে উত্তর দিলেন, আমি দুটি দোকান দেখেছি।

জিজ্ঞেস করলেন, কোন-কোন দোকান?

তিনি বললেন, একটি শাহ আফাক (রহ.)-এর, আরেকটি গোলাম আলী দেহলবি (রহ.)-এর।

এখানে খানকাকে এশ্‌কের দোকান বলা হয়েছে। দেখুন, কাপড়ের দোকানে কাপড় পাবেন, সবজির দোকানে সবজি পাবেন। তেমনি এশ্‌ক ও ভালোবাসার দোকানে আপনি এশ্‌ক-ভালোবাসা পাবেন। আল্লাহওয়ালাদের খানকা নামক দোকানে আপনি আল্লাহকে খুঁজে পাবেন।

ان سے ملنے ہے یہی اک راہ

ملنے والوں سے راہ پیدا کر

'তাঁর সাথে প্রেমের মিলনের একটিই আছে পথ। আর সেই পথ হচ্ছে আল্লাহর সাথে যাদের সম্পর্ক আছে, তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।'

সুতরাং যে আল্লাহপ্রাপ্ত বান্দাদের সাথে সম্পর্ক গড়বে, সে আল্লাহকে পেয়ে যাবে।

تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں

میں چل رہا ہوں اپ میرے ساتھ اے

'এই মহব্বতের পথে তো তুমি একা চলতে পারবে না। আমি চলছি; তুমি আমার সাথি হয়ে যাও।'

তাবলীগ-তালীমের চেয়েও তাযকিয়া গুরুত্বপূর্ণ

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বলেছেন, জীবিকা উপার্জনে এমন মশগুল থাকা যে, মাস কেটে গেল আর আহলুল্লাহর সোহবতে যাওয়া সম্ভব হলো না; আমার নিকট এটা নাজায়েয।

তালীম ও তাবলীগ থেকেও আমার দৃষ্টিতে তাযকিয়া জরুরি। কারণ, গোমরা যত দল আছে, সেসবের প্রতিষ্ঠাতারা সকলেই ইল্মওয়ালা ছিল। কিন্তু তাযকিয়া না থাকার কারণে তারা গুমরাহ হয়ে গেছে। কারণ, ইল্ম দিয়ে কাজ হয় না যদি আমল না থাকে আর আমলের প্রতি ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয় আল্লাহওয়ালাদের সোহবত দ্বারা।

ইল্মের বিশ্বস্ততা

সোহবতে আসুন; তারপরই দেখতে পাবেন, আমাদের ইল্মের বিশ্বস্ততা বজায় রাখা উচিত। না হলে ইল্মের লাজ রক্ষা হবে না। হযরত থানবি (রহ.) বলতেন, এক জজ সাহেব আলেম ছিলেন। তার আদালতে একবার এক হিন্দু আর এক আলেমের মকদ্দামা এল। নিয়ম অনুযায়ী বিচারক রায় দিলেন আলেমের পক্ষে। সাথে-সাথে বলে দিলেন, এই মামলায় সমস্ত সম্পদসহ অতিরিক্ত সুদের আটশো টাকাও আপনার।

সে-সময় একজন শিক্ষকের বেতন ছিল মাত্র দু-টাকা। তো যার বেতন মাসে দু-টাকা, তিনি আটশোরও বেশি টাকা পেলে তো তা তার

জন্য আনন্দের বিষয়। অথচ এই আলেম বলে দিলেন, আমার সুদ ও মুনাফার অর্থের কোনো প্রয়োজন নেই।

জবাবে জজ সাহেব বললেন, আল্লামা শামী (রহ.) লিখেছেন–

لَا رِبٰوا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ

'দারুল হরবে মুসলমান ও হরবি তথা কাফেরের মাঝে লেনদেনে সুদ হয় না।'

আলেম একথা শুনে জজকে বললেন, জনাব! এ কেমন কথা! আপনি আমাকে সুদের টাকাগুলো দিয়ে দেবেন আর আমি বগলের নিচে ফাতাওয়া শামী নিয়ে মানুষকে বলে বেড়াব, দেখো, এই সুদ আমার জন্য জায়েয! বলুন! এটা কি হতে পারে?

হযরত থানবি (রহ.) বলেন, এটিই হচ্ছে ফিক্হ! দীনের জ্ঞানী ব্যক্তি তো বিষয়টি জায়েয লিখে দিয়েছেন; কিন্তু যেহেতু আলেম হিসেবে বিষয়টি মানায় না, তাই এই আলেম এই রায় নিজের লাভ সত্ত্বেও মেনে নিলেন না এবং তিনি সুদ নেওয়া থেকে বিরত থাকলেন।

মানবজীবনে এই গুণগুলো আসে আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের মাধ্যমে। সম্পদ নিজের জন্য জায়েয থাকার পরও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করলেন। সম্পদগুলো তিনি নিলেন না।

তাছাওউফের সর্বনিম্ন উপকারিতা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বলেছেন, আহলুল্লাহর সোহবত থেকে সর্বনিম্ন যে-ফায়দাটা হয়, তা এই যে, বান্দা নিজের দোষ নিজে দেখতে সক্ষম হয়। তাছাওউফ হাসিল করা ফরজ। দলিল হলো–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

'ও হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো আর কোনোমতেই মুসলিম ছাড়া অন্য কোনো অবস্থাতে মৃত্যুবরণ করো না।'[১]

এখানে আদেশসূচক সিগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। আর আদেশসূচক শব্দ দ্বারা ফরজ-ওয়াজিব হুকুম সাব্যস্ত হয়।

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০২

তো অন্তত নিজে বাঁচার জন্য, নিজের দোষ সংশোধনের জন্য তাছাওউফ হাসিল করা এবং নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া আবশ্যক।

একথাটা মাথায় রাখুন যে, তাছাওউফ যা-তা বিষয় নয়। একটু হাল এসে গেল আর নামাযে শরীক হয়ে গেলাম, যিকিরের মজলিসে বসে গেলাম। এর নাম তাছাওউফ নয়। তাছাওউফ তো বরং যোগ্যতা অর্জনের নাম যেন আখলাকে ইনসানিয়াত চলে আসে। এখলাছ এসে যাওয়া, বিনয়ের গুণ এসে যাওয়া-ই মূলত তাছাওউফ।

তাই তো আমার ব্যাপারে একথা প্রসিদ্ধ আছে যে, আমি আজকের যুগে আহলুল্লাহদের সোহবতকে ফরজ বলি। কারণ, সোহবত এখতিয়ার করলেই বান্দাকে দুনিয়ার কোনো ধোঁকা প্রভাবিত করতে পারে না। আজকের যুগে ফেতনা মহামারির আকার ধারণ করেছে। আজ মানুষ হাদীছ অস্বীকারকারী হয়ে গেছে। কেউ-কেউ নিজেদের আহলে কুরআন বলতে শুরু করেছে। এ-রকম নানা ফেতনা এযুগে মাথচাড়া দিয়ে উঠেছে। আহলুল্লাহর সোহবতে থাকলে এসব ফেতনা বান্দার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না।

আমাদের ওস্তাদ মাওলানা আশরাফ শাদ (রহ.) বলেন, আমার দৃষ্টিতে কোনো-না-কোনো শায়খের সোহবত এখতিয়ার করা মানেই এই আয়াতের লক্ষ্যবস্তু হয়ে যাওয়া–

وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا

'যে তাতে প্রবেশ করল, সে নিরাপদ হয়ে গেল।'[১]

যে বায়আত হয় এবং শায়খের হাতে হাত মেলায়, তার আকীদা-বিশ্বাস আর খারাপ হয় না। তবে হ্যাঁ বায়আত হতে হবে আকীদা শুদ্ধ আছে এমন মানুষের হাতে। যার হাতে বায়আত হবে, সে যদি জাহেল হয় আর বলে, আরে! ছাড়ো ইল্‌মের পথ, তা হলে এমন ব্যক্তির হাতে বায়আত না হয়ে আপন ঘরে ফিরে যেতে বলা হবে। বলা হয়, তাছাওউফ তো বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করার নাম। আপনারা হিম্মত করুন, সাহস করুন। অন্যথায় এমনও হতে পারে যে, আল্লাহকে অস্বীকার করে বসলেন। এমনও হতে পারে যে, দীনের কোনো অংশ অস্বীকার করে বসলেন। এতে তো আযাব এসে যেতে পারে।

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৯৭

گر ہوائے ایں سفر داری دلا

دامن رہبر بگیر و پس بیا

'হে আত্মা! হে দিল! যদি এই সফরের আশা-ই রাখ, তাহলে পথপ্রদর্শকের আঁচল ধরো।'

بے رفیقے ہر کہ شد در راہ عشق

عمر بگذشت ونشد آگاہ عشق

এশ্‌কের পথে নিঃসঙ্গ চলা আর জীবন নাশ করা এক কথা। সারাটা জীবন শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু এশ্‌ক পাওয়া যাবে না।

সোহবতের মাধ্যমে সহীহ্ দীনের ওপর অটল থাকা যায়

কেউ একথা না বোঝা চাই যে, আমি তো আলেম; আমার তো ইল্‌ম আছে; আমারও কি সোহবতে থাকতে হবে? আমারও কি আরেকজনের আঁচল ধরে, আরেকজনের হাত ধরে পথ চলতে হবে? দারুল উলূম দেওবন্দের যখন ভিত্তি স্থাপন করা হলো, তখন আল্লাহর কুদরতে শুরার সকলেই ছিলেন সাহেবে নেসবত। সকলেই ছিলেন শায়খের সোহবতপ্রাপ্ত। তাঁরা আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। ইল্‌ম অনুযায়ী তাঁদের আমল ছিল। তাঁরা সহীহ দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এজন্যই সহীহ দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হলেও তাছাওউফ জরুরি। আহলুল্লাহর সোহবত দ্বারা চারটি উপকার লাভ করা যায়।

(১) তাঁদের আলোচনা, তাঁদের কথা, তাঁদের মালফুযাত শুনে নিজের নফসের হীনতা বুঝে আসে।

(২) মানবস্বভাবে আমল করার এবং সুন্দর্য আখলাক অর্জনের যে গুণ আছে ,তার দ্বারা মানুষ আমল ও আখলাক নিজের মাঝে স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

(৩) মানুষ আল্লাহওয়ালার সোহবতে থাকার কারণে তাঁর দু'আয় শামিল হয়ে যায়।

(৪) যদি কোনো কারণে তোমার ওপর আহলুল্লাহর দিল খুশি হয়ে যায়, তাহলে তা তোমার কবুলকৃত দু'আ হয়ে গেল। কারণ, তাদের খুশি হওয়া-ই দু'আয়ে মুস্তাজাব হিসেবে গণ্য।

(৫) আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে চারটি উপকার রয়েছে

(৬) প্রথম উপকার হলো, আল্লাহ্ওয়ালাদের প্রজ্ঞাময় কথাবার্তা শুনে আত্মার বিস্মৃত বিষয় স্মরণ হয়ে যায়।

(৭) দ্বিতীয় উপকার হলো, মানুষসুলভ সদাচরণের অনুকরণ এবং চারিত্রিক উন্নয়ন সাধনের মানসিকতায় মানবস্বভাব সে বিষয়কে নিজের মাঝে ধারণ করতে শুরু করে।

(৮) তৃতীয় উপকার হলো, সোহবতে যাওয়ার কারণে আল্লাহওয়ালা বুযুর্গগণের দু'আয় শামিল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

(৯) চতুর্থ উপকার হলো, আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ কোনো বিষয়ে সোহবতে অংশগ্রহণকারী ব্যাক্তিটির উপর যদি খুশি হয়ে যান, তাহলে এটিও তার জন্য একটি সৌভাগ্য এবং এটি তার জন্য দু'আ পাওয়ার মাধ্যম।

(১০) রূহুল মা'আনী কিতাবে আছে, আল্লাহওয়ালা বুযুর্গরা খুশি হওয়াও দু'আ পাওয়ার মাধ্যম।

(১১) আমরা সুফিবাদের নিয়মকানুন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত গুনাহ এবং ময়লা থেকে অভ্যন্তরকে পরিচ্ছন্ন করার বিষয়কে অস্বীকার করি না।

নেসবত প্রাপ্ত হওয়ার গ্যারান্টি

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বলেছেন, তিনটি কাজ করো; আমি তোমাকে নেসবত পাওয়ার গ্যারান্টি দেব।

১. নেক আমলের গুরুত্ব দাও।

২. সালেহীনের সোহবত ইখতিয়ার করো, কারও হাতে বাইআত হও।

৩. তাঁদের কথামতো অধিকহারে যিকির করো। তিনি বলেছেন, তিনটি কাজ করবে; তাহলে আল্লাহর কসম! আল্লাহর কসম! আল্লাহর কসম! তিনবার কসম খেয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাদের নেসবতের নূর দান করবেন। দেখুন, এটা আমার কথা নয়, সাধারণ কোনো মানুষের কথা নয়– মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)-এর কথা।

গায়রে মুকাল্লিদদের আকাবিরগণও তাছাওউফের প্রবক্তা ছিলেন

আজকাল কিছু আধুনিক পরহেযগার দেখবেন, তারা তাছাওউফকে অস্বীকার করে। তারা মনগড়া কথা বলছে এবং নফসের পূজা করে যাচ্ছে। অথচ তাদের পূর্ববর্তীরা তাছাওউফেরই লোক ছিলেন। শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব নজদি তাছাওউফের প্রবক্তা ছিলেন। তার কিতাব مؤلفات الفتاوى والمسائل -এ তিনি লিখেছেন

إِذَا كَانَ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الدِّيْنِ مِنْهُمْ مَنْ يَتَعَانِىْ بِالْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَيَقُوْلُ لَهُ الْفُقَهَاءُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَعَانِىْ بِالْعِبَادَةِ وَطَلَبِ الْاٰخِرَةِ كَالصُّوْفِيَةِ فَبَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ بِهٰذَا الدِّيْنِ الْجَامِعِ لِلنَّوْعَيْنِ

'যাদের দীনি ব্যক্তিত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, তাঁরা দুই ধরনের। এক ধরনের হলেন, যাদের লক্ষ্য জ্ঞান ও ফেকাহ। এদের ফোকাহা বলা হয়। অপর দল হলেন, যাদের লক্ষ্য হলো ইবাদাত ও আখেরাতের অন্বেষণ। যেমন– সূফিয়ায়ে কেরাম। এই উভয় বিষয়ের সমন্নয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এই দীনসহ প্রেরণ করেছেন।

তিনিই অন্যত্র লিখেছেন–

وَلِهٰذَا كَانَ الْمَشَايِخُ الصُّوْفِيَةُ وَالْعَارِفُوْنَ يُوْصُوْنَ كَثِيْرًا بِمُتَابَعَةِ الْعِلْمِ

'আর এ-কারণেরই মাশায়েখে সূফিয়া ও আরেফগণ ইলম অনুযায়ী আমল করতে বেশি-বেশি উপদেশ দিতেন।'

তিনি আরও লিখেছেন–

وَمِنَ الْعَجَائِبِ فَقِيْهٌ وَصُوْفِىٌّ وَعَالِمٌ وَزَاهِدٌ

'একজন মানুষ ফকীহ ও হলেন, সূফিও হলেন, আলেমও হলেন আবার যাহেদও হলেন; এক এক বিস্ময়কর ব্যাপার!

মোটকথা, তিনি বারবার বলতে চেষ্টা করেছেন যে, তাছাওউফের লোক ফকীহ ছিলেন, আলেম ছিলেন, সূফি ছিলেন। তাঁরা ইল্ম অনুযায়ী আমল করতেন এবং আল্লাহর এশ্ক ও মহব্বত তাঁদের মাঝে বিদ্যমান ছিল।

وَلَا نُنْكِرُ طَرِيْقَةَ الصُّوْفِيَّةِ وَتَنْزِيَهَ الْبَاطِنِ مِنَ الرَّذَائِلِ الْمَعَاصِىْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ

যখন তার ছেলে নিজেই বলছেন, আমরা অস্বীকার করি না, তা হলে এই লোকগুলো কীভাবে অস্বীকার করে দেয়। মন-মর্জির কথাবার্তা হয়ে যায় না? যেকথাটা পছন্দ হলো, সেই কথাটা মেনে নিলাম, সেটা গ্রহণ করলাম আর যেকথাটা পছন্দ হলো না, সেটা মানলাম না। এ কেমন কথা?

ভাই! আপনি সোজাসুজি বলে দিন। এক তো হলো ফিকহে মালেকী, আরেক আছে ফিকহে হাম্বলী, আরেক আছে ফিকহে শাফেয়ী আর আছে ফিকহে হানাফী। এগুলোর কোনো একটির উপর আমল করা উচিত। তা না করে আপনারা তো দেখছি ফিকহে নফসানীর উপর আমল করতে শুরু করেছেন। আপনাদের ইমাম তো নফস। আপনারা নফসের ইকতিদা করছেন। তাই বড়দের মানছেন না, বরং বলা যায় মানার তাওফীক পাচ্ছেন না, এদিকে নিজের মনে যাই চাচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছেন।

এখন দেখুন! আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ইমামের পেছনে ফাতেহা পড়ার কথা বলেন না। তাঁর একথাটাকে তারা মানে না। আবার দেখুন, ইমাম বোখারি বলেন, তিন তালাক দিলে শরয়ীভাবে তিন তালাক হয়ে যাবে। অথচ ওই লোকগুলো তাঁর একথাটা মানে না। একেই বলা হয় ফিকহে নফসানী বা নফসের আনুগত্য। হাফেয ইবনুল কায়্যিম (রহ.) আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র। আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার শাগরেদ হাফেয ইবনুল কায়্যেম طبقات حنابل গ্রন্থে লিখেছেন–

اِبْنُ قَيِّمٍ وَكَانَ عَالِمًا بِعِلْمِ السُّلُوْكِ وَكَلَامِ اَهْلِ التَّصَوُّفِ وَاِشَارَاتِهِمْ وَدَقَائِقِهِمْ

'ইবনে কায়্যেম সুলূক ও আহলে তাছাওউফের কথা ও তাঁদের ইশারা-ইঙ্গিত সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।'

মোটকথা, এতটুকু বুঝে রাখুন যে, তাছাওউফ জরুরি, তাযকিয়া ফরজ। আর বড়-বড় যত আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ অতীত হয়েছেন, সকলেই তাছাওউফ হাসিল করেছেন। প্রত্যেকে শায়খের সোহবতে থেকে আমলের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহির ওপর সোহবতের প্রভাব

এবার সামনের কথা শুনুন। বড়-বড় ওলামায়ে কেরাম আপন-আপন মাশায়েখের কাছে গমন করেছেন। নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য সফর করেছেন। নিজের হৃদয়ে সেই আধ্যাত্মিক নূর অর্জন করার জন্য সফর করেছেন। মন দিয়ে কয়েকটি কথা শুনুন। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.) ইল্‌ম হাসিলের পরে প্রথমেই হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর

কাছে গমন করেছেন। তার ইচ্ছে ছিল হযরতের সঙ্গে দেখা করেই চলে আসবেন। দেখাসাক্ষাতের পর্ব শেষে ফেরার জন্য হযরত গাঙ্গুহি অনুমতি চাইলেন।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) বললেন, মিয়া রশীদ আহমদ! আমাদের কাছে কয়েকটা দিন থাকো।

হযরত গাঙ্গুহি বললেন, হুজুর! আগামী কাল থেকে আমাকে পড়াতে হবে। এখানে থাকলে তো ছাত্রদের ক্ষতি হয়ে যাবে।

হাজী সাহেব বললেন, মিয়া! কালই চলে যেয়ো; আজকের দিনটা থাকো।

হযরত গাঙ্গুহি বললেন, হুজুর! এটা তো আপনার খানকা। রাতে সালেকরা উঠে যাবে, তাহাজ্জুদ আদায় করবে, যিকির করবে। আমার তো এর মধ্যে ঘুমই আসবে না। আমি তো সফরে ক্লান্ত। এভাবে রাত জাগব আবার সকালে সফর করতে হবে। এর পর তো আমি পড়াতে পারব না।

হাজী সাহেব বললেন, মিয়া! তুমি ঘুমিয়ে থেকো। তোমাকে কেউ জাগাবে না।

হযরত গাঙ্গুহি বললেন, ঠিক আছে হুজুর!

হযরত গাঙ্গুহি থেকে গেলেন।

হাজী সাহেব বললেন, রশীদ আহমদের সিট আমার কাছাকাছি জায়গায় দাও! রাতে হযরত গাঙ্গুহি শুয়ে গেলেন। তিনি বলেন, যখনই তাহাজ্জুদের সময় হলো, আমার চোখ খুলে গেল। আমি দেখলাম, কেউ নামায পড়ছে, কেউ তেলাওয়াত করছে, কেউ যিকির করছে। কেউ দু'আ করছে।

হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.)। তাঁর শায়খের সোহবতে থেকেই তো এত বড় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। এ-ব্যাপারে আমরা পেছনে আলোচনা করেছি। তাঁর আমল-আখলাক, তাঁর ইল্‌ম ও মারেফাতের কথা আমরা পেছনে আলোচনা করেছি। তো আমলের জন্য আমাদের সাধনা করা উচিত। আম্বিয়া কেরামের গুণ আমাদের মাঝে আনয়ন করা উচিত।

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

'তারা রাতের সামান্য সময়ই নিদ্রায় কাটাত এবং রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।'[১]

---

১. সূরা যারিয়াত : আয়াত ১৭, ১৮

মুফতী মুহাম্মাদ হাসান (রহ.)-এর উপর সোহবতের প্রভাব

আমাদের পাঞ্জাবের বড় মাদরাসা জামি'আ আশরাফিয়া। সেই মাদরাসারই প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান (রহ.)। অনেক বড় যোগ্য আলেম তিনি। হযরত থানবি (রহ.)-এর কাছে বারবার আসতেন আর বলতেন, হযরত! আমাকে বায়আত করিয়ে নিন! হযরত থানবি (রহ.) তাকে বারবার ফিরিয়ে দিতেন। হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান (রহ.) যতই আবেদন করতেন, হযরত থানবি (রহ.) বলতেন, আরে! বায়আতের উদ্দেশ্য তো মহব্বত অর্জন করা। আর তা তো তোমার মধ্যে আছেই।

আমাদের দেশে আমরা পোলাও-রিরিয়ানি পাকানোর সময় শেষে ভালো করে ঢাকনাটা মুড়িয়ে দিই যেন এর মধ্যে স্বাদ ভালো করে আসে। তো হযরত থানবিও তাকে ফিরিয়ে দিয়ে-দিয়ে যেন পোলাওটাকে শেষ পাক দিয়ে নিচ্ছেন।

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান (রহ.) বলেন, একদিন আমার ভেতর এমন জযবা ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো যে, আমি বললাম, আজ আমি বায়আত হওয়া ছাড়া ফিরবই না। আমি ছুটে গেলাম। হযরত থানবি (রহ.) তখন কিছু লিখছেন। আমি বললাম, হযরত! আমি নিয়ত করে এসেছি, আজ বায়আত না হয়ে আমি ফিরব না।

আমার কথা শুনে হযরত থানবি (রহ.) কাগজটা অন্য দিকে রেখে আমার দিকে মনোনিবেশ করলেন। বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে , বায়আত করব; তবে আমার কিছু শর্ত আছে।

আমি বললান, বলুন!

হযরত থানবি (রহ.) বলতে শুরু করলেন–

প্রথম শর্ত : যে-কিতাবগুলি আপনি অমুক গাইরে মুকাল্লিদ আলেমের কাছে পড়েছেন, সেগুলো আবার দারুল উলূমের ওস্তাদগণের কাছে পড়ে নেবেন। এমনকি ছাত্রদের সঙ্গে বসেই পড়বেন।

ইয়া আল্লাহ! এত দিন ছাত্র পড়ালাম আর এখন তাদের সাথেই পড়ব! একাকী কামরায় বসে পড়ার কথা বললে তো মানা যেত। এ তো অনেক কঠিন শর্ত। কিন্তু হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান (রহ.) বললেন, ঠিক আছে হযরত! আমি পড়ে নেব।

দ্বিতীয় শর্ত : আপনারা যারা পাঞ্জাবের অধিবাসী, আপনারা কুরআন মাজহুলভাবে তেলাওয়াত করেন। কারণ, পাঞ্জাবের ভাষার মধ্যে মাজহুল ও

গুন্না বেশি। তাই আপনি কোনো কারী সাহেবের কাছে তেওয়ালে মুফাস্‌সাল দিয়ে নামায আদায় করতে পারেন এ পরিমাণ কেরাত শিখে নেবেন।

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান (রহ.) বলেন, ঠিক আছে হযরত! আমি শিখে নেব।

তৃতীয় শর্ত : আপনি আমাকে আপনার জীবন যাপনের ব্যাপারে পর্দার আড়াল থেকে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দেবেন।

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান (রহ.) বলেন, ঠিক আছে হযরত! এরও এখতিয়ার দিলাম।

এভাবে তিনি বায়আত হয়ে গেলেন। এই বায়আতের পরেই আল্লাহ তাআলা মাত্র কয়েক দিনের মাথায় তার সিনাকে আধ্যাত্মিক নূরে ভরে দিলেন।

দেখুন, তাকে ফিরিয়ে দিতে-দিতে তার ভেতর যখন পিপাসা তীব্র আকার ধারণ করেছে, এবার তিনি নিজেকে কীভাবে সঁপে দিতে পারলেন। দেয়াশলাই যদি শুকনো হয়, তখন ঘষা দেওয়ার সাথে-সাথেই আগুন জ্বলে ওঠে। ইল্‌মের সাথে যদি আমল থাকে, তা হলে কেমন যেন দেয়াশলাই প্রস্তুতই করে রাখা আছে; আল্লাহওয়ালা বুযুর্গগণ শুধু আগুনটা লাগিয়ে দেন।

তারপর আল্লাহ হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসানকে কত উচ্চ মাকাম ও মর্যাদা দান করলেন!

আল্লাহর শান দেখুন! যখন নীল গম্বুজে জামিআ আশরাফিয়া মাদরাসার সূচনা হয়, সে-সময় গোটা লাহোর অঞ্চলে এটিই ছিল বড় মাদরাসা। এখান থেকে কিছু ওস্তাদ বের হয়ে একটি মাদরাসা করলেন। একটি ছোট গলিপথের মতো স্থানে তিনি এটা শুরু করেন।

সামনের ঘটনাটি হযরত ফজলুর রহমান (রহ.) নিজে আমাদের শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, আমার বয়স তখন কম ছিল। এমন স্থানে মাদরাসা করাকে আমি মেনে নিতে পারিনি। আমি আমার বাবার কাছে বললাম, আব্বু! দেখুন তো কেমন হলো! একে তো আগের মাদরাসার সঙ্গে তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আবার এখানে কত ছোট জায়গায় মাদরাসা করে বসেছেন! আমার বাবা আমাকে বললেন, আরে বেটা! মনে করো, তোমার মাথায় একটা ভারী বোঝা। তোমার ঘাড় মটকে যাবে অবস্থা। এমন সময় তোমারই কোনো এক বন্ধু এসে তোমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। তোমার বোঝার অর্ধেক সে নিজের মাথায় তুলে নিল। এমন পরিস্থিতিতে তুমি তোমার এই বন্ধুকে কি শত্রু মনে করবে?

আমি বললাম, তাকে আমি সবচেয়ে উপকারী বন্ধু মনে করব। এবার আব্বু বললেন, আরে! পুরো শহরে শুধু মাদরাসা ছিল আমাদেরটা। আর সমস্ত বোঝা ছিল আমার ঘাড়ে। অবশেষে আরেকটা মাদরাসা হলো। আমারই ভাই-বন্ধুরা আমার মাথা থেকে কিছু বোঝা নিয়ে গেল। এরা-ই আমার আসল উপকারী বন্ধু।

এই এখলাছ তাকে কে শিক্ষা দিল? হযরত থানবি (রহ.)-এর সোহবত শেখাল।

হযরত মুফতী মাহমুদ হাসান সাহেব (রহ.)। তাঁর মাঝে তাঁর শায়েখের সোহবতে আমলের জযবা পায়দা হয়েছে। আল্লাহ তাঁকে মাকবুলিয়্যাত দান করেছেন। তিনি তাঁর শায়খ থেকে সোহবত উঠিয়েছেন এবং ফয়েজ লাভ করেছেন। আজ আমাদের অজ্ঞতা সীমা ছড়িয়ে গেছে। হযরত সায়্যেদ সুলাইমান নদবি বড় মাপের আলেম ছিলেন। তিনি হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)-এর সাক্ষাতে এসে প্রশ্ন করলেন, হযরত! তাছাওউফ কাকে বলে? থানবি (রহ.) বললেন, নিজেকে মিটিয়ে দেওয়ার অপর নাম হচ্ছে তাছাওউফ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, হযরত! দীনে এর ভিত্তি কী? হযরত বললেন, তুমি কিছু দিন আমার কাছে থাকো; কোনো প্রশ্ন করো না।

তিনি থাকতে লাগলেন। হযরত নদবি সাহেব বলেন, মাত্র দুদিন পরই হযরতের নূরানি তাওয়াজ্জুহর দ্বারা এমন হলো যে, আমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম। আমার প্রশ্নগুলো দূর হয়ে গেল। ফলে আমি নিজেকে বাইআতের জন্য পেশ করে দিলাম। তিনি আরও বলেন, লোকেরা আমাকে আল্লামা বলে, বড় আলেম বলে, মহাজ্ঞানী বলে। অথচ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)-এর দরবারে গিয়েই আমি আমার অজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন হলাম।

কেম্বলপুরি থেকে কামেলপুরি

হযরত আবদুর রহমান কেম্বলপুরি বোখারি শরীফ পড়াতেন। তিনি চলে এলেন থানাভবনে হরযত থানবির দরবারে। তিনি বোখারি শরীফ পড়াতেন। তবে আমলে রং পেতেন না। তিনি এলেন বায়আত হওয়ার জন্যে। তিনি এমন সোহবত গ্রহণ করেছেন যে, হযরত থানবি (রহ.) নিজেই বলেন, সে তো কেম্বলপুরি থেকে কামেলপুরি হয়ে গেছে।

মূর্খতার অনুমান

হযরত সায়্যেদ সুলাইমান নদবি বড়মাপের আলেম ছিলেন। তিনি হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)-এর সাক্ষাতে এসে প্রশ্ন করলেন, হযরত! তাছাওউফ কাকে বলে? থানবি (রহ.) বললেন, নিজেকে মিটিয়ে দেওয়ার অপর নাম হচ্ছে তাছাওউফ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, হযরত! দীনে এর ভিত্তি কী? হযরত বললেন, তুমি কিছু দিন আমার কাছে থাকো; কোনো প্রশ্ন করো না।

তিনি থাকতে লাগলেন। হযরত নদবি সাহেব বলেন, মাত্র দুদিন পরই হযরতের নূরানি তাওয়াজ্জুহর দ্বারা এমন হলো যে, আমি আমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম। আমার প্রশ্নগুলো দূর হয়ে গেল। ফলে আমি নিজেকে বায়আতের জন্য পেশ করে দিলাম। তিনি আরও বলেন, লোকেরা আমাকে আল্লামা বলে, বড় আলেম বলে, মহাজ্ঞানী বলে। অথচ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)-এর দরবারে গিয়েই আমি আমার অজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন হলাম।

যদি কোনো শুআইব আসে...

বোঝা গেল, যদি এই গুণ আমরা অর্জন করতে চাই, তাহলে নিজেকে আগে সমর্পণ করতে হবে।

كَالْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْغَسَّالِ

'গোসল প্রদানকারীর হাতে মাইয়্যেতের মতো নিজেকে শায়েখের হাতে সমর্পণ করতে হবে।'

اگر کوئی شعیب آئے میسر
شبانی سے کلیمی دو قدم ہے

হযরত মূসা (আ.) যেভাবে শুয়াইব (আ.)-এর সংস্পর্শে আসার পরই রাখাল থেকে হয়ে গেলেন নবী, হয়ে গেলেন কালীমুল্লাহ, তেমনিভাবে আমরা যদি কোনো শুয়াইবের হাতে যেতে পারি, তো আল্লাহওয়ালা হয়ে যেতে পারব।

گر تو سنگ خارۂ مرمر شوی
چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی

'তুমি পাথর হতে পার; কিন্তু কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবতে এসে তাঁর হাতে নিজেকে সঁপে দাও। দেখবে, তিনি তোমাকে হিরে-মুতি-পান্না বানিয়ে দেবেন।'

আল্লাহ আমাদের বুযুর্গানে দীনের মজলিসে বসার, তাঁদের কথা শোনার এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر
انہی کے اتقا پر ناز کرتی ہے مسلمانی
گر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کے مزے آئیں
جو آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخن دانی

'তাঁরা ওই সকল বুযুর্গানে দীন, যাঁদের ঘুম ইবাদাত থেকেও উত্তম। অন্যরা ইবাদাত করা যেমন, তাঁরা নিদ্রা গেলেও তেমন। তাঁদের তাকওয়া, তাঁদের খোদাভীতি, পরহেযগারি বিশ্ব মুসলিম প্রত্যক্ষ করছে। তা তাদের জন্য নেয়ামত। এমন বুযুর্গানে দীন যখন নির্জনে বসেন, তখন তাঁরা নির্জনে নন, আল্লাহর সম্মুখে থাকেন। একাকিত্বের মাঝে সঙ্গীর সাথে থাকার স্বাদ পান আর শত-সহস্র সঙ্গীর মাঝেও তাঁরা থাকেন নিশ্চুপ ও ধ্যানমগ্ন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

: সমাপ্ত :